...ন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ১৫।

জ্ঞানের মামাল-বিশেষ।

জ্ঞান-মাত্রেতেই এমন একটি অবয়ব থাকা চাই, যাহা সাধারণতঃ সকল জ্ঞানেতেই আছে; আবার, এমনও একটি অবয়ব (অথবা অবয়ব সমষ্টি) থাকা চাই, যাহা কেবল সেই জ্ঞানটিতেই আছে; অথবা যাহা একই কথা—জ্ঞান-মাত্রেরই একটি অপরিবর্ত্তনীয় অবশ্যম্ভাবী সার্ব্বভৌমিক (অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমান) অবয়ব, এবং একটি পরিবর্ত্তনীয়—আগন্তুক—বিশেষ (অর্থাৎ জ্ঞান-ভেদে বিভিন্ন) অবয়ব, দুইই থাকা চাই; ...রা, পরিবর্ত্তনীয়—আগন্তুক—বিশেষ—অবয়ব-টিকে ছাড়িয়া, অপরিবর্ত্তনীয়—অবশ্যম্ভাবী—সার্ব্বভৌমিক—অবয়বটিকে জ্ঞান। ...ত পারে না; তেমনি আবার, অপরি...নীয়—সার্ব্বভৌমিক—অবশ্যম্ভাবী অবয়বটিকে ছাড়িয়া পরিবর্ত্তনীয় আগন্তুক বিশেষ অবয়বটিকে জ্ঞানা হইতে পারে না; মোট কথা এই,—এ দুইটি অবয়বের কোন-টিই অন্যটিকে ছাড়িয়া একাকী জ্ঞান-পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে না: পরন্তু, জ্ঞান-মাত্রই ঐ দুই অবয়বের সংযোগ-সাপেক্ষ।

থাকিতেই চায়, যাহা জ্ঞান-মাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। তেমনি আবার,—প্রত্যেক জ্ঞানেই যদি এমন একটি অবয়ব না থাকিত, যাহা সেই জ্ঞান-টির বিশেষ লক্ষণ, তাহা হইলে জ্ঞান-সমূহের মধ্যে কোন প্রকার বৈচিত্র্য থাকিতে পারিত না; এক জ্ঞান আর এক জ্ঞান হইতে পৃথক্ রূপে বিবেচিত হইতে পারিত না। কিন্তু, বিভিন্ন জ্ঞান পরস্পর হইতে পৃথক্ রূপে বিবেচিত হইতে দেখা যায়। তাহারা শুধু কেবল জ্ঞান বলিয়া পরিচিত নহে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ জ্ঞান বলিয়া পরিচিত। অতএব প্রত্যেক জ্ঞানে এমন একটি অবয়ব (অথবা অবয়ব-সমষ্টি) থাকিতেই চায়, যাহা সেই জ্ঞানের বিশেষ লক্ষণ। এইরূপে দাঁড়াইতেছে যে, জ্ঞান-মাত্রই দুইটি উপাদানে বিনির্ম্মিত;—তাহার মধ্যে একটি অপরিবর্ত্তনীয়, অবশ্যম্ভাবী, এবং সার্ব্বভৌমিক—এটি সর্ব্বত্রই সমান,—আর-একটি পরিবর্ত্তনীয়, আগন্তুক, এবং বিশেষ—এটি জ্ঞান-ভেদে বিভিন্ন; এই দুই অবয়বের কোনটিই স্বতঃ (অর্থাৎ আর একটিকে ছাড়িয়া শুদ্ধ কেবল আপনি একাকী) জ্ঞান-পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে না; জ্ঞান-মাত্রই ঐ দুই বিভিন্ন অবয়বের সংযোগ-সাপেক্ষ।

—— ...ই কি আর আগন্তুক এবং কি

বটে। ঐ দুইটি অবয়বের সংযোগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। এমন কি, ও-দুইটি অবয়বের কোন একটির অসদ্ভাবে জ্ঞানের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—আগন্তুক অবয়বটি দল-কে-দল সমস্তই উচ্ছিন্ন অথবা পরিত্যক্ত হইতে পারে না বটে, কিন্তু তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তাহা অসীম পরিবর্ত্তন-ক্ষম—যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন-ক্ষম। জ্ঞানের আগন্তুক অবয়ব, বা বিশেষ অবয়ব, যাহা কেন হউক্ না (যেমন বৃক্ষ) তাহা অনায়াসে অপসারিত হইতে পারে, তবে কি না—তাহার পরিত্যক্ত স্থানে আর কোন-একটি বিশেষ অবয়ব (যেমন অট্টালিকা কিম্বা আর কোন কিছু) সন্নিবেশিত হওয়া চাই—তাহা হইলেই জ্ঞান যেমন তেমনি অব্যাহত থাকিবে। এ অবয়বটিকে যে "আগন্তুক" বলা হয় তাহা এ জন্য নহে যে, জ্ঞানে সেরূপ কোন একটি অবয়ব না থাকিলেও চলিতে পারে,—এ জন্য নহে যে, আগন্তুক অবয়ব ব্যতিরেকেও জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে;—উহাকে আগন্তুক বলিবার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল এই যে, উহা পরিবর্ত্তন-ক্ষম। পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই উহা আগন্তুক। জ্ঞানের মধ্যে একটা-না-একটা কোন প্রকার বিশেষত্ব প্রবিষ্ট না হইলে জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু তাহা বলিয়া বিশেষ এইটি না ঐটি জ্ঞানের অঙ্গসাৎ না হইলে যে জ্ঞান সিদ্ধ হইবে না—এমন কোন কথা নাই; কারণ, বিশেষত্বের প্রকার-ভেদ অপরিসীম। একটা অন্তর্হিত হইবা-মাত্র আর একটা তাহার স্থানে উপস্থিত হয়। জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব যখনই যাহা উপস্থিত, তখনই তাহার পরিবর্ত্তে আর একটা কিছু উপস্থিত হইলেই হইতে পারে;—তাহা যদি হইতে না পারিত, তবে জ্ঞানের বৈচিত্র্য একেবারেই বিলুপ্ত হইত ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বিলুপ্ত হইত। আমাদের জ্ঞানে পুস্তকের পরিবর্ত্তে পুষ্প উপস্থিত হইতে পারে শব্দের পরিবর্ত্তে বর্ণ উপস্থিত হইতে পারে; একটা বিশেষের পরিবর্ত্তে আর-একটা বিশেষ উপস্থিত হইতে পারে। এই জন্য জ্ঞানের এই অবয়বটি আপনার যাবতীয় প্রকার ভেদের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত—আগন্তুক। পক্ষান্তরে, জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়বটিকে যে, অবশ্যম্ভাবী বলা যায়—তাহা এজন্য নহে যে, একা কেবল তাহারই বলে জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে,—এজন্য নহে যে, জ্ঞান-সিদ্ধির জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই; উহাকে অবশ্যম্ভাবী বলিবার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল এই যে, উহা অপরিবর্ত্তনীয়। জ্ঞানের এ অবয়বটিতে কোন পরিবর্ত্তনই তরঙ্গিত হইতে পারে না,—এ অবয়বটি এমনি খাদের সুর যে, ইহার উপর গিট্‌কিরি চলে না। এ অবয়বটি সকল জ্ঞানেরই সাধারণ ধর্ম্ম হওয়াতে ইহার উপর পরিবর্ত্তনের আদবেই কোন অধিকার নাই; ইহা সকলেতেই সমান হওয়াতে ইহার আসনে দ্বিতীয় কেহই বসিবার যোগ্য নহে; ইহা সর্ব্বত্র একাকী হওয়াতে ইহার রূপান্তর অসম্ভব। এ অবয়বটি এক সময়ে যেরূপ সকল সময়েই সেইরূপ; ইহা—যাহা আছে তাহাই আছে—তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না;—তাহা যদি হইতে পারিত, তবে আর উহা সকলেরই সাধারণ ধর্ম্ম হইত না;—তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান-সমূহ ঐক্য ভ্রষ্ট হইত। বৈচিত্র্য-বিলোপেও যেমন—ঐক্য বিলোপেও তেমনি—জ্ঞান আর জ্ঞান থাকে না। অতএব, এক হিসাবে জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী এবং আগন্তুক এই দুই অবয়বের উভয়েই অবশ্যম্ভাবী; আর এক হিসাবে অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ে দুয়ের মধ্যে

সুস্পষ্ট প্রভেদ দুই হয়; যথা,—জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়বটির যে, অবশ্যম্ভাবিতা, তাহা দ্বিগুণ অবশ্যম্ভাবিতা; (১) এ অবয়বটি উচ্ছিন্ন হইতেও পারে না—(২) পরিবর্ত্তিত হইতেও পারে না। বিশেষ অবয়বটির অবশ্যম্ভাবিতা একগুণ মাত্র; বিশেষ অবয়বটি দল-কে-দল উচ্ছিন্ন হইতে পারে না—এই মাত্র;—জ্ঞান-মাত্রেতেই কোন না কোন বিশেষত্ব লাগিয়া থাকা চাই; কিন্তু সেই যে, বিশেষত্ব বা বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা পরিবর্ত্তনীয়; অনবরতই—তাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিবর্ত্তনই তাহার মুখ্য পরিচয় চিহ্ন; এই জন্য তাহার সমস্ত আকার-ভেদ এবং প্রকার-ভেদের মধ্যে তাহা আগন্তুক।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অবতারণার উদ্দেশ্য কি? ॥২॥

উপক্রমণিকায় বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য চুপিচুপি মানিয়া লওয়া হইয়াছিল; এমন কি আমাদের মূল প্রশ্নটির উল্লেখ করাতেই বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ উপক্রমণিকায় যখন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে যে, এমন একটি অপরিবর্ত্তনীয় সাধারণ অবয়ব কি এমন একটি অপরিবর্ত্তনীয় স্থায়ী অবয়ব কি, যাহা সকল জ্ঞানেই বর্ত্তমান,—তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, সেরূপ একটি অদ্বিতীয় স্থায়ী অবয়ব অবশ্যই আছে, আর তা'ছাড়া আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে এমন আর এক প্রকার অবয়বও আছে যাহা পরিবর্ত্তনীয় এবং বিশেষ-ধর্ম্মী। তবে যে এখানে পুনর্ব্বার সেই কথার অবতারণা করিয়া তাহার প্রমাণ দেখানো হইতেছে—তাহার কারণ এই যে প্রথমতঃ জ্ঞানের প্রকৃত অঙ্গ-নির্ব্বাচন কোথাও যদি হইয়া থাকে তবে তাহা এই সিদ্ধান্তে; দ্বিতীয়তঃ, সামান্য বিশেষ সম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্ত যদি প্রমাণসঙ্গত হয় তবে তাহা এই সিদ্ধান্ত; তৃতীয়তঃ, সামান্য বিশেষ সম্বন্ধীয় নানাবিধ কূটতর্ক যাহার মীমাংসা আজ পর্য্যন্তও শেষ হয় নাই—বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ-সূত্রে তাহার ইতিবৃত্ত উপলক্ষে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিবার পথ পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত ঐ-সমস্ত কূট-তর্কের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিবে। চতুর্থতঃ, আত্মা ভৌতিক বস্তু বলিয়া উপলব্ধি-সাধ্য নহে—ইহা প্রমাণ করিতে হইলে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কোন-ক্রমেই সম্ভবে না; আর, ইহার প্রমাণের উপরেই অস্তি-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তের প্রমাণ নির্ভর করে; ইহারই জন্য, প্রধানতঃ, বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অবতারণা।

জ্ঞানকে ছাড়িয়া সামান্য বিশেষের প্রশ্ন আন্দোলন ॥৩॥

তত্ত্বজ্ঞানের আর আর প্রশ্নের ন্যায়—সামান্য বিশেষ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিপরীত প্রান্ত হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। এই প্রশ্নটিকে অগ্রে জ্ঞান-ঘটিত করিয়া দাঁড় করাইয়া তাহাকে জ্ঞানাগ্নিতে পরিশুদ্ধ করা উচিত ছিল—তাহা না করিয়া অগ্রেই তাহাকে সত্তা-ঘটিত করিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে। সকল বিজ্ঞানই যে, অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুবের অন্বেষণ—সবিকল্পের মধ্যে নির্ব্বিকল্পের অন্বেষণ—অনেকের মধ্যে একের অন্বেষণ—এই সত্যটি পুরাকালীন তত্ত্বজ্ঞদিগের সমুচিত হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। কিন্তু হইলে হয় কি—তাঁহারা এই যথার্থ অন্বেষণ প্রণালীটিকে অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। জ্ঞান নিজেই যে ঐ দুই অবয়বের সংযোগ-সাপেক্ষ, ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া অথবা বড় একটা মনোযোগ না করিয়া—উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে একেবারেই তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন যে সকল সত্তাই সাধারণ এবং বিশেষ এই দুই অবয়বের সংযোগ-

সাপেক্ষ। এইরূপে তাঁহারা গোড়াতেই সত্তা সম্বন্ধীয় অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং কাল্পনিক অনুমানের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। জ্ঞানই কেবল সত্তান্বেষণের পথ-প্রদর্শক—ইহা বিস্মৃত হইয়া, জ্ঞান কি উপাদানে গঠিত ইহার প্রতি ফিরিয়া না দেখিয়া, কোন্ উপাদানটি সাধারণতঃ সকল জ্ঞানেই বর্ত্তমান—সবিকল্পের মধ্যে নির্ব্বিকল্প—অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুব—সকল জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে এক অদ্বিতীয় জ্ঞেয়—ইহা স্থির না করিয়া,—একেবারেই তাঁহারা সত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন্ উপাদানটি সকল সত্তাতেই বিদ্যমান—প্রাকৃত জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়—আগন্তুক বস্তু সকলের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী—সকল সত্তার মধ্যে এক অদ্বিতীয় সত্তা—ইহারই অন্বেষণে তৎপর হইলেন; এবং এই বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বনের ফল এই হইল যে, তাঁহাদের সমস্ত অনুসন্ধান শূন্যে পর্য্যবসিত হইল।

গ্রীক দেশীয় তত্ত্ববিদ্‌দিগের তত্ত্বান্বেষণ ॥৪॥

অনুসন্ধানের এইরূপ দিক্-বিপর্য্যয় তত্ত্বানুশীলনের নবোন্মেষের সময়েই বেশী-মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। তাহার সাক্ষী, গ্রীক দেশীয় থেলীস্ যখন ধার্য্য করিল যে, জল, ও আনাক্সিমীনীস্ ঘোষণা করিল যে, বায়ু, সকল সত্তারই সর্ব্বসাধারণ মূল-সত্তা, তখন তাঁহাদের অনুসন্ধান যে, কেবল সত্তাতেই আবদ্ধ ছিল (তা'ও আবার সকল সত্তাতে নয় শুদ্ধ কেবল জড় সত্তাতে) ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল অপক্ব অনুসন্ধান-ব্যাপার শুদ্ধ কেবল এই জন্যই স্মরণার্হ যে, ও-সব আঁকুবাঁকু একটি সৎপ্রবৃত্তি বিকাশের পূর্ব্ব-সূচনা—যদিচ তাহা অনুপযুক্ত বিষয়ে অপব্যয়িত; সৎপ্রবৃত্তি সে কি? না বহুধা-বিচিত্র অবভাসের মধ্যে একের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি; তাহার অবৈধ প্রয়োগ কি? না, প্রথমে উচিত ছিল—তাহাকে জ্ঞান-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা,—তাহা না করিয়া অগ্রেই তাহাকে সত্তা-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে. ইহাই তাহার অবৈধ প্রয়োগ।

গ্রীক দেশীয় তত্ত্ববিৎ পার্মিনিডীস্ ॥৫॥

পার্ম্মিনিডীস্ ইন্দ্রিয়-গম্য জড়-সত্তার অতীত প্রদেশে অনুসন্ধান চালাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত জিজ্ঞাস্য যে কি তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। ইহা তিনি জানিয়াছিলেন যে, সেই সত্যই কেবল তত্ত্বজ্ঞের বিবেচনা-যোগ্য যাহার কোন-কালেই অন্যথা সম্ভবে না; আর, ইহাও তিনি অবগত ছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ের অবভাস-রাজ্যে সে রূপ নির্ব্বিকল্প সত্যের অন্বেষণ পাওয়া যাইতে পারে না; তাই তিনি পূর্ব্বতন আধিভৌতিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদিগের অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্ত সকল অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, জগতের কেন্দ্র-স্থানীয় চিরন্তন তত্ত্ব—সার্ব্বভৌমিক সত্য—সকলের একমাত্র অদ্বিতীয় বন্ধন সূত্র—এই যে একটি পদার্থ, ইহা শুদ্ধ কেবল একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার বলিয়া প্রকাশ পাইলে চলিবে না—উহা জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য বলিয়া প্রকাশ পাওয়া চাই;—এরূপ একটা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রকাশ পাওয়া চাই যে তাহার অন্যথা-ভাবনা জ্ঞানের সাধ্যাতীত,—তাহার বিপরীত পক্ষ স্ববিরোধী এবং অসঙ্গত। কাজেই এরূপ মূলতত্ত্ব জড় জগতে মিলিতে পারে না,—ইন্দ্রিয়ে উপলব্ধ হইতে পারে না; কারণ, ইন্দ্রিয়-সকল এখন যেরূপ আছে তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা আর একরূপ হইলেও হইতে পারে,—তাহা হইলেই ইন্দ্রিয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়-সমূহের যখন রূপান্তর

ভাবিতে পারা যাইতেছে তখন স্পষ্টই তাহারা নির্ব্বিকল্প সত্য নহে। পার্ম্মিনি-ডীসের দৌড় এই পর্য্যন্ত। জিজ্ঞাসা প্রশ্নকে তিনি সবিকল্পের রাজ্য হইতে নির্ব্বিকল্পের রাজ্যে উঠাইয়া লইলেন বটে কিন্তু তাহাকে সত্তা রাজ্য হইতে জ্ঞান-রাজ্যে উঠাইয়া লইতে এখনো অবশিষ্ট—এটি তিনি করেন নাই।

জিজ্ঞাসা প্রশ্ন তথাপি সত্তা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্বন্ধীয় নহে ॥৬॥

সবিকল্প হইতে নির্ব্বিকল্পে এই যে, উত্থান ইহা একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন!

আগন্তুক অথবা সবিকল্প সত্য নহে কিন্তু নির্ব্বিকল্প অথবা অবশ্যম্ভাবী সত্যই তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য ও সর্ব্বপ্রধান যত্নের সামগ্রী এই-টি যে, হৃদয়ঙ্গম করা, ইহা অভীষ্ট পথের মুখ্য একটি সোপানে নিক্ষেপ করা; কিন্তু এইখানে থামিয়া দাঁড়াইয়া "কি আছে" ইহা লইয়াই আন্দোলন চলিতে লাগিল,—"কি আমরা জানি" এ প্রশ্ন চাপা পড়িয়া রহিল; কাজেই তত্ত্বানুসন্ধান চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল—সম্মুখে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। পার্ম্মিনিডীস্ এবং তাঁহার মতাবলম্বীরা বিষম এক আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন এই যে, সকল সত্তার মধ্যে, অথবা যাহা আরো ঠিক্—সকল উৎপত্তির মধ্যে এক অদ্বিতীয় সত্তা আছে—এমনি একটি সার্ব্বভৌমিক মূল সত্তা আছে যাহা জগতের কোন পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হয় না; আর, সকল সত্তার সারভূত সেই যে এক অদ্বিতীয় সত্তা তাহাই প্রকৃত সত্য। কিন্তু সেই যে এক অদ্বিতীয় সত্তা সার্ব্বভৌমিক মূল সত্তা তাহা কি? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, তাহা এক অদ্বিতীয় সত্তা—অপরিবর্ত্তনীয় মূল সত্তা,—তাহা অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুব—সবিকল্পের মধ্যে নির্ব্বিকল্প ইত্যাদি। থেলিস্ বলেন এই যে, জলই সকল সত্তার মূল সত্তা, এটাও যেমন সন্তোষজনক; পার্ম্মিনিডীস্ বলেন এই যে, যাহা সকল সত্তার মধ্যে এক অদ্বিতীয় মূল সত্তা তাহাই সার্ব্বভৌমিক অদ্বিতীয় মূল সত্তা এটাও তেমনি; ওটা যেমন বালকোচিত কল্পনা, এটা তেমনি ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দুইই সমান।

ধর্ম্ম-সোপান।

মনুষ্য চিরকালই সুখের ভিখারী। এই দুঃখ-শোক-পরিপূর্ণ পৃথিবীতে থাকিয়া কে না হৃদয় জুড়াইতে সুখের জন্য লালায়িত হয়। ইহার মধ্যে থাকিয়া কিসে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করত বিকুণ্ঠিত মানসিক বৃত্তি প্রবৃত্তির স্বাভাবিক সম্প্রসারণ বিধান করিবে, ইহার জন্য মানবকুলের ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই মানসিক সুখের অভাব। মর্ত্ত্যের বন্ধভাবে জড়িত থাকিয়াও সকলে সুখের বিমল হিল্লোলে প্রাণ মন শীতল করিতে চেষ্টা করে ও আপনার বদ্ধভাব ভুলিতে চায়।

মনুষ্যমাত্রেই মনে মনে সুখের একটি উচ্চ আদর্শ গঠন করিয়া রাখিয়াছেন, এবং কিসে তাহা কার্য্যে বা সম্ভোগে পরিণত করিবেন, অধ্যবসায় সহকারে তাহারই জন্য সংগ্রাম করিতেছেন, মনুষ্য জীবন সেই তুমুল সংগ্রামের অভিনয় ক্ষেত্র। অবশ্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও মানসিক পরিণতি ভেদে সকলের আদর্শ সমান নহে, সুতরাং সকলে একই পথে সেই আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট নহেন। কেহ বা বিদ্যাবিত্ত উপার্জ্জন, কেহ বা শারীরিক বলবিধান, কেহ বা প্রভূত যশোমান আহরণ, এবং কেহ বা সমাজে একাধিপত্য

স্থাপন করিতে পারিলে আপনাকে যথার্থ সুখী মনে করিতে পারিবেন আশা করিতেছেন। কিন্তু এই সকল উৎকট বিভিন্নমুখী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, তজ্জাত সুখে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান হইবে কি না, সেই সুখ সেই আনন্দ সুদূর ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত থাকায়, এবং উহার অর্জ্জন-চেষ্টায় মনুষ্যমন সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত থাকা প্রযুক্ত, সুখের তারতম্য ঘটিত কোন প্রশ্নই তাঁহাকে প্রথমে উদ্বোধিত করিতে পারে না। মনুষ্যহৃদয় এমনই অপূর্ণ,যে তাহার চির শান্তি নাই বিরাম নাই, সে যেন কোন রত্নহারা হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে, কিসে সেই অপূর্ণতার পরিহার হইবে—কিসেই বা মানসিক ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি হইবে ইহার জন্য সে শশব্যস্ত। সে যেন কি অপূর্ব্ব বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছে, যে জগতের মোহন সৌন্দর্য্য তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, সেই অপরিজ্ঞাত বস্তু না পাইলে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে না, তাহার প্রাণের পিপাসা কিছুতেই মিটে না, জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় না।

পৃথিবীতে সুখী হইবার প্রধানতঃ দুইটি উপায় আছে, এক ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ, অপর নীতি সকলের আপততঃ প্রয়োজনীয়তা বোধে তাহা কার্য্যে প্রবর্ত্তন। উভয়েরই লক্ষ্য এক, কিন্তু প্রকরণ বিভিন্ন। এই প্রকরণ ভেদে মনুষ্যগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী ঈশ্বরবাদী। তাঁহারদের সুখের নাম আত্মপ্রসাদ,দ্বিতীয় শ্রেণী নীতিবাদী বা হিতবাদী। তাঁহারদের সুখের নাম সাংসারিক সুখ। প্রথম পক্ষ ঈশ্বরের আদিষ্ট ও অভিপ্রেত জানিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিয়া সংসার প্রতিপালনে অনাসক্ত ভাবে রত থাকেন এবং নীতিমার্গ হইতে সূচ্যগ্র বিচলিত হন না; দ্বিতীয় পক্ষ ভবিষ্যৎ ফলের দিকে চাহিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে অগ্রসর নহেন। তাঁহারা আপাতমধুর সহজ-প্রাপ্য সুখ লইয়া ব্যতিব্যস্ত; ভাবী-কাল-নিহিত সাধনালব্ধ সুখ দূরপরাহত জানিয়া তদ্বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ থাকেন। প্রথম পক্ষ আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের মঙ্গল আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুখের গাম্ভীর্য্য পরীক্ষা করেন; দ্বিতীয় পক্ষ চক্ষের অদৃশ্য ঈশ্বর আত্মা পরকাল বিষয়ে মস্তিষ্ক পীড়নে সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান চাহিয়া সুখের প্রসর পরিমাণ করিয়া লয়েন। একের মতে ঈশ্বরের আদেশ মাত্রই অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাপি তিনি ধর্ম্ম ও নীতির অবমাননা করিতে কোনরূপেই অগ্রসর হন না। কার্য্যে ভাবে সাধনে কিসে ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান হয়, কিসে সত্যের বিমল আলোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হয়, ফলকামনা শূন্য হইয়া কেবল ইহারই দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকে। সুতরাং তাঁহার কার্য্য ইহলোকের সঙ্কীর্ণ বন্ধন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের পাদমূল পর্য্যন্ত ঘেরিয়া লয়। অপর পক্ষ ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীন ও উন্মার্গ-প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি প্রবৃত্তির ততদূর সঙ্কোচন করেন, যাহাতে তিনি জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত কাহারও সুখ ঐশ্বর্য্যের বিরোধী হইয়া না পড়েন। একের গন্তব্য পথ ও বিচরণ-ভূমি ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর বিমল জ্যোৎস্নায় জ্যোতিষ্মান্। রাজনির্দ্দিষ্ট পুস্তকবদ্ধ রাজনিয়ম সকলের ক্ষীণালোক প্রায়শঃ অপরের জীবনপথের নিয়ামক। তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা আবার অগ্রগামী তাঁহাদের মতে পরস্বাপহরণ চৌর্য্যবৃত্তি পরপীড়ন রাজবিদ্রোহ প্রভৃতি সংসার-ভঙ্গ-মূলক কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং দয়া দান, ক্ষমা বিনয়—যাহারদের পূর্ণ সম্প্রসারণে

পৃথিবী ভূস্বর্গ হইয়া উঠে তাহারদের অনুষ্ঠান বিকল্প কর্ত্তব্য। একদল স্বাধীন জীব হইয়াও উচ্ছৃঙ্খল অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমুচিত সংযমে মর্ত্ত্যে স্বর্গীয় সুখের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে চান, অপর নৈসর্গিক স্বাধীনতা প্রায় অক্ষুন্ন রাখিয়া স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপনে হতাশ হইয়া পড়েন। ফলতঃ একের কার্য্য উদ্দেশ্যপূর্ণ দায়িত্ব-সম্বলিত ও কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে সুন্দর আবদ্ধ অপরের তাহা নহে। যেমন অর্থকরী বিদ্যা বলিলে বিদ্যা অপেক্ষা অর্থের গুরুত্ব প্রতীত হয়, তেমনি তিনি সুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে, কার্য্য অপেক্ষা সুখের মহিমা ও আতিশয্য পরিকীর্ত্তন করেন।

ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবাদী মনুষ্যগণকে সাধারণতঃ অধিকারভেদে জড়োপাসক প্রতিমাপূজক, অবতারবাদী ব্রহ্মোপাসক এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি যাহা মানব মাত্রেরই মনে নিহিত রহিয়াছে, অসভ্যাবস্থায় তাহার ক্রমবিকাশের প্রথম সোপান জড়োপাসনা। অসভ্য নর বিশ্বরাজ্যের অনুপম কৌশল আলোচনায় অসমর্থ বলিয়া বিশ্বকর্ত্তার নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি মনে ধারণা করিতে পারে না। সে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু অতুল-ক্ষমতা সম্পন্ন দেখে তাহা জড়ই হউক বা জীবই হউক, তাহার নিকট মস্তক অবনত করে। সে অবস্থায় শ্রদ্ধা ভক্তি করা অপেক্ষা তাঁহাকে সকল অমঙ্গলের নিদান জানিয়া, বিপদপাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তৎসমীপে বলি উৎসর্গ করে। সে তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" জানিয়া তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি চিন্তনে ভয়ে বিকম্পিত হইতে থাকে। এ অবস্থায় তাহার ঈশ্বর "ভয়ানাম্ ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং"।

মনুষ্য যখন এ অবস্থা হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকে, তখন জড় কি জীব তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। সে তাহার জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের সূক্ষ্ম ভাব মনে ধারণা করিতে থাকে। এই স্থানে একেশ্বরবাদের উৎপত্তি। আমরা ইহার সম্পর্কে যাহা কিছু বক্তব্য পরে বলিতেছি কিন্তু আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন অতি কঠোর সাধনসাধ্য। দুর্বলচিত্তে এই পথে অগ্রসর হওয়া দুর্ঘট। সুতরাং মনুষ্য আপনার সাদৃশ্যে নির্ম্মিত কোন রূপ আকার প্রকারে বা প্রতিমাতে তাঁহার উজ্জ্বল স্বরূপের অবতারণা করিয়া তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। বৈদিক কালের পরবর্ত্তী সময় হইতে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজা ভারতের বহুসংখ্যক লোকের অস্থিমজ্জায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অপ্রতিম ঈশ্বরের যে প্রতিমা নাই তাহা পূর্ব্বতন ঋষিরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। এমন কি "ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ মম পূজাং গৃহাণ" ইত্যাকার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র হইতে "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং" ইত্যাদি দেব দেবীর ধ্যান পর্য্যন্ত সেই অনাদ্যনন্ত মহানের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় ভারতে এই ব্যাপক কালের মধ্যে প্রকৃত পৌত্তলিকতার উদয় হয় নাই। ভারতের এই মূর্ত্তি-পূজা অনুন্নতগণের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের,চিত্ত স্থৈর্য্য সম্পাদনে সহজ উপায় বলিয়া চিরকালই পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। পরিণামদর্শী ঋষিরা এক সময় ব্রহ্মপূজা সাধনের কঠোরতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধারণের ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় ভীত হইয়াছিলেন,এবং পাছে লোকে ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ মননে অশক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওত আত্মার প্রলয়দশা উপস্থিত করে,ইহারই জন্য গুণানুসারে অরূপী

ঈশ্বরের বিবিধ রূপ কল্পনা দ্বারা চিত্ত স্থৈর্য্য সম্পাদনের সহজ উপায়ের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

মূর্ত্তিপূজার কাল্পনিকতা দূর করিবার জন্য সম্ভবত এদেশে ঈশ্বরের অবতার স্বীকার। কিন্তু এ বিষয়েও যুক্তি যার পর নাই দুর্বল। এই প্রসঙ্গে আমরা বিদেশীয় অবতারবাদের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়া পৌরাণিক অবতারবাদের বিষয় কিছু বলিব। বাইবল প্রভৃতি গ্রন্থ অবতারের মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করেন। যখন পৃথিবী পাপহ্রদে ডুবিয়া যায়, যখন মনুষ্য দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, যখন ইন্দ্রিয়াসক্তিতে চারিদিক্ টলটলায়মান, তখন তাহাদের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর আপনার পুত্রকে বা অংশ বিশেষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া নিমগ্নশীল পৃথিবীকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া ধর্ম্মের পথ কল্যাণের সোপান দেখাইয়া দেন। অবতারবাদীদিগের মতে ঈশ্বরেরও আমারদের ন্যায় পুত্র কলত্র আছে, কোন চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তাঁহাকেও আমারদের ন্যায় কল কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তিনিও আমারদের ন্যায় ক্রোধাদি মানসিক বৃত্তির অধীন, এই সকল তাঁহার মহান্ স্বরূপে আমারদের ক্ষুদ্র ভাবের ছায়া আরোপ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবতারগণকৃত অমানুষিক বা অনৈসর্গিক বিষয় সকল ছাড়িয়া দিলে অবতারবাদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উচ্চতর মহত্তর আদেশ উপদেশ সকল বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। সত্য বাক্যের এমনই মধুর সরল ও প্রাঞ্জল ভাব যে ইহার সহিত অন্য কিছুর বিমিশ্রণ হইলে, মস্তক আর তাহার নিকটে অবনত হইতে চাহে না। বিজ্ঞান চক্ষুর সম্মুখে উহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলে মানসক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া যায় এবং যতক্ষণ না উহা হইতে কোন সূক্ষ্ম মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায় ততক্ষণ আর উহার শান্তি নাই। আজকাল যে প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের রূপকাত্মক ভাবের মধ্য হইতে বিমল সত্য নিষ্কাসন জন্য এত হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, ইহা তাহার অন্যতম উদাহরণ স্থল। যদিও ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে অবতারের অপ্রতুল নাই, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে রূপক অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে,এবং ইহাতে মধ্যবর্ত্তিতার সংস্পর্শ নাই। বাইবেল কোরানে যেরূপ ক্রাইষ্ট বা মহম্মদের অহমিকা ঈশ্বরের প্রভাব ছাড়িয়া উঠিয়াছে, মুক্তিদানে ঈশ্বরের নাম অপেক্ষা অবতারগণের সাধকবাৎসল্যভাব যেরূপ প্রবল, অবতার ছাড়িলে যেরূপ বাইবেল ও কোরাণ অর্থশূন্য হইয়া পড়ে,পরিত্রাণের পথ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, হিন্দুশাস্ত্রের অবতারবাদের লক্ষ্য তদপেক্ষা সহস্র গুণে উচ্চ। এমন কি উভয়ের মধ্যে তুলনা সম্ভবে না। পৌরাণিক নিগূঢ় সত্য সকল অবতারগণের মুখ হইতে প্রকাশিত, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে সত্য কিছু মাত্র বিকারভাবাপন্ন হয় না। কিন্তু অনেক স্থলে বাইবল কোরাণ সত্যের উৎস প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। অবতারবাদীদিগকে কোন নূতন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন, উহা আমারদের জ্ঞান বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, উহা মনুষ্যের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ বিচরণ ভূমির অন্তর্ভূত হইলে অবশ্যই ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশিত থাকিত। বাইবেল যে বহুকাল ধরিয়া ইউরোপের জ্ঞানের মাত্রা সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, সত্য আবিষ্কারের অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিরোধক ছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে সত্যের অনুরোধে যে ধর্ম্ম বিশ্বাসকে ক্ষীণ করিতে হইয়াছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

উপরে যাহা কিছু বলিলাম সকলেরই লক্ষ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের দিকে। তবে অধিকারভেদে যা কিছু পথ-ভেদ। কিন্তু নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। প্রকৃত ঈশ্বরকে না জানিলে মুক্তি কোথায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমানে এই অভাব পূরণ করিতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ যেমন মহান্, সাধন তেমনই কঠোর। মনকে আড়ম্বর স্পৃহা হইতে সংযত করিয়া সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে সমাহিত করা বড় অল্প আয়াসসাধ্য নহে। একে ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় সঙ্কীর্ণ তাহার উপর নিরাকার নিরবলম্ব ব্রহ্মপূজা—কি অসাধ্য সাধন। ইহাতে মূর্ত্তিপূজা বা অবতারবাদের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন কিছু দুর্ল্লভ সত্য নাই, যাহা প্রচলিত অপর ধর্ম্ম শাস্ত্রের অতীত। ইহার জ্বলন্ত সত্য সকল ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে ধর্ম্মপুস্তক মাত্রেই বিকীরিত রহিয়াছে। সহজ জ্ঞান, বিবেক, চিন্তা, দায়ীত্ব লইয়া আলোচনা করিলেই জ্যোতিকণা সকল বাহির হইয়া পড়ে। ইহার সত্য সকল এমনই সহজ যে উচ্চারণ করিবামাত্রই ভিতর হইতে সায় পায়। যাহা কিছু সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, শুদ্ধ তাহাই যে ইহার অন্তর্ভূত এমন নহে। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কালে যাহা কিছু সত্য অবিষ্কৃত হইবে তাহাও ইহার অন্তর্ভূত। এমন স্বাধীন এমন উদার ধর্ম্ম আর নাই। ঈশ্বরের উজ্জ্বল স্বরূপ অক্ষুন্ন ভাবে কেবল ইহাতেই প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। জ্ঞান-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কেবল ইহাতেই সম্ভবে। প্রচলিত আর সকল ধর্ম্মই জ্ঞানের বহুদূর পশ্চাতে নিপতিত রহিয়াছে। জ্ঞানের পরীক্ষায় আলোড়িত হইলেই তত্তৎ ধর্ম্মের বিষয় সকল পরস্পর বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের গুরুত্ব আলোচনা না করিয়া যশোমান্ আহরণ বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ইহাতে প্রবেশ করেন, তাঁহারা কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে ইহার শুভ্রত্বে কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, ও নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনের বিলয় দশা উপস্থিত করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনসাপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, ইহার সহিত আড়ম্বরের যোগ নাই, ইহার সহিত কোন রূপ আড়ম্বরের যোগ হইলেই মনে করিতে হইবে, যে ইহার প্রাণ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে আত্মার মধ্যে অন্তঃসলিলা বহাইতে পারিবে, বিশ্বাস সাধনে, বাক্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে, যখন বক্তৃতা প্রদান অপেক্ষা জীবনে নিষ্ঠা প্রতিফলিত করা অধিকতর গৌরবের সামগ্রী হইবে, যখন তপোবনের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতে বিভিন্নমুখী রিপু সকলের মধ্যে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, যখন প্রতি প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ের দ্বার সকল আপনা হইতে উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকিবে, তখনই ব্রহ্মসাধনে আপনাকে জয়যুক্ত মনে করিও, অন্যথা নহে।

উপসংহারে বক্তব্য যে ধর্ম্ম বিষয়ে বৃথা নিন্দাবাদ বা সমালোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিরূপে জ্ঞানোন্নতি ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের ভাব পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মমাত্রই আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতেছে। অনন্তজ্ঞান ঈশ্বর আমাদিগকে ঘোর বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক চাহেন না, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান লইয়া অনন্ত জ্ঞানসাগরের কি মর্ম্ম উদ্ভেদ করিব। আমরা যদি সরল হৃদয়ে কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তাহা

হইলে তিনি আমারদের ব্যাকুলতার পরিহার করেন। তাঁহার বিশ্বরাজ্যে মূর্খ জ্ঞানীর বিভেদ নাই, তিনি আমারদের সরল বিশ্বাস চান। আমরা যদি সুখী হইতে চাই, তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে হইবে। তিনি ভিন্ন যে সুখ সে দুঃখ, তিনি ভিন্ন যে সম্পদ সে বিপদ। কাণ্ডারী যেরূপ ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া পোত সঞ্চালন করে, আমরাও যদি সেইরূপ তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসারসমুদ্রে ভ্রাম্যমান হই, তবে আর আমাদের সুখের ইয়ত্তা থাকে না। তিনি ক্ষুদ্র মলিন বিষয়ে সুখ দেন নাই, উহারা কোন মতেই আমারদের হৃদয়ের অপূর্ণতার পরিহার করিতে পারে না। "ভূমৈব সুখং" সেই ভূমা সেই মহানই সুখ স্বরূপ, তিনিই রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। "এষ-হ্যেবানন্দয়াতি" ইনিই আমাদিগকে বিমল আনন্দ বিধান করিতেছেন। অনন্ত সুখের ভাণ্ডার আমারদের সম্মুখে, উপাসনারূপ কুঞ্চিকা যোগে দ্বার উদ্ঘাটন কর, একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাইবে।

ভাগবত।

ভাগবত ঋষিপ্রণীত মহাপুরাণ। অনেকে বলেন ইহা ব্যাসকৃত। কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। যিনি মহাভারতের রচয়িতা সামান্য পরীক্ষাতেও ভাগবত তাঁহার বলিয়া কিছুতে বোধ হয় না। ফলত ব্যাসের হউক বা না হউক এই গ্রন্থ কোন মহাজ্ঞানীর লেখনী-প্রসূত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার রচনা-রীতি ও প্রতিপাদ্য বিষয় সকল আলোচনা করিয়া কাল সম্বন্ধে এইমাত্র বুঝা যায় যে ইহা মহাভারতাদি গ্রন্থের বহু পরবর্ত্তী। ফলত যে কবিরই হউক বা যে সময়েরই হউক গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশে যার পর নাই উৎকৃষ্ট। কবিতা ও দর্শনের এরূপ মিশ্রণ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান ও গভীর ভক্তি এই দুই একত্রে কেবল এই গ্রন্থই শিক্ষা দিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশে বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট এই উপাদেয় গ্রন্থ একপ্রকার উপেক্ষিত হইয়া আছে। কারণ, অনেকে বলেন ইহা সাম্প্রদায়িকতার হস্ত হইতে মুক্ত নয়। এক্ষণে বাস্তবিক ইহার সে দোষ আছে কি না একবার তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

মুখ্যত কৃষ্ণের উপাসনা প্রবর্ত্তন ভাগবতের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থে অন্যান্য দেবতার পরাভবে একমাত্র কৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। ইন্দ্র বৃষ্টি দ্বারা শস্য সম্পত্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য পূর্ব্বে সকলে ইন্দ্রযাগ করিত। কিন্তু এখনকার তত্ত্বদর্শী লোক যেমন প্রাকৃতিক কারণ সহকে শস্য সম্পত্তির রক্ষা দেখিয়া তদ্বিষয়ে ইন্দ্র নামক কোন দেবতার অস্তিত্বেও অনাস্থা করেন ভাগবতে ইন্দ্রের উপাসনা প্রতিরোধের নিমিত্ত সেইরূপ শস্য রক্ষা বিষয়ে তর্কমুখে প্রাকৃতিক কারণ স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য দেবতার পক্ষেও নানা কথা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম নহেন দার্শনিক যুক্তি দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের উপাসনা যে পুরুষার্থসাধক নহে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মা ঈশ্বরাভিমানী। তাঁহার এই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা তাঁহাকে কৃষ্ণের নিকট কৃতাপরাধ করিয়াছেন। কৃষ্ণের স্তুতিবাদ প্রসঙ্গে তাঁহার মুখ দিয়া বলাইতেছেন দেখ ভৃত্যবোধেও আমায় অনুকম্পা করিতে হইবে। এই যে জল বায়ু মৃত্তিকা ঘটিত অণ্ডঘট অর্থাৎ পৃথিবী ইহার মধ্যে আমি একটী সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত মূর্ত্তি, সুতরাং আমিই বা

কোথায় আর যে তোমার রোম-বিবর-রূপ গবাক্ষ দিয়া কথিত প্রকার অণ্ডরূপ অসংখ্য পরমাণু অনবরত গতায়াত করিতেছে, সেই তোমার মহিমাই বা কোথায়। নাথ, আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি কিন্তু গর্ভস্থ অর্ভকের পদোৎক্ষেপ অর্থাৎ পা ছোড়া কি মাতার নিকট অপরাধের নিমিত্ত হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার কুক্ষির বহির্ভূত নয় আমিও ইহারই অন্তর্ভূত। অতএব এই দৃষ্টান্তে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ভাগবতে ঈশ্বরাভিমানী ব্রহ্মার মুখে এইরূপ বিনীত বাক্য নির্গত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবোপাসকের ইহা অবশ্যই অসহনীয় হইতে পারে। ফলত অনেকে এই জন্যই ভাগবতে সাম্প্রদায়িকতা আরোপ করেন। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা নহে। আমরা পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী প্রতিপাদন করিব। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে ইন্দ্রাদির উপাসনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থ উপনিষদে এক আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। বেদোক্ত দেবতাদিগকে শক্তি সামর্থ্যে ব্রহ্মের নিকট হীন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন আখ্যায়িকার গূঢ় লক্ষ্য। বলিতে কি ভাগবতেরও লক্ষ্য ঠিক্ তাহাই। আমরা উপরে ভাগবতের কালনির্দ্দেশ স্থলে বলিয়াছি ইহা মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। মহাভারতের সময় দেব দেবীর প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত অল্প। পরবর্ত্তী পুরাণকারদিগের মুখ্য কার্য্যই দেবদেবীর প্রভাব বিস্তার। এই বহুদেবোপাসনায় ব্যাঘাত দিয়া বেদান্ত বা উপনিষদের ন্যায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত করা ভাগবতের উদ্দেশ্য ছিল এবং এই জন্যই বাসুদেব কৃষ্ণের নিকট ইন্দ্রাদি দেবতার পরাভব ঐ গ্রন্থে সবিস্তরে বর্ণিত দেখা যায়। ফলত ভাগবত একেশ্বর-প্রতিপাদক গ্রন্থ। ইহাতে সাম্প্রদায়িক দোষ আরোপ কল্পিত মাত্র।

এক্ষণে গ্রন্থকার কৃষ্ণকে কি ভাবে লইয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে ইহার একেশ্বরপরতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। দর্শনকারদিগের মধ্যে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ আছে। কিন্তু উপাসনার জন্য সগুণ ব্যবস্থেয় ইহা অনেকেরই মত। ভাগবতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের লৌকিক মূর্ত্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহাই কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি যে প্রকৃতির অতীত অসংসারী পুনঃ পুনঃ তাহারও উল্লেখ আছে। ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি স্বীকার করিলে এই সমস্ত বাক্যবিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এস্থলে প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত মীমাংসা এই যে কৃষ্ণ ব্রহ্মের লীলাবিগ্রহ। ফলত ব্রহ্মের লীলা পর্য্যন্তই লীলাবিগ্রহের যা কিছু যুক্তিবল। কিন্তু এই গ্রন্থে নির্বিশেষ ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ব্যুৎপাদিত নামে যেরূপে বিশেষিত হইয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলে বোধ হয় বাস্তব ঐ পরিচ্ছিন্ন কৃষ্ণ মূর্ত্তিকে ব্রহ্ম বলা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। এতদ্ব্যতীত অরূপী ব্রহ্মে যে গ্রন্থের মুখ্য তাৎপর্য্য ইহার অন্য প্রমাণ আছে। এই গ্রন্থে রাধা নামের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কৃষ্ণ যখন রাসলীলা প্রসঙ্গে গোপিকাদিগের নিকট অন্তর্হিত হন সেই সময় গোপিকারা তাঁহার অন্বেষণ প্রসঙ্গে একটী সঙ্গিনীর চিহ্ন পাইয়া মানিনী হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন তিনিই রাধা। যাহাই হউক রাধা ও কৃষ্ণ বা গোপিকা ও কৃষ্ণ এই দুইটীকে অনেক প্রামাণিক লোক রূপক মাত্র বলিয়া কল্পনা করেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ অর্থে ব্রহ্ম এবং রাধা বা গোপিকা অর্থে সাধক। এইরূপ রূপক কল্পনার মর্ম্ম অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এই গ্রন্থ যাঁহারা সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মের লীলাবিগ্রহের যৌক্তিকতায়

তাদৃশ আস্থাবান হইতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রন্থের জ্ঞানাংশ তাঁহাদিগকে এত আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তাঁহারা ঐ নামরূপকে রূপকে পরিণত করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মে গ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরও একটী কথা। ভাগবতে কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে। এস্থলে অবশ্য স্বরূপ অর্থে বিগ্রহ শব্দের ব্যবহার। এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি কৃষ্ণের দার্শনিক ব্যাপক মূর্ত্তি। আর লীলামূর্ত্তি দেশকালপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্য মূর্ত্তি। ইহাতে প্রকরণের অসঙ্গতি দোষ কে নিবারণ করিবে। যাহাই হউক আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় ভাগবত একখানি প্রকৃত ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ। ইহাতে সাম্প্রদায়িক গন্ধ কিছুমাত্র নাই। তবে ইহাতে যে ব্রহ্মের লীলামূর্ত্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে কেবল ভক্তিমার্গ দিয়া স্থূলোপাসকদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের পথে আনয়ন। বেদান্ত যাহা সহজে পারেন নাই এই গ্রন্থকার কৌশলে তাহাই সম্পাদন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা একেশ্বর-প্রতিপাদক গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক চক্ষে এই গ্রন্থের গৌরব রাখিবার স্থান হয় না। যখন তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম মদ্য মাংস ব্যভিচার আনিয়া জনসমাজকে ধর্ম্মহীন শ্রীভ্রষ্ট করিতেছিল, যখন বাহ্যে জাতিভেদ ব্যতীত প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায়, ভারতের সেই দুর্দ্দিনের সময় একমাত্র এই ভাগবত হইতে ধর্ম্মজগতের প্রদীপ্ত সূর্য্য চৈতন্য উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি এই গ্রন্থোক্ত ধর্ম্মে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া লোক সকলকে মহা মোহ হইতে উদ্ধার করেন। তিনি ইহারই জ্ঞান ও ভক্তি ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মসমাজে নবজীবন সঞ্চার করিয়া দেন। ফলত তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনেক অনুষ্ঠানের উপর এই গ্রন্থ অনেক স্থানে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছে এবং ধর্ম্ম ও জনসমাজের উপর একটী যুগান্তর আনিয়াছে। কিন্তু এই অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি সহজত দুর্ব্বোধ। ধর্ম্মে যাঁহার নিষ্ঠা আছে, যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম জন্মিয়াছে, যিনি লৌকিক ও অলৌকিক সকল প্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত সেইরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ ব্যতীত ইহার রসাস্বাদন করে কাহার সাধ্য। আমরা জাতীয় এই অত্যুজ্জ্বল রত্নকে হিন্দুমাত্রের কণ্ঠ ভূষণ দেখিতে মন প্রাণের সহিত কামনা করি। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট একেশ্বর-প্রতিপাদক গ্রন্থ।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-মূলক

পদ্য।

একবিংশ ব্যাখ্যান।

নিখিল ভুবন, [illegible] ভবন, [illegible] তব সনে।
করিয়া যতনে, [illegible], হৃদয়ের প্রিয়ধনে॥

পরম ঈশ্বর, যাঁহার রচনা,
এ বিশ্ব সুন্দর হয়।
যাঁহার মহিমা, অনন্ত অসীমা,
জড় জীব সবে কয়॥
রবি শশি তারা, গ্রহ ধূমকেতু,
যাঁহার নিয়মে চলে।
নদী বায়ু বয়, ঋতু আসে যায়,
তরু সাজে ফুল ফলে॥
তিনি এ ভবের হয়েন কাণ্ডারী,
আছেন ভবের মাঝে।
সবারে ধারণ, করেন রক্ষণ,
তাই বিশ্ব সুবিরাজে॥
সুদূর তারক, গভীর সাগর,
কোথা না প্রভাব তাঁর?
তিনি প্রাণ রূপে, সবে বিদ্যমান,
সকলের মূলাধার॥

অনুক্ষণ থাকি, আমাদের সনে,
জীবন করেন দান।
ইন্দ্রিয়ের বল, করেন প্রেরণ
দেন চিন্তা প্রেম জ্ঞান ॥
তাঁহার সমান, নিকটের বন্ধু,
আমাদের কেবা আর?
অন্তর অন্তরে, আত্মার গভীরে,
বল কার অধিকার?
হৃদয়-কানন, বিজন গহন,
আত্ম-পাখী সেই স্থানে।
বসিয়া শাখায়, চিদানন্দে গায়,
কেবা শোনে সেই গানে?
হৃদয়ের ভূমি, আত্মার আপন,
আত্মা একা কৃষীবল।
ফোটায় কুসুম, সুরভি [illegible]
বৃষ্টি সেথা অশ্রু জল ॥
বন্ধু [illegible], কতই বিপ্রেত,
[illegible] পরাজয়।
কত আশা [illegible], কত সাধ [illegible],
বিফলে পতিত রয় ॥
কত ভালবাসা, হইয়া উদিত,
[illegible]
কতই [illegible], কত হাহাকার
কে না তা দেখিতে পায়?
হৃদয়ের আশা, [illegible],
হৃদয়ের বিবরণ।
জানেন সকলি, সেই যে পুরুষ।
সর্ব্ব সাক্ষী তিনি হ'ন ॥
অন্য বন্ধু সনে, আমাদের আছে
আকাশের ব্যবধান।
কিন্তু তিনি হ'ন, আত্মার আশ্রয়,
হৃদি সদা বর্ত্তমান ॥
[illegible] বন্ধু মম প্রিয় জন,
শরীর বাহিরে রয়।
আত্মাতে পশিয়া আত্মারে দেখিতে
না তাদের সাধ্য হয় ॥
আত্মার অন্তরে, সেই এক জন,
আত্মার তিনি যে প্রাণ;
অমৃত পিপাসা, মুক্তির লালসা,
তিনিই করেন দান ॥
আত্মার যে তৃষা, মিটে তাঁরে পেলে
পরমাত্মা তিনি তাঁর।
তাঁহার শরণ, লও ওহে জীব!
মৃত্যু হ'তে হবে পার ॥

হউন না তিনি, আকার বিহীন,
নয়ন না পা'ক তাঁয়।
ভকত হৃদয়, শত আঁখি মেলি,
দেখিবারে তাঁরে পায় ॥
অরূপ সুন্দর, সুধাময় রূপ,
দেখে সদা প্রাণ ভরে।
প্রাণ সখা বলি, তাঁর প্রেমে মজি,
সহবাস তাঁর করে ॥
শূন্য অন্ধ শক্তি, মনের কল্পনা,
গুণ মাত্র মনোভাব।
এসব কিছুই নহেন ত তিনি
হৃদি যাঁর আবির্ভাব ॥
যাঁর জ্ঞান প্রেম অপার অসীম,
শোভে সদা চরাচর।
তিনিই হৃদয়ে, জীবন্ত রূপেতে,
রয়েছেন নিরন্তর ॥
তাঁহাকে জানিতে, সাধিতে পূজিতে,
আমাদের অধিকার।
বিশুদ্ধ নয়নে দেখিবারে পাই,
অরূপ মাধুরী তাঁর ॥
চারিদিকে পাই, তাঁর পরিচয়,
হৃদি তাঁর দরশন।
তিনি পিতা মাতা, গুরু জ্ঞান দাতা,
সব আশা সম্পূরণ ॥
তাঁহার প্রেমেতে যে জন মগন,
সতত সেবায় তাঁরে,
তিনি দয়া করি, হৃদয়ে তাহার,
দেখা দেন আপনারে।
সেই নিত্য সঙ্গী, হৃদয়ের বন্ধু
হৃদয়ের প্রিয়ধন।
সুদূর নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য মাঝে
নহে তাঁর সিংহাসন ॥

সিংহাসন তাঁর, আত্মার অন্তরে,
সেই তাঁর নিকেতন।
তিনিই তোমার চিরাশ্রয় প্রভু,
ভজ তাঁরে অনুক্ষণ ॥

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

মহাত্মা সেণ্টপলের জীবন বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

ধর্ম্মজগতে আজ কাল অভেদ ও সাম্য দৃষ্টি। অভেদ ও সমদর্শীরা কি পৌত্তলিক, কি জড়, কি ব্রহ্মোপাসক সকল প্রকার ধর্ম্মাবলম্বিকে ঈশ্বরের পথের পথিক বলিয়া মনে করেন ও তাহাদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পান।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"

নদী সকলের গতি বিভিন্ন হইলেও সকল নদীরই গন্তব্য স্থান সমুদ্র। সেই রূপ মনুষ্য যে কোন সম্প্রদায়েরই হউন না কেন, তাঁহার লক্ষ্য ও গম্য স্থান সেই পরমেশ্বরই। এ নিমিত্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুরা ধর্ম্মে একাগ্রতা, ধর্ম্মজীবন লাভের উপায়, ঈশ্বরোদ্দেশে জীবন সমর্পণ ইত্যাদি বিষয় সকল, কি স্বদেশী কি বিদেশী কি ইহুদী কি মুসলমান নির্ব্বিশেষে ভক্ত মাত্র হইতে শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই রূপ ভাবের অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর মহাপুরুষদিগের জীবন সমালোচিত হইতেছে। উপস্থিত গ্রন্থ খানি তাহার উদাহরণ। দেবেন্দ্র বাবু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা সেণ্টপলের জীবন অবলম্বন করিয়া কয়েকটী গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ অতি সুন্দর হৃদয়ের ভাবোদ্দীপক ভাষায় বিবৃত করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ঈশ্বরের পথে পথিক জনগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

ভক্তি ও ভক্ত। অর্থাৎ নারদ ও শাণ্ডিল্য কৃত ভক্তিসূত্র। পারিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই ভক্তি গ্রন্থখানি ভক্ত সেন মহোদয় কর্ত্তৃক ভক্তিরসের সহিত সরল ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জীবন পরীক্ষা বা জীবন স্বপ্ন চতুষ্টয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিরচিত।

আমরা এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। গ্রন্থের সংক্ষেপার্থ এই; জীব নিজকৃত কুকর্ম্ম জন্য সংসারে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই পৃথিবী জীব মাত্রেরই পরীক্ষামন্দির। ধর্ম্ম তাহাদের পরীক্ষক ও এই পরীক্ষার নাম জীবন পরীক্ষা। অনেকে মায়ার প্রলোভনে বিষয়ভোগে বশীভূত হইয়া জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না কিন্তু যাঁহারা একান্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারাই "কুচিন্তা"র দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়া সুমতি সত্য বিবেক প্রভৃতির অবলম্বনে কৃতার্থ হয়েন। অনন্য মনে কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনাই সংসার হইতে উদ্ধারের এক মাত্র উপায়, ইহাই রূপকচ্ছলে প্রতিপন্ন করা গ্রন্থের তাৎপর্য্য। আমরা এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের ঈশ্বরপরায়ণতা, ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা, হৃদয়ের অকিঞ্চনতা বা কোমলতা ও সাধুতার পরিচয় পাইয়া যার পর নাই প্রীত হইলাম। তাঁহার বর্ণিত কতকগুলি বিষয়ের সহিত আমাদিগের মতভেদ হইলেও গ্রন্থ খানি যে অধ্যাত্ম জীবন লাভের সহায় হইবে ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। গ্রন্থের ভাষাটী প্রাঞ্জল ও সুললিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত দুএকটী স্তোত্র ও গান বাস্তবিকই "হৃদয়স্পর্শী" হইয়াছে।

মহদ্বাক্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪৩)

এই পৃথিবীতে অনেক ঘটনা, অনেক কার্য্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার ফল, কিন্তু মানুষ তাহা জানে না।

(৪৪)

যদি একটী পাপকে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দাও, তাহা হইলে জানিও সহস্রটী পাপ প্রবেশ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

(৪৫)

ধর্ম্ম দুর্ব্বলের বল, জ্ঞান হীনের জ্ঞান, দুঃখীর সুখ, নিরানন্দের আনন্দ, ও পরিতপ্তের সান্ত্বনা।

(৪৬)

একেবারে অধিক উচ্চে উঠিতে যাইও না, কেন না তাহাতে পতনের সম্ভাবনা আছে। আবার নিম্ন ভূমিতে ও পড়িয়া থাকিও না, কেন না তাহাতে পদ দলিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ চৈত্র মঙ্গলবার ১৮০৮ শক।

সম্বৎসর কাল যিনি আমাদের শরীর মন আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন, যাঁর কৃপা নিমেষে নিমেষে অবলম্বন করিয়াছি, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে পাপে তাপে যিনি সমানরূপে বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, সৌভাগ্য-সুদিনে যাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া কতই আনন্দ ভোগ করিয়াছি, দুর্ভাগ্য-দুর্দ্দিন-তিমির মধ্যে—দুর্গতির মধ্যে যাঁহার মুখজ্যোতি দেখিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনে ক্ষমবান হইয়াছি—গভীর স্বর্গীয় শান্তি অনুভব করিয়াছি, আজ সেই বৎসরের শেষ দিন। আজ মস্তককে কি তাঁহার পবিত্র চরণে অবনত করিব না? যে হৃদয়কে তিনি সম্বৎসর কাল রক্ষা করিলেন, সেই হৃদয়-পদ্মে কি আজ তাঁর পূজা করিব না? যিনি মঙ্গল হস্তে আমাদের শোকাশ্রু মার্জ্জনা করিয়াছেন, তাঁর জন্য কি এক বিন্দু প্রেমাশ্রুপাত করিব না? এস সেই চির জীবনসখাকে এই পবিত্র কালে একবার হৃদয়-মন্দিরে ভক্তিভরে দর্শন করিয়া বিগতপাপ ও বিগতশোক হই। এস একবার তাঁহাকে প্রেমভরে নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মানন্দে অশ্রুপুলকে পূর্ণ হই। এখন হৃদয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, এ ব্যাকুলতার কি তিনি শান্তি করিবেন না? "হৃদয় চাতক মোর, চায় তোমারি পানে হে শান্তিদাতা, শান্তিপীযূষ বারি বরিষ বরিষ" কোথা নাথ অনাথের নাথ। এখানকার পঙ্কিল বারিতে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। আমরা চাতকের ন্যায় তোমার অমৃত বারির প্রতীক্ষা করিতেছি, আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদের পিপাসা দূর কর। আমরা তোমার দর্শনের প্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি, দর্শন দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, এখানকার দিন অবসান হইতেছে, সঙ্গী সকল ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, পৃথিবীর সকল সুখ দুঃখ রূপে পরিণত হইতেছে, বাল্যের পর যৌবন—যৌবনের পর বার্দ্ধক্য—বার্দ্ধক্যের পর জরা—জরার পর মৃত্যু দ্রুতপদে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; ইহা দেখিয়া শুনিয়াও কি আমরা সেই

অভয় পদ—সেই অমৃত স্বরূপকে আশ্রয় করিব না? তবে কি প্রকারে সংসার-বন্ধন—মৃত্যুজ্বালা ও মৃত্যুপীড়া হইতে মুক্তি লাভ করিব? হে জীবননাথ! আমরা আজ আমাদের জীবনকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। শুনিয়াছি—বুঝিয়াছি এ জীবন তোমার হস্তে রাখিয়া দিলে, তাহা অক্ষয় জীবন হইয়া থাকে, তাই আজ অতি সন্তর্পণে ইহাকে তোমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতেছি। নাথ! আমরা যে তোমার—তোমার চির আশ্রিত। তুমি আমাদের আত্মাকে সম্যকরূপে রক্ষা কর। আমাদের জীবনের এক বৎসর চলিয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে, সৎকার্য্য পরোপকার এবং তোমার প্রেম-মুখ দেখিবার কত অবসর তুমি আমাদিগকে দিয়াছিলে। আমরা তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও। তোমার আদেশের বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছি আর যেন তাহা না করি। জীবনের যে যে অংশে তোমার সহবাস-সুখে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, আগামী বর্ষে যেন সে প্রকার না হই। আগামী বৎসর যেন দিন রাত্রি তোমার সহবাস সুখে তৃপ্ত থাকিয়া এখানকার শোক সন্তাপ বিস্মৃত হইতে পারি। তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া যেন পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে পারি। নাথ! তুমি তোমার প্রেম মুখ আমাদের সম্মুখে এমন করিয়া ধর যেন তাহার আকর্ষণে পার্থিব অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তুর আকর্ষণ হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি। তোমার নিকট করযোড়ে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা। হে অকিঞ্চন গুরু! দুঃখী অকিঞ্চনদিগের হৃদয়ের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অমৃত নিকেতন।

(বালকের রচনা)

১

প্রেমের হিল্লোলময় সমীর হেথায় বহে
বসন্ত নিশীথ গীতি
জোছনার মধুপ্রীতি
খেলে হেথা অনুক্ষণ অমৃতের কথা কহে।
কালানল হেথা ওগো কাহারেও নাহি দহে।

২

অযুত তারকা হ'তে পরিমল হেথা ঝরে
কুসুমের হাসিরাশি
চিরদিন হেথা বাসি
মধুর আলোকে ধীরে জগতে ভাসিত করে—
আনন্দ বিতরে সুধা তুলিয়া স্নিগ্ধ করে।

৩

শত শত অর্ত্তনাদ বিমল সঙ্গীতে হেথা—
হ'য়ে যায় পরিণত;
—নিজের মনের মত
খেলিয়ে বেড়ায় সবে—রহেনাকো কারো ব্যথা—
কুসুমিত হয় প্রাণ—রচে আনন্দের গাথা।

৪

মুক্ত হৃদে হেসে হেসে মধুময়ী আশাগুলি
হাতে ল'য়ে বীণা বাঁশী
ব'সে সবে পাশাপাশি
বাজাইছে হেথা শুধু অপার হরষে ঢুলি
হেরিছে জগতে ধীরে—ঘুচিছে বিশ্বের ধূলি।

৫

ফুল ফলে ভরা হেথা প্রণয়ের উপবন—
নাইকো তাহার শেষ—
নাই কণ্টকের লেশ,
পীযুষ তটিনী ধীরে—মৃদুল মধুর স্বন—
ব'হে যায় মাঝ দিয়ে—সিক্তে লোক অগণন।

৬

স্বপ্নমায়া ছদ্মবেশে আসিতে পারে না কভু—
আছেন সতত জাগি—
—সবার শান্তির লাগি—
সত্যের পিনাক তুলি মহাদেব—মহাপ্রভু!
হেথায় সবার হায় সাধ নাহি কেন তবু?

৭

মোহের বাঁধন কাটি আসুক সকলে হেথা
ধূসরিত প্রাণ সবে
অমৃতের মধুরবে
করুক বিমল শুভ্র—যাবে শোক দুখ ব্যথা
ঘুচে যাবে জীবনের রাশি রাশি মলিনতা।

ধর্ম্মের উৎপত্তি।

মনুষ্য-শরীর এক অপূর্ব্ব মিলন-ক্ষেত্র। জড় শরীরের সহিত নিরাকার মন ও আত্মার এমন অপূর্ব্ব পরিণয় আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। শরীর মন ও আত্মা এমনই সুন্দর শৃঙ্খলে আবদ্ধ যে একের উন্নতি অপরের উন্নতির অপেক্ষা করে। যিনি ইহাদের মধ্যে কোন একটির উন্নতি সাধনে উদাসীন তিনি অপূর্ণ মনুষ্য। একে মনুষ্য ক্ষুদ্র অপূর্ণ জীব, তাহাতে আবার ইহার কোন এক প্রধান উপকরণের সম্যক বিকাশ না হইলে অপূর্ণতার মধ্যে ঘোরতর অপূর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি আমরা শুদ্ধ জড় শরীরের বলাধানে বা পুষ্টিসাধনে তৎপর হই, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে ইতর প্রাণিবর্গের কিছুই প্রভেদ থাকে না। কেবল মাত্র আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইলে শরীর ক্ষীণ, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আবার শরীর ও মনের উৎকর্ষ প্রদত্ত হইলে, আত্মার বিষম দশা উপস্থিত হয় এবং ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

মনুষ্য শরীর মন ও আত্মা এই তিনের সমষ্টি হইলেও শরীরের স্বাস্থ্য আর সকলের উন্নতির মূল। যেমন গৃহের পত্তন সুদৃঢ় না হইলে তদুপরি অট্টালিকা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম না হইলে না মন তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, না আত্মা ধর্ম্মবলে পুণ্যবলে বলীয়ান হইতে থাকে। সেই জন্যই স্বাস্থ্যসম্পদ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গললাভের নিদানভূত। একদিকে দেখিতে গেলে যেমন শরীর আর আর সকলের উন্নতির মূল তেমনই ইহার রক্ষণ ও পুষ্টিসাধন অপর দুইটির যত্নায়াস সাপেক্ষ। আত্মা যেন দেহপুরের রাজা। বুদ্ধি যেন ইহার মন্ত্রী ও সহায়।

শরীরের ন্যায় মনেরও প্রাকৃতিক কার্য্য নির্দ্দেশ আছে। মনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার কার্য্য সকল আপনা হইতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে; যথা জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া যে কত অসংখ্য বিষয়ের জ্ঞান আমরা লাভ করিতেছি তাহা একবার স্মরণ করিলে মন বিস্ময়রসে প্লাবিত হইয়া যায়। আমরা জাগ্রত থাকি বা অর্দ্ধ-নিদ্রিত থাকি আমাদের মনের এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম নাই। সে যেন আপনার বিষয় ব্যাপার লইয়া বিভোর। সে ইন্দ্রিয়ানুভূত বোধ-সমষ্টি লইয়া যে তাহাদের মধ্যে কতপ্রকার সংযোজন করিতেছে, কত জ্ঞানের বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতেছে, তাহা সেই জানে। বাহিরে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ, শোভার চিরোন্মুক্ত প্রস্রবণ সুবিশাল ধরণী, কিছুতেই জ্ঞানের পিপাসার শান্তি হইতেছে না। আজীবন ধরিয়া সুখ দুঃখ ভয় বিপদের কত ভাবই মনের উপর পদচিহ্ন রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে. সুখ লাভের দুঃখ পরিবর্জ্জনের কতই প্রবল ইচ্ছা তাহাকে সতিবাস্ত করিতেছে, তথাপি তাহার কার্য্যে বিরাম নাই, তাহার চিরপ্রদীপ্ত ক্ষুধার অবসান নাই। কোথায় সে নিদ্রার কোলে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে যায়, সেখানেও স্বপ্নাবেশে চিন্তা মনের মধ্যে কার্য্য করে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিশিষ্ট জড় পৃথিবী উপরে অনন্ত আকাশ তাহার জ্ঞানের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না। সে যখনই অবসর পায় সসীম হইতে অসীমে, অন্ত হইতে অনন্তে, জড় হইতে অজড়ে, মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে আত্ম-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বিশ্বাসের হস্তধারণ করিয়া পদচালনা করিতে থাকে।

যাহা কিছু সঙ্গতি লইয়া জ্ঞান সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় তন্মধ্যে ঈশ্বরে সহজ বিশ্বাস ইহার অন্যতম। যখনই মনুষ্য আপনার অপূর্ণতা জগতের অতুলন সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকার্য্যে সূক্ষ্মতম কৌশলের বিষয় চিন্তা করে, সে ইহার অন্তরালে ঈশ্বরের হস্ত না দেখিয়া থাকিতে পারে না। এ বিশ্বাস এমনই সহজ এমনই বিশ্বজনীন যে সকল দেশের সকল কালের সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস যার পর নাই স্বাভাবিক বিশ্বাস। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর যখনই তাহার মানসক্ষেত্রে চিন্তা করিবার ক্ষমতা উদ্গত হয় তখনই সে কার্য্যের পশ্চাতে কারণকে, কৌশলের পশ্চাতে কৌশলকর্ত্তাকে স্বতই দেখিতে পায়। মনুষ্য এইরূপ আর কয়েকটি সহজজ্ঞানকে সহায় করিয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওত আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। জ্ঞানের পিপাসা এমনই বলবতী, আত্মার নৈসর্গিক গতি এমনই উদ্ধমুখী যে কেবলমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। সে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইবার অনবরত চেষ্টা করে। সে কখন বা জড়কে পূজা করিতে যায়, কখন বা মানসিক গভীর ব্যাকুলতার পরিতোষের জন্য পরিমিত প্রতিমাকে বা মনুষ্য বিশেষকে পূজা করিতে যায়, কখন বা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তস্ফূর্ত্ত বাক্যে বলিয়া উঠে "নেতি নেতি" যিনি মহান যিনি সমুদয় ভুবনের একমাত্র অধিপতি যাঁহার সৃষ্টিতে একই কৌশল একই উদ্দেশ্য কার্য্য করিতেছে তিনি কখনই "এই" শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না।

ক্রমে যতই তাহার জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই সে ঈশ্বরের সুমহান মঙ্গল হস্ত সর্ব্বত্র প্রসারিত দেখে। অনন্ত সৃষ্টি অনন্ত কৌশল তাঁহার অনন্ত জাগ্রত জীবন্ত ভাব দেখাইয়া দেয়। আপনার হীন ও মলিনতার উপর তাঁহার সস্নেহ মাতৃদৃষ্টি অনুপম পিতৃস্নেহ বিশদ রূপে অনুভব করিতে থাকে। আলোচনা করিতে করিতে তাঁহাকে এতই উচ্চ দেখে, তাঁহার অসীম প্রভাব এমনই সুস্পষ্ট অনুভব করে যে তাহা অপেক্ষা অধিক করিয়া দেখা জ্ঞানের ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়ে। জ্ঞান একবার তাহার সঙ্কীর্ণ বন্ধনের মধ্যে তাঁহাকে ধারণা করিতে যায়, অমনই তাহার বল বুদ্ধি শক্তি অবশ হইয়া পড়ে, মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়, আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এমন অশান্তি এমন অপূর্ণতা তাহাকে আর কখনই অনুভব করিতে হয় না।

এই সময় তাহার ঘোর মানসিক বিপ্লবের সময়। পৃথিবীকে নিদারুণ উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া যেমন পশ্চিম সূর্য্য পৌর্ণমাসী চন্দ্রের উদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগের জন্য পৃথিবীরূপ সর্বনিবার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ জ্ঞানসূর্য্য অনুরাগ চন্দ্রমাকে আত্মারূপ সুবিস্তৃত আকাশে প্রদীপ্ত করিয়া দিয়া কথঞ্চিৎ অবকাশ গ্রহণ করে, অন্তরাকাশে জ্ঞানের যে সুনীল মেঘ এতদিন একাধিপত্য করিতেছিল অবিরল বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় অনুরাগের শুভাগমনে তাহা সুবিমল হইয়া উঠে। শুষ্ক জ্ঞান যে সুশীতল ছায়া প্রদান করিতে পারে নাই, অনুরাগের বিমল জ্যোৎস্নায় তাঁহার স্বপ্রকাশ উজ্জ্বল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সেই সাধক আপ্তকাম হইয়া বলিয়া উঠেন

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা"

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা

ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়; তাঁহা হইতে আত্মিক প্রিয়তম সুহৃৎ আমাদের আর কেহ নাই। জ্ঞান যাঁহাকে ধরিতে গিয়া পরাস্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, অনুরাগভরে ভক্তিযোগে তিনি তাঁহার জাজ্বল্যতর সত্তা সহজে উপলব্ধি করিতে থাকেন। এইরূপে পৃথিবীতে যে কয়েকটি ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে, সেই সেই ধর্ম্মের মূলে জ্ঞান প্রচ্ছন্ন বা পরিস্ফুট ভাবে বিদ্য-মান রহিয়াছে। সেই ঐশ্বরিক জ্ঞান হই-তেই ভক্তি বা অনুরাগ অনুস্যূত হইয়াছে, কেন না ভক্তি জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল। এবং সেই জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনে ধর্ম্মের উৎপত্তি। ধর্ম্ম মাত্রেই যে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে এমন নহে। জ্ঞানযোগে তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া প্রীতি-প্রসূনে তাঁহাকে পূজার্চ্চনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ভক্তির সহিত জ্ঞা-নের তারতম্য ভেদে ইহাকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। যে ধর্ম্মে জ্ঞান হইতে ভক্তি পূর্ণমাত্রায় অনুস্যূত হইয়া সাধককে একে-বারে উন্মত্ত করিয়া তোলে, সংসারের অনি-ত্যতা দেখাইয়া হৃদয়ে বৈরাগ্য আনয়ন করে, সেই ধর্ম্মেই বিশুদ্ধ ভক্তির অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। এ ভক্তি হৃদয়ে বহমান হইলে মনুষ্য তাঁহার প্রেমে একে-বারে উন্মত্ত হইয়া পড়ে, সংসারের ভয় বিভীষিকার তাড়না আর তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় না, এমন যে ভয়ানক মৃত্যু সেও তাঁহাকে আর ব্যথা দিতে সমর্থ হয় না।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

তিনি জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া নিষ্কলঙ্ক পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। তিনি তখন রোগ শোক বিপত্তি বিষাদের উপরি-তন স্তরে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করেন এবং এখানে থাকিয়াই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামের চিরতৃপ্তিকর মলয়-হিল্লোলে আত্মার পুষ্টি-সাধন করিতে থাকেন। কিন্তু যখন হৃদয়ে ভক্তি-স্রোত অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত করিবার জন্য বা অবসাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জ্ঞান অপেক্ষা বাহিরের আয়োজন উপকরণ বা আড়ম্বরের প্রয়োজন হয়, বাহিরের সাম-য়িক উত্তেজনার বিশেষ আবশ্যকতা বিল-ক্ষণ অনুভূত হয় তখনই অবিশুদ্ধ ভক্তি হৃদয় অধিকার করে। জ্ঞানের সহিত সেই ভক্তির সামঞ্জস্য নাই। লোকে চিন্তা বা আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র অনু-করণের বশবর্ত্তী হইয়া পরম্পরাগত ধর্ম্মের বাহ্যভাব আপনার জীবনে প্রতিফলিত করিলে তাহার হৃদয়ে যে ভক্তির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতীব অকি-ঞ্চিৎকর, তাহা ভক্তির প্রতিরূপ মাত্র, তাহা বাস্তবিক ভক্তি নহে। তাহার মূলে ভয় বা অনুকরণভাব বিদ্যমান থাকাতে উহার প্রাণ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ফলত জ্ঞান ও ভক্তির যথাযথ বিমিশ্রণ না হওয়াতেই পৃথিবীতে জড়পূজা, সাকারবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি মতভেদের উৎপত্তি হইয়াছে।

যখন সাধকের মন এইরূপে জ্ঞান ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয় তখন তাঁহার মন প্রাণ কবিত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মের অঙ্কুর অঙ্কুরিত হইলেই তিনি তাঁহার ধ্যান ধারণা ও পূজার্চ্চনা করিবার শৃঙ্খলা উদ্ভাবনে ব্যতিব্যস্ত হন। যে সত্য উদ্ভাবন করিয়া তিনি আপনার মন প্রাণ শীতল করিয়াছেন, যাঁহার অভয় হস্ত সর্ব্বত্র প্রসারিত দেখিয়া তিনি নির্ভয় হইয়াছেন সেই সত্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করি-বার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং মুক্তকণ্ঠে

প্রকাশের কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন অথবা নিজ সাধনালব্ধ ঈশ্বরের আদেশ উপদেশ গ্রন্থবদ্ধ করিয়া যান। এইরূপেই ধর্ম্মপুস্তক বা পূজাপদ্ধতির উন্মেষ হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-প্রীতিতে একবার অবগাহন করিলে সংসারের কোন সুখ কোন আনন্দ তাঁহাকে বিমল তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না। সেই সুখসাগরের অমৃত বারি একবার আস্বাদন করিলে পৃথিবীর হীন মলিন ভাব আর তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না। তিনি চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধ মুখে দেবপ্রসাদ বারি ভিক্ষা করিবার জন্য সেই প্রেমঘনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইহাতেই তাঁহার আত্মপ্রসাদ, ইহাতেই তাঁহার মনের শান্তি। এইরূপে ভাব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতে থাকে।

যখন জ্ঞান ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য দেখাইয়া দেয়, ইচ্ছা আপনা হইতেই ইচ্ছাময়ের সেই মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হয়। যাহা কিছু তাঁহার অভিপ্রেত, তিনি তাহাতেই আপনার ইচ্ছার যোগ করেন। যশৈষণা, বিত্তৈষণা আর তাঁহার চিত্ত-বিক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। তিনি ঈশ্বর-প্রীতিকেই মুখ্য করিয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য বোধে সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এইরূপে যখন তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি আত্মারূপ দর্পণে সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়, যখন তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিপাদ্য হন, যখন ভাব তাঁহার সহবাসজনিত বিমল আনন্দকে উচ্চতম মহত্তম বলিয়া উহারই অনুগমন করে, যখন ইচ্ছা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন শরীর তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে আপনাকে উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত না হয়, তখন আর সাধকের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না, তিনি এখানে থাকিয়াই জীবন্মুক্ত হয়েন।

শ্মশানে।

(বালকের রচনা)

১

কোথায় অতীত প'ড়ে কোথায় তাহার গান?
ভেসে গেছে সাথে তার কোথায় অযুত প্রাণ?
হেথায় বুঝিরে তার মধুর সমাধি স্থান
হেথায় সকলি যেন হইয়াছে অবসান!
বনের মর্ম্মর গীত
নদীর গম্ভীর বাণী
মধুর জোছনা-সিক্ত
যামিনীর মৃদুপাণী
পরশয়ে অতীতের সমাধি-আবাসে ধীরে;
আকুলিত হ'য়ে যায়
পাষাণে প্রতিস্তর।
হৃদয় অসীমে ধায়—
প্রীতিময় স্তরে স্তর!
তুচ্ছিয়া বিপদ শোক—ভবাগত দুখনীরে
কেন না বিমল প্রাণে হেরি আমি জগতীরে?

২

ওইকে কাঁদিছে দূরে, হেরিবে না কেউ তারে?
ওইকে বাজায় বাঁশী তটিনীর পরপারে!
কিসের লীলায় হায় জগত পুরিয়া আছে?
গড়িল জগতে হায় কে—এ মধুর ছাঁচে?
ধরি রূপ বিমোহন
নিয়ত নাচিছে বিশ্ব
করিতেছে উদ্ঘাটন
কোটী কোটী নব দৃশ্য!
হেরিতেছি দৃশ্য চয়ে—সংশয়েতে ঘেরা ঘোর!
নাইকো সরল প্রাণ—ব্যাকুলিত দুখ ভরে
দ্বেষ মান অপমান ব্যস্ত শুধু এই ল'য়ে
আলোকের প্রাণী হ'য়ে আঁধারেতে কেন মোরা?
আঁধারের শত শত
ওই হেরি অনুচরে!
হাসিছে ঘিরিয়া মোরে
অপার হরষ ভরে!
আলোকের প্রাণী আমি কেনরে ঘিরিবে ওরা?
করিবে আশয়ে মোর বিষময় গীতে ভরা!

৩

মগ্ন মুগ্ধ নেত্রে যেন কোটী কোটী তারা চাহে
শ্মশানের বক্ষপরে উদাস সঙ্গীত গাহে
সুগভীরা নিশীথিনী তুলেছে গভীর ধ্বনি
শ্মশান কাঁপিয়া ওঠে ভীষণ প্রমাদ গণি !
নীরব আকাশ দেখে
আকুল নয়নে তাই
ধীরে কহে কে কোথারে !
গেছে চ'লে—কেহ নাই ।
সুগভীর স্তব্ধ সব শ্মশান ভূমির পরে !
[illegible]
[illegible]
কোথা [illegible] যাব
কেবা আমি কেবা তুমি
[illegible] এই বিশ্ব চরাচরে
শুধু [illegible] কোলাহল ক'রে মরে ।

৪

[illegible] এস হেথা একবার
বিজন [illegible] মাঝে এস তুমি দেখা দাও
অমিয় মাধুরী তব হেথায় বিজন ঠাঁয়ে
দেখিয়ে এসেছি মাত দেখা দাও দেখা দাও
তোমায় দেখিলে মাত
ঘুচে যাবে শোক দুখ
পাইব অভয় আমি
পাইব অমৃত সুখ ।
দাঁড়াব জগত মাঝে তুলিয়া উন্নত শির
সর্ব্বত্র দেখাব কহি
তোমার অভয় ধাম
সর্ব্বত্র তোমার গান
গাহিব মা অবিরাম
[illegible] আকুল সবে—গাহিবে গম্ভীর স্বর !
ভেদিধীরে সপ্ত লোক উঠিবে আনন্দ গীর !

ভাগবত ।

বর্ষা ঋতু ।

বর্ষাকাল উপস্থিত । গগনতল বজ্রগম্ভীর রবে ধ্বনিত এবং দিকমণ্ডল ঘন ঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল । আকাশ নিবিড় নীল মেঘে আচ্ছন্ন ও এখানে অস্ফুট-জ্যোতি, উহা গুণত্রয়ে আচ্ছন্ন জীব চৈতন্যের ন্যায় অনুমিত হইল । সূর্য্য আট মাস কাল ভূমি হইতে যে জলময় ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন উচিত সময়ে সহজে তাহা আবার প্রদান করিতে লাগিলেন । কোন দয়ার্দ্র হৃদয় লোক যেমন [illegible] সন্তপ্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার [illegible] উদ্দেশে [illegible] আপনার জীবনকেও দিয়া থাকেন সেইরূপ প্রচণ্ড-বায়ু-কম্পিত মেঘ পৃথিবীকে উত্তপ্ত দেখিয়া উহাকে আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত জীবন (জল) দিতে লাগিল । যে ব্যক্তি ফল কামনা পূর্ব্বক তপস্যা করে সেই তপস্যার ফল ভোগসম্পদ পাইয়া তাহার তপঃ-সাধন ক্লিষ্ট দেহ যেমন পুষ্ট হয় সেইরূপ তপঃ-(গ্রীষ্ম) কৃশা পৃথিবী মেঘের জলে নিরন্তর সিক্ত হইয়া পুষ্ট হইয়া উঠিল । যেমন কলিযুগে পাপ (মলিন) দ্বারা পাষণ্ডেরাই সপ্রভ হয় আর বেদ সকল নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে সেইরূপ প্রদোষকালে খদ্যোতেরা অন্ধকার দ্বারা সপ্রভ হইল আর গ্রহ সকল নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল । যেমন নিত্য কর্ম্মাবসানে আচার্য্যের পাঠ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শিষ্যেরা অধ্যয়ন করিয়া থাকে সেইরূপ মণ্ডুকেরা মেঘ গর্জ্জন শুনিয়া মক মক রবে ডাকিতে লাগিল । ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের যেমন দেহ ও ধনসম্পদ উৎপথগামী হয় সেইরূপ শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল উৎপথগামী হইতে লাগিল । ভূমি শস্য-শ্যামল ইন্দ্রগোপ নামক কীটে লোহিত এবং ছত্রাকার শিলীন্ধ্র নামক উদ্ভিদ দ্বারা ছায়া-যুক্ত হইয়া রাজ-সৈন্যের ন্যায় [illegible] ভিত হইয়া উঠিল । ক্ষেত্র সকল শস্য-সম্পদের দ্বারা কৃষকদিগের প্রীতি উৎপাদন করিল । ঈশ্বর-সেবায় ভক্তের মূর্ত্তি যেমন সুন্দর হয় সেইরূপ নূতন জল-সেবায় কি জলবাসী কি স্থলবাসী সকলেরই মূর্ত্তি মনোহর হইয়া উঠিল । অপক্ক যোগার কাম-

বাসনা যুক্ত চিত্ত ভোগ্য-বিষয়-যুক্ত হইলে যেমন ক্ষুভিত হয় বায়ুবেগে তরঙ্গিত সমুদ্র নদী-সঙ্গমে সেইরূপ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মে যার মন সে যেমন বিপদে অভিভূত হইলেও ব্যথিত হয় না সেইরূপ পর্ব্বত সকল বর্ষার জলধারায় তাড়িত হইলেও ব্যথিত হইল না। শ্রুতি যেমন কালোপহত ও অনভ্যস্যমান হইয়া সন্দিগ্ধ হয় সেইরূপ পথ সকল তৃণাচ্ছন্ন ও অক্ষুণ্ণ হইয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। যেমন চলসৌহৃদ কুলটা স্ত্রী গুণী পুরুষে স্থির থাকে না তেমনি চল-সৌহৃদ বিদ্যুৎ লোকবন্ধু মেঘে স্থির থাকিতে পারিল না। গুণাত্মক প্রপঞ্চ মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন শোভা পান সেইরূপ নির্গুণ (জ্যা রহিত) ইন্দ্র-ধনু গুণ-(মেঘের শব্দ গুণ) যুক্ত আকাশে শোভা পাইতে লাগিল। জীব স্বচৈতন্যে প্রকাশিত অহঙ্কার দ্বারা আবৃত হইয়া যেমন স্বয়ং প্রকাশ পায় না সেইরূপ চন্দ্র স্বজ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মেঘে আবৃত হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইল না। সংসার-দাবদগ্ধ বিষয়-বিরাগী যেমন কোন ব্রহ্মপরায়ণের সমাগম হইলে আনন্দিত হয় সেইরূপ ময়ূরেরা মেঘাগমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কলিযুগে পাষণ্ডাদিগের নাস্তিত্ববাদ দ্বারা যেমন বেদমার্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ বর্ষার প্রবল জলপ্রবাহ দ্বারা সেতু সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। তৎকালে সকলে এইরূপ প্রবল বর্ষা দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল।

শরৎকাল।

শরৎকাল উপস্থিত। আকাশে মেঘ নাই, জল স্বচ্ছ, বায়ু মৃদু ও মন্দ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির মন যেমন পুনরায় যোগ সেবা দ্বারা প্রকৃতিস্থ হয় সেইরূপ শরৎকাল দ্বারা জল প্রকৃতিস্থ হইল। ঈশ্বরভক্তি যেমন আশ্রমীদিগের অশুভ নাশ করে সেইরূপ শরৎ আকাশের মেঘ, বৃষ্টিভীত জীব জন্তুগণের সঙ্ঘাতভাবে বাস, পৃথিবীর পঙ্ক ও জলের মল নষ্ট করিল। যেমন বীতপাপ শান্ত মুনিগণ পুত্রবিত্তৈষণা ত্যাগ করিয়া শোভা পান সেইরূপ মেঘ সকল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শুভ্র জ্যোতিতে শোভা পাইতে লাগিল। জ্ঞানীরা যেমন কৃপা হয় তো কোথাও জ্ঞান দেন কোথাও বা জ্ঞান নাও দেন সেইরূপ শরতে পর্ব্বত সকল কোথাও জলধারা দিতেছে কোথাও বা নাও দিতেছে। ফলত তৎকালে বর্ষার ন্যায় পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে আর জল-প্রপাত দৃষ্ট হইল না। আয়ু দিন দিন ক্ষয় হইতেছে ইহা যেমন স্ত্রী-পুত্রাদি-পাররত বিষয়-মুগ্ধ মনুষ্য বুঝিতে পারে না সেইরূপ জল যে দিন দিন ক্ষয় হইতেছে ইহা অল্প-জলচারী মৎস্যাদি জীবেরা বুঝিতে পারিল না। বহুপোষ্যপরিবৃত লোভাদির বশীভূত দীন দরিদ্র যেমন দুঃসহ সন্তাপ পায় অল্প-জলচারী মৎস্যাদি জীব সেইরূপ শারদ সূর্য্যের কঠোর উত্তাপ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যেমন ধীর ব্যক্তি শরীরাদি অনাত্মায় অহন্তা মমতা ত্যাগ করেন সেইরূপ স্থল সকল পঙ্ক এবং ওষধি সকল অপক্বতা অল্পে অল্পে ত্যাগ করিতে লাগিল। আত্মা সম্যক নিষ্ক্রিয় হইলে মুনি যেমন বেদধ্বনি পরিত্যাগ করেন সেইরূপ শরৎ-সমাগমে জল স্থির হওয়াতে সমুদ্র তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। যোগীরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভ্রশ্যমান জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়-নিরোধ দ্বারা রক্ষা করেন সেইরূপ কৃষকেরা সেতুশালী ক্ষেত্র হইতে ভ্রশ্যমান জলকে সুদৃঢ় সেতু দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিল। আকাশ মেঘশূন্য, চন্দ্র নির্ম্মল এবং বায়ু সমশীতোষ্ণ। সকলে এইরূপ শরৎশ্রী দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ।

নববর্ষ উপলক্ষে প্রার্থনা।

করুণানিধান! কতশত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকালে তোমার নাম লইয়া ধন্য হইবার জন্য এই পবিত্র সময়ে পবিত্র স্থানে সকলে সমাগত হইয়াছি। আজ তোমারই আদেশে পুরাতন বর্ষ নববর্ষে পরিণত হইয়া গেল। আজিকার তরুণ ভানু তোমার অভিনব কীর্ত্তি কাহিনী ঘোষণা করিবার জন্য পূর্ব্ব গগনে উদিত হইল, সমুদয় লোক সমুদয় দেবমনুষ্য আলোকে ও প্রেমে আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সেই প্রথম দিন যে দিবসে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রথম বিঘূর্ণিত হইল, সেই সময় হইতেই যেমন পৃথিবী সমভাবে জীবন ও সুখে পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে তেমনই তোমার শান্তির অনন্ত প্রস্রবণ চিরতৃপ্তিপ্রদ উদার ক্রোড় সমুদয় দেব মনুষ্যের জন্য তুল্যভাবে প্রসারিত হইয়াছে। এমন সুনিপুণ হস্ত কোথায়, যিনি তোমার করুণার কণামাত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। যখন সামান্য ঘটনায় তোমার অনুপম দয়ার অলৌকিক চিত্র সন্দর্শন করিলে বাক্য স্তব্ধ হইয়া যায়, আনন্দ অশ্রুতে পরিণত হয়, তখন চিরজীবনে তোমার অপরিশোধ্য করুণা প্রবাহের যাহা কিছু নিদর্শন পাইয়াছি এ ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া—কেমন করিয়া তাহার প্রতিদান করিব। যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই নাই, তাহার পূর্ব্বে তুমি আমার জন্য আয়োজন করিয়া রাখিলে, ইন্দ্রিয় দিবার পূর্ব্বে সুখের অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিলে। যখন অনুভব করিবার হৃদয় ছিল না, তুমি বিবিধ কাম্য বস্তুতে পৃথিবীকে পরিপূরিত করিলে। অশ্রুজল কি তাহা জানিবার পূর্ব্বে শোক তাপ বিদূরিত করিয়া দিলে। তুমি কি আমার অনন্তকালের স্নেহময় পিতা—করুণাময় মাতা নহ। তুমি যে আমার অস্তিত্বের পূর্ব্বে আমার জন্য চিন্তা করিয়াছ—এখন কি আমাকে ভুলিয়া রহিবে। তোমাকে ভাল বাসিতেছি—এখন কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছি—আমাকে কি অসহায় রাখিবে? কখনই না। পিতা! আমি যে তোমার সঙ্গে থাকিবার অধিকার পাইয়াছি, আমি যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি আমারদের মধ্যে ব্যবধান আনিয়া দেয়, কাহার সাধ্য।

পিতা! তুমি যে সকল সুখের সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত করিয়া আমাকে মর্ত্ত্যের বদ্ধভাবের মধ্যে প্রেরণ করিলে আমি কেবল তাহাতেই নীয়মান হইয়া, তোমার অভয় কূল হইতে বহুদূর পশ্চাতে নিপতিত হইয়াছি, আপনার হীন ও মলিন ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। একণে পৃথিবীর ভয় বিভীষিকায় প্রপীড়িত হইয়া দীনস্বরে তোমার অমোঘ আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি—মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাসে বিকম্পিত হইতেছি—অভাব অনটনের সর্ব্বগ্রাসী প্রব্যাদানে ব্যাকুল হইয়া তোমাকেই ডাকিতেছি। তুমি তোমার উজ্জ্বল স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশ কর। যাহাতে তোমার চরণতল বক্ষে আবদ্ধ করিয়া সংসারের মোহ আবরণ ভেদ করত উপরে উখিত হইতে পারি, আমাকে এরূপ বল বুদ্ধি শক্তি প্রদান কর। সংসারের প্রিয়বস্তুর বিনাশে হৃদিস্থিত যে চিতাগ্নি প্রধূমিত হইয়া তোমার মঙ্গল হস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তুমি তোমার অমৃতবারি সিঞ্চনে সে জ্বালা নির্ব্বাপিত করিয়া দাও, তোমার মোহন মূর্ত্তি দেখাইয়া আমাকে তোমার প্রেমসাগরে নিমজ্জিত রাখ; হৃদয়ের অপূর্ণতার পরি-

দার করিয়া উঁহাকে প্রেম-পীযূষে পরিপূর্ণ কর।

জগদীশ! তোমার নিকটে আর কি ভিক্ষা করিব। তুমি যে আমারদের জন্য চাহিবার কিছুই রাখ নাই। প্রার্থনা না করিতে করিতে যে আমারদিগের সকল অভাব সকল অনটন বিদূরিত করিয়া দিলে। উপরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, নিম্নে তরুলতা ফল পুষ্প গিরি নদী, পিতৃহৃদয়ে বাৎসল্য-ভাব, মাতার হৃদয়ে অতুলনীয় করুণা—এ সকলই তোমার অযাচিত দান। তোমার অতুলন মঙ্গলদৃষ্টি দিবানিশি আমারদের মঙ্গল সাধনে তৎপর রহিয়াছে। তোমার অবিশ্রান্ত করুণার কথা ভাবিতে গেলে বাক্য স্তব্ধ হয়, বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে, হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে প্লাবিত হইয়া যায়। তুমি যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এত দিন জীবিত রাখিয়াছ, ভয় বিপদের মধ্যে অভয় দান করিতেছ, তবে [illegible]দের সম্মুখ হইতে মোহমেঘ অপসারিত করিয়া দাও, তোমার উজ্জ্বল রশ্মিকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ [illegible] কর, বিজ্ঞান-চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান কর। তোমার কৃপাদানে [illegible] হইলে শুষ্ক [illegible] মঞ্জরিত হয়, আর আমাদের মৃত-[illegible] কি বলবান হইবে না? [illegible] একবার ধারণ করিতেছে আমাদের এই ক্ষুদ্র আত্মার কি উপায় হইবে না। আমরা নববর্ষের উপকূলে দণ্ডায়মান, সম্মুখে তমসাচ্ছন্ন দিগন্ত বিশ্রান্ত ভীষণ সমুদ্র প্রবল বেগে তরঙ্গায়িত হইতেছে। তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া—তোমার বিঘ্ন-বিনাশন নাম লইয়া ইহাতে অবতরণ করিলাম। তুমি কৃপা করিয়া তোমার স্নেহ হস্ত আমারদের মস্তকের উপর বুলাইয়া দাও, আশ্বাসবচনে আমাদিগকে আশীর্বাদ কর যে আমরা দৈববলে বলীয়ান হইয়া তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন করি—তোমার মহিমা মহীয়ান করিতে অগ্রসর হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদান্ত দর্শন।

বৈদান্তিকেরা বেদের নিত্যতা স্বীকার করেন। নিত্য শব্দ নিত্য অর্থের বোধক, বেদ সেই শব্দার্থসম্বন্ধ হেতু নিত্য। এস্থলে একটী আপত্তি আছে। মহাপ্রলয়ে জগতের নির্লেপ লয় হয়। সৃষ্টিকালে জগৎ আবার নূতন সৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন প্রলয়ে অভিধান ও অভিধেয়াদি কিছুই থাকে না তখন শব্দের আর নিত্যতা কোথায়? সে কাহার প্রত্যায়ক হইবে। সুতরাং শব্দের অনিত্যতায় শব্দাত্মক বেদেরও অনিত্যতা দাঁড়ায়।

বুঝিলাম, কিন্তু বেদের অনিত্যতায় ইহা পর্য্যাপ্ত হইল না। মহাসৃষ্টি ও মহাপ্রলয় প্রবৃত্ত হইলেও সংসার অনাদি। সংসার অনাদি বলিয়া উহার সকল সম্বন্ধও অনাদি। তবে যদি বল, মহাপ্রলয় ব্যবধানে অস্মৃতি নিবন্ধন বেদার্থের ব্যবহার কিরূপে সম্ভবে। এ বিষয়ে বক্তব্য আছে। সুপ্তি ও জাগ্রৎ অবস্থা সৃষ্টি ও প্রলয় বলিয়া স্মৃত হয়। দেখ, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির পূর্ব্ব-প্রবোধের ন্যায় উত্তর-প্রবোধেও যেমন ব্যবহারের বিলোপ হয় না, পূর্ব্ব-প্রবোধে তাহার যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে বিষয় ছিল উত্তর-প্রবোধে যেমন তাহাই থাকে; কল্পান্ত প্রভব ও প্রলয়ও এইরূপ বুঝ। অর্থাৎ কল্পান্ত প্রভব ও প্রলয়ে কোনও ব্যবহারের বিচ্ছেদ হয় না।

না বুঝিলাম না। এই সুপ্তিতে জীব সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদির সহিত পরমাত্মায় একীভূত হয়। আর যখন সে প্রবুদ্ধ হয় তখন প্রজ্বলিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল যেমন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে,

সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপেই দেখিতেছি জীবের সর্ব্বব্যবহার নিষ্পত্তি হয়। এস্থলে এই সুপ্তিতে পরমাত্মার ব্যবহারের অবিচ্ছেদ থাকায় প্রবুদ্ধ জীবের পূর্ব্বপ্রবোধের ন্যায় উত্তর প্রবোধে ব্যবহার-বিচ্ছেদ হইতেছে না। কিন্তু মহাপ্রলয়ে সর্ব্বব্যবহারের উচ্ছেদ হয়। সুতরাং জন্মান্তরের ন্যায় কল্পান্তরের সর্ব্বব্যবহার সম্বন্ধ কিরূপে স্বীকার করি।

না, ইহাও দোষের কথা হইল না। যদিও মহাপ্রলয়ে সর্ব্বব্যবহারের উচ্ছেদ স্বীকার কর কিন্তু ঈশ্বরের অনুগৃহীত হিরণ্যগর্ভাদির কল্পান্তরের ব্যবহার সম্বন্ধ থাকে। তবে যদি বল কৈ মনুষ্যাদিতে তো জন্মান্তর ব্যবহারের সম্বন্ধ কিছুই দেখা যায় না তবে হিরণ্যগর্ভাদির কল্পান্তর ব্যবহার সম্বন্ধ থাকে ইহা কিরূপে বুঝিব। অবশ্য ইহারও উত্তর আছে। তুমি প্রাকৃত জীবের ন্যায় হিরণ্যগর্ভাদিকে বুঝিও না। যেমন মনুষ্য হইতে নিম্নতম জীব পর্য্যন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদির প্রতিবন্ধ অনুক্রমে অধিক দেখা যায় সেইরূপ মনুষ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তি অনুক্রমে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই হিরণ্যগর্ভাদি প্রতিকল্পে প্রাদুর্ভূত হন*। আর ইঁহাদের পারমৈশ্বর্য্যও বেদ স্মৃতিবাদে শ্রুত হওয়া যায়। সুতরাং সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যেমন পূর্ব্বপ্রবোধবৎ উত্তর প্রবোধেও সর্ব্বব্যবহার বিচ্ছেদ হয় না সেইরূপ প্রকৃষ্ট জ্ঞান কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ঈশ্বরানুগৃহীত হিরণ্যগর্ভাদির যে কল্পান্ত ব্যবহারের অবিচ্ছেদ থাকিবে ইহা অসম্ভব কি সে। যেমন হিরণ্যগর্ভ বেদে বেদে বিশুর শাখা-দ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ আছে। ইহারা জ্ঞানাধিক্য হেতু কল্পান্তরিত বেদকে স্মরণ করিয়া তৎ তৎ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং এইরূপে ব্যবহারের অবিচ্ছেদে বেদ নিত্য।

আরও দেখ পূর্ব্বসৃষ্টি ও পরসৃষ্টিতে নাম রূপের একটা তুল্যতা থাকে। এইটি তোমাকে বুঝাইতেছি শুন। সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম বিহিত এবং দুঃখ পরিহারের নিমিত্ত অধর্ম্ম নিষিদ্ধ। এ কথার একটু তাৎপর্য্য আছে। সুখ ও দুঃখ ধর্ম্মে অনুরাগ ও অধর্ম্মে বিদ্বেষ বিষয়কই হইয়া থাকে। ইহার কখন ব্যভিচার হয় না। অর্থাৎ অধর্ম্ম করিয়া সুখ ও ধর্ম্ম করিয়া দুঃখ হয় না। ইহলোকেই দেখ অধর্ম্মে দুঃখ ও ধর্ম্মে সুখের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বকল্পে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি পরকল্পে ইহলোক-প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের ফল পশু-হিংসাদির তুল্য তাহারও ফল হওয়া চাই। কারণ দুঃখে আমার সম্পূর্ণ কামনার অভাব ছিল। আর পূর্ব্বকল্পে যে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি পরকল্পে ইহলোক-প্রত্যক্ষ অধর্ম্মের ফল দুঃখের ন্যায় তাহারও ফল দুঃখ হওয়া চাই। নচেৎ কৃতহানি দোষ দুর্নিবার হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখিতেছি ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল-স্বরূপ পরপর সৃষ্টি পূর্ব্ব-সৃষ্টির সদৃশ হইয়াই হয়। ইহাই পরসৃষ্টিতে পূর্ব্বসৃষ্টিগত নামরূপের সমানতা। ফলত উত্তর সৃষ্টি যে পূর্ব্বসৃষ্টির সদৃশ ইহার হেতু মনুষ্যের কর্ম্মফল। বিহিত ও নিষিদ্ধ প্রত্যেক কর্ম্ম একটী অপূর্ব্ব আর একটী সংস্কার জন্মাইয়া দেয়। এই অপূর্ব্ব হইতে ফলভোগ হয় আর এই সংস্কার হইতে পুনর্ব্বার তজ্জাতীয় কর্ম্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহলোকে কেহ ধার্ম্মিক কেহ অধার্ম্মিক কেহ

* বুদ্ধি দুই প্রকার ব্যষ্টি ও সমষ্টি। তোমার আমার প্রত্যেক মনুষ্যের ব্যষ্টি বুদ্ধি। আর সমস্ত বিশ্বে যাহা ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা সমষ্টি বুদ্ধি। ইহাকে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বলিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভাভেদেন ব্রহ্মাদিপদবেদ্যা সমষ্টিবুদ্ধির্মহান্ ইত্যাহ। ভাষ্য

মৃদু কেহ ক্রুর কেহ হিংস্র কেহ অহিংস্র এই রূপ হয়। এইরূপ হয় যে তাহার প্রতি কারণ পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কার। এই সংস্কার প্রকৃতি স্বভাব ও বাসনা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এখন প্রলয় ও সৃষ্টিতে জগতের সংস্কারাবশেষ লয় ও সংস্কার-মূলক উদ্ভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ জগতের যখন লয় হয় তখন স্বীয় উপাদানে তাহার কার্য্য-সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, আর যখন তাহার উদ্ভব হয় তখন স্বীয় উপাদানে লীন কার্য্য-সংস্কার-মূলকই তাহার উদ্ভব হইয়া থাকে। ফলত নির্লেপ লয় নাই। তুমি যদি এই সংস্কার শক্তিরও প্রলয় স্বীকার কর তাহা হইলে জগদ্বৈচিত্র্যের আকস্মিকত্ব দোষ দুর্নিবার হইয়া উঠে।

এখন তোমার একটী কথা অবশিষ্ট আছে। তুমি বলিতে পার এই সংস্কার ব্যতীত জগৎবৈচিত্র্যকারিণী ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কল্পনা করিব। না, তা পার না, যেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সম্বন্ধের নিয়তত্ব আছে সেই রূপ ভূরাদি লোক, জীব সমূহ ও ভোগহেতু কর্ম্ম ইহাদেরও নিয়তত্ব আছে। যেমন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির উত্তর প্রবোধে পূর্ব্বচক্ষুর্জাতীয় চক্ষুই জন্মায় এবং তাহা রূপকেই যেমন গ্রহণ করে, কদাচ রসাদিকে গ্রহণ করে না; সেইরূপ এই ভোগাশ্রয় ভূরাদি লোক, জীব সমূহ ও ভোগহেতু কর্ম্ম এইগুলি পূর্ব্বলোকাদির তুল্যই হয় ইহাই নিয়ম। মনে কর, মনের বিষয় সমস্ত ইন্দ্রিয়-সাধারণ, এতদ্ব্যতীত ইহার কি কোন অসাধারণ বিষয় কল্পনা করিতে পার। এই দৃষ্টান্তে সকল কল্পে ব্যবহারের যে তুল্যতা থাকে ইহাই স্থির বুঝিও। অতএব প্রলয় ও উৎপত্তি সম্বন্ধ থাকিলেও জগৎ নিত্য। জগৎ নিত্য হওয়াতে অভিধান অভিধেয় ও অভিধাতৃ ব্যবহারের বিচ্ছেদ হইতেছে না, সুতরাং বেদ নিত্য।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

এক বিংশ ব্যাখ্যান।

গত বৈশাখ মাসের পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠার পর।

যিনি নিত্য সঙ্গী, হৃদয়ের বন্ধু,
হৃদয়ের প্রিয় ধন।
সুদূরেতে নয়, হৃদয় যাঁহার,
প্রিয় হয় সিংহাসন॥
তাঁরে কেন মোরা, না পাই দেখিতে
তাঁরে হই সদা হারা?
কি আড়াল তাঁরে না দেয় দেখিতে,
সে আড়াল—আপনারা॥
মলিন কামনা, কুটিল বাসনা,
লয়ে মোরা সদা রই।
তাঁতে নাহি মতি, তাঁহার পথেতে
পথিক কভু না হই॥
আজীবন শুধু, মিছা কাযে রত,
"আপন" "আপন" তরে।
তাঁহার আদেশ, করিতে পালন,
মন নাহি কভু সরে॥
হৃদয় মলিন, পাপে কলুষিত,
তাঁরে না দেখিতে চাই।
মোহ জালে অন্ধ আঁখি—তবে তাঁরে
কেমনে দেখিতে পাই॥
হও শুদ্ধ মতি, ন্যায় সত্য দয়া,
বিবেক কর রে সার।
নিজে দেব হও, পরম দেবেরে,
পেতে হবে অধিকার॥
মলিন দর্পণে, রবির যেমন,
প্রতিবিম্ব নাহি হয়।
সকলঙ্ক হৃদি, পুণ্য নাম যাঁর,
নাহি তাঁর অভ্যুদয়॥
ছাড় মোহ তবে, ছাড় রে কুমতি,
ত্যজ ত্যজ মলিনতা।
তবে ত তোমার, হইবে অন্তরে,

তাঁর জন্য ব্যাকুলতা ॥
"ব্যাকুল অন্তরে, চাহরে তাঁহারে,"
পাবে তাঁর দরশন।
পাইবে হৃদয়ে হৃদয়ের সখা,
হৃদয়ের প্রিয়ধন ॥
ধন বিদ্যা বল, সময় তোমার,
কর তাঁরে নিয়োজন।
'আমি' ও 'আমার' হৃদয় হইতে
কর কর বিসর্জ্জন ॥

দেখ মুক্তি-দাতা, হৃদয়ে তোমার,
আসিতে প্রয়াস পান।
লয়ে যেতে তোমা, তাঁর পুণ্য পথে
অবিরত তিনি চান ॥
তাঁর ইচ্ছা নয়, তাঁরে ছাড়ি মোরা,
তাঁহা হ'তে দূরে র'ব।
মোহের ছলনে, বিষয় লইয়া
প্রবৃত্তির দাস হ'ব ॥
দেখ তাই তিনি, অবসর খুঁজি,
আসি দ্বারে সবাকার।
বলেন বচন, সংসার তারণ,
পাপ-বন্ধ টুটিবার ॥
সম্পদ্ বিপদে, শোক হর্ষ মাঝে,
সে বচন শুনা যায়।
ভক্ত শোনে তাহা, প্রাণ মন দিয়া
প্রেম শান্তি কিবা পায় ॥
তাঁহার মোহন মুরলী-নিস্বন
ডাকে সবে তাঁর পানে।
কত সাধু জন, সে রবেতে মাতি,
ছাড়ি কুল ধন মানে ॥
তাঁহারে লইয়া, প্রেমানন্দে মজি,
তাঁর সহ করে বাস।
পিয়ে তাঁর সুধা, সে সুধা বিলায়,
হয়ে থাকে তাঁর দাস ॥
ব্যাকুল অন্তরে, অকিঞ্চন হয়ে,
কর তাঁর অন্বেষণ।
আপনারে দিয়া, তিনি যে তোমারে,
তুষিবেন অনুক্ষণ ॥

তাঁর নাম লও, কর তাঁর কায,
তাঁহার বচন রাখ।
পাবে যদি তাঁর, স্বর্গীয় প্রসাদ,
প্রেম ভরে তাঁরে ডাক।

হায় ! মোরা ভুলে যাই, না করি স্মরণ।
দয়াময় আমাদের করিয়া সৃজন ॥
কত স্নেহ কত প্রেম, করেন বর্ষণ।
আপন অভয় দেন, লইলে শরণ ॥
কোথা তিনি মহারাজা জগৎ ঈশ্বর।
কোথা পাপমতি মোরা অতি ক্ষীণ নর ॥
তাঁর করুণার নহি আমরা ভাজন।
কিন্তু তাঁর হেন জনে নাহি বিস্মরণ ॥
স্নেহেতে ভরিয়া কত করিছেন দান।
বলে দেন মুক্তি-পথ অমৃত-সোপান ॥
কিবা চান প্রতিদান নিকটে তোমার ?
হৃদয় তোমার চান, জেন এই সার ॥
দেখো দেখো, তাঁরে নাহি কর প্রত্যাখ্যান।
হৃদয় খুলিয়া তাঁরে করহে আহ্বান ॥
তাঁরে দাও মন প্রাণ পাবে সেই ধন।
তাঁহাতে করিবে বাস জীবন মরণ ॥

প্রার্থনা।

আছ কাছে তুমি নাথ ! হৃদয় ঈশ্বর।
কিন্তু মনে করি তুমি সুদূর অন্তর ॥
তোমা দেখিবারে মোরা না করি যতন।
তাই নাহি পাই মোরা তব দরশন ॥
তোমা তরে যেই হয় কাতর হৃদয়।
দেখা দাও হৃদি আসি তাহারে নিশ্চয় ॥
সকল অভাব তার করহ মোচন।
ঘুচাইয়া দাও তার মায়ার বন্ধন ॥
তোমা হেন ধনে মোরা হয়ে বিস্মরণ।
কি লইয়া করিতেছি জীবন যাপন ॥
কবে মোরা তব প্রেমে হইব প্রেমিক।
অমৃতের পথে তব হইব পথিক ॥
কর নাথ ! মনোবুদ্ধি করি নিয়োজন।
একান্তে তোমারে যেন করি অন্বেষণ ॥

করে লও আমাদের একান্ত তোমার।
তব কার্য্য করি যেন জীবনের সার॥
তোমাতে সকল প্রীতি করিয়া অর্পণ।
তোমারে লইয়া করি সফল জীবন॥
ইতি একবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আপদ বিপদ।*

বিগত ১১ চৈত্র দিবসে সন্ধ্যার পর অনরেবেল্ আনন্দমোহন বসুর প্রস্তাবে কলিকাতার সিটি কলেজ ভবনে একটি কথোপকথন সমিতি হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ন বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের আপদ বিপদ বিষয়ে যাহা বলেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

"মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থা অতিশয় মান হয়, তাহার পর শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য তাহার পুনরুদ্দীপনে যখন যত্নবান হইলেন তখন ব্রাহ্মের সংখ্যা এত অল্প হইয়া গিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিকের অবস্থা এমন মন্দ ছিল যে মধ্যে মধ্যে নিরাশ অন্ধকার আসিয়া আমাদিগের মনকে আচ্ছন্ন করিত, কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সেই নিরাশার অন্ধকার ক্রমে উন্নতির আলোকে দূরীকৃত হইল। ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত হইল, ব্রাহ্ম দলের সৃষ্টি হইল, আমাদের জীবননায়ক ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত হইল, আমাদের ভ্রাতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নানা স্থানে গমন করিলে, সেখানে ব্রাহ্মসমাজ, য়ুরোপ আমেরিকাতে ঘোষিত হইল। এক্ষণে অনেক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে কোন আশঙ্কা নাই যে এই পরম পবিত্র ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইবে কিন্তু সত্যের কথা বলিতে কি যতই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশাল আকার ধারণ করিতেছে ততই নূতন আশঙ্কা মনে উদিত হইতেছে। অদ্য সেই সকল আশঙ্কা তোমাদিগের নিকট বিবৃত করিবার ইচ্ছা।

আমরা যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রবেশ করিলাম তখন শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের নিকট বৈদ্য জাতীয় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, তিনি আমাদিগের কার্য্য দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন "বাবা! আগুণ নিয়ে খেলা, এরপর টেরটা পাবা।" বস্তুতঃ আমরা এখন টের পাইতেছি যে কি আগুণ লইয়া আমরা নাড়া চাড়া করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথম আশঙ্কা এই যে ক্রমে পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ এই ধর্ম্মে প্রবেশ করিবে। আমরা পরিমিত অন্তবৎ জীব, ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ। অন্তবৎ জীব অনন্তকে সম্যক্ রূপে ধারণ করিতে পারে না। যেমন মানবীয় ক্ষীণ দৃষ্টি প্রসারিত মহা সমুদ্রকে এককালে সম্যক রূপে ধারণ করিতে পারে না, সে দৃষ্টি দিগ্বলয় দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, সেইরূপ আমাদিগের পরিমিত আত্মা সেই মহান অনন্ত পরমাত্মাকে সম্যক ধারণ করিতে পারে না; ধারণ করিতে না পারাতে পরিমিত দেবতার উপাসনার অধিকতর অনুরাগী হয়। অতএব আমাদিগের ধর্ম্মে ক্রমে পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ আসিবার সম্ভাবনা। ইহুদিদিগের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে তাহারা ক্রমাগত ঈশ্বর দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াও পুনঃ পুনঃ পৌত্তলিকতাতে পতিত হইয়াছিল। যখন কোন ধর্ম্ম উপধর্ম্ম দ্বারা কলুষিত হয় তখন একজন ধর্ম্ম-সংস্কারক উদিত হয়েন, তিনি সেই ধর্ম্মকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ করেন, আবার তাহা অবিশুদ্ধ আকার ধারণ করে, পুনরায় একজন ধর্ম্ম-সংস্কারক উদিত হওয়ার আবশ্যক হয় এইরূপ ধর্ম্মের পুরাবৃত্তে দেখা যায়। আমাদিগের ধর্ম্মে যে এরূপ ঘটিবে না তাহা আমরা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি না। মধ্যে আমাদিগের সম্মুখ দিয়াই ত অবতারবাদের একটি প্রবাহ চলিয়া গেল। আমরা যদি "হা! হা!" করিয়া না পড়িতাম তবে তাহা আর একটু হইলেই প্রসারিত হইয়াছিল। আমাদিগের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম কালে পৌত্তলিকতা ও উপধর্ম্ম দ্বারা কলুষিত হইবার আশঙ্কা আছে। এ বিষয়ে আমাদিগের অতিশয় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় আশঙ্কা—সাধারণের পক্ষে নিরাকারে প্রীতি করা কঠিন অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মে উপাসনাহীনতা আসিবার সম্ভাবনা। যদি এই উপাসনাহীনতা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে বড়ই বিপদ, যেহেতু সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাই পুরুষ অপেক্ষা ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অধিকতর যত্নবান দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মিকারা শ্রদ্ধার পাত্রী কিন্তু যদি এই উপাসনাহীনতা কখন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে এই কথা বলা অনুচিত হইবে না যে ইহা অপেক্ষা আপনারা প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন তাহা যে ভাল ছিল। এই উপাসনাহীনতা যেন আমাদিগের স্ত্রীলোক-

---

* ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিলে "The Rocks a head" হয়।

দিগের মধ্যে না ঢুকে। এই উপাসনাহীনতা তাঁহা-
দিগের মধ্যে ঢুকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে বিশে-
ষতঃ যখন পাশ্চাত্য বিলাস আমাদিগের সমাজকে
গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়াছে। আমা-
দিগের এ বিষয়ে পৌত্তলিকদিগের অগ্রগামী হওয়া
কর্ত্তব্য। ঠাকুরের পূজা না হইলে যেমন তাঁহারা
জলগ্রহণ করেন না সেইরূপ প্রাত্যহিক উপা-
সনা কার্য্য সম্পাদিত না হইলে কোন ব্রাহ্ম
পরিবারের জলগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। তৃতীয়
আশঙ্কা যে যখন আমাদিগের ধর্ম্ম প্রচারশীল ধর্ম্ম তখন
তাহার অনুবর্ত্তীদিগের আচরণ দ্বারা তাহা কলঙ্কিত
হইবার সম্ভাবনা। নদীর প্রস্রবণ যখন পর্ব্বতে থাকে
তখন কেমন বিশুদ্ধ কিন্তু মনুষ্যের আলয়ে অবতরণ
করিয়া যতই তাহা প্রবাহিত হইতে থাকে ততই
নগরের আবর্জ্জনা তাহাতে পড়িয়া তাহা অবিশুদ্ধ হয়।
ধর্ম্ম যতদিন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে তত
দিন বিশুদ্ধ থাকে কিন্তু যাই সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে
তাহা প্রচারিত হইতে থাকে, ততই মনুষ্যের নিকৃষ্ট
প্রবৃত্তির সংস্পর্শে তাহা আইসে ততই তাহা ক্রমে অবি-
শুদ্ধ আকার ধারণ করে। মনুষ্যের এই সকল নিকৃষ্ট
প্রবৃত্তি এত প্রবল যে তাহারা সংসার হইতে ধর্ম্মের
বেশে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সেই রাজ্যের বিনাশ
সাধন করে। সংসারের সেই দ্বেষ, সংসারের সেই
অভিমান, সংসারের সেই ধনলোভ, সংসারের সেই
যশোলিপ্সা সংসারের সেই প্রভুত্বের ইচ্ছা ধর্ম্মের বেশ
ধরিয়া ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করে। অতএব আমা-
দিগের নিজের চরিত্রের প্রতি অত্যন্ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।
যেন আমাদিগের চরিত্রের দ্বারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে
কলঙ্কিত না করি। জানিবে আমাদিগের প্রতি সমস্ত
জগতের দৃষ্টি রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উচ্চধর্ম্ম।
আমরা অতি উচ্চ উচ্চ কথা বলি, সেরূপ কথা সেই
রূপ আচরণ না হইলে লোকে সুতরাং নিন্দা করে।
চতুর্থ আশঙ্কা এই যে প্রচারশীল ধর্ম্মের দস্তুরই এই
যে তাহাতে বাক্যের প্রাচুর্য্য হয়। অনেক বাক্য ব্যয়
না করিলে প্রচারশীল ধর্ম্ম প্রচারিত হয় না। এক
একটা উৎসবে কত বাক্যব্যয় হয় বিবেচনা কর।
বাক্যের প্রাচুর্য্য হইতে গেলেই লোকের আন্তরিক
অঙ্গ সাধনের প্রতি মনোযোগের হ্রাসতা হয়। সমাজ,
বক্তৃতা, উৎসব সকলই আবশ্যক কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধ-
নের প্রতি আমাদিগের অধিকতর মনোযোগী হওয়া
কর্ত্তব্য। অন্তরঙ্গসাধন অতি কঠিন, বাক্য ব্যয় সহজ।
এই জন্য মনুষ্য অন্তরঙ্গসাধন অপেক্ষা বাক্যের প্রতি
অধিক মনোযোগী হয়।

"পুত্রানুপুত্রবিষয়েষ্বনুতৎপরোপি
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং
সঙ্গীতনৃত্যগতিতানবশংগতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব।"

"যেমন সঙ্গীত নৃত্য গীতের নিয়ম পালন করিয়াও
ধীরা নটী আপনার মস্তকস্থিত জলপূর্ণ কুম্ভের প্রতি
মনোযোগী হয় তেমনি পুত্রপৌত্রাদি বিষয়ে অনুতৎপর
হইয়াও জ্ঞানী ব্যক্তি [illegible] পরমেশ্বরকে
বিস্মৃত হয়েন না।" এই শ্লোক অনুসারে প্রকৃত
গৃহস্থের আচরণ করা কর্ত্তব্য কিন্তু এইরূপ আচরণ কি
কঠিন। যখন কাহারো প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হয়,
যখন উৎকোচ লইবার প্রবৃত্তি হয় তখন ক্রোধ দমন
করা অথবা লোভ দমন করা কি কঠিন। নিজের
কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের উপকার করা কি কঠিন।
এই সকল কার্য্য অতি কঠিন কিন্তু এই সকল কার্য্যই
অর্থাৎ ঈশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে দেখা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি
দমন করা, নিজের কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের উপ-
কার করাই অন্তরঙ্গ সাধন। মনুষ্য কঠিন কার্য্য
সম্পাদন অপেক্ষা সহজ কার্য্য যে কেবল বাক্যব্যয়
তৎসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে বিচিত্র নহে। পঞ্চম আশঙ্কা,
[illegible] নূতন [illegible]
[illegible] কোন [illegible] না
[illegible] আছে। ধর্ম্ম ও সমাজ
সংস্কারে দেখা যায় পুরাতন অনিষ্ট উৎপাটন কর,
তাহার পাশ দিয়া নূতন অনিষ্ট গজাইবে। ধর্ম্ম-
সংস্কারের আনুষঙ্গিক অনিষ্ট অহঙ্কার ও অবিনয়। নূতন
আলোক পাইয়া লোকের মাথা ঘুরিয়া যায়। ব্রাহ্ম-
ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম প্রচারক কানপুরনিবাসী লালা
হাজারিলালকে কোন দেশের কিন্তু বিজ্ঞ পৌত্তলিক
জমিদার বলিয়াছিলেন "লালা সাহেব! হমকো ব্রাহ্ম
কিজিয়ে [illegible]
[illegible]
উপস্থিত হয়। [illegible]
পেক্ষা গুরু। নূতন [illegible] আলোক পাইয়া লোকে
এতদূর গর্ব্বিত হইয়া উঠে যে পিতৃপুরুষদিগের ধর্ম্ম
কিছুমাত্র ভাল দেখে না। পিতৃপুরুষদিগের প্রণীত
ধর্ম্মগ্রন্থ সকল একত্র জড় করিয়া নদীর বানে একেবারে
ভাসাইয়া দিতে চায়। এই দোষ হইতে ঈশ্বর ব্রাহ্ম-
সমাজকে রক্ষা করুন। আমাদিগের বিষয় এই যে পূর্ব্বে
যাহা হউক এক্ষণে এই দোষের অনেক ন্যূনতা দেখি-
তেছি। ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধে যেমন সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও
সেইরূপ। পুরাতন অনিষ্ট উৎপাটন কর, তাহার পাশ

বয়সে বিবাহের পক্ষ তথাপি তাহার আনুসঙ্গিক অনিষ্টের প্রতি অন্ধ নহি। অধিক বয়সে বিবাহপ্রথা নিবন্ধন দুশ্চরিত্রতা আসিবার সম্ভাবনা। আমি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ। আমি প্রাচীন ভারতবর্ষে ও এক্ষণে মাদ্রাজ বোম্বাই প্রদেশে যেরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত তাহার পক্ষ কিন্তু স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরবদ্ধতাতে চিরঅভ্যস্ত বঙ্গদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রথম প্রবেশ করাইবার সময় আনুষঙ্গিক অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। আমি এরূপ বলি না যে এরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে কিন্তু ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি বিধবা বিবাহের উপকারিত্ব স্বীকার করি। সকলেই অবগত আছেন যে আমার নিজ পরিবারে উহা প্রচলিত করাইয়াছি তথাপি উহার আনুষঙ্গিক অনিষ্টের প্রতি একেকালে আমি অন্ধ নহি। একপতি ছাড়িয়া পত্যন্তর আবার সে পতি [illegible] অন্য পতি গ্রহণ করিতে গেলে পতিভক্তির হ্রাস হয় বিশেষতঃ বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে [illegible] হয় পাছে [illegible] কি আমার স্মৃতির প্রতি [illegible] হইয়া [illegible] ও [illegible] জীবন পরিবার ও পরোপকার ব্রত অবলম্বন করেন সেই সকল স্বভাব [illegible] স্ত্রীলোকের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। এই আশঙ্কা [illegible] ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে [illegible] বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহারা ঈশ্বর-প্রণীত শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যে যখন বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে তখন আমরা যখন কোন ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না তখন আমাদিগের মধ্যে আত্মবিরোধ হইবার ত আরো সম্ভাবনা। এ সকল অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? এই সকল অনিষ্ট নিবারণের উপায় এক কথার ভিতর আছে, ব্রহ্মপ্রীতি। ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি থাকিলে আমাদিগের ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা আসিতে পারে না। দৃশ্যমান দেবতাকে প্রীতি করা সহজ। নিরাকারকে ভাল বাসিতে গেলে উচ্চ প্রীতির আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি এই উচ্চ প্রীতি থাকিলে আমাদিগের মধ্যে কখন পৌত্তলিকতা আসিবে না। ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতি থাকিলে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদিগের উপাসনাহীনতা দোষ কখন ঘটিবে না। ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতি থাকিলে আমাদিগের চরিত্র দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতি থাকিলে কেবল বাক্যের প্রাচুর্য্য হইবে না, অন্তরঙ্গ সাধনের প্রতি মনোযোগ হইবে। প্রকৃত ঈশ্বর প্রীতি থাকিলে অহঙ্কার ও অবিনয় কখন আসিবে না। প্রকৃত ঈশ্বর প্রীতি থাকিলে অল্প বয়সে বিবাহ না করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ কাল পর্য্যন্ত আপনার চরিত্র লোকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবে। প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতি থাকিলে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াও আপনার চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবে। প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতি থাকিলে স্ত্রীলোকের পতিভক্তি রক্ষিত হইবে যেহেতু আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্বন্ধ আছে পার্থিব দাম্পত্য সম্বন্ধ তাহার ছায়া মাত্র। আমাদিগের দেশের নিদারুণ প্রথাবশতঃ যে সকল বালবিধবা কষ্ট পায় তাহাদিগের বিবাহের কথা বলিতেছি না। তাহাদিগের বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি বয়স্ক বিধবাদিগের বিবাহের কথা বলিতেছি। প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি ও পতিভক্তি থাকিলে বয়স্ক বিধবারা পশুবৃত্তি দমন করিয়া পরিবার ও পরের উপকার সাধনে জীবন ক্ষেপণ করিবে। বিপত্নীক পুরুষেরাও ঐরূপ করিবে। যদি সন্তান না হইয়া মধ্য বয়সের পূর্ব্বে কেহ বিধবা অথবা [illegible] হয় [illegible] অথবা [illegible] করিতে [illegible] হয় সে সম্বন্ধ [illegible]। প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম থাকিলে মতভেদের প্রতি [illegible] হইবে সুতরাং [illegible] বিষয়ে [illegible] আমাদিগের মধ্যে আত্মবিরোধ হইবে না। এই আত্ম[illegible] সম্বন্ধে আমি অপ্রাসঙ্গিক [illegible] কথা বলিতে [illegible] আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভারতবর্ষীয় সমাজ বাহির হইল, ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাহির হইল। দল হইতে দল বাহির হইল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে আবার একটা নূতন দল না বাহির হয় যেহেতু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের অনেক আশাভরসার স্থল। ব্রহ্মপ্রীতিই সকল দুঃখ কষ্টের একমাত্র ঔষধ; ব্রহ্মপ্রীতিই সকল আপদ বিপদের উদ্ধারক। ঈশ্বরভক্ত পারস্য কবি জেলালুদ্দিন রুমি বলিয়াছেন "প্রেম! তুমি কুশলে থাক। তুমি আমার সুখদ ঔষধ। তুমি আমার সকল রোগের চিকিৎসক। তুমি খুব হীন সমীচীন ঔষধ। তুমি আমার প্লেটোও গেলেন অর্থাৎ চিকিৎসক।" * আমরা ব্রাহ্ম; ব্রহ্মই আমাদিগের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য হারাইয়া যদি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা দেশের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, স্পষ্ট অনিষ্ট হইবেক।"

রাজনারায়ণ বসু এই সকল কথা বলিলে

---

* মুসলমানেরা আফ্লাটুন অর্থাৎ প্লেটোকে উত্তম দার্শনিক ও চিকিৎসক বলিয়া বিশ্বাস করে।

পর ধর্ম্মনিষ্ঠ উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় গাত্রো- খান করিয়া ভাবোদ্বেলিত চিত্তে ভগ্ন স্বরে বক্তার সাধুবাদ করিলেন ও উপস্থিত ব্রাহ্ম- দিগকে বক্তা দ্বারা বর্ণিত আপদ বিপদ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা পায় এ বেলা হইতে তাহার যত্ন করিতে প্রোৎসাহিত করিলেন। আরো দুই একজন ব্রাহ্ম কিছু কিছু বলিলে পর সমিতি ভগ্ন হইল।

মহদ্বাক্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫২)

সামান্য অপকার অগ্রাহ্য করা মহত্ত্বের চিহ্ন।

(৫৩)

[illegible] মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি [illegible] করে [illegible] কর।

(৫৪)

ঈশ্বরের সহিত যদি আমাদিগের সাদৃশ্য না থাকিত তাহা হইলে [illegible] ভক্তি করিয়া, তাঁহাকে ভাল বাসিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া, পরিতৃপ্ত হইতাম না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে।

(৫৫)

পবিত্র যিনি, তাঁহার নিকট সকল বস্তু পবিত্র, সকল দিন শুভ, সকল ঘটনা মঙ্গলকর এবং সকল মানুষ স্বর্গীয়।

(৫৬)

ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত নিগূঢ় এত নিকট যে তাহাদের মধ্যে যোগ নিবন্ধ করিবার জন্য মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তির সাহায্য নিতান্তই অনাবশ্যক।

(৫৭)

তোমার আত্মায় যে স্বাভাবিক জ্যোতি নিহিত আছে তাহাই উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা কর—তাহার আলোক তোমার জন্য যত উপকারী, অতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর উপদেশও তোমার পক্ষে সেরূপ উপকারী হইবে না।

(৫৮)

যিনি ঈশ্বরের সহবাস উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ও স্বর্গের সৌন্দর্য্যের আভাস পাই।

(৫৯)

রিপুগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে আত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় সে অবস্থায় বিশ্বজনীন সত্য, ন্যায় ও পবি- ত্রতার সহিত তাহার আর কোন বিরোধ থাকে না।

(৬০)

তুমি ভিন্ন তোমাকে আর কেহ শান্তি দিতে পারে না।

(৬১)

যদি অকপট ভাবে কথা কহ ও কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমার বাক্য ও কার্য্য কখন [illegible] না।

(৬২)

তোমার প্রত্যেক মিথ্যা [illegible] বা ব্যবহার তোমার আত্মাকে কলুষিত করিয়া স্থির [illegible] না। উহার ফল সমস্ত মানব সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

(৬৩)

[illegible] যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় [illegible]—যে দেখিতে পায় যে সকলের সহিত [illegible]।

(৬[illegible]৩)

[illegible] করিও, কিন্তু নিজের [illegible] বর্জ্জনা করিও না।

(৬৫)

যে মৃত্যু কামনা করে সে দেখায় যে সে ইহ জীব- নের কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ।

(৬৬)

মৃত্যু অপেক্ষা মৃত্যু ভয় পরিত্যাজ্য।

(৬৭)

দোষ স্বীকার করা নির্দ্দোষিতার সমতুল্য।

(৬৮)

শিশির কণায় যেমন সূর্য্যালোক প্রতিবিম্বিত হয়, মানবাত্মায় ঈশ্বর তেমনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

(৬৯)

[illegible] জগতে কিছুই মুক্ত হয় না।

(৭০)

সকল রহস্যের মূল কি? অজ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞানীর নিকট কিছুই রহস্য নহে।

(৭১)

প্রার্থনা আধ্যাত্মিক বার্ত্তাবহ। উহা জীবাত্মার সংবাদ পরমাত্মার নিকট লইয়া যায় এবং পরমাত্মার সংবাদ জীবাত্মার নিকট আনয়ন করে।

(৭২)

একটী সৎকার্য্যের ফল অনন্তকালস্থায়ী। তাহার মঙ্গলপ্রসূ শক্তি কোন্ কালেই বিনষ্ট হইবে না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে মঙ্গলের বিনাশ কোথায়?

(৭৩)

প্রেম ছাড়া ধর্ম্ম হইতে পারে না। প্রেম হইতেই ধর্ম্মের জন্ম। প্রেমই ধর্ম্ম, প্রেমই স্বর্গ, প্রেমই ঈশ্বর।

(৭৪)

যে সকল ব্যক্তি সত্যের সাধনা করিয়াছেন তাহাদিগের জীবন এক একটী মহান ধর্ম্মগ্রন্থতুল্য।

(৭৫)

যদি সত্য শিক্ষা দিতে চাহ তাহা হইলে সত্য পালন কর। যদি তুমি অন্য একটী আত্মাকে ভাব-মুগ্ধ করিতে চাহ, তাহা হইলে নিজে ভাব-মুগ্ধ হও।

(৭৬)

দোষ স্বীকার করা মহৎ গুণ। যে দোষ স্বীকার করে সে শীঘ্রই নির্দ্দোষ হয়।

(৭৭)

সহিষ্ণুতা আমাদিগের আত্মার প্রভাব ও শক্তি প্রকাশ করে।

(৭৮)

তোমার প্রতি যদি কেহ কোন অন্যায়াচরণ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা ভুলিয়া যাওয়াই মহত্ত্বের চিহ্ন।

(৭৯)

যাহা হারাইয়া যায় তাহার কোন মূল্য নাই। যাহা কখন হারায় না তাহাই লোভনীয়।

(৮০)

দুঃখ যে সুখের সহগামী, সে সুখ পরিত্যাগ করাই জ্ঞানীর উচিত।

(৮১)

পবিত্রতা সকল দুঃখের ঔষধ।

পত্র।

দেওঘর, ১০ বৈশাখ, ৫৮।

পরমপূজনীয় মহাশয়েষু,

প্রীতি পূর্ব্বক প্রণাম

আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন মহাবাক্যগুলি মাঝে মাঝে বদলায়। অদ্য হইতে নিম্নলিখিত মহাবাক্যগুলি ধরিয়া থাকিতে মানস করিয়াছি।

(১)

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

(২)

Thou, O God! hast made us for thyself and the soul finds no rest until it rests in thee.

(৩)

অধুনৈব সুখী শান্ত বন্ধমুক্ত ভবিষ্যসি।

(৪)

স মোদতে মোদনীয়ংহি লব্ধ্বা।

(৫)

সকলত্রো বা বিকলত্রো বা সধনাঢ্যো বা বিধনাঢ্যো বা
সংসারেহস্মিন যোজিতচিত্তঃ শোচতি শোচতি শোচত্যেব।
যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

প্রত্যুত্তর।

তোমার দ্বিতীয় মহাবাক্যটি (Thou, O God! hast made us for thyself and the soul finds no rest until it rests in thee.) অতি চমৎকার হইয়াছে। এখন তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে তুমি এইটি আর কখনো ছাড়িয়া দিও না, ইহা তোমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে পুতিয়া রাখিয়া দিও, কেননা এমন জিনিস একবার ছাড়িয়া দিলে আর পাইবে না। আমিও তোমার এই মহাবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি। তিনিই আমার এক মাত্র আরাম স্থান—তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথাও আরাম পাই না। কত স্থানে আমাদের জন্য গৃহ বাঁধিয়াছি তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আরামের জন্য উচ্চ হিমালয়ের কত কত নিভৃত কন্দরে প্রবেশ করিয়াছি, কত কত উচ্চ চূড়ে আরোহণ করিয়াছি, কত কত নদীর স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া কত দূরে গিয়াছি কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া সেখানেও আরাম নাই। নির্জ্জনে বনে প্রান্তরে গৃহ বাঁধিয়াছি, হয়তো সে গৃহ ভাঙ্গিয়াছে না হয় মনই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয়ে আরাম নাই দেখিয়া আমি এখন অনন্যচেষ্টা হইয়া সেই হৃদয়নাথ প্রিয়বন্ধুতেই সকল প্রকার আরাম উপভোগ করিতেছি। আজ প্রাতঃকালে আমি বাগানের একটি চম্পক পুষ্পের আঘ্রাণ লইতেছিলাম ও হাফেজের এই শ্লোক গান করিতেছিলাম যে, হে প্রাতঃকালের সুগন্ধ সমীরণ আমার সেই প্রিয় বন্ধুর আবাস স্থান কোথায়? এমন সময় তোমার পত্র আমার হস্তগত হইল। আমি তাহাতে

আমারই কথার সায় পাইলাম। আমি যে আরাম স্থানে বসিয়া আনন্দ মনে তাহার কথা ধ্বনিত করিতেছিলাম তোমার পত্র তাহারই প্রতিধ্বনি লইয়া আসিল এবং আমার হৃদয়ে তোমার হৃদয়ের আনন্দ মিলিয়া ঈশ্বরে এবং জগতে, অন্তরে এবং বাহিরে আনন্দ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। অতএব এমন মহাবাক্য তুমি যেন আর কখন ছাড়িয়া দিও না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৮ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত মাঘ মাসে ব্রাহ্ম সাধারণকে যে উপদেশ দেন তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহকাল ও পরকালের শুভ ইচ্ছা করেন এই উচ্চ উপদেশ তাঁহাদেরই বিশেষ উপযোগী। ইহা প্রধান আচার্য্যের শেষ জীবনের শেষ উপদেশ। ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি আপনার যে মহামূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা অবসান হয় বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আপনার কতকগুলি শেষ কথা উপহার দিয়াছেন। তাহাই এই উপদেশ। ইহা ব্রাহ্মসমাজের চির সম্পত্তি ও অতি যত্নের ধন। এ দেশে যতদূর উত্তম হওয়া সম্ভব আমরা সেইরূপে এই উপদেশ মুদ্রিত করিয়াছি এবং এ দেশে যতদূর উত্তম হওয়া সম্ভব আমরা সেইরূপে এই গ্রন্থখানি বাঁধাইয়াছি। ফলত ইহার বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রত্যেকেরই মন প্রাণ হরণ করে। যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন। সোণার জল দিয়া বাঁধা পুস্তকের মূল্য ।৵০ আর ভাল কাপড়ে বাঁধা পুস্তকের মূল্য ।০ আনা।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

৫০। ৬০ বৎসর হইতে চলিল এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। এমন অনেক কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা এই সমাজভুক্ত। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা সমাজভুক্ত না হইয়াও ইহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই উভয় প্রকার লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। সম্প্রতি আমরা একটী ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। যে কোনরূপে হউক যাঁহারা এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭ [illegible]

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩০১৪৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৬৯৪ ৶০
সমষ্টি	৫৭০৯ ৷০
ব্যয় ...	২৬১৭। ৬
স্থিত	৩০৯১৸৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৬৯৪৸৶৯

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্ম সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য (১৮০৮ শকের কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত)	১৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮০৮ শকের আশ্বিন হইতে মাঘ পর্য্যন্ত)	১০৲
" " সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮০৭ শকের পৌষ হইতে ১৮০৮ শকের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত)	১২৲
" " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) (১৮০৮ শকের আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত)	১৲
" " শ্রীনাথ মিত্র (১৮০৭ শকের [illegible] ও চৈত্র)	১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য মহাশয়	১০০৲
পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০৲
" " শিবচন্দ্র দেব (কোন্নগর)	৫৲
" " [illegible] দেব ঐ	২৲
" " [illegible] মিত্র	৫৲
" " [illegible] নন্দী	২৲
" " অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	৪৲
" " [illegible] মল্লিক	৪৲
" " [illegible]কুমার সরকার (বোয়ালিয়া)	৪৲
" " [illegible] সিংহ (তেলিনি)	২৲
" " ক্ষেত্রমোহন ধর	২৲
" " লালবিহারি বড়াল	২৲
" " দীননাথ অধোতা	২৲
" " রাজকৃষ্ণ আড্ডা	২৲
	২৩০৲

জের	২৩০৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম	১৷৶০
" " কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
" " হরনাথ ঠাকুর	১৲
" " রামলাল ঘোষাল	১৲
" " আশুতোষ রায় (বান্দা)	১৲
শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী	৫৲
" ত্রৈলোক্যমণি দাসী	৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হিরণ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় (কেতুপাড়া পাবনা)	৫৲
পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৲

বিশেষ দান।

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে প্রাপ্ত	[illegible]
দানাধারে প্রাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ আয়	[illegible]
	৬৯৪৸৶৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৭৯৸৶৩
পুস্তকালয় ...	১৩৯৸৶৯
যন্ত্রালয় ...	১২১৪৷৴৬
গচ্ছিত ...	৩৯২৲৶৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৭৩৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৮০৲
দাতব্য ...	৬০৲
সমষ্টি	৩০১৪৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪৪৸৴৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৬০। ৬
পুস্তকালয়	৯২৶৬
যন্ত্রালয়	৯৬৯৷৴০
গচ্ছিত	৫৫৪৷৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩৬৷৶ ৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৮০৲
দাতব্য	৬০৲
অধ্যাত্ম রামায়ণ	১৯। ৯
সমষ্টি	২৬১৭। ৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্ম ও সুখ।

শরীর মন ও আত্মা লইয়া মনুষ্য গঠিত। ইহাদের প্রত্যেকেরই ঐশ্বরিক কার্য্য নির্দ্দেশ আছে। প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অভাব অনটন আছে। প্রত্যেকের লক্ষ্য প্রত্যেকের তৃপ্তি বিভিন্ন দিকে। শরীর সুস্থ সবল দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ থাকিয়া কামনার অশেষবিধ বিষয় সম্ভোগ করিতে চাহে। সে স্বাধীন থাকিতে চাহে, বন্ধন তাহার পক্ষে যার পর নাই অসহ্য; পরিশ্রম করিতে সক্ষম কিন্তু তাহার অন্তে বিরাম অন্বেষণ করে। কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে চাহে না, এমন কি, শরীরের কোন এক অংশে সামান্য কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে সে তাহা উন্মূলন করিতে না পারিলে সুস্থির হইতে পারে না। মন জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা দয়ামায়া, স্নেহ মমতা, সহানুভূতি, প্রেম-ভক্তি, সুখের ইচ্ছা, দুঃখ পরিবর্জ্জনের বাসনা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। শরীরের কষ্ট হউক তাহাও স্বীকার তথাপি সে আপনার কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর। শরীর অবসন্ন হইয়া যাইতেছে, নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কি, তথাপি সে জ্ঞান উপার্জ্জনে নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত। পরদুঃখবিমোচনের জন্য অশেষ প্রকার অজ্ঞাত বিপদ আপনার মস্তকের উপর আনয়ন করিবে তাহাও স্বীকার তথাপি অপরের দুঃখের হৃদয়ভেদী দৃশ্য, সকরুণ আর্ত্তনাদ তাহার পক্ষে অসহনীয়। সে ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর শরীর লইয়া প্রেমের অনুরোধে অপরের হিত-সাধন ব্রতে দিনযামিনী অতিবাহিত করিবে তাহাও বাঞ্ছনীয়, তথাপি আপনার চিত্ত আপনার স্বার্থের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিবে না। আত্মা আবার ইহলোকের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য অশরীরী অনন্ত মহানের উদ্দেশে এখানকার যশোমান প্রভূত ধনৈশ্বর্য্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই প্রেম নিবদ্ধ করিবে, তাঁহার উজ্জ্বলতম সত্ত্বা সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া সংসারের দুশ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে, যেখানে থাকিলে অন্তরতম প্রিয়তম সুহৃদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগের মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই, যেখানে থাকিলে চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া হৃদয়সখার সহিত ক্ষণিক বিচ্ছেদ ঘটাইতে

পারে না, শারীরিক ও মানসিক সুখের মুখাপেক্ষী না হইয়া অম্লানবদনে অসঙ্কুচিত ভাবে সেই গভীর অরণ্যে ভীষণ পর্ব্বতগুহায় তাঁহার উৎসাহজনন পবিত্র নাম গাহিতে গাহিতে গমন করিবে, ইহারই জন্য ব্যাকুল।

মনুষ্য এই ত্রিমাত্রা পথে তিনটি বলের কেন্দ্রস্থানে বর্ত্তমান। শরীর মন আত্মা তিন জন বিভিন্ন পথে লইয়া যাইবার জন্য ইহাকে তিন দিক হইতে আকর্ষণ করিতেছে। শরীর বল ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা, বিলাসের মনোহারিত্ব দেখাইতেছে; মন জ্ঞানের আবশ্যকতা, স্নেহমমতার অনুপম মাধুর্য্যের প্রলোভন দেখাইতেছে; আত্মা অনিত্যতার উপর নিত্যতার রাজত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের দিকে মনুষ্যকে আকর্ষণ করিতেছে। মনুষ্য কোন্ দিকে যাইবেন। তাঁহাকে বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। আপনার অনন্ত উন্নতি স্মরণ করিয়া ধীর ও গম্ভীর ভাবে প্রকৃত কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা আপাতমধুর আশুতৃপ্তিকর শারীরিক ও মানসিক সুখের পশ্চাতে গমন করিলে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, নতুবা প্রতিকূল স্রোত আসিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে ও পশ্চাৎ উদ্ধারের পথ একেবারে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিবে।

প্রকৃতির তরুলতা যেরূপ স্বভাবের জলরৌদ্র পাইয়া সম্যক্ পোষিত ও বর্দ্ধিত হয়, মনুষ্যের উন্নতি তদ্রূপ স্বভাবের কঠোর নিয়মে আবদ্ধ নহে। সে স্বাধীন জীব, স্বাধীনতা তাহার প্রাণ, স্বাধীনতা তাহার মস্তকের ভূষণ। স্বাধীনতাই তাহাকে সৃষ্টিরাজ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন প্রদান করিয়াছে। ঈশ্বরের সুমহান্ মঙ্গল নিয়ম তাঁহার আদেশ উপদেশ হৃদয়-পটে অবিনশ্বর অক্ষরে জ্বলন্ত ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সংসারের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া আপনার গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে হইবে ও স্বকীয় প্রভাবে আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট হইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান হইলে দেহতরী গুপ্তশৈলের নিদারুণ আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কত ঘূর্ণা কত আবর্ত্তের ঘোর চক্রে পতিত হইয়া রসাতলে গমন করিতে হইবে।

মনুষ্যকে তিনটির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। শরীর মন আত্মা এই তিনেরই সম্যক স্ফূর্ত্তি বিধান করিতে হইবে অথচ কেহ কাহাকে সঙ্কুচিত না করে তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। শরীর সাধারণের ভিত্তি, শরীরের নাশে মন বিনষ্ট আত্মা আশ্রয়বিহীন। শরীর রুগ্ন ভগ্ন হইলে মন নিস্তেজ ও স্ফূর্ত্তিশূন্য, আত্মা ঈশ্বরচিন্তনে অপারগ। শরীর রোগের আক্রমণে কম্পিত হইলে তাহার তরঙ্গ আসিয়া মনকে অতিক্রম করিয়া আত্মার মূলদেশ স্পর্শ করে ও ইহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। মন শরীর ও আত্মার মধ্যস্থলে। মনের বিকলতায় মনুষ্য ক্ষিপ্ত ও উন্মাদ। জ্ঞানের সমধিক বিকাশ না হইলে না শরীর সুরক্ষিত হয়, না আত্মার সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তাহাতে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি প্রতিভাত হয়। আত্মার উৎকর্ষ সাধিত না হইলে যাহার জন্য মনুষ্যের এত গৌরব তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

মনুষ্য বিষম সমস্যায় নিপতিত; তিনের মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করা নিতান্ত অনায়াসসাধ্য নহে। শরীর মন ও আত্মা নিরবচ্ছিন্ন আপনার আপনার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য মনুষ্যকে কত প্রকার লোভ প্রদর্শন করিতেছে ও সুখের পূর্ব্বাভাস দিতেছে। ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার সুখ স্পৃহনীয়,

কোন্ প্রকার সুখের প্রসর গাম্ভীর্য্য অধিক, কোন্ প্রকার সুখ বহুকালস্থায়ী, কোন্ কোন্ প্রকার সুখের অনুবর্ত্তী হইলে ভবিষ্যতে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই এই সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতে মীমাংসা করিয়া অগ্রসর হইতে না পারিলে নিদারুণ মনস্তাপ আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিবে ও মন হইতে শান্তি সৌভাগ্য নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে। জগৎ-পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে, তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলে কিছুই ব্যর্থ হইবার নহে। যখন আমরা শরীর মন ও আত্মার সহিত গাঢ়রূপে আবদ্ধ, যখন আমরা ইহাদের মধ্যে কোনটিকে ছাড়িয়া তিষ্ঠিতে পারি না, তখন প্রত্যেকের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিয়া, যাহার যতটুকু অধীন হইয়া চলিলে আমাদের জীবন ঈশ্বরের আদেশের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করিতে পারে, কেবল তাহা দেখিয়া আমাদের বৃত্তি প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে ও জীবনপথে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমরা আত্মার বাহন শরীর পাইয়াছি। ইহাকে নীরোগ রাখিতে হইবে, ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল, অত্যাবশ্যক বিলাসের সামগ্রী সকল তাহার সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে অথচ শরীর আমাদিগকে যে সকল কুটিল পথে লইয়া যাইবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রতি সতর্ক থাকিতে হইবে। ভোগেচ্ছা প্রবল হইয়া আমাদিগকে অদত্ত ধনগ্রহণে লোভ দেখাইতে পারে, রসনেন্দ্রিয় বা অযথা ক্রোধ আসিয়া প্রাণীবধে বা অবিহিত হিংসা কার্য্যে উত্তেজিত করিতে পারে ও কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাদিগকে দুষ্কর্ম্ম সাধনে উন্মুখ করিতে পারে। এই সামান্য শরীর, ইহা হইতে প্রধানত আমরা তিন ভাবে প্রতারিত হইয়া ধর্ম্মজীবনকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও জনসমাজকে বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিতে পারি। সুতরাং শরীর রক্ষা করিতে হইলে শুদ্ধ শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না, উচ্চতর মহত্তর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

আমরা ঈশ্বরকৃপায় বাগিন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি। সুমিষ্ট বাক্যে কত লোককে পরিতৃপ্ত করিতে পারি, শোকের সান্ত্বনা, বিপদে পরামর্শ দান করিয়া কত মনুষ্যের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারি। কিন্তু দেখ এমন প্রভূত কল্যাণ-প্রসূ ইন্দ্রিয় হইতে নিরবচ্ছিন্ন অমৃত উদ্গীরিত হয় না। সংসারে মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল এমনই বিজড়িত রহিয়াছে যে বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য্য না করিলে, আমরা ইষ্টের পরিবর্ত্তে কত লোকের অনিষ্ট সাধন করিতে পারি। জগতের কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যে না হইয়া অভ্যাসগত না হইলে আপনার উপর কোন মতেই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। কি জানি সাময়িক উত্তেজনা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। আমরা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগে কত কোমল হৃদয়কে ব্যথা দিতে পারি, মিথ্যা কথনে কত লোকের মহদনিষ্ট এমন কি তাহাদের সর্ব্বস্বাপহরণ ও প্রাণদণ্ড ঘটাইতে পারি, পরোক্ষে পরনিন্দা করিয়া অকারণ কত পবিত্র হৃদয়ে দোষারোপ করিতে পারি, অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণে সময়ে সময়ে আপনার ও পরের কত না অপকার করিতে সমর্থ হই। সামান্য বাক্য যাহা বায়ুর স্ফুরণ ভিন্ন কিছুই নহে, তাহাই আবার আমাদিগকে বিপদগামী করিবার জন্য চারিটি উপায় করিয়া রাখিয়াছে।

বুদ্ধি কোথায় জ্ঞানের দীপ হস্তে লইয়া রহস্যময় পৃথিবীর যবনিকা উত্তোলন করিয়া

আমাদিগকে সৃষ্টি-কৌশলে সৃষ্টিকর্ত্তার অনুপম জ্ঞান, আশ্চর্য্য কৌশল, অদ্ভুত পারিপাট্য দেখাইয়া দিবে, না আস্তিকতা হইতে নাস্তিকতার দিকে, শুভকামনা হইতে লোকের অনিষ্ট চিন্তনে, পরহিত সাধন হইতে পরদ্রব্য লাভের আলোচনায়, ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্মের দিকে, স্বর্গ হইতে রসাতলের দিকে অজ্ঞাতসারে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। বুদ্ধি ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদিগের বিনাশের জন্য তিনটি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে।

আত্মা এই ক্ষুদ্র দেহের অধিপতি। শরীর মন বাক্য কখনও বা ইহার অনুকূল বা প্রতিকূল। বিশেষ বিবেচনার সহিত পদনিক্ষেপ না করিলে এই প্রবল দশ অন্তঃশত্রুর কোন একটির হস্তে পতিত হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হইবে। এই ঘোর বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মনুষ্যের কল্পনার বল চাই, সহিষ্ণুতা চাই, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা চাই, দেবপ্রসাদ চাই, তবে মনুষ্য অব্যাহত থাকিতে পারে নচেৎ অপনার ক্ষুদ্র বলের উপর নির্ভর করিলে সে কি দণ্ডায়মান থাকিতে পারে?

ঈশ্বর লইয়াই আত্মার অস্তিত্ব। যেমন চন্দ্রে সূর্য্যজ্যোতি নিপতিত না হইলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ আত্মরূপ বিমল দর্পণে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত না হইলে তাহার স্বত্তা তাহার স্বতন্ত্রভাব কোনরূপেই প্রতিভাত হয় না। অসীম জগৎ ক্ষুদ্র চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই যেমন চক্ষুর মর্য্যাদা, সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মা ক্ষুদ্র দেহাবরণের মধ্যে থাকিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করে বলিয়াই তাহার এত মহত্ত্ব এত গৌরব। আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, আত্মার নিভৃত নিলয়ে পরব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি প্রভৃতি বিবিধ মানস উপচারে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে, সকল স্থানে তাঁহার উজ্জ্বল সত্ত্বা অনুভব করিয়া প্রেমভরে বিগলিত হইতে হইবে, এই জন্যই মনুষ্যের হৃদয়ে আত্মা প্রতিষ্ঠিত। শরীর ও মনকে সংযত করিয়া আত্মার অধীনে আনয়ন করিলে যদি অক্ষয় পরম ধন লাভ করা যায়, তাহাদের বিনিময়ে তাহাদের বিসর্জ্জনে যদি অশেষ পুণ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়, যদি পার্থিব উপাদানের সাহায্যে অনন্ত জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তখন আর ইহা অপেক্ষা কি অধিক প্রার্থনীয় হইতে পারে। ধর্ম্মের অনুরোধে ঈশ্বরের আদেশে শরীর ও মনের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধার অনুবর্ত্তী করিতে পারিলে মনে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, সে আনন্দের স্বাদ যিনি না গ্রহণ করিয়াছেন, বাক্য তাঁহাকে কি বুঝাইবে। যিনি অভ্রভেদী হিমাচলচূড়া দিগন্তবলয়বেষ্টিত অনন্ত মহাসমুদ্র না দেখিলেন, বৃথা বাক্য তাঁহাকে কি পরিচয় প্রদান করিবে।

ঈশ্বরের উপর প্রীতিসংস্থাপন করিলে, সে প্রীতি ব্যর্থ যায় না; তাঁহার উপর নির্ভর থাকিলে তিনি বিপদের সময় আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না; তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে কষ্টক্লেশ সহ্য করিলে শরীর অক্ষয় শরীর হইয়া উঠে। তাঁহার পবিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিলে, আর্ত্তকে ঘোরবিপদ হইতে পরিত্রাণ করিলে শরীর অসামান্য বলে বলীয়ান হইয়া উঠে; তাঁহার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিলে মৃত্যু আমাদিগকে পীড়া দিতে পারে না; আত্মা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহা বিমল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই অভয়দাতার পবিত্র চরণের নিকট উপস্থিত হয়। যে বিদ্যা যে জ্ঞান

তাঁহাকে দেখাইয়া দেয় সে জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিলে জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়; মন শান্তিসাগরে অবগাহন করিয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। তাঁহাতে ন্যস্তমনা হইলে পীড়ার যন্ত্রণা শোকের তীব্রতা দূরীভূত হয়। তাঁহাকে পাইলে মনুষ্য আর কিছুই চাহে না; তাহার সকল পিপাসার শান্তি হয়, সকল কষ্টের অবসান হয়। তিনি রোগেই অস্থির হউন, পাপেই জর্জ্জরিত হউন, প্রাণারামকে পাইলে তাঁহার আর কোন অভাব থাকে না? আত্মার ভেষজ সেই পরব্রহ্মকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেদীপ্যমান দেখিলে শারীরিক দুর্ব্বলতা রোগের নিদারুণ আক্রমণে তিনি আর কাতর হন না; বরং মৃত্যুকে অমৃতলাভের সেতু জানিয়া মনে মনে পুলকিত হয়েন। এইরূপে মনুষ্য যখন আত্মার অনন্ত গতি, ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলভাব হৃদয়ে সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া প্রেমে, ধর্ম্মে সৌহার্দ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন, শরীর ও মনকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া আত্মার অধীন করিয়া লন এবং সেই আত্মাকে অম্লান ঈশ্বরের পদতলে আনয়ন করেন, তখন আর তাঁহার সুখের ইয়ত্তা থাকে না, তখন তিনি অন্তঃস্ফূর্ত্ত বাক্যে বলিয়া উঠেন,

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে—
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।

বেদান্ত দর্শন।

তোমরা যে বল, সাংখ্যের প্রধানবাদ বেদপরিগৃহীত নহে ইহা অসিদ্ধ কথা। বেদের কোন কোন শাখায় সাংখ্যোক্ত প্রধানের দ্যোতক শব্দ দৃষ্ট হইতেছে। এই জন্য কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রধানের জগৎকারণত্ব বেদসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাবৎ বেদোক্ত সেই সমস্ত শব্দের অর্থান্তর না ঘটাইতে পার তাবৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলেও তাহা টেঁকিতেছে না। কঠ শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে,

'মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ'

মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। স্মৃতিপ্রসিদ্ধ মহৎ অব্যক্ত ও পুরুষ যে যে নামে অভিহিত আর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে যাহার পর যাহার ক্রম, কঠ শ্রুতিতে দেখ ঠিক্ তাহাই আছে। আর ইহার যৌগিক অর্থ যাহা ব্যক্ত নয় তাহাই অব্যক্ত। অতএব যৌগিক ও রূঢ় বা প্রসিদ্ধ এই দুই রূপেই আমরা এই অব্যক্তকে সাংখ্যোক্ত জগৎকারণ প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

না, তুমি এই কঠ শ্রুতিতে স্মৃতিপ্রসিদ্ধ মহৎ ও অব্যক্তের অস্তিত্বপর বাক্য আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পার না। স্মৃতি যেরূপ প্রধানকে ত্রিগুণাত্মক স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া ধরে দেখ কঠশ্রুতি তাহাকে সেরূপে বলিতেছে না। এস্থলে অব্যক্ত কেবল একটি শব্দমাত্র। যাহা ব্যক্ত নয় তাহা অব্যক্ত ইহার ইহাই যৌগিক অর্থ। সুতরাং এই শব্দ অন্য কোনও সূক্ষ্ম ও দুর্লক্ষ্য বিষয়ে যে প্রযুক্ত হইতে না পারে ইহা তুমি কিরূপে অস্বীকার করিবে। আর এই অব্যক্ত শব্দ যে, কোন বস্তুতে রূঢ় বা প্রসিদ্ধ তাহাও নয়। হইতে পারে ইহা প্রধানবাদিদিগের রূঢ় কিন্তু সেই রূঢ় শব্দটী তাঁহাদেরই পারিভাষিক, সুতরাং তাহা বেদার্থ নির্ণয়ে কারণ হইতে পারে না। আর পর পর শ্রেষ্ঠতার একটি ক্রমমাত্র ধর্ম্ম দেখিয়া স্মৃত্যুক্ত অব্যক্তকে কঠ শাখার অব্যক্তের সহিত যে সমান অর্থে লইবে ইহাও সঙ্গত নয়। এই অব্যক্তের আকারটী

কি অগ্রে ইহা বুঝ। অশ্বের স্থানে একটা গো দেখিয়া ধীমান ব্যক্তি তাহাকেই অশ্ব বলিয়া ধরে না। ফলত কঠশ্রুতির যে প্রকরণ উপলক্ষে এই অব্যক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে ইহা সাংখ্যের প্রধান বলিয়া কিছুতে বোধ হয় না। এই অব্যক্ত শব্দে শরীর, ইহা রূপক কল্পনায় রথ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আমি শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছি দেখ পূর্ব্বাপর গ্রন্থ আত্মা শরীরাদিকে রথিরথাদি রূপে কল্পনা করিয়াছে।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।

আত্মা রথী শরীর রথ বুদ্ধি সারথী মন প্রগ্রহ (লাগাম) এবং ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব বলিয়া জান। আত্মা দেহ ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় সকল ভোগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ। যখন বুদ্ধি-সারথী বিবেকী হন তখন মন দ্বারা ইন্দ্রিয় অশ্ব সকলকে বিষম বিষয় মার্গ হইতে আকর্ষণ করেন। এখন তুমি বলিতে পার আত্মার যখন স্বতই ভোগ সম্ভব তখন তাহার রথাদি সংযোগে কি প্রয়োজন। না, আত্মা স্বয়ং ভোগে অক্ষম, দেহাদি সংস্পর্শেই তাহার ভোক্তৃত্ব। যাক্, আত্মা এই সমস্ত অসংযত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সংসারকে পায়। আর সংযত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা গন্তব্যের পার বিষ্ণুর সেই পরম পদকে পায়; এইটুকু দেখাইয়া সেই গন্তব্যের পার বিষ্ণুর পরম পদটী কি? এই আকাঙ্ক্ষায় গ্রন্থ সেই সমস্ত প্রকৃত ইন্দ্রিয়াদি হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিষ্ণুর পরম পদকে দেখাইতেছে—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।

পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি রথ রূপক কল্পনায় অশ্বাদি ভাবে গৃহীত হইয়াছে এস্থলেও তাহারাই গৃহীত হইতেছে। তা না যদি স্বীকার কর তাহা হইলে প্রকৃতের ত্যাগ ও অপ্রকৃতের গ্রহণ-দোষ ঘটিবে। এই শ্রুতিতেও ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি পূর্ব্বশ্রুতির ন্যায় তুল্য-শব্দে ব্যবহৃত আছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থে এই বলা হইতেছে যে, যে সমস্ত শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গোচর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সেই সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইন্দ্রিয়ের শক্তি কেবল গ্রহণ, সেই গ্রহণ অবশ্যই বিষয়াধীন। বিষয় অবিদ্যমানে ইন্দ্রিয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই জন্য এই শ্রুতিতে বলা হইল ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ। তৎপরে বলিল বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ। কারণ ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়-ব্যবহার তাহা মনোমূলক। কারণ মন না থাকিলে সেইটী ঘটে না। তৎপরে বলিল মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কারণ সমস্ত ভোগ্যবিষয় বুদ্ধি-সোপানে আরোহণ করিয়া ভোক্তাতে আইসে। তাহার পর বলিল এই বুদ্ধি হইতে আত্মা মহান্ ও শ্রেষ্ঠ। কারণ ভোগ্য উপকরণ হইতে ভোক্তার শ্রেষ্ঠতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এস্থলে আত্মাকে যে মহান বলা হইল তাহা সর্ব্বস্বামিত্ব নিবন্ধন ইহার পক্ষে অবশ্যই সঙ্গত। অথবা হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি বুদ্ধিকে মহান বলে। প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের যে বুদ্ধি তাহা সমস্ত বুদ্ধির পরম প্রতিষ্ঠা, তাহাই এস্থলে মহান্ আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার বুদ্ধির গ্রহণ থাকাতে অবশ্য তদ্দ্বারাই এই সমষ্টি বুদ্ধি গৃহীত হইয়াছে তথাপি এস্থলে তাহার পৃথক উপদেশ হইল। সেই হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধি যে আমাদের বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি। এখন তুমি বলিতে পার এই সমষ্টি বুদ্ধিকে যদি

তুমি আত্মার স্থলে অভিষিক্ত কর তাহা হইলে, এই শ্রুতিতে আত্মার আর কৈ স্বীকার থাকিল। না, ইহাতেও আত্মা অস্বীকৃত হইতেছে না। এই শ্রুতিতে যখন পরম পুরুষ শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে তখন তদ্দ্বারাই রথী আত্মার গ্রহণ বুঝিতে হইবে। কারণ পরমাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মা উভয়ে অভিন্ন।

এইরূপে যখন রথী আত্মাকে পাওয়া গেল তখন শ্রুতিতে কেবল রথ অর্থাৎ শরীর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতেছে। এখন বুঝিয়া দেখ পূর্ব্বোক্ত মন বুদ্ধি প্রভৃতি ষট্ পদার্থের মধ্যে অব্যক্ত শব্দ সুতরাং শরীরেরই বাচক হইয়া দাঁড়ায়। ফলত এই শ্রুতির মুখ্য তাৎপর্য্য শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বিষয় ও ভোগসংযুক্ত অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ভোক্তা আত্মার শরীর প্রভৃতির রথাদিরূপক কল্পনায় সংসারমোক্ষ নিরূপণ দ্বারা কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রদর্শন, এতৎ ভিন্ন ইহার আর কিছুই তাৎপর্য্য নাই।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।

এই আত্মা সমস্ত ভূতে গূঢ়রূপে আছেন। সূক্ষ্মদর্শীদিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে তিনি দৃষ্ট হন। এই শ্রুতিতে কেবল বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরম পদের দুষ্প্রাপ্যত্ব দেখাইয়া তাহা পাইবার জন্য পরে যোগ প্রদর্শিত হইতেছে।

যচ্ছেৎ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি।

বাক্যকে মনে সংযত করিবে। অর্থাৎ বাক্ আদি বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবে। মনও সংকল্প-বিকল্পাত্মক এই জন্য জ্ঞান-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিতে তাহার ধারণা করিবে। এই বুদ্ধিকে ভোক্তা মহান আত্মাতে অথবা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিতে সূক্ষ্মতা সম্পাদনার্থ ধারণা করিবে। আর মহান আত্মাকে শান্ত আত্মা অর্থাৎ পরম পুরুষে ধারণা করিবে। অতএব কাঠ শ্রুতির পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে সাংখ্যপরিকল্পিত প্রধান বা প্রকৃতির আর স্থান হয় না।

বুঝিলাম, শ্রুতিতে অব্যক্ত শব্দ শরীরে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা প্রধান-বাচক নয়। কিন্তু এস্থলে আর একটী আপত্তি আছে। স্থূলত্ব নিবন্ধন স্পষ্টতর এই শরীর ব্যক্ত-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, অব্যক্ত শব্দ অস্পষ্টেরই বোধক, অতএব এই স্থূল শরীরে অব্যক্ত শব্দ কিরূপে সঙ্গত হয়।

অবশ্যই হইবে। কারণ-শরীর সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অব্যক্ত শব্দ সেই কারণ-শরীরে প্রযুক্ত হইতে পারে। যদিও তুমি এই স্থূল শরীরকে অব্যক্ত শব্দের অযোগ্য বল কিন্তু ইহার মূল ভূত-সূক্ষ্ম যে অব্যক্ত শব্দের যোগ্য ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পার না। ইহাতেও তুমি বলিবে কারণ-শরীর সূক্ষ্ম, তাহারই বিকার এই স্থূল শরীর, সুতরাং যাহা প্রকৃতি বিকারে তাহার কিরূপে প্রয়োগ হইতে পারে। অবশ্য, কেনই না হইবে? অনেক স্থলে প্রকৃতি বিকারে ব্যবহৃত হইতেছে। দেখ গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং। অর্থাৎ দুগ্ধ দ্বারা গোমকে মিশ্রিত করিবে। এস্থলে গো শব্দ প্রকৃতি কিন্তু তাহা স্ববিকার দুগ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই তো গেল ব্যবহার [illegible] শ্রুতিতেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব [illegible] যথা, তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ। এই নাম-রূপবিভিন্ন অভিব্যক্ত জগৎ প্রাগবস্থায় যখন বীজ-শক্তিতে—প্রকৃতিতে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ যখন ইহার নাম রূপ ব্যক্ত হয় নাই তদবস্থায় ইহাকে অব্যক্ত শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলেও প্রকৃতিই বিকারে প্রযুক্ত হইতেছে।

ভালই বলিলে, যদি তুমি অনভিব্যক্ত

বীজাত্মক প্রাগবস্থায় স্থিত জগৎকে অব্যক্ত-শব্দ-যোগ্য বলিয়া স্বীকার কর তবে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে শরীরেরও অব্যক্ত-শব্দ-যোগ্যত্ব স্বীকার করিয়া লও। এইরূপ সূক্ষ্ম প্রাগবস্থার স্বীকার থাকিলে তবেই তো সেই প্রধান-কারণবাদ আসিয়া দাঁড়ায়। কারণ আমরা এই জগতেরই প্রাগবস্থাকে প্রধান বলি।

না, ইহা দ্বারাও প্রধান-কারণবাদ আসিবে না, কারণ যদি আমরা কোন স্বতন্ত্র প্রাগবস্থা বা বীজশক্তিকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করি তবেই প্রধানকারণবাদ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা এই প্রাগবস্থাকে পরমেশ্বরেরই অধীন বলিয়া স্বীকার করিতেছি। ইহা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে। তোমাকে অবশ্যই এই অস্বতন্ত্র প্রাগবস্থা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ তদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন হইতেছে। প্রথমেই দেখ না, তদ্ব্যতীত পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ ঈশ্বর যদি শক্তিশূন্য হন তবে তাঁহার জগৎকার্য্যে প্রবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই গেল একটী কার্য্য। আরও দেখ, মুক্তির পর আর জন্ম নাই। তাহার প্রতি কারণ বিদ্যা বা জ্ঞান দ্বারা এই বীজশক্তিরই নাশ। সুতরাং ইহা দ্বারা যে মহৎ কার্য্য সাধন হইতেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই বীজশক্তির নামান্তর অবিদ্যা। ইহা অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ্য, পরমেশ্বরের অধীন। ইহা মায়াময়ী মহা সুষুপ্তি। ইহার প্রভাবেই সংসারী জীব সকল স্বরূপ-বোধ-শূন্য হইয়া শয়ান রহিয়াছে। শ্রুতিতে এই অব্যক্ত কোথাও আকাশ শব্দে নির্দ্দিষ্ট, কোথাও অক্ষর শব্দে নির্দ্দিষ্ট এবং কোথাও বা মায়া শব্দে নির্দ্দিষ্ট। এই মায়া বাস্তবিকই অব্যক্ত এই শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য, কারণ উহা বস্তু কি, না, তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। এই অব্যক্ত হইতে মহতের উৎপত্তি এই জন্য মহৎ হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ কথিত আছে। ফলত অবিদ্যাই অব্যক্ত। দেখ, অবিদ্যার বলেই জীবের যাবদীয় ব্যবহার নিষ্পত্তি হইতেছে। এখন দেখ কাঠ শ্রুতিতে এই প্রকৃতি অব্যক্তের অভেদোপচারে বিকৃতি শরীরে প্রয়োগ হইয়াছে। যদিও শরীরের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিও অব্যক্তের বিকার তথাচ অব্যক্ত হইতে অভেদে কেবল শরীর মাত্র যে অব্যক্ত বলিয়া গৃহীত হইল তাহার হেতু এই যে, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ এই শ্রুতিতে স্বশব্দে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শব্দেই ইন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ আছে। সুতরাং ইন্দ্রিয় অব্যক্ত নয়। আর রূপক কল্পনায় গৃহীত ষট্ পদার্থের মধ্যে সকলেরই কথা এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, কেবল শরীরই অবশিষ্ট সুতরাং অব্যক্ত শব্দে এই শরীরই বুঝিও।

অনেকে বলেন শরীর দ্বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম। সেই দ্বিবিধ শরীরই রূপক কল্পনায় রথত্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ এই শ্রুতিতে অব্যক্ত শব্দে কেবল সূক্ষ্ম শরীরকে বুঝিতে হইবে। কারণ সূক্ষ্মই অব্যক্ত শব্দে প্রয়োজ্য। আর জীবের বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবহার নাকি ইহারই অধীন এই জন্য জীব হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব।

যাঁহারা এইরূপ তর্কে প্রধান-কারণবাদ আনিতে চান তাঁহাদিগকে অগ্রে আমার এই কথাটীর প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" এই রূপককল্পনায় যখন নির্বিশেষে দ্বিবিধ শরীরের রথত্বে কীর্ত্তন আছে তখন "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ" এই শ্রুতিতে শরীরত্বে সমান স্থূল সূক্ষ্মের মধ্যে কেবল সূক্ষ্মেরই কেন গ্রহণ হইবে আর স্থূলেরই বা কেন না হইবে। যদি

বল, শ্রুতিতে যাহা উক্ত আমরা তাহারই অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ, আর যাহা উক্ত নাই জোর করিয়া তাহা কিরূপে বুঝিব। শ্রুতি অব্যক্ত শব্দে সূক্ষ্ম শরীরেরই উপস্থিতি করিয়া দিতে পারে, স্থূল শরীর ব্যক্ত, সুতরাং অব্যক্ত শব্দ দ্বারা তাহার উপস্থিতি হইতে পারে না। তোমাদের এই আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। একার্থবোধক শব্দের এক বুদ্ধিতে পরস্পর আকাঙ্ক্ষার যে আরোহণ [illegible] নাম একবাক্যতা। এই একবাক্যতাকে [illegible] অর্থপ্রতিপত্তি হইতে পারে না। [illegible] ঐ দুই পূর্ব্বাপর শ্রুতি এই একবাক্যতা ত্যাগ করিয়া কোন অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে না। যদি করে তাহা হইলে শরীর শব্দে যাহা প্রসিদ্ধ সেই প্রকৃত স্থূলের ত্যাগ [illegible] আর যাহা অপ্রকৃত শরীর শব্দে কেবল সেই সূক্ষ্মের গ্রহণ হয়, বাস্তব ইহা একটী দোষ। আরও দেখ আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত একবাক্যতা হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না করিলে এই একবাক্যতাটী মাঠে মারা যায়। সুতরাং তুমি বেদার্থ গ্রহণ কিরূপে কর।

আর একটী কথা। অনাত্ম-বস্তুকে শুদ্ধি বলে। সূক্ষ্মত্ব হেতু আত্মার সহিত অভেদে সহজে সূক্ষ্ম শরীরের গ্রহণ হয় এই জন্য তাহা দুঃশোধ্য। আর স্থূল শরীর দৃষ্ট দৌর্গন্ধ্যাদি দোষত্ব হেতু সুশোধ্য। এস্থলে এই দুঃশোধত্ব হেতু সূক্ষ্মেরই গ্রহণ হইয়াছে আর সুশোধত্ব হেতু স্থূলের গ্রহণ হয় নাই এরূপও মনে করিও না। কারন এই শ্রুতিতে কাহারও শোধনের কোন কথা নাই। ইহা পর পরের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া পরিশেষে পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই কেবল ইহাই বলিয়াছে। অতএব অব্যক্ত শব্দে স্থূল সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীরই শ্রুতির প্রতিপাদ্য ইহা বুঝিও।

আরও শুন, সাংখ্য সম্প্রদায় [illegible] হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান না [illegible] কৈবল্য লাভ হয় না ইহা স্বীকার করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রধান জ্ঞেয়। কারণ গুণস্বরূপ না জানিলে গুণ হইতে পুরুষের ভেদ বুঝা যায় না। কোন স্থলে অণিমাদি বিভূতি প্রাপ্তির নিমিত্তও প্রধান জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রুতিতে অব্যক্ত জ্ঞেয় বলিয়া উক্ত হয় নাই। এস্থলে এই অব্যক্ত একটী পদ মাত্র [illegible] উপাস্য এরূপ কিছুই নির্দ্দেশ নাই। অনুপদিষ্ট [illegible] কোন কাজেই আসিতে পারে না। এ কারণেও অব্যক্ত শব্দে প্রধান হইল না।

আলোচনা।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

কতকগুলি লোকের বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বড়ই বিরোধিতা আছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে দুইয়ের মধ্যে বিরোধিতার পরিবর্ত্তে একতাই দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞান সৃষ্টির নিয়ম সকল [illegible] বিকাশ ও সেই সকল নিয়মের প্রকৃতি [illegible] গতি [illegible] করিয়া থাকে। বিজ্ঞান ঈশ্বরেরই মহিমা মহীয়ান করিতেছে। যে সকল সত্য নিয়ম বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা মানুষকে অধিকতর রূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবনকে গঠিত ও উন্নত করিতে শিক্ষা দিতেছে। বৈজ্ঞানিক সত্য সকল যতই আবিষ্কৃত হইতেছে ততই এক অদৃশ্য ও দেশ-কাল-অতীত পুরুষের অস্তিত্ব ও তাঁহার শক্তি ও মঙ্গল স্বরূপের প্রমাণ অধিকতর স্পষ্টই হইতেছে। বিজ্ঞান বহু আলোচনার পর স্থির করিয়াছেন

যে কোন একটী প্রাণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বে বিজ্ঞান বলিতেন যে প্রাণ আপনা আপনি সম্ভূত হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক এক্ষণে সে সংস্কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে দিন হইতে বিজ্ঞান প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে স্বীকার করিয়াছেন সেই দিন হইতেই উহা একটী আদি প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে। এইরূপে যতই বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিবে ততই উহা ধর্ম্মের সত্য গুলি প্রমাণ করিবে, তাহাদের সত্যতা সুস্পষ্ট রূপে দেখাইয়া দিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিক নিয়ম লইয়া ধর্ম্মের সৃষ্টি, আর ভৌতিক নিয়ম লইয়া বিজ্ঞানের সৃষ্টি। দুই প্রকার নিয়মই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, অতএব বিজ্ঞানে যখন আর অসত্য থাকিবে না, যখন উহা সকল সত্য ভৌতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিবে তখন আধ্যাত্মিক নিয়মের সমষ্টি যে ধর্ম্ম তাহার সহিত বিজ্ঞানের কোন রূপ বিরোধিতা থাকা কোন রূপেই সম্ভব হইবে না। তখন ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয়ম এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক নিয়মের অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের একতা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে। তখন [illegible]িকগন ধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য বা সংশয়-[illegible] না হইয়া গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসী হইবেন।

বাসনা নিবৃত্তি।

বাসনা নিবৃত্তিই ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা, এই বিশ্বাস খুব প্রচলিত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই মত প্রচার করেন। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়েরও ঐ মত। ইয়োরোপের Pessimist নামক সম্প্রদায়েরও ঐ মত। আবার কোন কোন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণও ঐ রূপ মত প্রকাশ করেন। ফ্রান্স দেশে Madame Gyon নাম্নী এক গভীর ঈশ্বরপ্রেমিকা মহিলা ছিলেন। তিনি Quietism নামক ধর্ম্ম মতের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন "From our wishing and desiring our unhappiness proceeds" অর্থাৎ আমাদের বাসনা হইতেই আমাদের অসুখের উৎপত্তি, অতএব বাসনা পরিত্যজ্য। বাসনা নিবৃত্তির মত অতি ভ্রমাত্মক। নীচ বাসনা, অপবিত্র বাসনা অবশ্যই পরিত্যজ্য, কেন না তাহা হইতে আমাদের ঘোর অবনতি, এবং সর্ব্বনাশ হইতে পারে। কিন্তু পবিত্র বাসনা, উচ্চ বাসনা, সাধু বাসনা যদি আমরা পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আমাদিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করা হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী নানা বাসনার আকর। সেই সকল বাসনার মধ্যে যে গুলি পবিত্র নীতিসঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত ও যাহার অনুসারে কার্য্য করিলে সেই সকল বৃত্তিগুলি পবিত্র ও উন্নত হয়, সে সকল বাসনা চরিতার্থ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। সকল বাসনার নিবৃত্তি সাধন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা বাসনাশূন্য হইব স্রষ্টার তাহা কখনই ইচ্ছা নহে, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বাসনাপূর্ণ করিতেন না। বাসনা সকল নিয়মিত ও সুপরিচালিত করাতেই আমাদের মহত্ত্ব ও তাহার উপরই আমাদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গল নির্ভর করে, বাসনা নিবৃত্তিতে আমাদিগের মহত্ত্ব নাই ও তাহা আমাদিগের অমঙ্গলসাধক। ঈশ্বর আমাদিগকে নানা পবিত্র বাসনা দিয়াছেন, সে সকলের চরিতার্থতা আমাদিগের সুখ ও উন্নতির কারণ, সে সকলের নিবৃত্তিতে প্রকৃত

সুখও নাই, উন্নতিও নাই। অতএব বাসনা নিবৃত্তির মত অতি ভ্রমপূর্ণ এবং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

বিবেকবৃত্তির সর্ব্বজনীনতা।

বিবেক অর্থে যে কেবল ভাল মন্দ জ্ঞান বুঝায় তাহা নহে, যাহা ভাল তাহা করা উচিত অর্থাৎ তাহার কর্ত্তব্যবোধও বুঝায়। বিবেক বৃত্তির দুইটী শাখা—ভাল মন্দ জ্ঞান ও যাহা ভাল তাহার কর্ত্তব্যবোধ। ভাল মন্দ জ্ঞান বুদ্ধি-সাপেক্ষ, আর কর্ত্তব্যবোধ হৃদয়-সাপেক্ষ। সকল লোকের সকল জাতির বুদ্ধি সমান নহে, এই জন্য সকল লোকের সকল জাতির ভাল মন্দ জ্ঞানও সমান নহে। কিন্তু মানব জাতির মধ্যে বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়ের উৎকর্ষের অনেকটা সমতা আছে, সেই জন্য আমরা বিবেক বৃত্তির অন্যতর শাখা যে কর্ত্তব্যবোধ, সকল জাতির মধ্যে তাহার সমতা দেখিতে পাই। সভ্য জাতির ভাল মন্দ জ্ঞান উন্নত, আর অসভ্য জাতির ভাল মন্দ জ্ঞান অনুন্নত, কিন্তু উভয়ের কর্ত্তব্যবোধ সমান। এক অসভ্য জাতি মানুষ বৃদ্ধ হইলে তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাহাকে বধ করা ভাল জ্ঞান করে, কিন্তু সভ্য জাতি বৃদ্ধ লোক কি প্রকারে অধিক কাল জীবিত থাকিবে তজ্জন্য বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করা ভাল বিবেচনা করে। এই বিষয়ে কি ভাল তৎসম্বন্ধে অসভ্য ও সভ্য জাতির মধ্যে বিরোধিতা রহিয়াছে কিন্তু উভয়ে যাহা ভাল বিবেচনা করে তাহার কর্ত্তব্যবোধ সম্বন্ধে বিরোধিতা নাই। অসভ্য যেরূপ কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হইয়া বৃদ্ধকে বধ করে, সভ্য জাতি সেইরূপ কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হইয়া বৃদ্ধকে বাঁচাইয়া রাখিতে যত্নবান হয়। সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে ভাল মন্দ জ্ঞানের সম্বন্ধে বিরোধিতা, কিন্তু কর্ত্তব্যবোধ সম্বন্ধে একতার আরও নানা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বিবেকবৃত্তির অন্যতর শাখা যে কর্ত্তব্যবোধ তৎসম্বন্ধে মানব জাতির মধ্যে যে আশ্চর্য্য একতা দেখা যায়, তাহাই বিবেক বৃত্তির সর্ব্বজনীনতার বিশিষ্ট প্রমাণ।

বিশ্বাসের বল।

বিশ্বাস পর্ব্বতকে নড়াইতে পারে, কোন সাধু পুরুষ এই মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বিশ্বাসের বল অতুল। ধর্ম্ম-পথে চলিতে গেলে সেখানকার যে সকল পর্ব্বত-সম বাধাবিঘ্ন আছে তাহা বিশ্বাসই দূর করিতে সক্ষম। ঈশ্বর আত্মাকে পবিত্র করিতে পারেন, এবং করিবেনই করিবেন, যিনি ইহা সমস্ত মন প্রাণের সহিত বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে অধিক দিন "হে ঈশ্বর আমার আত্মাকে পবিত্র কর" এই প্রার্থনা করিতে হয় না, অচিরাৎ তিনি স্বীয় আত্মার পবিত্রতা সাধন করিতে সক্ষম হয়েন। ঈশ্বর পাপীর প্রার্থনা শুনেন, অকপট ভাবে ধর্ম্মবলের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি কখনই নিরাশ করেন না, যিনি ইহা সমস্ত মন প্রাণের সহিত বিশ্বাস করেন, তিনি পাপ প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ করিতে শীঘ্রই সক্ষম হয়েন। ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ, তিনি মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল করেন না, এবং আমি যে অমঙ্গলের সৃষ্টি করি তাহার মধ্য হইতেও তিনি মঙ্গল উৎপাদন করেন, যিনি সমস্ত প্রাণ মনের সহিত এই বিশ্বাস করেন তিনি সকল অবস্থাতেই শান্তচিত্ত ও অবিচলিত থাকিবার স্বর্গীয় বল প্রাপ্ত হয়েন। বাস্তবিক প্রকৃত, অকপট, গভীর বিশ্বাস ধর্ম্মোন্নতির পথ হইতে এই সকল পর্ব্বত-সম বাধা বিঘ্ন দূর করিতে অলৌকিকরূপে সক্ষম হয়।

ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ।

ঘোর সংশয়বাদীর যদি বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে তাহাকেও ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। মানুষ নিজ দোষে যে সকল অমঙ্গলের সৃষ্টি করে, স্পষ্ট দেখা যায় যে ঈশ্বর স্বীয় সুন্দর মঙ্গলময় নিয়ম দ্বারা সে সকল অমঙ্গল হইতেও নানা মঙ্গলের সৃষ্টি করেন। মানব জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই সত্যের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের অনুষ্ঠিত অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপাদন করিতে যিনি তৎপর তাঁহার মঙ্গলময় ভাবের তুলনা কোথায়? যিনি আমাদের কৃত অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করেন, তিনি যাহা কিছু করেন তাহা আপাততঃ অমঙ্গলকর প্রতীয়মান হইলেও যে প্রকৃত পক্ষে অমঙ্গলকর নহে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। মানব-অনুষ্ঠিত অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপন্ন করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন যে তিনি কোন প্রকারে আমাদিগের কখনই প্রকৃত অমঙ্গল করিতে পারেন না।

স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রম আছে। স্বাধীনতা বাস্তবিক এক প্রকার অধীনতা, কেন না, উহা স্ব অর্থাৎ আপনার অধীনতা। প্রকৃত আপনি বা আমি কে? না আত্মা। আমার আত্মার প্রকৃত অবস্থা কি? না, উহার ঈশ্বর-প্রদত্ত পবিত্রতা, উজ্জ্বলতা ও মহত্ত্ব। আমার আত্মার এই রূপ প্রকৃত অবস্থাতে উহার যে সকল ইচ্ছা বা বাসনা থাকে তাহাদেরই অধীনতার নাম স্বাধীনতা। মূল কথা ঈশ্বরের অধীনতাই স্বাধীনতা—কেননা মানবাত্মা যখন অবিকৃত ও বিশুদ্ধ তখন উহা ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব মাত্র।

ক্রমশঃ।

গভীর নিশীথে হরিবোল।

১

সুনিবিড় আঁধারে
ছাইয়াছে ধরারে
কি—এক মহামন্ত্র বলে যেন একেবারে
রহিয়াছে সমুদয় সুগম্ভীর নীরব!
স্বপ্ন মহা উচ্ছ্বাসে
ভ'রে মহা উল্লাসে
বেড়াইছে ঘোর মদ হৃদয় হইতে হৃদে
ধরিয়া মুরতি নানা—সহস্র নব নব।

২

হেরিছে তারকারা
ভব আকুলপারা
স্বপনের সুমধুর চঞ্চল খেলাগুলি,
তাদের যেতেছে লাগি পরাণেতে চমক।
আঁধারকোলে আসি
ধীরে ধীরে নিশ্বাসি
পাইতেছে সজীবন আরাম হৃদয় মাঝে
আলোকের নাহি চায় জ্যোতির্ম্ময় আটক।

৩

ঝুরু ঝুরু ঝর্ঝর
সর সর মর্ম্মর
পাতায় পাতায় কত উঠিছে মধুর স্বন্
নিশির করুণ ধ্বনি মেশিছে সেই সনে।
বাদুড় পেঁচকেরা
—অসীম শূন্য ঘেরা—
কোটী কোটী তারকার কোমল কটাক্ষ মাঝে
ঘুরিতেছে একা একা কাননে বনে বনে।

৪

সুষুপ্ত প্রাণে ধীরে
গম্ভীরা প্রকৃতি রে
গাহিছে করুণ তানে কি যেন স্বরগ গান
কুলমরী অলসতা জাগিছে মনপ্রাণে।
চুমিয়া বন ফুল
বিমল সরকুল
স্নিগ্ধ মলয় বায়ু বহিয়া যাইছে চ'লে
পরিমলে মগ্ন হৃদি—আকুল প্রীতিদানে—

৫

হেরিছে চরাচরে
অপার প্রেমভরে
কঠোরতা দিয়েছে সে সুদূরে—সুদূরে ফেলি,
প্রেমের মোহনগীতে হ'য়েছে বিভোর সে।

আপনা ভুলিয়ে সে
ঘুমিছে সবে হেসে
আনন্দ পূরিত আঁখি—দেখিছি হৃদয়ে চেয়ে
ডুবিয়া যাইছি ধীরে অসীম সুধারসে!
"বল হরি হরি বোল!"
"বল হরি হরি বোল!"

৬

একিরে ভীষণতা!
নাশিছে নীরবতা—
চমকিয়া চারিদিক চ'লেছে ছুটিয়া কোথা ?
কোমল মাধুরী নাশি চ'লেছে ছুটে কোথা ?
পশু পাখী হতাশে
গাছের আশে পাশে
ঘুমাইল, উঠিতেছে চমকি চমকি ভয়ে
শত প্রাণ কম্পমান আবেগে [illegible] কোথা!

৭

হায়রে কোথা হ'তে
[illegible] চারিভিতে
ভেদিয়াছে ঘন ঘন [illegible]
—শিহরিছে তরুলতা— [illegible] —মরণ সঙ্গীত ?
ছিনিয়া লইয়াছে
কেকে কাহার কাছে
পৃথিবীর রাশি রাশি জীবন কোলাহল—!—
পৃথিবীর নিদারুণরে—প্রণয় পিরীত ?

৮

কাহারে সাথে নিয়ে
দিক দেশ ছাড়িয়ে
অনন্তের কোন্ পানে—অজানা দেশেতে কোন্
না জানি ছুটেছে—ছুটিয়াছে সবেগে।
যাইছে ছাড়িয়ে যে
এই ভবের কাজে
কাছে তার কেহ নাই কেহ নাই আজিকে গো
মরণ সঙ্গীত শুধু রহিয়াছে রে জেগে।

৯

হেথাকার বসন্ত
সুখ দুখরে অন্ত
ছেড়ে তারে চ'লে গেছে, দিনমান রাত্রি আর
কোথায় তাহার কাছে ? সকলি একাকার!
বাসনা কি বিলাস
হৃদয় কি উদাস
চির দিনের তরেতে ছেড়ে চ'লে গেল তারে
আর কি দেখেছো দেখা তাহারে একবার ?

১০

তাহার তরে আর
ছাড়িবে কি আবার
পুলকে করিয়া নৃত্য বিহগে মধুর গান ?
ছাড়িবে না—ছাড়িবে না আবারে ছাড়িবে না।
আর কি তার তরে
এই শূন্যের পরে
সহস্র স্বর্গীয় ফুল হাসিবে উজলি দিক ?
হাসিবে না—হাসিবে না আবারে হাসিবে না।

১১

আর কি দশদিশে
ফুলেরা সবে মিশে
উড়ায়ে সুরভিকণা নাচিবে তাহার তরে ?
নাচিবে না—নাচিবে না আবারে নাচিবে না।
তাহার তরে আর
রহিল এ[illegible]
কিছু কি—কিছু কি ? না—সকলে ছাড়িল তারে
একা সে কোথায় গেল কেউ তারে হেরিবে না।

১২

কিছুই রহিল না
কিছুই রহিল না
রহিল বুকের মাঝে তাহার স্মৃতিটী ল'য়ে
মরণ সঙ্গীত শুধু জাগিয়া এধরায়।
[illegible] সেই শুধু
ধ্বনিয়া [illegible]
ধরার হৃদয় মাঝে, তাহার তরেতে প্রাণ
নীরবে নিশ্বাসি আর করিবে হায় হায়।

১৩

রহিল না—রহিল না!
থাক—[illegible]!
রহিবে না কিছু [illegible] ?
দূর কর ছাই সব [illegible] মায়া!
মোহের মালা গাঁথি
ধ'রেই—ধ'রেই আছি
ভাবি না কো একবার মুহূর্তের তরে আমি
নিভাইছ কার প্রাণে—ল'য়ে আছি যে ছায়া

১৪

কোথা কল্পনারী
কর গো [illegible]
এ [illegible]
[illegible]
[illegible]
দেখাও [illegible]
অনন্ত অমৃতময় সংসারের পরপারে
ভয়ে ভয়ে যারা অসীম ভবেতে দেহক্ষয়।

উপাখ্যান।

কোন একটী গ্রামে কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও পুত্র। পুত্রটী নিতান্ত শিশু। একদা ব্রাহ্মণ গৃহদেবতার পূজা করিয়া কোনও কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হয়। ব্রাহ্মণী পাকাদি করিয়াছেন। কিন্তু গৃহদেবতাকে অন্ন নিবেদন করিয়া না দিলে কাহারই আহার হইবে না। অবোধ শিশুটী বড় ক্ষুধার্ত্ত। সে কাঁদিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী কহিলেন, বাছা, ঠাকুর না খাইলে আমি যে তোরে অন্ন দিতে পারি না। তুই একটু থাম্, ঠাকুরের ভোগ দেখে, পরে দিব। ব্রাহ্মণী এইরূপে প্রবোধ দিয়া গৃহকার্য্যে পুনর্ব্বার ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু বালক আর পর নাই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। সে আর থাকিতে পারিল না। সে সত্বর সে গৃহে দেবতা তথায় প্রবেশ করিল। আস্তে আস্তে দেবমূর্ত্তিকে পদ্মাসন হইতে নামাইয়া এবং সম্মুখে অন্ন দিয়া সজল নয়নে কাতর কণ্ঠে কহিতে লাগিল, ঠাকুর তুই খা, আমার বড় ক্ষুধা, তুই না খেলে মা আমায় খেতে দিবে না। কিন্তু বালক দেখিল ঠাকুর কিছুতেই খায় না। তখন সে আরও কাতর হইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, ঠাকুর, তুই খা। প্রসিদ্ধ এইরূপ যে দেবতা বালকের এই কাতরতায় স্বয়ং আসিয়া ঐ পাষাণ মূর্ত্তিতে অন্ন আহার করেন।

ঠাকুরের সত্তা ও তাঁহার আহার-প্রবৃত্তিতে এই বালকের বিশ্বাস কি স্বাভাবিক। ঠাকুরের আহার-প্রবৃত্তি হইল না দেখিয়া সে অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। এই কাতরতায় দেবতা তাহার প্রত্যক্ষ হন বৈষ্ণব গ্রন্থোক্ত এই উপাখ্যানের এইটুকু তাৎপর্য্য। ফলত বিশ্বাস কিরূপ হওয়া চাই তাহাই ইহাতে বলা হইতেছে। কিন্তু অজ্ঞান বালকের এই বিশ্বাস অসত্যে বিশ্বাস। হউক অসত্যে বিশ্বাস কিন্তু বিশ্বাস কিংস্বরূপ ও তাহার কত দূর বল সেই টুকু আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা সত্যের উপাসক। আমরা যদি এই বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাসে কাতর হইয়া ডাকি তাহাহইলে ব্রহ্ম অবশ্যই আমাদের প্রত্যক্ষ হন। ঈশ্বর আছেন, তিনি নিশ্চয়ই আছেন, আমার কথা শূন্যে বিলীন হয় না, তিনি নিশ্চয়ই শুনেন মনে বিশ্বাসের এইরূপ অটল বল হওয়া চাই এবং তাহা স্বাভাবিক ও সরল হওয়া চাই। ফলত বিশ্বাস যদি এইরূপ প্রকৃতির না হয় তাহা হইলে অদর্শনে ঈশ্বরের জন্য কখন কাতর হইতে দিবে না। ঐ বালক যেমন ঠাকুরের আহার-প্রবৃত্তি না দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িল সেইরূপ প্রকৃত বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের অদর্শনে তুমিও কাতর হইয়া পড়িবে। তখন দেখিও ভক্তবৎসল বিদ্যুতের ন্যায় তোমার আত্মায় পরিস্ফুরিত হইবেন। তাহাই ব্রহ্মদর্শন। সেই বিদ্যুৎস্ফুরণে তোমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইবে, বাক্য মন স্তব্ধ হইয়া যাইবে, এবং অন্তরে শান্তি ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সঞ্চরিত হইবে। কেবল কতকগুলা পুস্তক পড়িলেই বিশ্বাসের বল হয় না। অনেকের বাল্য কাল হইতে ধর্ম্মনিষ্ঠার দিকে মনের একটুকু স্বাভাবিক গতি বা ঝোঁক হয়। ধর্ম্মনিষ্ঠ সৎপরিবারে থাকিলে এইরূপ মানসিক গতি হওয়া খুব সহজ ও সম্ভব। পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানচর্চ্চা ও সৎসঙ্গাদি দ্বারা তাহা পুষ্ট হইতে থাকে। ফলত যেখানে সর্ব্বদাই ঈশ্বরপ্রসঙ্গ হয় যেখানে বায়ুপ্রতি হিল্লোলে কর্ণে সৎকথা আনে সেই স্থানে সহজেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে

নিষ্ঠা বদ্ধমূল হয়। অতএব প্রত্যেক পরিবার যদি এইরূপ সৎপরিবার হয় তাহা হইলে বিশ্বাসের জন্য একটা আয়াস পাইতে হয় না। এই জন্যই বলি অগ্রে সৎপরিবার সকল প্রস্তুত কর প্রকৃত বিশ্বাসীর সংখ্যা অবশ্যই বাড়িবে।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-মূলক

পদ্য।

দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান।

শুষ্ক জ্ঞানে বলে, রিপু কোলাহলে, নাহি তাঁরে পাওয়া যায়।
সেই শান্ত মনে, ধ্যান নিত্যধনে, সেই তাঁরে হৃদি পায়॥

শুধু জ্ঞান তর্ক বলে কে লভিবে তাঁয়।
ন্যায় সাংখ্য শ্রুতি যাঁর অন্ত নাহি পায়।
তবে সেই সার ধন, কিসে হবে উপার্জ্জন ?
তাঁরে রাখিবার হৃদি আছে কি উপায় !

তাঁরে সকাতরে যেবা এক মনে চায়।
তাঁর দয়া অবিরত সেই হৃদি পায়।
"আপনার আপনার," না রাখে হৃদয়ে আর,
শুধু তাঁর হইবারে যার প্রাণ চায়॥

রিপু কোলাহল যার নাহিক অন্তরে।
বিষয়-লালসা যেই দূরে পরিহরে।
তাঁর পথ জানি সার, তাঁরে স্মরে বার বার,
সেই পায় হৃদি দেখা হৃদয়-ঈশ্বরে॥

পাপ কার্য্য পাপ মতি মলিন জীবন।
আশাপাশে বদ্ধ কাম ক্রোধ পরায়ণ।
নীচ চিন্তা নীচ ভাব, সদা মনে আবির্ভাব,
সংসার কূপেতে যেই সদাই মগন॥

পাপ জন্য অনুতাপে দহি মনে মনে।
দয়াময়ে নাহি ডাকে কাতরে সঘনে।
হেন ভাবে জীবন তার, বৃথা যায় অনিবার,
কেমনে যাইবে সেই অমৃত ভবনে ?

দেখ অনুপম দয়া পরম পিতার।
অমৃতের বারি তিনি তরে সবাকার।
বিতরেন শত ধারে, যেবা যত ল'তে পারে,
অজস্র তাঁহার দান কিবা চমৎকার॥

সেই দান ল'তে জীব! হও অগ্রসর।
সে অমৃত ল'য়ে পূর হৃদয় কন্দর।
কিন্তু আছে যুক্তি সার, কর শূন্য হৃদাধার,
রেখনা মলিন কিছু হৃদয় ভিতর॥

চিন আপনারে, কর কর অন্বেষণ।
কিবা তব মতি গতি কিসের চিন্তন।
নির্ম্মল করহে চিত, হও শান্ত সমাহিত
পাইবে নিশ্চিৎ তাঁরে বেদের বচন॥

সংসার পঙ্কিল জল হলাহল ময়।
তাহে যদি পূর্ণ হয় তোমার হৃদয়।
অমৃতের বিন্দুলেশ, তবে তাহে সমাবেশ,
কেমনে হইবে বল—হইবার নয়॥

কেন জীব! মৃত্যু তুমি কর আলিঙ্গন ?
থাকিবে কি মৃত্যু-পাশে সমস্ত জীবন ?
বিষয় কামনা ত্যাগ, কর তাঁরে অনুরাগ,
অমৃতের হেথা তুমি পাবে আস্বাদন।

পাপতরে তাঁর কাছে করহ ক্রন্দন।
ডাক তাঁরে পাপ হ'তে করিতে মোচন।
চাও তাঁরে সকাতরে, অমৃতের বিন্দু তরে,
করিবেন তিনি তব তৃষা নিবারণ॥

হবে অনুকূল ক্ষণে সে বারি পতন।
প্রতীক্ষা করহ তাহা চাতক মতন।
কর কর পরিষ্কার, যতনেতে হৃদাধার,
সে বারি করিবে যদ হৃদয়ে ধারণ॥

সংসারের দাস যবে মোহের পরশে।
মিছাকাযে মাতি ডুব আমোদের রসে।
নিজ মনো দেবতারে, পূজ নানা উপচারে,
আপনারে হারা হও প্রবৃত্তির বশে॥

তখন সে অনুকূল নাহি হয় ক্ষণ।
তখন অমৃত-বারি না হয় পতন।

মায়া-স্বপ্ন ভাঙ্গি যবে, তোমার চেতন হবে,
"কিবা করিলাম ভবে" হইবে শোচন ॥

তখন ভাতিবে তব সেই সুসময়।
সুখ দুঃখে থাকিবে না আশা আর ভয়।
মজিবে না মোহে আর, পাশরিবে এ সংসার,
দেব-ভাব ধরি হবে উদাস হৃদয় ॥

প্রেম-মুখ তাঁর তুমি করিবে দর্শন।
নিমীলিবে কিম্বা যবে খুলিবে নয়ন।
যবে পূর্ণ শশধর, হৃদয়-প্রফুল্লকর,
বিতরে অমিয়-মাখা কিরণ আপন।

রজত রশ্মিতে ধরা করে সুরঞ্জিত।
নদী গিরি তরু তাহে সুচারু শোভিত।
চন্দ্র করে সুধা দান, [illegible] করে পান,
চরাচর যেন সব পুলকে পূরিত ॥

সে সুষমা মাঝে কিম্বা উষার শোভায়।
কিম্বা যবে সাজে মেঘ গিরির চূড়ায়।
যবে সন্ধ্যা মনোহর, অনুপম স্নিগ্ধকর,
মধুর ভাবেতে [illegible] আবরে ধরায় ॥

সব শোভা মাঝে তুমি তাঁহারে দেখিবে।
তাঁহার মহিমা দেখি তাঁহারে গাহিবে।
যাঁর প্রেম অতুলন, হৃদি পাবে অনুক্ষণ,
তাঁহারে বাহিরে দেখে আনন্দে ভাসিবে।

ক্রমশঃ।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

শকাব্দা ১৮০২।

১ অগ্রহায়ণ—অদ্য "Life of Macaulay by G. Trevelyan পাঠ করি।" মেকলের কালেজে পড়িবার সময় গণিতের প্রতি বিরাগ ছিল। সকলে বলে যে গণিত শিক্ষা "Discipline of the mind" মনের সংক্রে উপকারী [illegible]। বলিতেছেন—Discipline of the mind! say rather starvation, confinement, torture, annihilation but it must be" "সাধন! সাধন না বলিয়া একেবারে অনাহারে প্রাণ বিয়োগ,কারাবাস,নিগ্রহ,বিধ্বংশ বলিলে হয় কিন্তু ইহা ঘটিবেই" (অর্থাৎ আমাকে উহা পাড়িতেই হইবে)। কিন্তু এইরূপে সন্তোষ অবলম্বন করিলেও পুনরায় অসন্তোষ ফুটিয়া বেরুচ্চে! "But three years! I cannot endure the thought. I cannot bear to contemplate what I must undergo. Farewell then Homer and Sophocles and Cicero!

———— "Farewell happy fields.
Where joy forever dwells! Hail horrors, hail,
Infernal world!"

"তিন বৎসর পড়িতে হইবে। ইহা মনে করা আমার পক্ষে অসহ্য। কি কষ্ট আমাকে পাইতে হইবে ইহা ভাবিলে সহিষ্ণুতা থাকে না। হোমর সফক্লিস্ এবং সিসিরো তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি!

"চিরানন্দ লোক যে সুখদ প্রান্তরে,
বিদায় হব নিকটে! [illegible] তোরেরে
নরক ও নরকের ভীষণ দর্শন!"

কলেজে এখন কার অনেকেরও গণিতের প্রতি এইরূপ বিরাগ, কিন্তু একণে তাহারা উপকারিতা বিশেষতঃ কল্পনার নিবৃত্তির সম্বন্ধে তাহার উপকারিতা স্বীকার করিয়া থাকে।

৭ অগ্রহায়ণ অদ্য—Langham Hall Pulpit Vol III No 38. Theism, its Principles and Belief Part IV" পাঠ করি। এই উপদেশে বক্তা সাহেব পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন পরলোকের প্রধান প্রমাণ এই যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের জন্য সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভাল বাসা সার্থক হইবার আবশ্যকতা এবং দ্বিতীয়তঃ মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবার জন্য মনের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা। এই দুইটি প্রমাণ বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া হইবে বিশেষতঃ প্রথমটি। ঈশ্বরের জন্য এত করিলাম তাহার পর তিনি একেবারে আমাকে বিনাশ করিবেন ইহা কি কখন হইতে পারে?

৮ অগ্রহায়ণ—অদ্য প্রাতে, উ বাবু ও গো, বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ, Theosophy এবং Spiritualism সম্বন্ধে কথা হয়। আমি বলিলাম যে যোগে এবং থিওসফি যতদূর যোগ লইয়া নাড়া চাড়া করে তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস আছে। যোগে আশ্চর্য্য শক্তির সঞ্চার হয়। আমি বলিলাম যে যোগীরা অনেক

সঞ্চার হয়। আমি বলিলাম যে যোগীরা অনেক দিন বিনা আহারে থাকিতে পারেন ও শূন্যে বসিয়া থাকিতে পারেন ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। Spiritualism সম্বন্ধে আমি বলিলাম যে মিল্টন যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে—
"Millions of spiritual creatures walk the earth
Both when we wake and when we sleep unseen"

"অযুত অযুত আত্মা অবনী মণ্ডলে
করে বিচরণ যবে নিদ্রিত আমরা
থাকি অথবা জাগ্রত।"

এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে পরলোকগত আত্মা সকল আমরা যাহা করিতেছি তাহা অনুভব করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের কথা বার্ত্তা চলে ইহার যাহা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তদপেক্ষা নিশ্চয় তর প্রমাণ না পাইলে তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না কিন্তু আমি যাহা বলিলাম তাহা যেন আপনারা ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস না মনে করেন। ইহা আমার নিজের বিশ্বাস মাত্র।

১৩ অগ্রহায়ণ—অদ্য বয়সী [illegible] উপাসক "Theism; its Principles and Beliefs Part V" পাঠ করি। ইহাতে তিনি বলেন যে [illegible] এবং দেবপ্রসাদ উভয়ের সংযুক্ত কার্য্যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি। "That while the soul is diligently seeking and earnestly striving to know God and his will, the divine spirit is also operating by imparting strength and energy, by giving clearness to the spiritual sight and by actually showing to the soul what it is in earnest to see and to know." "যখন আত্মা ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানিতে মনের সহিত ও বিশেষ যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা করে তখন ঈশ্বরের প্রভাবও তাহাকে বল প্রদান করিয়া এবং তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পরিষ্কার করিয়া যাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা তাহাকে বস্তুতঃ প্রদর্শন করে।"

নূতন পুস্তক।

বংশানুচরিত। ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুর পরগণার অন্যতর জমিদারির ভূস্বামিদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাঁহাদিগের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। চৌধুরী মহাশয় উক্ত পরগণার ভূম্যধিকারিগণের পাঁচ শত বৎসর যাবৎ ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত প্রদান করিয়াছেন। উঁহাদিগের মধ্যে একজন বিখ্যাত নাম। মহারাজাধিরাজোপাধিক জম্মুর (জুমর) নন্দী. যিনি সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের বৃত্তিকার ছিলেন ইনি ১২৯০ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন।

আহ্নিক ক্রিয়া বা সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত জীবের দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। গ্রন্থকর্ত্তা "জীবন পরীক্ষা" প্রণেতা বলিয়া পরিচিত কিন্তু তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানির ভাব ভঙ্গী ও লিখনপ্রণালী 'জীবন পরীক্ষার' ন্যায় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে বলিতে পারি না। সংসারে বাস, জীবের আত্মবিস্মৃতি, সেই বিস্মৃতি অপনোদনের উপায়, মনুষ্যের মুখ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। তিনি স্থানে স্থানে জীব ব্রহ্ম এক, "সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই" ইত্যাদি অদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানে অদ্বৈতবাদী হইলেও ভক্তিতে একজন শান্ত দাস্য ও সখ্য ভাবের উপাসক। তিনি "শান্তিবিধাতা ভগবানকে যেরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য" তাহার আদর্শ স্বরূপ প্রাতঃ সায়াহ্ণ সম্পদ বিপদ যৌবন বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু কালীন কয়েকটী প্রার্থনা প্রকটিত করিয়াছেন। প্রার্থনাগুলি উপযোগী হইয়াছে বলিতে হইবে। পরন্তু তিনি লিখিয়াছেন—

"যিনি বিপদ সম্পদ ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা মৃত্যু প্রভৃতি সর্ব্বকালেই আমাদিগকে সমভাবে ভাল বাসেন, তিনিই আমাদের পরম বন্ধু পরমেশ্বর। * * আমরা সংসারে থাকিয়া যাহা করিব তাহা সেই বন্ধুর কার্য্য

যাহা বলিব তাহা সেই বন্ধুর কথা যাহা দেখিব তাহা সেই বন্ধুর পদার্থ" ইত্যাদি ইহা প্রকৃত ভক্তের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বৈ আর কি ?

আত্ম-জ্ঞান তরঙ্গিণী। শ্রীঅতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত। ব্রহ্ম কি জীব কি পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি, জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি বৈরাগ্যের মূল ও প্রকার, দেহের সহিত জগতের সাদৃশ্য প্রভৃতি এই পুস্তকে হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পত্র।

(বাবু রাজনারায়ণ বসুর প্রতি লিখিত)

ভক্তিভাজনেষু,

আমি [illegible] চুঁচুড়ার উদ্যানে প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি [illegible] উপদেশের অবস্থায় একখানি সোফার উপর [illegible]। শরীর [illegible] নাই শীর্ণ, অমন যে জ্যোতিষ্মান ঋষিমূর্ত্তি [illegible] তাহার [illegible] রহিয়াছে। দেখিয়াই [illegible] হইলাম। [illegible] অন্তরে বুঝিলাম ইহাঁর [illegible] দিন অবসান হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার [illegible] নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] কষ্টে [illegible], চক্ষু কষ্টে দেখে, বাক্য কষ্টে [illegible] কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিলাম [illegible] কিছুতেই বিন্দুমাত্র বিচলিত নহেন। তিনি [illegible] ও প্রফুল্ল, [illegible]। ফলত এইরূপ অবস্থায় এরূপ [illegible] আর কখন দেখি নাই। [illegible] আমায় [illegible] শুনাইতে [illegible] এবং [illegible] অনুবাদ করিয়া আমায় [illegible]। [illegible] সমস্ত [illegible] আকর্ষণ করিতেছেন এবং উৎসাহে [illegible] উৎসাহকে পরাস্ত করিতেছেন। আশ্চর্য্য, [illegible] জীবনের সমস্ত কর্ম্ম সারিয়া শেষ বিদায়ের জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া আছেন তাঁহার এইরূপ উৎসাহ ও আনন্দ, এইরূপ স্থিরতা ও দৃঢ়তা। ফলত আমি এরূপ আর কখন দেখি নাই। ভাবিলাম ইনি [illegible] ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁর কিছুতে ভয় নাই। তৎকালে তিনি হাসিতে হাসিতে আমায় বলিলেন "জীবন-পুস্তকের আর এক পৃষ্ঠা উল্টাইবার সময় উপস্থিত। দেখা যাক্ ইহাতেই বা কি আছে।" পরলোকে ইহাঁর কি দৃঢ় বিশ্বাস। তখন ভাবিলাম আমরাও যেন এইরূপে মরিতে পারি। কিন্তু আমাদের পক্ষে এরূপ আশা বড় দুরাশা। ব্যাপক কালের অনেক সাধন না থাকিলে কে এরূপ [illegible] হইতে পারে। ফলত তাঁহার হাফেজ শুনিয়া আমার মন আর্দ্র হইয়া গেল। মনোমধ্যে এক পবিত্র ঔদাস্য আনিয়া দিল। তৎকালে আমি মুহুর্মুহু তাঁহার সেই পবিত্র ঋষিমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। আর দেখিতে পাইব না বলিয়া বড় সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। বলিতে কি মহাপুরুষ দর্শনের পুণ্য আমার দেহ মনকে পবিত্র করিল। কাতর মনে ভাবিতে লাগিলাম পৃথিবীর পবিত্র দেবতা বুঝি এত দিনের পর পৃথিবী ছাড়িয়া যান। ঐ সময় তিনি "আমার শেষ কথা" বলিয়া দুই একটী কথাও শুনাইতে লাগিলেন। আমি আরও কাতর হইলাম। আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার [illegible] চরণ [illegible] বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিলাম।

[illegible] থাকেন [illegible] আপনার [illegible] সংবাদে [illegible] করিবেন।

[illegible]

৫০। ৬০ বৎসর হইতে চলিল এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। এমন অনেক কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা এই সমাজভুক্ত। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা সমাজভুক্ত না হইয়াও ইহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই উভয় প্রকার লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। সম্প্রতি আমরা একটী ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। যে কোনরূপে হউক যাঁহারা এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আমরা কএক মাস ব্রাহ্ম সমিতির যে বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছি তদ্দৃষ্টে যাঁহারা আমাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধনার্থ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইতেছেন আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

নাম।	ধাম।
বাবু রসিকলাল রায়	ভাগলপুর
,, উদয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ঐ
,, জগৎচন্দ্র নাথ	(সমুদ্রগড়) গোয়াড়ী
,, ভবদেব [illegible]	(কালনা) ঐ
,, ভুবনচন্দ্র নাথ	কৃষ্ণনগর
,, প্রহ্লাদচন্দ্র নাথ	কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক
,, অটলবিহারী মণ্ডল	(সমুদ্রগড়) গোয়াড়ী
,, রঘুনাথ নাথ	ঐ
,, অনাথবন্ধু রায়	কাকিনীয়া (রংপুর)
,, মহেন্দ্রনাথ [illegible]	(দমদম) রাজারহাট
,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত	জয়দেবপুর রাজবাড়ী (ঢাকা)
পণ্ডিত [illegible]	ফিরোজপুর (পঞ্জাব)
বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	চাঁদপুর (ত্রিপুরা)
,, হরিদাস [illegible]	জাঙ্গিপাড়া (কৃষ্ণনগর)
,, [illegible]লাল সিংহ রায়	ঐ
,, [illegible] সিংহ রায়	ঐ
,, [illegible] সিংহ রায়	ঐ
,, রামচরণ সিংহ রায়	ঐ
,, গগনচন্দ্র সিংহ রায়	ঐ
,, সুরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়	ঐ
,, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়	ঐ
,, [illegible]কানাথ সিংহ রায়	ঐ
,, হরিপদ মিস্ত্রী	ঐ
,, হরিদাস মণ্ডল	ঐ
,, বিহারিলাল ভড়	ঐ
,, তারিণীচরণ কুণ্ডু	ঐ
,, মতিলাল ভড়	ঐ
,, গণেশচন্দ্র দাস	ঐ
,, হীরালাল মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, লক্ষ্মীনারায়ণ কুণ্ডু	ঐ
,, জটাধারি সিংহ রায়	ঐ
,, হৃদয়নাথ সিংহ রায়	ঐ
,, ক্ষেত্রমোহন সিংহ রায়	ঐ
বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	[illegible] মায়াখানা
,, হীরালাল মুখোপাধ্যায়	[illegible] ধর্ম্ম সভা
,, গগনচন্দ্র হোম	নং ১৩ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট
,, রাধিকাপ্রসাদ দাস	বেহার (পাটনা)
,, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	সাতমোড়া (ত্রিপুরা)
,, চন্দ্রকিশোর পাল	ঐ
,, হরিচরণ নাগ	গুড়াপ (ভাস্তারা)
,, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	[illegible]
,, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামপুকুর
,, পি চাটুর্য্যে	তমলুক (মেদিনীপুর)
,, রাখালদাস মল্লিক	ফুলবাড়িয়া (বাগুড়ি)
,, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	জয়নগর (২৪ পরগনা)
,, [illegible] প্রসাদ	লক্ষ্ণৌ
,, শরৎচন্দ্র রায়	ঐ
,, রামানন্দ গুপ্ত	নর্ম্মাল আদর্শ বিদ্যালয় (ঢাকা)
,, হরানন্দ গুপ্ত	জগন্নাথ কালেজ (ঢাকা)
,, [illegible]কুমার ঘোষ	গৌহাটী
,, উদয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	[illegible] ভাগলপুর
,, কিশোরীমোহন পাল	নবাবগঞ্জ
,, কেদারনাথ সরকার	ঐ
,, ভোলানাথ দাস	ঐ
,, দ্বারকানাথ হাজরা	ঐ
,, নরহরি পাল	ঐ
,, হরিদাস পাল	ঐ
,, সতীশচন্দ্র সুর	ঐ
,, নিত্যানন্দচন্দ্র গুপ্ত	রাঁচী (ছোটনাগপুর)
,, ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার	গৌহাটী
,, [illegible]নাথ সেন	[illegible]
,, [illegible]মোহন [illegible]	[illegible]পাড়া (ত্রিপুরা)

ক্রমশঃ।

PUBLIC THEISTIC LIBRARY
BENARES.

PROSPECTUS.

The Brahmo Samaj of Benares has just completed the fourth year of its existence. Persons interested in the cause of the Brahmo Samaj are fully alive to the numerous difficulties of preaching the truths of theism in an idolatrous place like Benares,—the main stronghold of superstition and poly theism The difficulties therefore seemed almost insur-

mountable at the outset. It is now gratifying to be able to inform the Brahmo Public that our humble exertions have, by the blessings of God, proved, to a certain extent, successful. Hitherto the Samaj has not done anything towards public good but the present year has been one of great importance in the history of the Benares Brahmo Samaj, when its Executive Committee have, for the first time, undertaken to effect moral, social, and religious amelioration of the people by means of a few works of general utility, the chief among them is the establishment of a library called the "Public Theistic Library" besides a Reading Room attached to it, The library will contain books purely of religion and morality including the biographies of all earnest workers, both men and women. The main object is to place such books within the reach of the public and infuse a spirit of religious enquiry into the minds of those who are still enveloped in the darkness of utter ignorance and gross superstition. It is needless to say that an institution of this kind cannot be made readily useful without sufficient help from outside and that the spread of theism throughout India rests in a great measure on the progress of the Benares Brahmo Samaj. The generous public, patriots, friends, sympathisers and particularly the members of the Brahmo community are therefore most earnestly solicited to extend their charity to our humble project.

Books and any amount, however small, will be most thankfully accepted and acknowledged by the Secretary.

BENARES BRAHMO SAMAJ, BENGALITOLA BENARES. 1st April 1887.

Ramchandra Mullick *President*,
Mahendranath Sircar *Secretary*,

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৮ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার [illegible] দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত মাঘ মাসে ব্রাহ্ম সাধারণকে যে উপদেশ দেন তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহকাল ও পরকালের শুভ ইচ্ছা করেন এই উচ্চ উপদেশ তাঁহাদেরই বিশেষ উপযোগী। ইহা প্রধান আচার্য্যের শেষ জীবনের শেষ উপদেশ। ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি আপনার যে মহামূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা অবসান হয় বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আপনার কতকগুলি শেষ কথা উপহার দিয়াছেন। তাহাই এই উপদেশ। ইহা ব্রাহ্মসমাজের চির সম্পত্তি ও অতি যত্নের ধন। এ দেশে যতদূর উত্তম হওয়া সম্ভব আমরা সেইরূপে এই উপদেশ মুদ্রিত করিয়াছি এবং এ দেশে যতদূর উত্তম হওয়া সম্ভব আমরা সেইরূপে এই গ্রন্থখানি বাঁধাইয়াছি। ফলত ইহার বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রত্যেকেরই মন প্রাণ হরণ করে। যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন। সোণার জল দিয়া বাঁধা পুস্তকের মূল্য ।৶০ আর ভাল কাপড়ে বাঁধা পুস্তকের মূল্য ।৵ আনা।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

আগামী ৯ই আষাঢ় বুধবার সন্ধ্যা ৭।০ টার সময়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক উৎসব হইবেক।
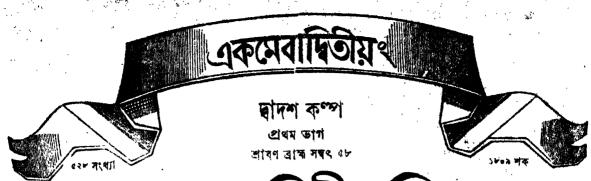
শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মশিক্ষা।

মনুষ্যের চারিদিকে বিপদ চারিদিকে দুর্গতি। রিপুকুলের অত্যাচারে শরীর প্রপীড়িত, পাপের গ্লানিতে আত্মা কলুষিত, মোহান্ধকারে মন অবসন্ন ও গ্লানিযুক্ত, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গবৎ সম্পত্তি বিপত্তির পর্য্যায়োত্থিত প্রবাহ আসিয়া মনুষ্যকে বিভ্রান্ত ও হতাশ করিয়া ফেলিতেছে। এখানে বিপদে সাহায্য, উপকারে কৃতজ্ঞতা, প্রেমে প্রতিদান নাই। সকলে মিলিয়া যেন তাহাকে ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে নিপাতিত করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সমুদয় পৃথিবী যেন এই আবর্ত্তের পরিধি, নরপিশাচেরা ইহার পরিচালক, মানব প্রকৃতি ইহার অনুকূল। পৃথিবীগাত্রে এমন বীর কয় জন আছেন, যাঁহারা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারেন যে তাঁহাদের জীবন এই ঘোর আবর্ত্তে সমাকৃষ্ট না হইয়া অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর পথ কেন এ প্রকার কণ্টক-সমাচ্ছন্ন, পাপের দিকে মনুষ্যের কেন এ প্রকার পদস্খলন, ঈশ্বরের শান্তিরাজ্য কেন এ প্রকার বিভীষিকাময়—বিবাদ গ্লানি শোক তাপ পরিপূরিত। যথার্থ কল্যাণের নিদানভূত জানিয়া কেন এখানকার হীরক-মুক্তা রত্ন-প্রবাল, সুখ-সম্পত্তি বিষয়-বিভব দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলে কালক্রমে ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হয়, ইহার কি কোন মীমাংসা নাই? অনন্তজ্ঞানসমুদ্র রাজাধিরাজ ত্রিভুবনপরিপালকের রাজ্যের কণামাত্র এই পৃথিবী কি বাস্তবিক প্রহেলিকাময়, ইহার অধিপতি কি বাস্তবিক রহস্যময়, তাঁহার অনন্তজ্ঞান আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির কি এমনই বিরুদ্ধধর্ম্মী যে তাঁহার অনুমত কল্যাণগর্ভ নিয়ম সকল আমারদিগের অভাব অনটন বিমোচনে অক্ষম? তিনি কি তাঁহার আশ্রিত অনন্যগতি ক্ষুদ্র সন্তানগণকে লৌহদণ্ডে শাসন করিতেছেন? জগতের প্রকৃত ছবি যদি এরূপ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়, ঈশ্বরের শান্তিরাজ্য যদি নরকযন্ত্রণার অভিনয়-ক্ষেত্র হয়, তবে আমারদিগের ঈশ্বর কেমন করিয়া প্রেমময় হইবেন, কোথায় তাঁহার ন্যায়, কোথায় তাঁহার সুশাসন?

একদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে পৃথিবী আপাততঃ এরূপ সামঞ্জস্যশূন্য, অর্থশূন্য, লক্ষ্য-

শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হয় সত্য বটে কিন্তু আমারদের প্রাণ বিশ্বস্রষ্টাকে স্নেহমমতাশূন্য কঠোর রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। তিনি আমারদের স্রষ্টা পাতা বিধাতা, তিনি আমারদের প্রাণের ঈশ্বর। তিনি আমারদের জন্য সর্ব্বদা অশেষবিধ কল্যাণ বিধান করিতেছেন। যখন আমরা নিদ্রায় অভিভূত হই তখনও তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন। পৃথিবীর প্রত্যেক পুত্রই তাঁহার স্নেহের ধন। যাঁহার উদার সদাব্রতে আমরা ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, রোগের ঔষধ, আরামের স্থল লাভ করিতেছি, সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ দোষে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর পিতা বলিতে পারি? তিনি যদি ঘোর প্রতারক হইতেন তবে সকলই মিথ্যা হইত। তিনি যদি একভাবে থাকিয়া আপনাকে অন্যভাবে প্রকাশিত করিতেন তবে আর তিনি আপনার সৎস্বরূপে কেমন করিয়া অবস্থিতি করিতেন। আমরা সকল বিষয়েই ক্ষুদ্র। তিনি অনন্ত ও মহান। তিনি জ্ঞানে অনন্ত, প্রেমে অনন্ত, সাধুভাবে অনন্ত, দেশে অনন্ত কালে অনন্ত। আমরা আমারদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি লইয়া কেমন করিয়া সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের প্রসর অনুভব করিতে সক্ষম হই। আমারদের কি ভ্রম কি মোহ।

আমরা জ্ঞান-বুদ্ধি-বলে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই সুস্পষ্ট বুঝিতেছি যে সৃষ্টিরাজ্যে এমন স্থান নাই যেখানে শৃঙ্খলা নাই। হীরকপ্রভ অযুত অগণ্য নক্ষত্র যাহা অসম্বদ্ধ ভাবে গগনতল ছাইয়া রহিয়াছে, তাহারও মধ্যে শৃঙ্খলা। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র রেখামাত্রও গম্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে না। জগতের সকল স্থানেই শৃঙ্খলা, পৃথিবীর সকল স্থানেই সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কি ভৌতিক জগতে কি জীবজগতে কি আধ্যাত্মজগতে সকল স্থানেই ইহার সত্তা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জগতের এই সকল অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আমারদিগের বৃত্তি প্রবৃত্তি আশা ইচ্ছা নিয়মিত করিতে না পারিলে যে আপনার কার্য্যে নিজের বিভীষিকা উৎপাদিত হইবে, পদে পদে প্রতারিত হইতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি। জগতের অধিপতি প্রজাবৎসল পিতা তাঁহার পুত্রগণের জন্য যাহা কিছু আয়োজন উপকরণ তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে তদুপযোগী শিক্ষা সাধন ধৈর্য্য অধ্যবসায়ের অপেক্ষা করে।

আমরা আত্মার অবলম্বন শরীর ও মন পাইয়াছি। স্বাস্থ্য-সম্পদের যে স্বর্গীয় সুখ, যিনি আজীবন কাল ব্যায়াম শিক্ষায় শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম করিয়াছেন, তিনিই যেমন সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন, রুগ্ন জীর্ণ ব্যক্তি সহজে কেমন করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ না হইতে হইতে যাঁহার বর্ণ শিক্ষার সূচনা হইয়াছে, যিনি বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে স্রষ্টার অপরিসীম জ্ঞান ও কৌশল অবগত হইতেছেন, যিনি গ্রহ নক্ষত্রের প্রত্যেক আবর্ত্তনে, নরদেহের সূক্ষ্মতম কৌশলে, জড় জগতের মৌলিক উপাদান সংমিশ্রণে, উদ্ভিদ শাস্ত্রে, চক্ষু-নির্ম্মাণ-কৌশলে প্রত্যেক রক্তবিন্দু পরীক্ষায় একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট থাকিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন, স্তম্ভিত ও সচকিত হইয়া অবিরল ধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞ নিরক্ষর ব্যক্তি কেমন করিয়া সে বিমল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিবে। অনন্ত বিশ্বে যে

সুখ যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সে সুখে সুখী হইতে চাহিলে নিশ্চেষ্ট ভাবে উদাসীনের ন্যায় উপবেশন করিয়া থাকিলে কোন ফলই লাভ হইবেক না। আমরা যে সকল শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারদের সম্যক স্ফূর্ত্তি বিধান করিতে হইবে তাহাদিগকে পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে, তবে ইন্দ্রিয় সকল সুখের অনন্ত দ্বারে পরিণত হইবে।

আমরা শারীরিক বল লাভে দেহপুষ্টি-সাধনে সচেষ্ট নয় বলিয়া পৃথিবী অকাল-মৃত্যু, রোগ শোক পাপ তাপের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত, শরীর ধারণ বিড়ম্বনামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আমরা বুদ্ধিজীবি মনুষ্য; স্বাধীনতা আমারদের ভূষণ; বুদ্ধি-শক্তির যথোচিত উৎকর্ষ সা. ত হয় না বলিয়া পৃথিবী হিংসা দ্বেষ অসূয়া পরনিন্দা নর-শোণিতপাত ও রাজবিপ্লবে কলঙ্কিত হইতেছে, আমারদিগের যে স্বাধীন ভাব স্বাধীন ইচ্ছা, তাহা হইতে অমৃত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গরলই উদ্গীরিত হইতেছে— ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার শান্তিময় সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। ঈশ্বর আমারদের হস্তে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, দেখ ব্যবহারের দোষে নিজের শান্তি মঙ্গলের সুখ সৌভাগ্যের মূলদেশে তদ্দ্বারা নিষ্ঠুর আঘাত প্রদত্ত হইতেছে।

ঐহিক সুখের দিকে মনুষ্যের স্বাভাবিক আকর্ষণ। মনুষ্য সুখের ভিখারী। শরীর ও মন তাহার উপলক্ষ। শারীরিক ও মানসিক সুখ দূরপরাহত নহে, বহু আয়াস সাপেক্ষ নহে। বিবেচনা ও সহিষ্ণুতার সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারিলে এখানে স্থায়ী বিমল আনন্দ সহজেই লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা এমনই অধীর এমনই হীন যে নিজ নিজ কর্ম্মদোষে আমরা আপনারাই আপনারদিগের সুখের অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছি। সকলই দেখিতেছি সকলই বুঝিতেছি, অথচ ভগবৎ-নিন্দাবাদে রসনাকে কলঙ্কিত করিতে সঙ্কুচিত হই না। আমারদের এ ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

যখন শারীরিক ও মানসিক সুখ সহজ-সাধ্য বুঝিয়াও উহারদের প্রতি আমারদের শোচনীয় অধৈর্য্য, তখন আত্মদর্পণে ভুবনেশ্বরকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া যে মনুষ্য জন্মকে সার্থক করিব, স্বীয় স্বীয় দেবভাব পবিত্রভাবকে জাগরিত করিব, আধ্যাত্মিক বল বর্দ্ধিত করিব, ইহলোক হইতে পরপারে যাইবার পাথেয় বহুল পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া লইয়া, যোগানন্দে প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিব, ইহার জন্য প্রবল অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সমাবেশ কোথায়? মনুষ্য বর্ত্তমান সুখের প্রসব অন্বেষণ করে, গাম্ভীর্য্য চাহে না, সাধন-সাপেক্ষ অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া বিগতপাপ হয় না বলিয়া চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি দর্শন করে, বিভীষিকা দর্শনে তাহার মর্ম্মস্থল প্রকম্পিত হইতে থাকে, ঘোর দশনা কাল স্বরূপা মহাশক্তির অট্টহাস্যে জীবন্মৃত হইতে থাকে।

মনুষ্য যদি মনুষ্যের মত হইত, যদি সে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছাকে ব্যর্থ করিয়া না দিত, যদি সে তাঁহার ইঙ্গিতের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিত, তবে এ ছার মর্ত্ত্যধাম স্বর্গধাম হইয়া পড়িত। আমরা আপনার দোষে তাঁহা হইতে দূরে গিয়া পতিত হইয়াছি তাঁহার মধুর বাণীর স্বর বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই এত দারিদ্র্য, এত কষ্ট ক্লেশ আপনার মস্তকের উপর আনয়ন করিয়াছি। এই ঘোর বিষয় ব্যাপা-

রের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আপ্তকাম হইতে পারিতেছি না, সেই জন্য সাংসারিক সামান্য পরিবর্ত্তনে হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে, সান্ত্বনার দিক অন্ধকারময় হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষুর জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। আমরা তাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই বলিয়া তৃণের ন্যায় এই ঘোর সংসার-পাথারে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, শোক তাপ বিপত্তি বিষাদের ক্রীড়া সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছি।

শরীর ও মনের সঙ্গে আমারদিগের অস্থায়ী সম্বন্ধ। ইহারা সকলেই পড়িয়া থাকিবে আত্মা কেবল জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধামের দিকে ক্রমাগতই অগ্রসর হইবে। শারীরিক ও মানসিক উন্নতি অভাবে যে কত কষ্ট তাহা প্রতিজনেই পরীক্ষায় অবগত হইতেছি। আত্মার সঙ্গে আমারদের চিরন্তন যোগ। তাহার উৎকর্ষ সাধিত না হইলে, ধর্ম্মশিক্ষায় ঈশ্বরজ্ঞানে সুশিক্ষিত না হইলে আমারদের যে শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় তাহা বাক্যে বুঝান যায় না। যিনি ধর্ম্মবলে পুণ্যবলে আত্মার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছেন আত্মার অবনতি যে কি তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন।

মনুষ্য শরীর মন আত্মার সমষ্টি। মন শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শরীরের উন্নতির সীমা আছে, কতদূর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া ইহার উন্নতির মাত্রা পূর্ণ হয়। মন যেমন শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তেমনই মনের ক্ষুধা সমধিক বলবতী, সামান্য উপকরণে ইহার তৃপ্তি সাধিত হয় না। তথাপি মনের জ্ঞানের সীমা আছে। কিন্তু আত্মার উন্নতির সীমা নাই। একদিকে ঈশ্বর যেমন মহান্, আত্মার অতৃপ্তি তেমনই বলবতী। এলোক হইতে তাহার পিপাসার সূচনা হয়। এলোক হইতে লোকান্তরে যতই সে অগ্রসর হইতে থাকে, যতই ধর্ম্মশিক্ষায় বলীয়ান হইতে থাকে ততই তাহার পিপাসা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সম্মুখে অনন্ত ঈশ্বর, বহুসহস্র বৎসর পরেও পরমাত্মা যেমন তেমনিই থাকিবেন অথচ জীবাত্মা জ্ঞানে প্রেমে বর্দ্ধিত হইয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে।

আমরা এমন অপূর্ব্ব রত্ন এমন অক্ষয় বীজ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও এমনই মহৎ যে বিশ্বস্রষ্টার সুমহান ছবি ইহাতে প্রতিভাত হয়। এমন অক্ষয় রত্ন পাইয়া যেন তাহাকে হীন মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া না রাখি। ঈশ্বর যে ধর্ম্মবল ও সাধু ইচ্ছা নিয়ত আমারদিগের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন তাহা লইয়া যেন ইহার অঙ্গ-পুষ্টি করি। প্রকৃত ভাবে সুখী হইবার সকল আয়োজন উপকরণ আমারদিগের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার সহিত আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছার যোগ নিবদ্ধ করিয়া যেন সংসারারণ্যে ভ্রাম্যমান হই। শরীর মন আত্মা সকলেরই উন্নতি সাধন করি। ধর্ম্মশিক্ষা প্রধান লক্ষ্য করিয়া লই। অধ্যবসায় সহকারে নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হই। তাঁহার অভিমতে কার্য্য করিলে হৃদয়ে এত আনন্দ সমুত্থিত হইবে যে সে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া সমুদয় পৃথিবীকে প্লাবিত করিবে, শোক তাপ এখান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করিবে, জগতের প্রহেলিকা বিদূরিত করিয়া এখানে স্বর্গের পত্তন নিখাত করিবে।

পৃথিবীর সঙ্গে আমারদের ক্ষণিক যোগ। এখানে সকল পদার্থই মৃত্যুর অভিমুখীন। এমন নশ্বর জগতে মৃত্যুময় জীবের সঙ্গে প্রেম নিবদ্ধ করিলে আমারদের পরিত্রাণ

কোথায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন "তোমার যে প্রিয় সে নিতান্ত মরণশীল"। পৃথিবীর উপর কত তরঙ্গ উঠিয়া আপনা হইতে মিশাইয়া যাইতেছে, কত জলবুদ্বুদ উত্থিত হইয়া পরক্ষণে বিলীন হইয়া যাইতেছে। অথচ আমরা জলবুদ্বুদের সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিতে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেবল তাহার সেবা করিতে সঙ্কুচিত হই না। পৃথিবীকে স্বদেশ ভ্রমে সেবা করি, আত্মার অনন্তগতি ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হই, এখানকার ধন সম্পদ সর্ব্বস্ব মনে করি, সম্পদ বিপদের অন্তরালে তাঁহার হস্তকে প্রত্যক্ষ অনুভব করি না। এই জন্যই এখানকার প্রহেলিকা ভেদ করিয়া আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারি না। সম্মুখে উজ্জ্বল অনন্ত ব্রহ্মধাম, এ প্রবাসের বাহিরে আত্মার নিজ নিকেতন, এখানকার কষ্ট ক্লেশ শোক তাপ আত্মার শিক্ষা সোপান, ধর্ম্ম ঈশ্বর আত্মার নিজস্ব সম্পত্তি, ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলে মন আর ঘোর বিসাদের আলয় হয় না। সকলই জ্যোতির্ম্ময় সকলই শোভাময় হইয়া উঠে। ধর্ম্ম শিক্ষায় মনুষ্যের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, ধর্ম্ম শিক্ষায় তাহার প্রেম চরিতার্থ হয়। ধর্ম্মশিক্ষায় তাহার গন্তব্য পথ আলোকিত হয়, ধর্ম্মশিক্ষায় মনের মালিন্য দূরীভূত হয়। শরীর মন আত্মার মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়, ঈশ্বরের বিমল মুখচ্ছবি প্রতিভাত হয়, বিপদ সম্পদের সোপান হয়।

ভবানীপুর পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ই বুধবার ১৮০৯ শক।

উদ্বোধন।

যিনি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতা, পাতা, যাঁহার মহিমা এই দ্যুলোক ও ভূলোকে, যিনি অধোতে, যিনি ঊর্দ্ধেতে, যিনি পশ্চাতে, যিনি সম্মুখে, যিনি দক্ষিণে যিনি উত্তরে, যাঁহাকে আমরা তাঁহার সৃষ্টিতে কেবল পরোক্ষরূপে অনুভব করি, এমত নহে, আমরা যাঁহাকে হৃদয়-মন্দিরে আত্মার অভ্যন্তরে, "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" প্রত্যক্ষ বিদ্যমান দেখি, যিনি ভক্তের হৃদয়ের প্রিয়তম ধন, যিনি হৃদয়ে সমাসীন থাকিয়া ধর্ম্মামৃত পান করিবার পিপাসা প্রদান করিয়া আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। যিনি রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু, যাঁহাকে পাইলে আমরা পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ, পরম শান্তি সম্ভোগ করি,—প্রকৃত জীবন লাভ করি। যিনি অমৃতের সেতু, আমাদিগের জন্য অমৃতের দ্বার নিয়তই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, যিনি প্রেমময়, যাঁহার এক নিমেষের করুণা মনেতে ধারণা বা বাক্যেতে বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, সেই পরম করুণাময় অশেষ মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আমরা এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। আইস সকলে বিশ্বাস প্রেম ও ভক্তি ভরে তাঁহার প্রতি চিত্ত সমাধান করি, তাঁহাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করি, ও তাঁহার ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত হই।

উপদেশ।

আমরা যাঁহার উপাসনার জন্য আজ এখানে আসিয়াছি তিনি মহতোমহীয়ান আর আমরা অতি ক্ষুদ্র তথাচ আমাদের তাঁহাকে জানিবার পিপাসা। কিন্তু আমাদের জ্ঞান লাভের পাঁচটী মাত্র দ্বার। আমরা তদ্দ্বারা বাহ্য বিষয় রূপরসাদিই গ্রহণ করিতে পারি। এ দিকে আবার পরীক্ষায় দেখা যায় যে ভূতে যত গুলি ভৌতিক গুণ কম সেই ভূতই অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। পৃথিবীতে রূপাদি পাঁচটী গুণ আছে কিন্তু জলে গন্ধ

গুণ নাই এ জন্য জল পৃথিবী অপেক্ষা ব্যাপক। তেজে গন্ধ ও রস নাই এ জন্য তাহা পৃথিবী ও জল অপেক্ষা ব্যাপক। বায়ুতে গন্ধ রস ও রূপ নাই এ জন্য তাহা পৃথিবী জল ও তেজ অপেক্ষা ব্যাপক। আকাশে কেবল শব্দ মাত্র আছে এ জন্য তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক। কিন্তু যাঁহাতে জড়ের ধর্ম্ম কিছু মাত্র নাই এবং যিনি এই সমস্ত নাম রূপের নির্ব্বহিতা তিনি যে কি ব্যাপক তাহা কি বুদ্ধির ধারণায় আনিতে পারে। কোন বৈদিক কবি ব্রহ্মের এই অনন্ত মহান ব্যাপক ভাব ভাবিতে গিয়া স্তম্ভিত ভাবে বলিতেছেন, অগ্নির্মূর্দ্ধা, দ্যুলোক ইহাঁর মস্তক, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, দিশঃ শ্রোত্রে, দিক সকল কর্ণ, বাক বিবৃতাশ্চ বেদাঃ, বিশ্বব্যাপক জ্ঞান ইহাঁর বাক্য, হৃদয়ং বিশ্বমস্য, আর এই বিশ্ব ইহাঁর হৃদয়। কবি ব্রহ্মের মহিমা গানে প্রবৃত্ত কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব ও আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া স্তব্ধ পুলকে কহিতেছেন এই ভূতাত্মক প্রকাণ্ড অণ্ড যাহা—পৃথিবী যাহার উপর আমি সপ্ত-বিতস্তি-পরিমিত দেহে দাঁড়াইয়া আছি তোমার নিকট ইহা একটী ক্ষুদ্র পরমাণু, এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অণু যে তোমার রোম-বিবর রূপ গবাক্ষ রন্ধ্র দিয়া অনবরত গতায়াত করিতেছে আমি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হইয়া সেই তোমার মহিমা কি বুঝিব। আদি কবির বিরাট হৃদয় অমূর্ত্তের এই বিরাটমূর্ত্তি হৃদয়ানলে অঙ্কিত করিয়া যেমন বলিল যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ; আমরাও তদ্রূপ সেই মহা প্রাণে আপনার ক্ষুদ্র প্রাণকে মিশাইয়া বলিতেছি যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তিনি বুদ্ধির অগ্রাহ্য। ফলতঃ তুমি সেই অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্রে যতই প্রবেশ কর অন্ত পাইবে না, নিশ্চয়ই তোমায় দিকভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় সচকিতে ফিরিতে হইবে। তিনি বুদ্ধির অগ্রাহ্য কিন্তু তিনি আত্মার গ্রাহ্য। বাহ্য বিষয় যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়-সাধারণ বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া আত্মায় আইসে ইহা সে রূপ নহে। ব্রহ্ম আত্মার স্বাভাবিক ভোগ। বুদ্ধি স্বচক্ষে সেই কোটি-সূর্য্য-প্রকাশকে দেখিতেছে, তাঁহার শুভ্র কিরণে আপনাকে রঞ্জিত করিতেছে কিন্তু হস্ত প্রসারণ করিলে পায় না, তিনি দূরাৎ সুদূরে। কিন্তু আত্মা সেই বিদ্যুৎ পুরুষের পবিত্র রত্নবেদি। তিনি তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হন। সুরনদী মন্দাকিনী স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভেদ করিয়া অনন্ত স্রোতে অনন্ত পথে চলিয়াছে, ইহার আদি কোথায় অন্ত কোথায় কিছুই নির্ণয় হইবার নয়, আত্মা সেই স্রোতে ভাসিয়াছে এবং তাহার অমৃত বারি পান করিয়া শীতল হইতেছে, এই তাহার ভোগ।

বুদ্ধি নিজের সংস্কার অনুসারে বস্তু গ্রহণ করে এজন্য কোন তত্ত্ব তাহার অনুভূত হয় না। বুদ্ধির এই সংস্কার কুসংস্কার। এই কুসংস্কার লোপ করাকে যোগাচার্য্যেরা আত্মার বৃত্তিরোধ বলিয়া নির্দেশ করেন। বৃত্তিরোধ হইলে দ্রষ্টা আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হয়। তখন তাহাতেই তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। আর বুদ্ধির সংস্কার থাকিতে তদাকারে আত্মারও আকার হয়। সুতরাং তাহাতে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হয় না। এই মন ও বুদ্ধি আত্মার বুদ্বুদ ও তরঙ্গ। একটী ইহাকে আলোড়িত ও আর একটী কলুষিত করিতেছে। মনের চাঞ্চল্য ও বুদ্ধির বিকার নষ্ট কর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে। কূপ যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু তাহা নির্ম্মল ও স্থির হইলে তাহাতে অনন্ত আকাশ প্রতিবিম্বিত দেখা যায়।

এই অনন্তের সাধনে আত্মপ্রসারণ আবশ্যক। বেদে সৃষ্টি প্রকরণে এইরূপ আছে।

যখন এই সমুদায় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন এক মহাশূন্য-সমুদ্র ছিল তখন সর্ব্ব প্রথমে প্রেমের আবির্ভাব হয়। সতের সহিত অ-কৃতকারণের যে বন্ধন তাহা এই প্রেমবন্ধন। ফলত ঈশ্বরের প্রেমেই জগতের আবির্ভাব এবং ঈশ্বরের প্রেমেই ইহার সদ্ভাব। অন-ন্তের সাধনে এই বিশ্বব্যাপক প্রেমকে আদর্শ করিয়া আপনার আপনার ক্ষুদ্র প্রেমকে প্রসারিত কর তাহাই আত্মপ্রসারণ। আমা-দের অতীত পুরুষ আমাদের জন্য এই পৃথি-বীর বক্ষে জ্ঞান বিজ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার রাখিয়া মঙ্গলময় কাল লোকান্তরে আমাদি-গকেই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাঁহারা যথায় থাকেন তাহা পিতৃলোক। স্বাধীন বুদ্ধিতে সেই সমস্ত জ্ঞান আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সহিত [illegible] মিলিত হও ইহা লোকান্তরে আত্মসম্প্রসারণ। ইহ-লোকে নানাপ্রকার পার্থক্য এক জন হইতে আর এক জনকে দূর অন্তরে রাখিয়াছে। সমান ক্ষুৎপিপাসা, সমান সুখ দুঃখ, আ-কৃতি প্রকৃতি কোন বিষয়ে মূলত কোন বৈষম্যই নাই তথাচ অন্তর, সর্ব্বপ্রযত্নে হৃদ-য়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবধান দূর করিয়া নির্ব্বি-শেষে সকলকে মৈত্রীভাবে আলিঙ্গন কর। ইহা প্রীতিযোগে ইহলোকে আত্মপ্রসারণ। ফলত জ্ঞান ও প্রেমে আত্মাকে প্রসারিত করিয়া তাহা হইতে বুদ্ধির কুসংস্কার দূর কর নিশ্চয় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে। বিষয় অবশ্য কঠিন। সংসারের ভোগও প্রতি-বন্ধক হইতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক জন মহাজ্ঞানী বলিয়াছেন

"তুলসি এয়সা ধ্যান ধর
যেয়সা বিয়ানকা গাই। মুমে তৃণ-চানা টুটে
চেৎ রাখে বাছাই"

এইরূপে যোগ অভ্যাস কর যেমন প্রসূতি ধেনু মুখে তৃণাদি চর্ব্বণ করিতেছে কিন্তু তাহার মন সম্পূর্ণ বৎসের দিকে আছে। আইস এইরূপে আমরা সংসারের ভোগের মধ্যে থাকিয়া মনকে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের দিকে রাখিবার চেষ্টা করি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ ক-রিতে পারিব।

পরমাত্মন্, আমরা পৃথিবীর ধূলিনির্ম্মিত জীব কিন্তু আমাদের অন্তরে স্বর্গীয় অগ্নি। চক্ষু মোহ-কুজ্ঝটিকায় অন্ধ। আমরা সেই অগ্নিকে দেখিতে পাই না। অন্তর্য্যামী! তুমি তো সকলই জানিতেছ, আমাদের চেষ্টার এমন কি বল যে আমরা তোমাকে জানিতে পা-রিব। "যেমনে তু জানায়া অহিজন জানে।" তুমি যাহাকে জানাও সেই তোমাকে জা-নিতে পারে। ক্রমে পৃথিবীর দিন অবসান হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে ঘোর অন্ধকার, তুমি কৃপা করিয়া অন্তরে শুভ্রজ্যোতি প্রকাশ কর যেন আমরা সুখে ইহলোক ত্যাগ করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে তো-মার দিকে নিয়তই আহ্বান করিতেছ, কিন্তু আমরা এমনই মূঢ় ও দুর্ভাগা যে তোমার কথা না শুনিয়া প্রবৃত্তির বশে অনিত্য পার্থিব বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছি। তুমি কতবার আমাদিগের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করি-তেছ, কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ পুনঃ পুনঃ মোহেতে অভিভূত হইতেছি। তুমি আমা-দিগকে অমৃতানন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছ, কিন্তু আমরা তোমার নি-কট যাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়া আস্বাদ করি না। হে জীবনের জীবন! তোমার প্রসাদে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন ধারণ করিতেছি। কিন্তু আমরা তোমাকে ছাড়িয়া জীবন যাপন

করিতেছি। হায়! আমরা কি তোমাকে ছাড়িয়া এইরূপে চিরজীবন যাপন করিব? আমাদের পরম লোক পরমগতি—জীবনের সুখ সম্পদ সর্ব্বস্ব, চিরজীবনের উপজীব্য যে তুমি—তোমাকে না পাইয়া সংসারারণ্যে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইয়া কি হাহাকার করিব? নাথ! তুমি আমারদিগের জীবনকে তোমার সহিত সংযুক্ত কর, আমাদিগকে একান্তে তোমার করিয়া লও। আমরা যেন তোমার কথা-প্রসঙ্গ, তোমার করুণা স্মরণ, তোমার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে অহরহ নিযুক্ত থাকি। যে কার্য্য করি, তাহাতে তুমি আমাদিগের লক্ষ্য হও। তোমার প্রেম মুখ পানে চাহিয়া তোমার প্রিয় কার্য্যসাধন করিবার জন্য যেন আমরা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি। তোমা বিহনে যে জীবন সে জীবন মৃত্যু—সেই মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। আমাদিগের পাপ তাপ মোচন কর, আমাদিগকে সংপূর্ণরূপে তোমার প্রতি অনুরক্ত কর। কবে আমাদিগের হৃদয়-কমল তোমার প্রেম-সূর্য্যের কিরণে বিকসিত হইবে, কবে অন্তবিহঙ্গ তোমার প্রেমালোকে পুলকিত হইয়া অন্তঃস্ফূর্ত্তি মধুর স্বরে তোমার মহিমাগানে প্রবৃত্ত হইবে! কবে তুমি আমাদিগের নয়নের অঞ্জন, হৃদয়ের স্পর্শ মণি, ও জীবনের ভূষণ হইবে। হে নাথ! আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর—তোমার পথের পথিক কর! তোমাকে লাভ করিয়া যেন আমাদিগের জীবন সার্থক হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ ফাল্গুন রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

পরমাত্মার উপাসনার জন্য আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। সংসারের সমস্ত ভাবনা চিন্তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আইস আমরা জ্ঞানময় প্রেমময় পরমাত্মার প্রতি মনকে সমাহিত করি। আমাদের সম্মুখে কোন দেবমূর্ত্তি নাই, কোন পূজার সামগ্রীর আয়োজন নাই, বাহিরের কোন ঘটা আড়ম্বর নাই, কিসে আমাদের মন আকৃষ্ট হইবে? আমাদের যিনি দেবতা তাঁহার নাম নাই—কি বলিয়া আমরা তাঁহাকে ডাকিব? তাঁহার রূপ নাই, কিরূপে আমরা তাঁহাকে দেখিব? তাঁহার উপমা নাই, কি প্রকারে আমরা তাঁহাকে ধ্যান করিব? ইহার উত্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন "শান্তো-দান্ত উপরত-স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি; শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া সাধক আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন।" আমাদের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে চায়, কোন বিষয়েই স্থির থাকিতে চায় না; যে কোন বিষয়ে মনকে বাঁধিয়া রাখ না, তাহার কিয়ৎকাল পরেই মন তথা হইতে বাহিরে যাইবার পথ অন্বেষণ করিবে; স্বস্থান-হইতে বাহিরে বিচরণ করিবার সংস্কার আমাদের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের উপাস্য দেবতাকে আমরা বাহিরে দেখিতে না পাইলে আমরা মনে করি যে, অন্তরে দেখা দেখাই নহে। আমাদের মনের এইরূপ বহির্মুখী সংস্কার অনেক দিনের সংস্কার, তাহার পরিবর্ত্তন এক দিনে হইতে পারে না; দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধন করিলে তবেই অল্পে অল্পে

তাহাতে আমরা কৃত-কার্য্য হইতে পারি। আমাদের মনে যেমন বহির্মুখী সংস্কার প্রবল, যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির মনে অন্তর্মুখী সংস্কার সেইরূপ প্রবল হইয়া উঠে তবে তাঁহার মন আর উদাসীনের ন্যায়, মাতৃহীন পিতৃহীনের ন্যায়, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় না; পরমাত্মার প্রেমে তাঁহার মন এমনি বাঁধা পড়িয়া যায় যে সেখান হইতে কেহই তাঁহার সে মনকে উঠাইয়া আনিতে পারে না; কার্য্য-কালে মন পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া কার্য্য করে, বিরাম-কালে মন পরমাত্মার ক্রোড়ে শান্তি সুখে নিমগ্ন হয়। প্রেম কি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানেন যে, মনের প্রেম যেখানে নিবদ্ধ হয় সেখান হইতে মনকে আর কোথাও ফিরানো দুষ্কর। মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতেছে এ অবস্থায় দৈব-যোগে যদি তাহাকে অজ্ঞাতসারে প্রেম আসিয়া অধিকার করে তবে তাহার বিক্ষেপ একেবারেই স্থগিত হইয়া যায়,—একই প্রেমের বস্তু তাহার তপ জপ ও ধ্যান হইয়া উঠে। এ ঘটনাটি আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? এই শিক্ষা দিতেছে যে, বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইবার সংস্কার মনের একমাত্র সংস্কার নহে,—নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হইয়া মন একমাত্র বস্তুতেও নিমগ্ন হইতে পারে,—ইহাতে অসম্ভব বা অলৌকিক কিছুই নাই; প্রেমী ব্যক্তির মন একমাত্র প্রেমের বস্তুতে দিবারাত্রি নিমগ্ন থাকে ইহা পরীক্ষার কথা। গৃহস্থ ব্যক্তির প্রেম স্ত্রী পুত্র পরিবারে বদ্ধ থাকে—ইহাই প্রেমের প্রথম সোপান; এই প্রেম যদি ঈশ্বর-প্রেমের সহিত সংযুক্ত হয় তবেই ইহা অতি পবিত্র প্রেম হইয়া উঠে। উদাসীন ব্যক্তির মনে প্রেমের ভাব দুর্ঘট; অগ্রে প্রেমের ভাব মনে অধিকার না পাইলে ঈশ্বর-প্রেম কোথা হইতে আসিবে? গৃহস্থ ব্যক্তি শৈশব কাল হইতে স্নেহ প্রেমের অধিকারে বাস করিতেছে—গৃহস্থ ব্যক্তিই সহজে ঈশ্বর-প্রেমের স্বর্গদ্বারে উপনীত হইতে পারে। এই জন্য ঈশ্বর-প্রেম সাধনের জন্য গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রম বলিয়া সকল শাস্ত্রে গীত হইয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণী কিয়দ্দূর খনন করিয়া যদি ক্ষান্ত হওয়া যায় তাহা হইলে প্রত্যেক বর্ষা ঋতুতে চতুষ্পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা বিগলিত হইয়া তাহাকে অল্প কালের মধ্যেই পঙ্কপূর্ণ করিয়া তোলে; এই জন্য যে পর্য্যন্ত না পাতালের জল নাগাল পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত গভীরে খনন করা কর্ত্তব্য, গার্হস্থ্য প্রেমের গভীরতা এবং পবিত্রতা সাধন করিয়া তাহাকে ঈশ্বর-প্রেমের সহিত সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য। গৃহ এইরূপ সংযোগ সাধনের পরম উপযোগী বলিয়াই তাহা আশ্রম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গৃহ এত যে পবিত্র আশ্রম—কিন্তু ঈশ্বর-প্রেম হইতে বিচ্যুত হইলে আর তাহা আশ্রম থাকে না—তাহা কঠোর কারাগার হইয়া উঠে, ভীষণ অরণ্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শুধু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম একটা কথার কথা; ঈশ্বর-ভ্রষ্ট মনুষ্য-প্রেম স্বার্থের অবলম্বন ব্যতীত এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে পারে না—ইহা জানা কথা। পৃথিবী হইতে কখন বিদ্যুতাগ্নি উঠিতে পারে না—মর্ত্যভূমি হইতে স্বর্গীয় প্রেম জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। ঈশ্বর-ভ্রষ্ট গৃহে সম্পদ বিপদকে সঙ্গে করিয়া আনে, প্রেম বিবাদ-কলহ সঙ্গে করিয়া আনে, দর্প-আস্ফালন পতনকে সঙ্গে করিয়া আনে, লক্ষ্মী শনিকে সঙ্গে করিয়া আনে। ঈশ্বর যে গৃহের উপাস্য দেবতা সেই গৃহই প্রেমের পবিত্র আশ্রম! মূল হইতে রসাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ যেমন শাখা-পত্র ফল-ফুলে শোভিত হয়, সে গৃহ সেইরূপ

ঈশ্বরের স্বর্গীয় অমৃত আকর্ষণ করিয়া জ্ঞান প্রেম কল্যাণে শোভিত হয়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেক।

দিবসের প্রারম্ভে শান্ত দান্ত হইয়া পরমাত্মাতে মনকে সমাহিত করা গৃহস্থ ব্যক্তির প্রথম কর্ত্তব্য। বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মাতে সমাহিত করা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কঠিন ঠেকিতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি ক্রমে যত বর্দ্ধিত হইবে ততই তাহা আনন্দের প্রস্রবণ হইয়া উঠিবে। সেই এক অদ্বিতীয় অনুপম পরমাত্মাকে আমরা অন্তরে পাইলে সকলকেই আমরা অন্তরে পাই—কেননা সকলেই পরমাত্মার অন্তর্ভূত। তখন বাহিরের যাহা কিছু সমস্তই অন্তরের হইয়া উঠে; ভ্রাতা তখন অন্তরের ভ্রাতা হয়, স্ত্রী পুত্র অন্তরের স্ত্রী-পুত্র হয়, পিতামাতা অন্তরের পিতামাতা হ'ন,—মূলকে অন্তরে পাইলে আমরা সকলকেই অন্তরে পাই।

আর একদিকে দেখা যায় যে, সাংসারিক দুঃখ-শোকের তীব্রতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান যেমন পরম মহৌষধ এমন আর কিছুই নহে। দুঃখ-শোকের অধিকাংশই আমাদের মনের বহির্মুখী সংস্কারের উপর নির্ভর করে, সে-সকল সংস্কার তন্তুকীটের ন্যায় আমরা আপনারাই নির্ম্মাণ করি এবং আপনারাই তাহাতে জড়াইয়া পড়ি। দেশাচার-মূলক কুসংস্কারকেই আমরা সচরাচর কুসংস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; কিন্তু তদ্ব্যতীত আরো অনেক কুসংস্কার আমাদের আছে; আমাদের যে-টা মনের ইচ্ছা তাহা সত্য না হইলেও তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করি—ইহাই যত কুসংস্কারের মূল। যাঁহারা অনেক কাল সম্পদের উচ্চ শিখরে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের সে সম্পদের জন্য তাঁহাদিগকে কোন আয়াস পাইতে হয় না, তথাপি এই এক ইচ্ছা মাত্র তাঁহাদের মনকে অধিকার করিয়া রহে যে, এ সম্পদ চিরস্থায়ী হউক, এবং শুদ্ধ সেই ইচ্ছার বলে তাঁহারা মনে করেন যে, ধন জন যৌবন সকলই চিরস্থায়ী; এইরূপ কুসংস্কার কোন কোন মূঢ় ব্যক্তির চক্ষে এরূপ ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে যে, সে যখন অপব্যয় দ্বারা স্বীয় সম্পত্তি বিনাশ করিতে থাকে—তখনও মনে করে যে, সে তাহার সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার নহে। আমাদের যাহা বহুকালের সংস্কার তাহাই আমাদের ইচ্ছা হইয়া দাঁড়ায়, এবং সেই আমাদের সত্যাসত্য ও সুখ দুঃখের একমাত্র প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে প্রকার অমূলক সংস্কার আমরা আপনারাই আপনাদের স্কন্ধে আরোপ করি—সুতরাং তাহা কৃত্রিম। বাহিরের বিষয়-সকল আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে কিন্তু আমরা তাহাদিগকে ছাড়িতেছি না,—একবার আমরা বিশ্বাস করিয়াছি যে, তাহারাই চিরস্থায়ী এই জন্য তাহারা চলিয়া গেলেও, আমরা এটা মনে করিতে পারি না যে, তাহারা চিরস্থায়ী নয়। পরমাত্মাতে আত্মাকে সমাহিত করিতে পারিলে এই সকল কুসংস্কার শিথিল হইয়া পড়ে—সুতরাং সেই কুসংস্কার-মূলক হর্ষ শোকও শিথিল হইয়া পড়ে,—এবং তাহার স্থানে সত্যজ্ঞান-মূলক অটল ব্রহ্মানন্দ উদ্বোধিত হয়।

হে পরমাত্মন্! আমাদের পতনশীল দুর্ব্বল হৃদয়কে তোমার প্রেমামৃত সিঞ্চনে সজীব কর, অন্ধকারকে আমাদের সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেও, একবার তোমার রশ্মিকণায় আমাদের আকুল নয়ন সার্থক হউক; আমাদের হৃদয় হইতে প্রেম উত্থিত হইয়া তোমার মাধুর্য্যে বিলীন হইতে চায়, তোমার মুখের আলোকে তুমি তাহাকে পথ প্রদর্শন

কর—এ দীন হৃদয় তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় গিয়া শীতল হইবে। সংসারের মৃগতৃষ্ণিকার পাছু পাছু কতদিন অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিবে। তোমার এক বিন্দু প্রেম-কণিকা নিখিলের জীবন—সেই অমৃত-বিন্দুতে তরুলতা মঞ্জরিত হয়—তাহাতেই পশু পক্ষী চেতন পায়—তাহাতেই মনুষ্যে আত্মা অমরত্ব লাভ করে। সেই অমৃত-বিন্দু হৃদয়ে পাইয়া হৃদয়ের সমস্ত বেদনা দূর করিব এই জন্য আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি—তুমি আমাদিগকে শান্তি-দান করিয়া চিরদিনের মত কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আনন্দ-সাধন।

হে মনুষ্য! যে দুঃখ তোমার চির-কণ্টক হইয়া তোমার মনে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাই যদি দিন রাত্রি ভাবিবে তবে তোমার স্রষ্টার অভিপ্রেত আনন্দ কবে ভোগ করিবে। তোমার স্রষ্টার অভিপ্রায় যে সকল জীব আনন্দ ভোগ করে। আনন্দই আত্মার প্রকৃতি। দুঃখকে মনে না আনিতে দিলে আত্মা উদাসীন অবস্থায় থাকে না। আনন্দ আপনি আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।

আত্মার দুইটি শক্তি আছে, দুঃখ-নিবারণী শক্তি ও আনন্দোদ্ভাবিনী শক্তি। এই দুই শক্তির যতই আমরা পরিচালনা করিব ততই তাহাদিগের বল বৃদ্ধি পাইবে। এই দুরন্ত পৃথিবীতে সকল ইচ্ছাশক্তি প্রতি মনের বলের প্রতি নির্ভর করে। লোকে কথায় বলে ইচ্ছা শক্তির এমন ক্ষমতা যে পর্ব্বতকে চালিত করিতেও সক্ষম হয়।

আত্মা বুদ্ধি দ্বারা দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। 'There is nothing good or bad but thinking makes it so'. কিছুই স্বভাবতঃ ভাল নাই কিম্বা স্বভাবতঃ মন্দ নাই কেবল মনই কোন বস্তুকে ভাল করে অথবা মন্দ করে ইহা যদি মনে করা যায় তাহা হইলে দুঃখ অনেক নিবারিত হয়। ইহা যদি ভাবা যায় যে

"The mind's in its own place and of itself
Can make a hell of heaven or heaven of hell"

"মন নিজ স্থানে স্থিত; নিজ হতে উহা স্বর্গ নরকে অথবা নরক স্বর্গেতে পারে ক-রিতে পরিণত।"

তাহা হইলে দুঃখ অনেক নিবারিত হয়।

"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"

আমিও যদি মনে করি যে আমি শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ, "যে দেখ ইন্দ্রিয়গ্রাম এ নহে স্বকীয় গ্রাম," তাহা হইলে কোন দুঃখ আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারে না। আমি শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ, যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা শরীর সম্বন্ধীয়, আমার শরীরকে যাহা দুঃখ দিতেছে তাহা শরীর সম্বন্ধীয় বস্তু, আত্মা পৃথক, তাহা হইলে দুঃখ আমাদিগকে কতক্ষণ অভিভূত রাখিতে পারে? যিনি এরূপ সর্ব্বদা ভাবেন তাঁহাকে প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় বাহ্য ঘটনা হর্ষ অথবা শোক দিতে পারে না। তিনি "হর্ষশোকৌ জহাতি।" তিনি হর্ষকে নষ্ট করেন বলিয়া তিনি আনন্দকে নষ্ট করেন না যেহেতু হর্ষ ও আনন্দ এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। আমরা যদি বিবেচনা করি যে দুর্ঘটনার অপেক্ষা সহিষ্ণুতার সৌভাগ্য অধিক তাহা হইলে আমরা দুঃখকে পরাভূত করিতে সক্ষম হই। সহিষ্ণুতাতে মহত্ত্ব আছে অতএব সহিষ্ণুতার সৌভাগ্য দুর্ঘটনার দুর্ভাগ্য অপেক্ষা কেন ন্যূন হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

আত্মা মনের কোন কোন উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা দুঃখকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়।

আত্মা লজ্জাবৃত্তি দ্বারা দুঃখকে পরাভব করিতে সক্ষম হয়। আমি অর্থাৎ আত্মা মহৎ পদার্থ। কি! ছার দুঃখ এমন মহৎ-পদার্থকে অভিভূত করিবে। ছি! অতি লজ্জার বিষয়।

আত্মা কোন কোন রিপু দ্বারা দুঃখকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। যথা অহঙ্কার ও ক্রোধ। আমি ভৌতিক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ। আমি ভৌতিক জগতের উপরে। আমি অতি মহৎ পদার্থ। কি! বাহ্য বস্তু রূপ ছোট লোক আমাকে পরাভূত করিবে? তাহা কখনই করিতে দিব না। এইরূপ মনে করিয়া আত্মা দুঃখকে জোরে পদাঘাত করিতে থাকে। সেই পদাঘাত নিবন্ধন দুঃখ পলায়ন করে। রিপুরা আমাদিগের শত্রু। শত্রু দ্বারা শত্রুকে নষ্ট করা ইহা অপেক্ষা রাজনৈতিক কৌশল কি হইতে পারে?

ততটা স্বাস্থ্য না থাকিলেও, বাহ্য সুখ-সম্পদ না থাকিলেও আত্মা আনন্দোদ্ভাবনী শক্তি পরিচালনা করিয়া আনন্দোদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়। যেমন কোন ব্যক্তির বন্ধুতা লাভ করিতে গেলে তাঁহার প্রতি মনোযোগ ও তাহার সাধনা করিতে হয় সেইরূপ আনন্দ লাভ করিবার জন্য তাহার প্রতি মনোযোগ ও তাহার সাধনা করিতে হয়। হাজার দুঃখে পতিত হইলে তবু আত্মাতে আনন্দ আনয়ন করা যায় কিন্তু তাহা করিতে গেলে আনন্দের দিকে মনকে ফিরাইতে হয়, আনন্দ ইচ্ছা করিতে হয়, আনন্দকে আহ্বান করিতে হয়, মনে আনন্দকে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে হয়, এইরূপ চেষ্টা করিয়া আনন্দ হইতেছে অতিশয় আনন্দ হইতেছে এইরূপ প্রগাঢ়রূপে ভাবিতে হয় তাহা হইলে মনে আনন্দের উদ্রেক হয় নতুবা হয় না কিন্তু ইহা বহুসাধনের ফল। একবার মাত্র এইরূপ করিলেই যে হইবে এমন নহে। এই যে আত্মার স্বতঃ আনন্দোদ্ভাবনী শক্তি আছে, আনন্দ লাভ জন্য তাহার পরিচালনা প্রধান উপায়; অন্যান্য উপায় তাহার সাহায্য মাত্র। মনের বল এত উপার্জ্জন করিতে হইবে যে যখনই মনে করিবে তখনই মনে শান্তি আনিতে পারিবে, যখনই মনে করিবে তখনই মনে আনন্দ আনিতে পারিবে তাহা হইলে মঞ্জুর। ইন্দ্রজাল যেমন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় কোন কার্য্য সাধন করে সেইরূপ আত্মা যখন খুসি তখন দুঃখ দূর করিবে এবং আনন্দ আনয়ন করিবে তাহা হইলে মঞ্জুর। তথাপি সহায়গুলি অবহেলা করা উচিত হয় না বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ সহায় নিতান্ত আবশ্যক। উহা না থাকিলে মনে যে আমোদে আনন্দের উদয় হইতে পারে এমত বোধ হয় না। এই সহায় সকল নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রথম সহায় সর্ব্বদা সন্তোষামৃত পান। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন তাহাতে সন্তোষামৃত পান করা যাইতে পারে। আমি যে অবস্থায় আছি তাহা অপেক্ষা ত তাহা নিকৃষ্ট হইতে পারিত কিন্তু তাহা হয় নাই অতএব ইহা কত সুখের কারণ। এক ব্যক্তির একটি পা গিয়াছিল, সে মনে করিত যে আমার দুইটি পা যে যায় নাই ইহা সৌভাগ্যের বিষয় ইহা বিবেচনা করিয়া সে সুখী থাকিত। যদি কোন মনুষ্য ভাবে যে আমি ত অচেতন পদার্থ থাকিতে পারিতাম, প্রকৃতি আমাকে চৈতন্য বিশিষ্ট পদার্থ করিয়াছেন ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এই সকল মহৎ মনোবৃত্তি যাহা অনন্তকালে ও অনন্তদেশে সঞ্চরণ করিতেছে তাহা না লাভ করিলেও ত করিতে পারিতাম। আমার এক্ষণে যে স্বাস্থ্য আছে তাহা অপেক্ষা তাহা ত ন্যূন হইতে পারিত। আমার যে প্রাণা-

চ্ছাদনের উপায় আছে ইহাও যদি না থাকিত। আমার যে দুই একটি অনুরক্ত বন্ধু আছে ইহারাও যদি না থাকিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্তোষ লাভ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় সহায় প্রকৃতির বর্ত্তমান শোভা দর্শন। যিনি প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম করিয়াছেন তিনি তাহার যখন যে শোভা তাহা দেখিয়া তিনি সর্ব্বদা বিমোহিত থাকেন। সুস্নিগ্ধ অভিনব প্রাতঃকালের এক প্রকার শোভা। মধ্যাহ্ন কালের তেজপুঞ্জপ্রভা আর এক প্রকার শোভা। সূর্য্যাস্ত সময়ের বিচিত্র শোভনবর্ণযুক্ত রাজসভার উপযুক্ত শোভা আর একপ্রকার শোভা। প্রকৃতি-রূপচিত্রকরের কি আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্য সেই সময় প্রদর্শিত হয়। পূর্ণিমা রজনীর সুধা-বর্ষণকারী শোভা অন্য এক প্রকার শোভা। অন্ধকার রজনীর "রতন মণি খচিত অম্বরের" শোভা অন্য এক প্রকার শোভা। প্রকৃতি সকল সময়েতেই শোভাযুক্ত। প্রকৃতির শোভা দর্শন আনন্দের অক্ষয় প্রস্রবণ।

তৃতীয় সহায় শারীরিক পরিশ্রম। যাহার শারীরিক পরিশ্রমে সুখানুভব হয় তিনিই এই জগতে সুখী। শারীরিক পরিশ্রম অতি মহৎ পদার্থ যেহেতু তদ্দ্বারা আমরা ভৌতিক জগতের উপরে জয়লাভ করি। এই জয় লাভে মহত্ত্ব আছে। যাহার শরীর দুর্ব্বল তিনি যতটুকু শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারেন তাহা করিলে আনন্দ লাভ করিতে পারেন যেহেতু যতটুকু পরিশ্রম করা যায় ততটুকু ভৌতিক জগতের উপর জয় লাভ করা যায়। সকল মহৎকার্য্যেতে আনন্দ আছে।

চতুর্থ সহায় অধ্যয়ন। বিখ্যাত পুরাবৃত্ত-লেখক গিবন বলিয়াছেন—I would not exchange the pleasures of study for the treasures of both the Indies" আমি উভয় ইণ্ডিয়ার (অর্থাৎ এসিয়া খণ্ডস্থ ইণ্ডিয়া অথবা এমেরিকা খণ্ডস্থ ইণ্ডিয়া) ধনের জন্য অধ্যয়নের সুখ বিনিময় করিতে ইচ্ছুক নহি।" অধ্যয়ন দ্বারা মৃত মহাত্মাদিগের সহিত কথোপকথন প্রচুর আনন্দের কারণ। প্রাচীন মিসর দেশে পুস্তকালয়ের দ্বারের উপর লেখা ছিল, "medicines for the soul" "আত্মার ঔষধ এখানে আছে।" এই ঔষধ দ্বারা মনের কত রোগ নিবারিত হয় তাহা বলা যায় না। যেমন পরিপাক কার্য্য দ্বারা আমরা যাহা আহার করি তাহা জীর্ণ করি তেমনি অধীত বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া তাহা জীর্ণ করিও মনের রক্তমাংসে পরিণত করি। এই মানসিক পরিপাক কার্য্যে বিলক্ষণ আনন্দ আছে।

পঞ্চম সহায় জ্ঞানালোচনা। পুস্তকের সহায় না লইয়া স্বাধীনভাবে মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ও সাধারণ জগত্তত্ত্ব আলোচনাতে বিলক্ষণ আনন্দ আছে। আবার পুস্তকের সহায় লইয়া তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। দুই প্রকার আলোচনাতেই আনন্দ আছে।

ষষ্ঠ সহায় ধর্ম্মানুষ্ঠান। আমাদিগের সাংসারিক অবস্থা হাজার মন্দ হউক তথাপি তাহা এত মন্দ হইতে পারে না যে ন্যায় সত্য ক্ষমা মৈত্রীর অনুষ্ঠান না হইতে পারে। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত আত্মপ্রসাদ হইতে কোন প্রকার সাংসারিক কষ্ট আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে সকল সহায় উল্লিখিত হইল তাহা সকল অপেক্ষা এই সহায় গুরুতর।

কিন্তু উপরে যাহা বিবৃত হইল তাহা আনন্দসাধনের বৌদ্ধ প্রণালী। ইহাতে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই। আনন্দসাধনের ব্রাহ্ম প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইতেছে। আনন্দ সাধনের ব্রাহ্ম প্রণালী যেরূপ আনন্দ-

জনক তাহার বৌদ্ধপ্রণালী সেরূপ আনন্দজনক নহে।

ক্রমশঃ

উদ্ধৃত।

বর্ত্তমানে বিবাহের বয়স লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিলাম যাঁহারা প্রকৃত স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ তাঁহারা বিবাহ-সম্বন্ধে এ দেশের প্রাচীন প্রথারই বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাঁরা স্ত্রীলোকের অল্পবয়সে বিবাহ বর্ত্তমান পারিবারিক প্রণালীর অনুকূল বলিয়া সমর্থন করিতেছেন। আমরাও গত বৎসর ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিষয়ে এইরূপই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। আলোচনার জন্য তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এখনকার কৃতবিদ্যদিগের মতে পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল। * * * কিন্তু এ দেশের যেরূপ পারিবারিক প্রথা স্ত্রীর এই বৈবাহিক বয়স তাহার খানিকটা প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এখনও একান্নবর্ত্তি সংসার আছে। ইহা যে শীঘ্র নির্ম্মূল হইবে সে সম্ভাবনাও অল্প। * * * * এই একান্নবর্ত্তিতা ভবিষ্যতে টেঁকে কি না টেঁকে সে বিষয়ের সবিস্তর মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইহা ঠিক যে ইহা এখনও আছে, এবং শীঘ্রই যে যাইবে তাহাই বা কে বলিল। এখন আইস প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল স্থির করিলে এই একান্নবর্ত্তিতার সহিত তাহার প্রতিকূলতা দাঁড়ায়। কারণ এই একান্নবর্ত্তিতার মূল ধর্ম্ম। একটী একান্নবর্ত্তি পরিবারে নানা প্রকৃতির লোক থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি যদি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত না করে তাহা হইলে পারিবারিক স্থিতিভঙ্গ অপরিহার্য্য। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়সটা কি বস্তু তাহাও একবার স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ। এই সময়ে প্রকৃতির নিয়মে স্ত্রীর প্রবৃত্তি সকল যার পর নাই উদ্দাম হইয়া উঠে। কল্পনার অলৌকিক চক্ষে নয় যদি সরল ভাবে বুঝ, নিয়ত যাহা ঘটিতেছে যদি তাই ধরিয়া বুঝ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ধর্ম্ম ও সৎসঙ্গের ব্যূহমধ্যে থাকিলেও শতের মধ্যে অন্তত উনননব্বইটীকে প্রকৃতি এই বয়সে ভোগপ্রবণ করিয়া ফেলে। সুতরাং ইহা স্থির কথা যে এই বয়স স্ত্রীলোকের ভোগবুদ্ধি বাড়াইয়া তুলে। এই ভোগের সহিত স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এদিকে আমাদের সাধারণত যেরূপ অবস্থা তাহাতে পাঁচটার মধ্যে এক জনের সর্ব্বাঙ্গীণ ভোগ চরিতার্থ হওয়া সম্ভবই নয়। সুতরাং এই ভোগবুদ্ধিই ক্রমশ ঐ স্ত্রীকে স্বার্থপ্রবণ করিয়া ফেলে। আবার যখন স্বার্থ প্রবল হইতে থাকে তখন ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবোধ আর বড় একটা স্থান পায় না। এখনও সামান্য গৃহস্থের মধ্যে কেহ কেহ যে পৃথক-অন্ন হইয়া পড়ে তাহার মূল অনেক স্থলেই এই স্ত্রীলোকের ভোগপ্রবৃত্তি বা স্বার্থ। সুতরাং বর্ত্তমান সংস্কারকেরা পঞ্চদশ বর্ষ স্ত্রীর বিবাহকাল নির্দ্দেশ করিয়া সমাজমধ্যে এই মহৎ দোষটী আরও ডাকিয়া আনিতেছেন। এই ভোগলুব্ধ স্ত্রী আসিয়া কেবল আপনার ভোগ ও ভর্ত্তাকে দেখিতে থাকিবে। স্বার্থের উৎপীড়নে ইহার নিকট অবশ্য প্রতিপাল্য পরিবারও সর্ব্বই উপেক্ষিত হইবে এবং অনেক নিরুপায় লোক যার পর নাই অন্নাভাবে কষ্টে দিনপাত করিবে। সুতরাং এখনও যখন এদেশে একান্নবর্ত্তি সংসার আছে এবং শীঘ্রই যে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহারও যখন সম্ভাবনা নাই তখন স্ত্রীলোকের এই ভোগপ্রবণ পঞ্চদশ বর্ষকে বিবাহকাল স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে এই ভারতে একজন আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা ঋষির এই পূর্ব্বোক্ত চিন্তা উদয় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের অপেক্ষা তিনিই ইহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া যান।

আয়ুর্ব্বেদে আছে পিতা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও সন্ততির জন্য পঞ্চবিংশতি বৎসরের পাত্রকে দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা দান করিবে। আমরা স্বাস্থ্যের মূল প্রশ্ন উপলক্ষে বিবাহের বয়স অবধারণের কথা তুলিয়াছি। সুতরাং অনেকে এই বৈদিক সিদ্ধান্ত বাল্যবিবাহ-দোষে উপহত বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু বৈদিক ঋষি এইটুকু মাত্র বলিয়া বিরত হন নাই। তিনি পরে বলিতেছেন এই পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় পুরুষ এই অপ্রাপ্ত-ষোড়শবর্ষা স্ত্রীতে যদি গর্ভাধান করে তাহা হইলে গর্ভস্থ জীব নষ্ট হয়। আর যদিও জন্মায় তাহা হইলে চিরজীবি হয় না। অথবা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অর্থাৎ হীনবীর্য্য হইয়া জীবিত থাকে। অতএব ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কাতে গর্ভাধান অক-

র্ত্তব্য (১)। এস্থলে আমরা দুইটী বিভিন্ন বিষয় পাই-তেছি। প্রথম দ্বাদশে বিবাহ, দ্বিতীয় ষোড়শে গর্ভাধান। এস্থলেও তুমি বলিতে পার তবে ষোড়শ-বর্ষ বিবাহকাল না হয় কেন। কিন্তু পূর্ব্বেই দৃষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে এদেশের পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তি নৈতিক। যে কারণ দর্শাইয়া বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের মত দূষিত বলিলাম এই ষোড়শেও সেই দোষ। এই জন্য বৈদিক ঋষি দ্বাদশবর্ষকে স্ত্রীর বিবাহকাল নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সহিত ধর্ম্ম অর্থ ও কামের যোজনা করিয়াছেন। এখন তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য হইবে। আমাদের পারিবারিক বন্ধন সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ষোড়শী যোড়শীর মনে এই কর্ত্তব্য-বীজ অঙ্কুরিত করা দুঃসাধ্য। সে কেবল আত্মসুখ-বুদ্ধিতে পরগৃহে আসিয়াছে। বলিতে কি, বয়সই তাহার এই ইচ্ছার হেতু। পরিবারের মধ্যে যাহারা তাহার আত্মসুখের প্রতিবন্ধক ক্রমশ তাহারাই উহার পর হইয়া থাকে। সে কেবলই ইচ্ছা করে সকলের সহিত পৃথক্ হই। কিন্তু স্ত্রীলোকের দ্বাদশবর্ষ ষোড়শের ন্যায় ভোগ-প্রবণ নয়। সে সেই বয়সে পরগৃহে আসিয়া গুরুজনের নিকট সহজে কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে পারে এবং করেও। তাহার মনের ভাব কোনও অংশে ইহার প্রতিকূল নয়। আবার ষোড়শ বর্ষে নিজের বুদ্ধিই অনেক সময় পর্য্যাপ্ত কিন্তু দ্বাদশে তাহা প্রায়ই হয় না। এই জন্য পিতৃপরিবারের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত এই বয়সেই ফলবৎ হওয়া সম্ভব এবং পরিবারস্থ লোকের গুণে তাহা হইয়াও থাকে। একটী লতা পরিণত না হইতে তাহাকে যথেচ্ছ নোয়াইতে পারা যায় কিন্তু পাকিলে আর সহজে তাহা হয় না। যাহাই হউক এইরূপে ভর্ত্তৃগৃহে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম শিক্ষার নিমিত্ত দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত অতীত হইয়া যায়। পরে তাহার স্বামিসন্দর্শন। এখনও যে এই বেদোক্ত উপদেশ হিন্দু পরিবারে যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে তাহা নহে। কিন্তু ইহার অনুরূপ অনেকটা আজও আছে। আজও এমন শত শত পরিবার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়াও প্রকারান্তরে এই বেদোক্ত নিয়ম পালন করিতেছে। এদেশের অনেক লোক কন্যার বিবাহের পর স্বামিসমাগম না হওয়ার জন্য যুগ্মবৎসর দ্বিরাগমন প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া থাকে। এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে গিয়া কন্যার পুনঃসংস্কারের কাল উপস্থিত হয়। পরে তাহার স্বামিসমাগম ঘটিয়া থাকে। এদিকে আবার শারীরতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন যে যদি দূষিত পারিবারিক বায়ু কন্যার মন মলিন না করে তবে তাহার পুনঃ সংস্কারের কাল সচরাচর চৌদ্দ বা পনর। কিন্তু স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে বৈদিক ঋষি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ষোড়শ বর্ষকে স্বামিসমাগমের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং যখন এদেশে একান্নবর্ত্তিতার প্রথা আজিও ভাঙ্গে নাই তখন পঞ্চ-দশবর্ষ না হইয়া এই দ্বাদশবর্ষই বর্ত্তমানে স্ত্রীলো-কের বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

এখন তুমি এই কথা তুলিতে পার যে একান্নবর্ত্তি সংসারের উপযোগী শিক্ষার নিমিত্ত তুমি যাহা বলিলে তাহা কি স্ত্রীলোকের পিতৃগৃহে হইতে পারে না? তজ্জন্য তাহার দ্বাদশে বিবাহ দিবার বিশেষ আব-শ্যকতা কি। অবশ্য আমরাও স্বীকার করি শিক্ষার স্থূল স্থূল কতকগুলি পিতৃগৃহে না হইতে পারে এমন নয়। কিন্তু ইহার ভিতর একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। প্রত্যেক পরিবারের কতকগুলি সাধারণ ও কতকগুলি বিশেষ ভাব থাকে। সুতরাং সেই বিশে-ষত্ব টুকু শিক্ষা করা ক্ষেত্র না পাইলে সম্ভবপর হয় না। এমন কি সেই বিশেষত্বের উপর পারিবারিক মানমর্য্যাদা সমস্তই নির্ভর করে। এই জন্য পিতৃ-গৃহের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা বলা যায় না। আর একটী কথা এই যে মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা কার্য্যত শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব আছে। পিতৃগৃহে মাতা বলিলেন শ্বশুরকে ভক্তি করিও, দেবরকে স্নেহ করিও, যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিও। কিন্তু ভর্ত্তৃগৃহে শ্বশ্রূ কহি-লেন যাও ঐ তোমার শ্বশুর, উহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর, এই তোমার স্নেহের পুত্তলী দেবর, ইহাকে তোমার হস্তে সঁপিয়া দিলাম পালন কর। মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা এই রূপ কার্য্যত শিক্ষার বল কি অধিক নয়? এই সমস্ত ভক্তি ও স্নেহের পাত্রদিগের গাঢ় সংস্রব নিবন্ধন ভক্তি স্নেহ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি কি অপেক্ষাকৃত সতেজ হয় না? ফলত বাল্যে ভর্ত্তৃ-গৃহে কার্য্যত এই সমস্ত সদ্‌বৃত্তির নির্বিঘ্নে অনুশীলন হইবে বলিয়া বৈদিক ঋষি স্ত্রীর পক্ষে দ্বাদশ বিবাহ-কাল স্থির করিয়াছেন। আর স্বার্থপ্রবণ ভোগলোলুপ

---

(১) পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীং আবহেত পিত্র্যা ধর্ম্মার্থকাম প্রজা প্রাপ্ত্যে।
ঊনষোড়শবর্ষায়াং সংপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদাধত্তে পুমান গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে,
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেৎ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মাৎ অত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।

যোড়শে ইহা কষ্টসাধ্য এই জন্য যোড়শকে পরিহার করিয়াছেন।

এখন তোমার এই এক আপত্তি হইতে পারে যে দ্বাদশ বর্ষ কন্যার বিবাহকাল স্থির হইলে সেই বালিকা স্বয়ং পাত্র-নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না। কন্যার স্বয়ং পাত্র-নির্ব্বাচন করা উচিত কি না সে বিচার এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে হইতে পারে না। তবে তোমাদের নির্ব্বাচনের অর্থ এই যে যাহার সহিত চির জীবন থাকিতে হইবে তাহার দোষ-গুণ-বিচার। তোমার মতে তাহা দ্বাদশে কোনও মতে সম্ভবে না। কিন্তু এস্থলে আমরাও তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পঞ্চদশেই কি তাহা হয়—না রূপজ মোহ আসিয়া সমস্ত ভণ্ডুল করিয়া দেয়? স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ এই দোষ-গুণ-বিচার পঞ্চদশেও সম্ভব নয়। আর তোমার আর এক আপত্তি এই দ্বাদশে স্ত্রীর ভর্তৃত্ব জ্ঞান জন্মে না? অন্তরের প্রেমও অধিক দায়িত্ব বোধের সহিত ভর্তৃত্ব জ্ঞান পনর বৎসরেও হয় কি? সুতরাং এ বিষয়ের একটী [illegible] জ্ঞান পনর ও বার উভয়কেই সমান। এই জন্য বলিতেছি দ্বাদশ বর্ষ যখন এদেশের পারিবারিক প্রকৃতির উপযোগী তখন স্ত্রীর পক্ষে দ্বাদশ এবং পুরুষের পক্ষে পঁচিশ বিবাহকাল হওয়া উচিত।

প্রেরিত পত্র।

বাসনা নিবৃত্তি।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শ্রদ্ধেয়!

আপনি গত আষাঢ় মাসের পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে "বাসনা নিবৃত্তির মত অতি ভ্রমপূর্ণ এবং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।" আপনি বলেন যে "ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটী নানা বাসনার আকর। সেই সকল বাসনার মধ্যে যে গুলি পবিত্র নীতিসঙ্গত ও যাহার অনুসারে কার্য্য করিলে সেই সকল বৃত্তিগুলি পবিত্র ও উন্নত হয়, সে সকল বাসনা চরিতার্থ করা আমাদের কর্ত্তব্য।" সেই "চরিতার্থতা আমাদিগের সুখ ও উন্নতির কারণ, সে সকলের নিবৃত্তিতে প্রকৃত সুখও নাই, উন্নতিও নাই।"

হিন্দু শাস্ত্র বিহিত সমস্ত বাসনা পরিহার আপনি অসঙ্গত মনে করেন। যে হেতু যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

> প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
> আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
>
> গীতা ২। ৫৫

স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেতে রমণ করেন। কপিল দেব কহেন—

> সর্ব্বত্রজাতবৈরাগ্য আব্রহ্ম ভবনান্মুনিঃ।
>
> ভাগবত ৩। ২৭। ২৪

মুনি ব্রহ্মলোকাদি সকল পদার্থে অনাসক্ত হয়েন। হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ আছে যে ব্রহ্ম ভিন্ন নিজের কি ঐহিক কি পারত্রিক কোন কামনাই হৃদয়ে ধারণ করিবে না—করিলে নিঃশ্রেয়স সাধনের ব্যাঘাত হইবে। আপনি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হয়ত মনে করিলেন, যে এত বড় জ্বালা, অসৎ কামনা গুলি যেন বর্জ্জন করিলাম, একটী সাধু সৎ কামনা কি মনে স্থান দিতে পারিব না? এ নিমিত্ত আপনি পবিত্র ও নীতি-সঙ্গত কামনা চরিতার্থ করিবার উপদেশ দিয়া মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। আপনার এ উপদেশটী সংসারের সাধারণ জনগণের পক্ষে অতীব হিতকর বটে, কিন্তু ভক্তির চক্ষে দেখিতে গেলে আপনার মধ্য পথেও কণ্টক আছে। "সর্ব্বান্ কামান্" এই "সর্ব্বান্" শব্দের উপর এত উৎকট কটাক্ষ কেন? ইহার কি কিছু অর্থ নাই? অবশ্যই আছে। তাহাই যথা সাধ্য বিবৃত করিয়া নিম্নে প্রকটন করিলাম, ভরসা করি মহাশয় এ প্রবন্ধটী নিরপেক্ষ ভাবে স্বীয় পত্রিকাতে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

"ভজনাৎ ভক্তিরুচ্যতে।" ভগবদিতর সমস্ত পদার্থ হেয় অকিঞ্চিৎকর ও ভগবান্‌ই এক মাত্র পরমোপাদেয় জ্ঞানে ভগবানের প্রতি একান্ত চিত্তার্পণের নাম ভক্তি। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" পরমেশ্বরের নিরুপম সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাঁহার প্রতি যখন চিত্ত ভক্তিভরে ধাবিত হয়, তখন তাহার অপর সমস্ত বস্তুতে বিরতি জন্মে। সে সৌন্দর্য্যের তুলনা ও সীমা কোথায়? কোন পারস্য দেশীয় কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রিয়তম যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া স্বীয় বদনারবিন্দ প্রদর্শন করেন তখন পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরী নারী সেরূপ দেখিয়া স্বীয় স্বীয় রূপকে ধিক্কার করিয়া লজ্জায় অধোবদন হয়। ফলতঃ সেই রসস্বরূপকে যে যথার্থ আস্বাদন করে, তাঁহাতে মজে, সে তিনি ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। ভক্তিতে বাসনার প্রসরতা নাই। যেহেতু বাসনার মূলে "আমি।" কিন্তু ভক্ত যাহার চিত্ত আত্মহারা হইয়া ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য রসে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাতেই রমণ করে, তাহার আর "আমি" কোথায়? তাহার আর নিজের বাসনা কিছুই থাকে না। তবে কি ভক্তের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহে প্রবৃত্তি নাই? তিনি কি নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডের ন্যায় হইয়া স্বীয় শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যুকে আহ্বান করেন? তিনি কি শরীর রক্ষা জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মসাধন বিষয়ে অবহেলা করেন? কখনই না। এ সকল কার্য্য তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা জানিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে আপনাকে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত করেন। পরম প্রভু, পরম পিতা, পরমবন্ধু পরমেশ্বর তাঁহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, ভক্ত তাঁহার দাস, তাঁহার পুত্র, তাঁহার প্রেমিক হইয়া তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করেন। এমন যে অত্যাবশ্যক কার্য্য শরীর ধারণ জন্য আহার করা ভক্ত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাসনায় প্রণোদিত হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না। তাঁহার নিকট আহারও ব্রহ্মসাধনের উপযোগী হয়। এ নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে

আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎ প্রাণধারণং।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্ বিজ্ঞায় পরংব্রজেৎ॥

আহার করিতে যত্ন করিবে, যেহেতু আহার করিলে প্রাণ ধারণ হয়, প্রাণ ধারণ কিসের জন্য? তাহাতে জীবনের উদ্দেশ্য পরম তত্ত্ব জানা যায়। সেই তত্ত্বের প্রয়োজন কি? সেই তত্ত্ব জানিলে জীব পরম ব্রহ্মকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

বাসনাশূন্য না হইলে সংসার পার হইয়া পর ব্রহ্মের অমৃত নিকেতনে উপনীত হওয়া যায় না। যে হেতু

বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চ তাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা॥

অষ্টাবক্র সংহিতা ৯।৮

বাসনাই সংসার, বাসনা ত্যাগ করিলেই সংসার ত্যাগ করা হয়। বাসনা বিমুক্ত হইয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা অবস্থিতি কর। বাসনা থাকিলেই কর্ম্মফলে আশক্তি থাকে, কর্ম্মফলে আশক্তি থাকিলে কি রূপে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হইবে? ভক্ত—যিনি স্বীয় আত্মাকে প্রভুর চরণে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করেন, তাঁহার কর্ম্মফলে কিছু মাত্র আশক্তি থাকে না। তিনি জানেন যে

ব্রহ্মোপাস্যমিতি স্ফুরত্যপি যদি ব্যাবর্ত্তকা বাসনা।

শান্তিশতক ৬ শ্লোক।

বাসনা জগদীশ্বরের আরাধনার অন্তরায় হয়। তিনি নিজের বাসনা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়েন না। তাঁহারই চিত্ত

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।

গীতা ৬। ১৯

অবাত-কম্পিত দীপ শিখার ন্যায় পরমেশ্বরেতেই নিহিত থাকে। তিনিই নিষ্কাম

ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অমৃত পথের পথিক হয়েন। পরন্তু নিজের বাসনা (সে গুলি সৎ ও সাধু হউক) যদি তাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলে কর্ম্মফলে আশক্তি হইবে, কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকারমনা হইতে পারিবে না, তোমার "আমিত্ব" ঘুচিবে না। শান্তি নির্ভর ও অভয় প্রভৃতি দৈবী সংপদ সংযোগের ব্যাঘাত হইবে, তোমাকে কতবার বাসনার "অশ্রু" ভোগ করিতে হইবে।

বাসনা নিবৃত্তি—বাসনা-পরিশূন্য হইয়া একান্তে ঈশ্বরে মনঃসমাধান করা—ইহা শুধু ঈশ্বরকে পাইবার উপযোগী সাধন মাত্র, এমত নহে। বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা বিবেকোচিত ও যুক্তিযুক্ত। ইহার একটী উদাহরণ দিতেছি। মনে কর, দাম্পত্য-প্রেম ও সন্তান-বৎসলতা এই দুইটী বৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তুমি স্বীয় পরিবারকে কুশলে রাখিবার জন্য কতকগুলিন বাসনা হৃদয়ে ধারণ করিলে। কিন্তু তুমি যদি ভক্ত হও, তাহা হইলে ওরূপ সংসারাশক্ত হওয়া ও তাদৃশ বাসনা পরবশ হওয়া কি তোমার উচিত? কিসে উচিত নয়? এ সংসার কারণ? এ সংসার কি তোমার? এ সংসার তোমার নহে। এ সংসার ঈশ্বরের। তোমার ইহাতে কিছুই স্বত্ব নাই। ঈশ্বর তাঁহার অনির্দ্দেশ্য মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য তোমাকে দু দিনের জন্য এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি বীজ রোপণ করিলে, মুকুল হইল, ফল হইল, কিন্তু ফল ভোগ করিবার সময়ে ঈশ্বর হয়ত তোমাকে এখান হইতে নিত্য ধামে লইয়া গেলেন।

যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগ বিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাং॥

ভাগবত ১১।১৭।৩৮

যেমন পুত্তলিকা-ক্রীড়াকারী পুত্তলিদিগকে যথেচ্ছা সংযোগ ও বিয়োগ করে, সেই রূপ সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর এতৎ সংসারের জনগণের পরস্পর মিলন ও বিচ্ছেদ সম্পাদন করেন।

অতএব যদি সার বুঝিতে চাও, তবে দেখিবে, যে ঈশ্বরের জন্য তোমাকে এ সংসারের কার্য্য করিতে হইবে। তুমি তাঁহার ভৃত্য মাত্র। তুমি এখানে প্রভুর কর্ম্ম করিবে, তজ্জন্য তুমি তাঁহার নিকট ভৃতি পাইবে। সেই ভৃতি কি? তাঁহার সহিত সহবাস, তাঁহার আনন্দ, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছার সম্মিলন, তাঁহার প্রেমানন সন্দর্শন, হৃদয়ে তাঁহার প্রসাদ সম্ভোগ প্রভৃতি। তুমি যদি স্বীয় ভৃতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া সংসারের দিকে সলালস দৃষ্টিপাত কর, তবে তুমি তোমার ভৃতি হইতে বঞ্চিত হইবে ও যাহার জন্য তোমার হৃদয়ের বিক্ষোভ হইয়াছিল, সে বস্তুও হয়ত তোমার তীব্র ক্লেশের কারণ হইবে। মনে কর, যদি কোন উদ্যানপালক ভৃত্য স্বীয় প্রভুর অগোচরে উদ্যানের ফল আত্মসাৎ করে, তবে কি সে স্বীয় ভৃতি ও সেই পাপার্জ্জিত ফল উভয় হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না?

অতএব যেমন কাম ক্রোধাদিকে আত্মবিনাশের দ্বার স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেইরূপ ঈশ্বর ভিন্ন যে কিছু বাসনা আত্মার অধোগতির নিদান বলিয়া জানিবে। এমত যে মহৎ কার্য্য দেশে বিদেশে তাঁহার নাম প্রচার, তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার, লোকের উপকার প্রভৃতি, ইহাতেও নিজের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইও না। তুমি ঈশ্বরের ভৃত্য এ গুলি তাঁহার কার্য্য, "তিনি যত দিন সেই সকল কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত রাখেন, ততদিন তাহা প্রাণপণে করিবে," এইরূপ বুদ্ধিতে

তাহা সম্পাদন করিবে। দেখ ঈশ্বর কত প্রচারক মহাত্মাকে অকালে পৃথিবী হইতে স্বর্গে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পবিত্র কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। তিনি হয়ত তাহাদিগের অপেক্ষা উন্নত সেবক দ্বারা কালে তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবেন। তাঁহার কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে?

অতএব সাধকের কি কর্ত্তব্য নয় যে সে ঈশ্বরকে একান্তে প্রেম ও ভক্তি করে, তিনি ভিন্ন আর অন্য বাসনায় মুগ্ধ না হয়, সে সেই প্রেমাস্পদকে নয়নে নয়নে রাখে, ও তাহার পানে চাহিয়া তাঁহার প্রেমিক হইয়া, তাঁহার কার্য্য করে, আপনাকে অকর্ত্তা ও ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া জানে? শ্রীমৎ বশিষ্ঠ-দেব শ্রীরামচন্দ্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই কি তাহার শিরোধার্য্য নহে?

বহির্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সংকল্প বর্জ্জিতঃ
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

ঈশ্বরকে কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং আপনাকে অকর্ত্তা ও তাঁহার অধীন জানিয়া বাসনা শূন্য হইয়া তাঁহার আদেশ মতে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

অবশেষে বক্তব্য যে ঈশ্বর-ভক্ত ও সদ্-বাসনাকারী উভয়ের কর্ম্ম ফল সমান হইলেও ভক্তের কর্ম্মের হেতু ও প্রবৃত্তি গরীয়সী এজন্য তাঁহাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। *

কস্যচিৎ ভক্তিপিপাসু জনস্য।

---

* পত্র প্রেরক নিজেই বলিয়াছেন আমরা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছি তাহা সাধারণ জনগণের পক্ষে অতীব হিতজনক হইয়াছে। আমরা যে বাসনা চরিতার্থ করিতে পরামর্শ দিয়াছি তাহা "পবিত্র" বাসনা। তাহা কি ঈশ্বরানুমোদিত নহে। ভক্ত ভিন্ন আর কে ঈশ্বরানুমোদিত বাসনা হৃদয়ে স্থান দেয়, বা তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রয়াস পায়? ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে পত্র প্রেরকের সহিত আমাদের মত বিরোধ কিছুই নাই। পরন্তু ভক্তি পথে থাকিয়া যেরূপে বাসনা পরিহার করা যাইতে পারে, তাহার যে চিত্রটী তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সহানুভূতি আছে।

সং।

পত্র।

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রতি লিখিত)।

দেবগৃহ
৩১ জ্যৈষ্ঠ, ৫৮।

পরম সুহৃদ্বরেষু
প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার।

আপনার ২৫ জ্যৈষ্ঠের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের পীড়ার সময় আপনি যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত যাহা দিয়াছেন তাহা অতি কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলাম। আপনি ৮ ফাল্গুন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আমি এক সপ্তাহ পরে এখান হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমি যখন চুঁচুড়ায় গিয়া পৌঁছিলাম তখন দেখি বিষাদ সকলের মুখ মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ও সমস্ত বাটীতে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। আমি যে দিন পৌঁছিলাম শ্রীমত্তের পীড়া সেই দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম তাঁহার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। কলিকাতা হইতে ডাক্তর আনিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া হুগলির সিবিল সার্জ্জনকে ডাকা হইয়াছে। আমি যখন পৌঁছিলাম তখন তিনি আসিয়া পৌঁছেন নাই। ক্ষণেক পরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি শনিবার দিবস চুঁচুড়ায় পৌঁছি। শ্রীমৎ রবিবার ও সোমবার দিবস অচেতন প্রায় ছিলেন। কেবল যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার নিকট যাইতেছে না। মঙ্গলবার দিবস চৈতন্য লাভ করিয়াই আমাকে উপরে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি সসম্ভ্রমে দূরে বসিলাম কিন্তু তিনি যে খাটে শুইয়াছিলেন তাহার উপর আসিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টি স্বভাবতঃ অতি ক্ষীণ। আমি কিঞ্চিৎ দূর হইতেও ভাল দেখিতে পাই না। খাটের উপর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া যখন তাহার শরীরের ভয়ানক শীর্ণতা অনুভব করিলাম তখন আমি আঁতকিয়া উঠিলাম। হায়! হায়! বাল্যকাল পর্য্যন্ত রক্ষিত সেই মধুর কান্তি ও লাবণ্য এক্ষণে কোথায়? সে সময় একটি আর্ত্তনাদ অবশ্য আমার মুখ হইতে বিনির্গত হইত কিন্তু কোন প্রকার অস্থিরতা দ্বারা তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে ডাক্তরের নিষেধ স্মরণ হইল আর আমি সামলাইয়া গেলাম। যিনি আমাকে উপরে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন তাঁহাকে যাইবার সময় আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম যে যত দূর পারি সুস্থিরতা রক্ষা করিব। খাটের উপর যাইবা মাত্র শ্রীমৎ আমার হাত তাঁহার হাতের ভিতর রাখিতে বলিলেন। আমার হাত ধারণ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে "আমি এক্ষণে দৃষ্টি হীন, নাড়ি ক্ষীণ" দিবা রাত্রের গতি অনুভব করিতে পারি না— "ন দিবা ন রাত্রিঃ শিব এব কেবলঃ"। আমি এক্ষণে কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি। এই কথা বলাতে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। তাঁহার প্রিয়তমের স্মরণে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। অন্তিম সময়ে সেই প্রিয়তমই আমাদিগের এক মাত্র অবলম্বন।

বিদায় হইবার সময় তাঁহার পদধূলি লইলাম। সেই সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনীয় নহে। যখন মনে করিলাম যে হয়তো তাঁহার সহিত আর ইহলোকে সাক্ষাৎ হইবে না—তখন আকুল হইয়া পড়িলাম। অগ্নিময় মস্তিষ্ক লইয়া নীচে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। হায়! হায়! এ জীবনের guide, phelosopher and friend "পথ প্রদর্শক, জ্ঞানদাতা ও সুহৃৎ" চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে?

শ্রীমৎ উপরে বর্ণিত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ সুদবাইলে পর (তখনও জীবনের বিশেষ আশা নাই) পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এক দিন তাঁহার হাতের একটি লেখা আমাকে দেখিতে দিলেন। হস্তাক্ষর কিছু অস্পষ্ট ছিল কিন্তু তিনি এরূপ অবস্থাতে আদোবে লিখিতে পারেন তাহা আমি স্বপ্নে মনে করি নাই। তাঁহার হস্তলিপি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম আর তাহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহা দেখিয়া আরো আশ্চর্য্য হইলাম। উহাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল "আমার শরীর এক্ষণে অন্য কর্তৃক যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে; তাহা এক্ষণে সকল প্রকার রাসায়নিক পদার্থাধার হইয়াছে। আমার আত্মা এক্ষণে সেই "শান্তং শিবমদ্বৈতং" এর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সংসারের কোন কষ্ট নাই, কোন শোক নাই। সকলই শান্তিময় দেখিতেছি"। আমি এই লেখা পড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম যে শ্রীমৎকে বলিবেন যে এ অবস্থাতে তাঁহার মনের শান্তি দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি ইতি।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

৫০। ৬০ বৎসর হইতে চলিল এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। এমন অনেক কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা এই সমাজভুক্ত। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা সমাজভুক্ত না হইয়াও ইহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই উভয় প্রকার লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। সম্প্রতি আমরা একটা ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। যে কোনরূপে হউক যাঁহারা এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৮ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত মাঘ মাসে ব্রাহ্ম সাধারণকে যে উপদেশ দেন তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহকালের ও পরকালের শুভ ইচ্ছা করেন এই উচ্চ উপদেশ তাঁহাদেরই বিশেষ উপযোগী। ইহা প্রধান আচার্য্যের শেষ জীবনের শেষ উপদেশ। ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি আপনার যে মহামূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা অবসান হয় বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আপনার কতকগুলি শেষ কথা উপহার দিয়াছেন। তাহাই এই উপদেশ। ইহা ব্রাহ্মসমাজের চির সম্পত্তি ও অতি যত্নের ধন। এ দেশে যতদূর উত্তম হওয়া সম্ভব আমরা সেইরূপে এই উপদেশ মুদ্রিত করিয়াছি এবং এ দেশে যতদূর উত্তম হওয়া সম্ভব আমরা সেইরূপে এই গ্রন্থখানি বাঁধাইয়াছি। ফলত ইহার বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রত্যেকেরই মন প্রাণ হরণ করে। যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন। সোণার জল দিয়া বাঁধা পুস্তকের মূল্য ।৵০ আর ভাল কাপড়ে বাঁধা পুস্তকের মূল্য ।০ আনা।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আনন্দ-সাধন।

(পূর্ব্ব মাসের পর।)

আনন্দ সাধনের বৌদ্ধ প্রণালী যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহা স্বল্পপ্রাণ প্রণালী। তাহার জীবনীশক্তি অধিক নাই। ক্ষীণ মনুষ্য আনন্দলাভ জন্য আপনার প্রতি নির্ভর করিলে তত কৃতকার্য্য হয় না। সেই আনন্দ স্বরূপের প্রতি নির্ভর করিলে তবে কৃতকার্য্য হয়। আপনার আত্মাতে বলপূর্ব্বক আনন্দ উদ্ভাবন করিয়া মনুষ্য কতটুকু আনন্দ লাভ করিতে পারে? কিন্তু যদি সে মনে করে যে আত্মার মূলে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহা হইতে পৃথক হইলে আত্মার আর কিছুই থাকে না, যাঁহার সঙ্গে সদাই আমাদিগের যোগ রহিয়াছে, এবং তাঁহার আনন্দস্বরূপ চিন্তা করে তাহা হইলে আনন্দলাভে কতক্ষণ বঞ্চিত থাকিতে পারে? "দেখ হে! আনন্দকর জ্ঞাননেত্র খুলিয়ে সুখ হইবে অপার"। "সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা" সেই প্রফুল্লকর বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকেন। প্রকৃতির অন্তরালে ঈশ্বর লুক্কায়িত থাকিয়া প্রকৃতির সুন্দর বক্ষে তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন এইটি না ভাবিলে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া আমরা তত আনন্দ লাভ করিতে পারি না। সকল বিদ্যার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে জানা। এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া যদি আমরা বিদ্যোপার্জ্জন না করি, জ্ঞানোপার্জ্জন না করি, তাহা হইলে আমরা বিদ্যোপার্জ্জন, জ্ঞানোপার্জ্জনে তত আনন্দ লাভ করিতে পারি না। ধর্ম্মানুষ্ঠান অর্থাৎ ন্যায়, সত্য, ক্ষমা, দয়া অনুষ্ঠান সময়ে যদি আমরা সেই ধর্ম্মাবহ পুরুষকে স্মরণ না করি তাহা হইলে আমরা তত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি না। তিনি মূলে না থাকিলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে তত জোর পৌঁছে না। ঈশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া সন্নীতি আপনাকে কতক্ষণ রক্ষা করিতে পারে?

হঠযোগ ও রাজযোগে কতদূর সত্য আছে বলা যায় না। উপমা স্বরূপ উক্ত হইতেছে যে যোগীরা কৃচ্ছ্রসাধন হঠযোগ ও সহজ রাজযোগের মধ্যে যতপ্রভেদ আছে বলেন আনন্দ সাধনের বৌদ্ধ প্রণালী ও ব্রাহ্ম প্রণালী মধ্যে তত প্রভেদ আছে। আনন্দ সাধনের ব্রাহ্মপ্রণালী একটি কথায়

ভিতর ভুক্ত আছে। সে কথাটি প্রীতি। এই প্রীতি ব্রাহ্মপ্রণালীকে অতি সহজ করে। এই প্রীতি হইতে ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর, তাঁহার প্রতি নিরতিশয় কৃতজ্ঞতা, তাঁহার সহিত সহবাস, তাঁহাতে আত্মার লয় সাধন উৎপন্ন হয় এই সকলই আনন্দ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

পূর্ব্বে যে সর্ব্বদা সন্তোষচিত্ত হইয়া থাকার কথা বলা হইয়াছে তাহার মূলে যদি ঈশ্বরপ্রীতি না থাকে তবে সে সন্তোষ দৃঢ় ও স্থায়ী হয় না। ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বকে দেখিতেছেন, কেবল আমাকে দেখিতেছেন না, তাঁহার বিশ্বের হিতের জন্য যদি প্রিয়তম আমাকে দুঃখে নিক্ষেপ করেন তবে সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা বহন করা কর্ত্তব্য এইরূপ ভাবিলে যেমন দুঃখ সহ্য করা যায় এমন আর কিছুতেই করা যায় না। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিনম্র চিত্তে এই দুঃখ বহন করেন। তাঁহার তাহাতে কিছুমাত্র অহঙ্কার উপস্থিত হয় না। দুঃখ সহ্য করিয়া যে বড় একটা পৌরুষের কাজ করিতেছি এমন তিনি ভাবেন না। তিনি কত দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহা সংসারের লোককে জানিতেও দেন না। তিনি ঈশ্বরকে বলেন, "প্রিয়তম! তুমি আমাকে প্রহার করিতেছ, কর। তোমার প্রহারও মিষ্ট।" এইরূপ ভাবে তিনি কষ্ট সকল সহ্য করেন। কষ্ট তাঁহাকে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া দেয়। কোন মহা-কবি বলিয়াছেন যে কষ্ট সর্প বিশেষ কিন্তু সেই সর্প মস্তকে একটি মহামণি ধারণ করে। সেই মহামণি ঈশ্বর-স্মরণ। কোন সাধক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে ভগবান! আমাকে সর্ব্বদা দুঃখে রেখো যেহেতু তাহা হইলে তোমাকে আমার সর্ব্বদা স্মরণ হইবে। আর একটি সাধক (তিনি একজন রমণী) প্রার্থনা করিয়া ছিলেন যে "প্রভু! আমার প্রত্যেক সুখাদ্য অলাবুতে কণ্টক রোপণ কর—এই জন্য রোপণ কর যে সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ হইবে।" সাধকেরা এইরূপে কষ্টের প্রীতিতে একেবারে পড়িয়া যান। কষ্ট তাঁহাদিগকে বড় ভাল লাগে। আহা! আত্মার কি অসাধারণ অবস্থা তখন হয়। যে কষ্ট হইতে লোকে স্বভাবতঃ দূরে পলায়ন করে সেই প্রিয়তম জন্য আত্মা তাহা অতি আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করে। প্রীতির প্রধান লক্ষণ প্রেমাস্পদের জন্য কষ্ট সহ্য করা। ঈশ্বরপ্রীতির প্রধান লক্ষণ ঈশ্বরের জন্য কষ্ট সহ্য করা। মানুষের প্রতি প্রীতির প্রধান লক্ষণ মনুষ্যের জন্য কষ্ট সহ্য করা। ঈশ্বর-প্রেমী মহাত্মারা ঈশ্বরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মানবহিতৈষী মহাত্মারা মানবের হিতের জন্য কত কষ্ট সহ্য না করিয়াছেন। ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ কষ্ট সহ্য করা। যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি কিনা এই কষ্ট সহ্য দ্বারা পরীক্ষা করা যায় অতএব কষ্টই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের জন্য কষ্ট সহ্য করা নিমিত্তই মনুষ্য মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত হয়। পৃথিবীর আশ্চর্য্য এই যে সাধু মহাপুরুষেরা ধর্ম্ম জন্য যখন কষ্ট সহ্য করেন তখন সংসারের লোকেরা তাঁহাদিগের কোন সম্বাদ লয়েন না। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পরে তাঁহারা তাঁহাদিগের নামে মস্তক অবনত করিতে দৃষ্ট হয়েন।

ব্রহ্মপ্রীতি হইতে ঈশ্বরের নিকট নিরতিশয় কৃতজ্ঞতা উপস্থিত হয়। সামান্য বস্তু সকল জন্য সেই প্রিয়তমের নিকট সাধক কত কৃতজ্ঞ হয়েন তাহা বলা যায় না। বৃক্ষের হরিতবর্ণ জন্য, সূর্য্যের কিরণ জন্য, বিহঙ্গমের সুস্বর জন্য, নদীর লহরী-লীলার জন্য, তিনি কত কৃতজ্ঞ হয়েন তাহা বলা যায় না। যদি সাধক কোন সুমধুর ফল প্রাপ্ত হয়েন তাহা সেই প্রিয়তমের উপহারস্বরূ

মনে করিয়া তাহা অতি আনন্দের সহিত ভক্ষণ করেন। তিনি সমীরণের হিল্লোলের জন্য ঈশ্বরের নিকট এত কৃতজ্ঞ হয়েন তাহা বলা যায় না। তিনি সমীরণকে তাঁহার প্রিয়তমের দূতস্বরূপ জ্ঞান করেন। তাঁহার প্রেমবার্ত্তা সে সর্ব্বদা বহন করিতেছে এমৎ মনে করেন যেহেতু বায়ু না থাকিলে আমরা কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না। এই প্রকারে তিনি নিরতিশয় কৃতজ্ঞতার নয়নে সর্ব্বদা সমস্ত জগৎ নিরীক্ষণ করেন। এই নিরতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রভূত আনন্দের কারণ হয়।

ঈশ্বরপ্রীতি সাধককে ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে প্রয়োজিত করে। এই সহবাস প্রভূত আনন্দের কারণ হয়। এই সহবাস যখন প্রগাঢ় ভাব ধারণ করে তখন তাঁহার হাজার দুঃখ হউক না কেন তথাপি তাহার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। যেমন প্রবল ঝটিকার সময় কোন দীপালোক-সমুজ্জ্বলিত সুদৃঢ় গৃহে উপবিষ্ট থাকিলে মনের স্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয় তেমনি দুঃখ ক্লেশের মধ্যে ঈশ্বরে অবস্থিতি করিয়া সাধক সেইরূপ স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে "এষোস্য পরমো-লোকঃ" ইনি জীবের পরম লোক অর্থাৎ পরম নিবাস।

বিশেষতঃ ঈশ্বরে আত্মার লয় সাধন যেমন প্রভূত আনন্দের কারণ হয় এমন আর কিছুই নহে। এই লয় বৈদান্তিক লয় নহে। যখন ঈশ্বর প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ হয়েন তখন এই লয় সাধন হয়। যখন আত্মা সকল চিন্তা সকল বাক্য, সকল কার্য্য সেই ঈশ্বর উদ্দেশে করেন তখন সে অতি উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেমন নদী সমুদ্রে অস্ত যায় সেইরূপ সাধকের সকল চিন্তা, সকল বাক্য, সকল কার্য্য সেই ঈশ্বররূপ সমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনে আর একটি ভাবের উপস্থিতি না হইলে এই লয় সাধন সম্পূর্ণ হয় না। সে ভাব জগতকে ব্রহ্মময় দেখা। প্রত্যেক বস্তু তাহার নিজের অস্তিত্ব, তাহার নিজের শক্তি জন্য ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতেছে। তিনি যদি আপনাকে কোন বস্তু হইতে পৃথক করিয়া লয়েন তাহা হইলে সে বস্তুর আর কিছুই থাকে না। অতএব তিনি সকলই। তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই যখন সাধক এইরূপ সর্ব্বদা মনে করেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ বিলুপ্ত হয়। তিনি কেবল ঈশ্বরকে চতুর্দ্দিকে দেখেন। তিনি একেবারে ব্রহ্মসাগরে নিমগ্ন হয়েন। এ অবস্থাতে কোথায় বা দারিদ্র, কোথায় বা দুঃখ, কিছুই অনুভূত হয় না। "তত্র ক মোহ কঃশোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" "তাঁহার শোক কোথায়, মোহ কোথায়, যখন তিনি সব একই অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মময় দেখেন।"

গৃহ প্রবেশোপলক্ষে ব্রহ্মোৎসব।

মনুষ্য এমনই সামাজিক জীব, আনন্দের সহিত তাহার এমনই নিগূঢ় সম্বন্ধ, যে অন্তরে কোন নূতন সুখশান্তির স্রোত বহমান হইলে সে তাহা অপরকে অভিব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। অন্তরাকাশে নবতর কল্যাণতর সুখসৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইলে সে আনন্দ হৃদয়ের ক্ষুদ্র বেলা ভূমি অতিক্রম করিয়া জগতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্যের সুখ যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, তাহার পবিত্রতা যতই কেন উৎকর্ষ লাভ করুক না, সে আপনাকে লইয়া সুখী হইতে পারে না, আপনার আনন্দ দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত করিবার জন্য জগতের দিকে সোৎকণ্ঠ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আনন্দ

পরিবেশনের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হয়, অপরকে স্বীয়ের সঙ্গী করিবার জন্য সস্পৃহভাবে তাহার দিকে ধাবমান হয়। সুকোমল কুমার যে মাতার অঙ্কদেশ সুশোভিত না করিল, সহস্র প্রকার অন্যবিধ সুখে সুখী হইলেও সে মাতার মানসিক গভীর ব্যাকুলতার শান্তি নাই। নরনারী পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ না হইতে পারিলে, শ্মশানসমান উভয়ের মানস-ক্ষেত্রের রমণীয়তা কোথায়। জানিতেছি—স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি, যে জগৎ হইতে স্নেহ প্রেম প্রত্যাহৃত করিতে পারিলে, অনেক প্রকার জ্বালা যন্ত্রণার দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, কিন্তু সে দুর্লভ আনন্দের পরিবর্ত্তে কে হস্তপদবদ্ধ বন্দীর অবস্থা প্রার্থনীয় মনে করিতে পারে? জগতে আত্মসম্প্রসারণই স্বাধীনতা, আপনার ক্ষুদ্র স্বরূপের মধ্যে স্নেহ প্রেম দয়া বাৎসল্য আবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখাই পরাধীনতা। অপরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিয়া আপনার বৃত্তি প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি বিধানই স্বাধীনতা। স্বাধীনতাই সকল মঙ্গলের নিদান। আমরা স্বাধীন জীব বলিয়া বিমল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিয়া পরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হই।

আসঙ্গলিপ্সা মনুষ্যের এমনই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অপরের নিকট মনদ্বার মুক্ত করা মনুষ্যের এমনই অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব, মনুষ্য হৃদয়ে বিমল সুখের আবির্ভাব এমনই উচ্ছ্বাস প্রবণ, যে অন্তর প্রদেশ আনন্দস্রোতে ভাসমান হইলে তাহার সঙ্কীর্ণতা অপগত হইয়া উহা উদারভাব ধারণ করে। মনুষ্য যখন কোন নির্ম্মল সত্য আবিষ্কার করে, ঈশ্বর বিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব দেখিতে পায়, তখন সে আনন্দ আর হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। তখন তিনি ফল মূলাহারী ও বাক্‌যত হইয়া নির্জ্জন অরণ্যে সাধন তপস্যায় মন সমাধান করিলেও মনের আবেগে বলিয়া উঠেন

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাআয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

হে দিব্যধাম নিবাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি, সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

আমরা যে ব্রহ্মামৃত পান করিবার জন্য সকল বান্ধবে এই পবিত্র সময়ে সম্মিলিত হইয়াছি, তাহার কারণ কি? আজ কেন এই সুদৃশ্য ভবন ব্রহ্মনামগানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে? আজ কেন জনকোলাহল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে? আজ কেন বিষয়ের কুটিলচিন্তা মনকে অধিকার করিতে পারে নাই? আজ সেই সুখদাতা সম্পদ বিধাতা মঙ্গলময় পুরুষ তাঁহার ভক্ত সন্তানকে নূতন গৃহের অধিকারী করিয়া দিলেন। এ আনন্দ তাঁহার হৃদয় কোনমতে ধারণ করিতে পারিতেছে না। তাই তিনি তাঁহার আনন্দে আমারদের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বর্দ্ধিত করিবার জন্য হৃদয়সখার অনুপম করুণার পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এখানকার বন্ধুবান্ধব সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন, সাংসারিক এ নূতন অভ্যুদয়ে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার প্রেমমুখ জাজ্জ্বল্যতর রূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য যোজিতচিত্ত হইয়াছেন।

ঈশ্বরের করুণা প্রতিদিবসে প্রতিরজনীতে আমারদের উপরে সমভাবে বহমান থাকিলেও, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পতিত না হইলে আমারদের মোহনিদ্রা অপসারিত হইয়া চৈতন্যের উদ্রেক হয় না, সেই জন্যই

উৎসবানন্দের উৎসব কার্য্যের যার পর নাই আবশ্যকতা। সমুদ্রবক্ষে সলিলের উচ্ছ্বাস অবগমন প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সংঘটিত হইলেও, যেমন পৌর্ণমাসী রজনীতে উহা সমধিক উন্নতি লাভ করে, তেমনই অন্তরাকাশে প্রেমশশী সহস্র কলায় উদিত না হইলে শ্রদ্ধাভক্তি বিকশিত হইয়া তাঁহার পাদদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি আমাদের আত্মাকে এমনই নিগূঢ় সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, যে তাঁহাকে না পাইলে তাহার আরাম নাই, শান্তি নাই। এই নূতন গৃহপ্রবেশোপলক্ষে কত আয়োজন উপকরণ সংঘটিত হইবে, কিন্তু তাঁহাকে না পাইলে এ যজ্ঞ অঙ্গহীন রহিয়া যাইবে। সুমধুর পান ভোজনে অন্তরের পিপাসা চরিতার্থ হয় না, সেই জন্য আজ বৈদিক সূক্তে তাঁহার মহিমা গীত হইতেছে।

নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া নগর গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে অন্য নদীর আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইলেও যেমন তাহার সাগরের পিপাসা শান্তি হয় না, তেমনই সেই ভূমা পরমেশ্বর তাঁহার সহিত আমাদিগকে এমনই সুযোগে আবদ্ধ করিয়াছেন যে আমরা পৃথিবীর সুখ সৌভাগ্যে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া সুখী হইতে পারি না। সংসার তাঁহার অভাব মিটাইতে সক্ষম হয় না। শিশু যেমন কোন অকিঞ্চিৎকর বস্তু লাভ করিয়া হৃষ্টমনে ঊর্দ্ধশ্বাসে মাতার নিকট গমন করিয়া সে আমোদ ব্যক্ত করিয়া সুস্থির হয়, বিশ্বজননি! আমরা তেমনি সাংসারিক নূতন সুখ সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হইয়া তোমাকে না ডাকিয়া আর কোন্ প্রাণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি? তোমার করুণাচ্ছটা জগৎময় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। যে তোমাকে দেখে না, চাহে না, তাহাকেও তুমি করুণা বিতরণ করিতেছ। আমাদের এ ক্ষুদ্র জীবন তোমার অপার করুণা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না।

বিশ্বপিতা! তোমার এই পবিত্র সন্তান তোমার আদেশে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে, আজ নবতর সম্পদসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ইহার মধ্যে তোমার করুণাপ্রদ হস্ত ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হইয়া নূতন সম্পদে বিভূষিত না করিলে ইহাঁর কি সাধ্য যে আপনার জন্য কিছু করিতে পারেন। তাই আজ তোমার এ ন্যায্য অধিকার তোমাকে প্রদান করিয়া আপ্তকাম হইবার জন্য তোমাকে সকাতরে আহ্বান করিতেছেন। তুমি কৃপা করিয়া এই পবিত্র স্থানে পবিত্র পরিবারের মধ্যে তোমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত কর। তোমার বিমল জ্যোতিতে অন্তঃপুর জ্যোতিষ্মান্ কর। তোমার চরণ ছায়ায় এ পবিত্র পরিবারকে স্থান দাও। সকল প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ এ পরিবার হইতে অপসারিত করিয়া দাও। সকল প্রকার বিঘ্ন ও পরিতাপের মধ্যে ইহাঁদিগকে অভয়দান কর। এ নূতন গৃহের অমঙ্গল অশান্তি বিদূরিত করিয়া দিয়া গৃহদেবতা রূপে চিরকাল বিরাজমান থাক। যাহাতে তোমার ভক্ত সন্তান সন্ততি অপরাজিত হৃদয়ে তোমাকে চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, প্রতি দিবস তোমার নিত্য পূজা সমাপন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, তুমি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে এ আশীর্ব্বাদ কর। তোমার নিকট জোড় করে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

[illegible]-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

([illegible] পত্রিকায় জ্ঞানতত্ত্বের তৃতীয় [illegible] দেখ—তাহার অব্যবহিত পরেই নিম্নে দ্রষ্টব্য)

গ্রীক দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবস্থিত ভাব ও তত্ত্বজ্ঞানের তিনটি ফাঁড়া ॥ ৭ ॥

আমরা বলিতেছি বটে যে, গ্রীক দেশীয় তত্ত্বজ্ঞেরা কেবল অস্তিত্বের প্রকৃতি বিষয়েই আন্দোলন করিয়াছিলেন, জ্ঞানের প্রকৃতি বিষয়ে নহে; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, তাঁহারা অস্তিত্বের অনুসন্ধানকে সর্ব্বাগ্রে শ্রেয় বিবেচনা করিয়া জানিয়া শুনিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অথবা আর কোন দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ না করিয়া শুদ্ধ কেবল তাহাতেই লাগিয়াছিলেন। তখনকার কালে, জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং অস্তিত্বের অনুসন্ধান, এ দুয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্টরূপে অবধারিত হয় নাই, এমন কি আজ পর্য্যন্তও, তাহা পরিষ্কার রূপে নির্ব্বাচিত ও স্থিররূপে অবধারিত হয় নাই। অতএব ঐ সকল তত্ত্বজ্ঞেরা একেবারেই যে, জ্ঞানের প্রকৃতি এবং নিয়ম সকলকে তাঁহাদের বিবেচনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। তাঁহাদের অনুশীলিত অস্তি-তত্ত্বের আবরণ ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে একপ্রকার অসম্বদ্ধ জ্ঞান-তত্ত্ব পৃথিবীর আদিম স্তরের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে; অস্তিত্ব-বিষয়ক আনুমানিক সিদ্ধান্ত-সকল জ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গ দ্বারা পরিকীর্ণ রহিয়াছে। তাঁহারা জ্ঞান এবং অস্তিত্ব দুয়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন;—তাঁহাদের জিজ্ঞাসা শুধু কেবল এ নয় যে, বস্তু-সকল কেমন করিয়া আছে—কি প্রকারে আছে—তাহারা কি—কিসের উপর তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে? তা ছাড়া, কেমন করিয়া তাহারা জ্ঞাত হয়, তাহাদের বিষয় আমরা কি জানি—কি ভাবি, কিরূপে তাহাদের জ্ঞান সিদ্ধ হয়, এই আর এক রকমের প্রশ্নও তাঁহারা উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের অপক্ব সৃষ্টি-তত্ত্ব—যাহা অস্তিত্ব-বিষয়ক—তাহা স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া ভিতর হইতে জ্ঞানতত্ত্বের আভাস উদ্গীরণ করে, শেষোক্ত তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তাধীন ইহা বলা বাহুল্য। এই অন্ধকারে বিচরণ—অস্তিত্ব হইতে জ্ঞানে এবং জ্ঞান হইতে অস্তিত্বে ঘুরিয়া বেড়ানো—ইহাই গ্রীক দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান-অভিব্যক্তির প্রধান রহস্য। এই ব্যাপারটির প্রভাবে জ্ঞানের প্রক্রিয়া-সকল এরূপ এক বিষম নাগ-পাশে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার জটা ছাড়ানো দুষ্কর। তত্ত্বজ্ঞানের তিনটি গ্রহ-পরিবর্ত্তনের সময়;—প্রথম, যখন জ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্ন (অর্থাৎ কি আমরা জানি এই প্রশ্ন) মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বে অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের (অর্থাৎ কি আছে এই প্রশ্নের) মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়; দ্বিতীয়, যখন বিমিশ্র পদ্ধতি অনুসারে অস্তিত্ব এবং জ্ঞান এক সঙ্গে এবং অভেদে অনুশীলিত হয়; তৃতীয়, যখন জ্ঞানের প্রকৃতি পর্য্যালোচিত হয় ও কি আছে না আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে কি আমরা জানি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত এবং মীমাংসিত হয়। প্রথম কালটিতে ভ্রমের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; যেহেতু তখনকার পদ্ধতি একেবারেই বিপরীত; তৎকালে যাহা প্রথমে বিবেচ্য তাহা চরমে নিক্ষিপ্ত হয়, যাহা চরমে বিবেচ্য তাহা প্রথমে আনীত হয়। এই জ্ঞানটিতে দার্শনিক আলোচনার অত্যন্ত হীনাবস্থা। দ্বিতীয় কালটিতে তত্ত্ব-সংকরের ভাব (অর্থাৎ অব্যবস্থিত ভাব—দুই নৌকায় পদার্পণের ভাব—গোলমালের ভাব) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কারণ দুই বিপরীত প্রণালী (অগ্র পশ্চাৎ ক্রমে নহে কিন্তু) এক সঙ্গে প্রয়োগ করা ঘোরতর বিশৃঙ্খলার মূল। কিন্তু এ স্থানটিতে ভ্রমের অংশ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প, কেননা অস্তি-তত্ত্বকে দূরে রাখিয়া জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন যাহা পরে আসিতেছে—এই খানে তাহার পথ উন্মুক্ত হইবার উপক্রম হয়। অনুশীলন-পদ্ধতি ক্রমে শোধিত হইয়া আসিতেছে—তত্ত্বজ্ঞান আপনার অধিকার সমর্থন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু তৃতীয় কালেই কেবল আকাঙ্ক্ষিত আলোকের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে; এইখানেই যে পর্য্যন্ত না "কি আমরা জানি" তাহা পরিষ্কার রূপে অবধারিত হয়, সে পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বিষয়ক কোন কথাতেই কর্ণ-পাত করা হয় না। এইখানেই তত্ত্বজ্ঞান স্বীয় মহিমায় বিরাজমান।

প্লেটো দ্বিতীয় কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥৮॥

প্লেটোর লিখিত গ্রন্থে দ্বিতীয় কালের চিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানীর হস্তে সামান্য-বিশেষের বিচার একটা মিশ্র অনুসন্ধানের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—কি আছে এবং কি আমরা জানি এই দুই প্রশ্ন তিনি এক চোটে মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শুদ্ধ কেবল সত্তাগত সামান্য বিশেষে তাঁহার অনুসন্ধান আবদ্ধ ছিল না; তিনি জ্ঞানগত সামান্য-বিশেষের সহিত উহাকে এক সঙ্গে জড়াইয়া উভয়কেই এক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্তকে (অর্থাৎ সত্তাগত সামান্য বিশেষকে) তিনি ঐন্দ্রিয়ক এবং শেষোক্তকে বৌদ্ধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে অনুসন্ধানের দুইটি বিভিন্ন ধারা জটা পাকাইয়া পাশাপাশি চলিতে থাকিল। ফলে প্লেটোর তত্ত্বজ্ঞানের ভিতর সরল-ভা[illegible] দেখিলে তাহার সার [illegible] মান হয় যে, অস্তি ([illegible]গত) এবং ভাতি (অর্থাৎ [illegible]গত) দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। সত্তাগত সামান্য বিশেষ এবং জ্ঞানগত সামান্য বিশেষ উভয়কেই প্লেটো তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

সত্তা এবং জ্ঞানের অভেদ শুদ্ধ কেবল অনুমান করিলে চলিবে না—প্রমাণ করা চাই ॥৯॥

সত্তা এবং জ্ঞানের অভেদ-ভাব তত্ত্বজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই,—তত্ত্বজ্ঞানের উহা অত্যাশ্চর্য্য পরম মহোপদেশ। ঐটি সমর্থন করিবার জন্যই তাহার সমস্ত যত্ন, এবং ঐটিই তাহার সমস্ত উপদেশের চরম তাৎপর্য্য; উহার প্রমাণ-প্রাপ্তির নামই সত্যে উপনীত হওয়া। কিন্তু সত্তা এবং জ্ঞানের অভেদ—অস্তি এবং ভাতির তাদাত্ম্য—আগে ভাগে মানিয়া লইলে চলিবে না,—শুদ্ধ কেবল অনুমান-মাত্রে জ্ঞান তৃপ্ত হইতে পারে না। ঐ সত্যটিকে প্রমাণ করা চাই। আর, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রে উহার প্রমাণ পদ্ধতি অতীব একটি সূক্ষ্ম এবং সুবিস্তীর্ণ প্রক্রিয়া। ব্যাপারটি সামান্য নহে; উহা সেই সমগ্র যুক্তি-শৃঙ্খলা—যাহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত-পরম্পরা ক্রমে বিন্যস্ত করা বর্ত্তমান সংহিতার সার সংকল্প। জ্ঞানের ভিত্তি-মূলের অবধারণ ব্যতিরেকে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া নিতান্তই অসাধ্য ব্যাপার। আর, যতক্ষণ না সেই ভিত্তিমূলটি অবধারিত হয়, ততক্ষণ অস্তিত্ব-বিষয়ক কোন কিছুতে আদবে হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয়।

প্লেটোর ভ্রমতা ॥১০॥

এইখানেই প্লেটো আছাড় খাইলেন।

[illegible] অভেদ প্রমাণ না করিয়া [illegible] লইলেন। মানিয়া [illegible]—তাহার জন্য প্লেটোর [illegible]ক হয় না। এখানে প্রমাণ প্রয়োজনই এক মা আবশ্যক; কারণ, যুক্তিহীন সত্য যদিচ স্থল-বিশেষে মনুষ্যের কাজে না লাগে এমন নয়, তথাপি ওরূপ সত্যের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের আদবেই কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্লেটো যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার পদ্ধতি অপদ্ধতি-বিশেষ, তাহা প্রমাণ-প্রয়োগের পথ রাখে নাই। কারণ, দুইটি পৃথক্ বিষয় যাহা তিনি এক সঙ্গে মিশাইয়াছেন তাহাদের পৃথক্ বিবেচনার উপরেই এখানকার প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে। এই জন্য তাঁহার চরম সিদ্ধান্ত যতই সত্য হউক্ না কেন, তাহা অযৌক্তিক। আর, ঐ কারণেই তাঁহার সমস্ত তত্ত্বালোচনা এত জটিল এবং বিভ্রান্তি-জনক। তাঁহার অস্তিতত্ত্বের সহিত জ্ঞানতত্ত্ব এরূপ জটা পাকাইয়া রহিয়াছে যে, তিনি নিজে উভয়ের ভেদ-নিরূপণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। অন্ততঃ তাঁহার ভাষ্যকারেরা দুয়ের ভেদাভেদের কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই।

প্লেটোর গুণ ॥১১॥

প্লেটোর লেখা যদিচ অব্যবস্থিত এবং গোলমেলে কিন্তু তাঁহার ভাবের ঔদার্য্য এবং মহত্ত্ব কিছুতেই ঢাকা থাকিবার নহে। সমুদ্র যেমন স্বীয় কূলের সমস্ত পাকচক্রের সহিত লিপ্ত, সেইরূপ তাঁহার আজ্ঞাবহ প্রতিভা সার্ব্বভৌমিক সত্যের সহিত ক্রমাগত যোগ-যুক্ত হইয়া চলিয়াছে। তাঁহার কল্লোলকারী ওষ্ঠযুগল চিন্তার কোন কূল-প্রদেশকেই অসংস্পৃষ্ট রাখে নাই। গভীর এবং অগভীর সকলের উপর দিয়াই তিনি প্রশস্ত অমায়িক এবং নিরাকুল ভাবে সমান চলিয়া গিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত এ কথা খাটে যে, প্লেটোর প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ও প্লেটোকে ভুল বোঝাই তত্ত্ব-বিভ্রান্তি। প্লেটোর প্রবর্ত্তিত সামান্য-বিশেষের প্রশ্নান্দোলন হইতেই আলেকজান্দ্রীয় পরতত্ত্ববাদীদিগের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান ও মধ্যযাব্দীয় দার্শনিকদিগের সমস্ত তর্ক-কোলাহল উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারই চতুর্দ্দিকে, সমস্ত নব্য দার্শনিক আলোচনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই বৃহৎ ব্যাপারটিতে মনোবিজ্ঞানও আপনার ক্ষুদ্র হস্ত সমর্পণ করিয়াছে ও মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, সে তাহার বিচার নিষ্পত্তি যতদূর করিবার তাহা করিয়া চুকিয়াছে—কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। কিন্তু এখনো তর্ক-বিতর্কের চক্র অন্ধকারে বিঘূর্ণিত হইতেছে, এখনও পর্য্যন্ত কাহারো প্রদত্ত কোন ব্যাখ্যা পলায়নোদ্যত সত্যের গতিরোধ করিতে অথবা অন্ধকার অপসারণ করিতে পারিয়া উঠিতেছে না। সত্তাবাদ (Realism), সংজ্ঞাবাদ (Nominalism), ভাববাদ (Conceptualism) *, সকলকেই একে একে

* ইউরোপের মধ্যযাব্দীয় দার্শনিকেরা ঐ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। গো শব্দে সাদা কালো সকল প্রকারেরই গরু বুঝায়—গো শব্দের অর্থ সাদা গরুও নহে কালো গরুও নহে—তবে কি? না শুদ্ধ কেবল গরুমাত্র। শৃঙ্গাদি অবয়ব যাহা সকল গরুর সাধারণ লক্ষণ গো শব্দে তাহাই কেবল সূচিত হয়—ধবল কৃষ্ণাদি বর্ণ যাহা বিশেষ বিশেষ গরুর বিশেষ বিশেষ লক্ষণ তাহা সূচিত হয় না। কিন্তু গরু প্রত্যক্ষ করিবার সময় আমরা শুদ্ধ কেবল তাহার জাতি-সাধারণ শৃঙ্গাদি লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াই ক্ষান্ত থাকি না, তাহার সঙ্গে তাহার কৃষ্ণবর্ণাদি ব্যক্তিগত লক্ষণও প্রত্যক্ষ করি। এখন কথা এই যে জাতিবাচক গরু (এক কথায় গোত্ব) না কালো গরু—না সাদা গরু—না কপিল গরু, তাহা সাধারণ গরু মাত্র, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষের গোচর নহে; তবে কি তাহার বাস্তবিক সত্তা নাই? যদি বল যে, তাহার বাস্তবিক সত্তা আছে তবে তুমি সত্তাবাদী; যদি বল যে, তাহার সত্তা বাস্তবিক নহে—শুদ্ধ কেবল মানসিক-মাত্র, তাহা মনের ভাব-মাত্র, তবে তুমি ভাব-বাদী। যদি বল সাধারণ গরু মনে কল্পনা করাও অসম্ভব—বিশেষ বিশেষ বর্ণ-বিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ আকৃতি-বিশিষ্ট গরুই

পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে—সকলেরই গোড়ায় গলদ্। এই সকল হাতুড়ে চিকিৎসা রোগ প্রতীকারের কিছুই করিতে পারিতেছে না। বিবাদের প্রকৃত মর্ম্মস্থানটি—গোলোযোগের মূলটি যে, কোনখানে, তাহা কেহই জানে না। রোগের মূল এবং তাহার ঔষধ, প্রশ্নটির তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নূতন অধ্যবসায় সহকারে মৃত্তিকা খনন করিয়া বাহির করা আবশ্যক।

গোড়ায় একটি গোলোযোগ ॥ ১২ ॥

গোড়াতেই একটি গোলোযোগ উপস্থিত হইতেছে। কি জ্ঞান-গত সামান্য-বিশেষ, কি সত্তা-গত সামান্য-বিশেষ, কোন প্রকার সামান্য-বিশেষের সম্বন্ধেই প্লেটো আপনার মত স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন নাই। প্লেটো যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে; প্রথমতঃ, এরূপ অর্থ হইতে পারে যে প্রত্যেক জ্ঞানই সামান্য এবং বিশেষ উভয় লক্ষণাক্রান্ত, অথবা যাহা একই কথা—জ্ঞান মাত্রেরই এরূপ একটি অবয়ব আছে যাহা সকল জ্ঞানেরই সাধারণ ধর্ম্ম, ও তদ্ভিন্ন এরূপ আর-একটি অবয়ব আছে যাহা সেই জ্ঞানটির বিশেষ ধর্ম্ম; ইহাই আমাদের এই তৃতীয় সিদ্ধান্তের মন্তব্য কথা। দ্বিতীয়তঃ, উহার অর্থ এরূপ হইতে পারে যে প্রত্যেক জ্ঞানই—হয় বিশেষ জ্ঞান—নয় সামান্য জ্ঞান, অথবা যাহা একই কথা কোন জ্ঞান এরূপ যে, তাহাতে কেবল জ্ঞানের বিশেষ অবয়বটিই আছে, আবার, কোন জ্ঞান এরূপ যে তাহাতে কেবল জ্ঞানের সাধারণ অবয়বটিই আছে; ইহাতে এইরূপ দাঁড়ায় যে, [illegible] জ্ঞানের সর্ব্বাংশ।

গোলমালের [illegible]

সত্তা সম্বন্ধেও [illegible] সূচক। প্রথমতঃ তাহার [illegible] হইতে পারে যে, প্রত্যেক সত্তারই এরূপ একটি অবয়ব আছে যাহা সকল সত্তার সাধারণ ধর্ম্ম, ও তদ্ভিন্ন এরূপ আর একটি অবয়ব আছে যাহা সেই সত্তাটির বিশেষ ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ, তাহার এরূপ অর্থ হইতে পারে যে, কোন কোন সত্তা কেবল মাত্র সাধারণ সত্তা ও কোন কোন সত্তা কেবল-মাত্র বিশেষ সত্তা।

গোলমালের উদাহরণ ॥১৪॥

অথবা প্রশ্নটি এইরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে;—প্লেটোর কৃত জ্ঞান এবং সত্তার অবয়ব-ভেদ কিরূপ? তাহা কি স্বগত ভেদ (যেমন একই জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম্ম এবং বিশেষ ধর্ম্ম এই দুয়ের ভেদ) অথবা স্বজাতীয় ভেদ (যেমন বিশেষ-জাতীয় জ্ঞান এবং সামান্য-জাতীয় জ্ঞান এই দুয়ের ভেদ)। ইহা স্পষ্ট যে, স্বগত এবং স্বজাতীয় এই দুই প্রকার ভেদ পরস্পর বিভিন্ন, আর, উভয়ের কোন্‌টির প্রতি লক্ষ্য করা হইতেছে ইহা যে-পর্য্যন্ত না আমরা অবগত হই, সে পর্য্যন্ত আমরা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া অথবা দুইকে এক সঙ্গে জড়াইয়া তুমুল বিভ্রান্তিতে আটক পড়িয়া যাই—এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। ইহার উদাহরণ:—দধির মৌলিক উপাদান দুগ্ধ এবং অম্ল; এই দুই উপাদানের প্রত্যেককে যদি আমরা দধি বলিয়া নির্দ্দেশ করি,—দুগ্ধ একজাতীয় দধি ও অম্ল আর এক জাতীয় দধি এইরূপ সিদ্ধান্ত করি, তবে আমরা কত না গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হই? আবার আমরা যদি দধিকে তরল এবং শুষ্ক এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ঐ দুই বি-

---

কল্পনার গোচর, সুতরাং সাধারণ গরু (গোত্ব) শুদ্ধ কেবল একটা নাম—তাহা সংজ্ঞা মাত্র, তবে তুমি সংজ্ঞাবাদী। এই তিন পক্ষের মধ্যে কাহার কিরূপ সত্যাসত্য তাহা বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের শেষভাগে নির্ণীত হইয়াছে। সং

...ধিকে ...ধির দুইটি মৌলিক ...করি, তাহাই বা কি ...এবং চেতন এই ...হইতে পারে; কিন্তু ...যদি আমরা জাতি-ভেদ বলিয়া গ্রহণ করি, তবে আমরা কত না ভ্রমে পতিত হই? কেননা তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, এক জাতীয় জীব প্রাণ-বিশিষ্ট কিন্তু চেতন-বিশিষ্ট নহে, ও আর-এক জাতীয় জীব চেতন বিশিষ্ট কিন্তু প্রাণ-বিশিষ্ট নহে। প্রাণ এবং চেতনের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা জীবের স্বগত ভেদ বলিয়াই অবগন্তব্য। অপিচ মনুষ্যের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ স্বগত ভেদ নহে, ইহা স্বজাতীয় ভেদ; ইহাকে স্বগত ভেদ বলিয়া গ্রহণ করিলে বিষম দুর্বি-পাকে পড়িতে হয়।

প্লেটোর কৃত সামান্য বিশেষের ভেদ স্বগত ভেদ কিম্বা স্বজাতীয় ভেদ? ॥১৫॥

জ্ঞানের এবং অস্তিত্বের ভেদ নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও ঐরূপ। এ কথা স্বতন্ত্র যে, প্রত্যেক জ্ঞান ও প্রত্যেক সত্তা সামান্য এবং বিশেষ এই দুই অবয়বের সঙ্ঘাত, আর, এ কথা স্বতন্ত্র যে, প্রত্যেক জ্ঞান—হয় বিশেষ জ্ঞান—নয় সামান্য জ্ঞান, প্রত্যেক সত্তা হয় বিশেষ সত্তা নয় সামান্য সত্তা। এই দুইরূপ কথা যদিচ শুনিতে প্রায় একইরূপ, সুতরাং হঠাৎ এটা বলিতে ওটা বুঝাইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ও-দুই কথা সমান হওয়া দূরে থাকুক্—একটি আরেকটির সাক্ষাৎ বিরোধী। কারণ, সামান্য-বিশেষের ভেদ যদি স্বগত ভেদ হয়—যদি এরূপ হয় যে প্রত্যেক জ্ঞান এবং প্রত্যেক সত্তা এক দিকে যেমন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত আর এক দিকে তেমনি সামান্য লক্ষণাক্রান্ত, তাহা হইলে আর এরূপ হইতে পারে না যে, এক জাতীয় জ্ঞান বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত—আর এক জাতীয় জ্ঞান সামান্য লক্ষণাক্রান্ত, অথবা একজাতীয় সত্তা বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত—আর এক জাতীয় সত্তা সামান্য লক্ষণাক্রান্ত। দধির অম্ল উপাদানকে কিংবা দুগ্ধ উপাদা-নকে দধি বলাও যা, আর, জ্ঞানের অথবা সত্তার কোন মৌলিক উপাদানকে জ্ঞান অথবা সত্তা বলাও তা; ওরূপ বলিলে স্বগত ভেদকে স্বজাতীয় ভেদ করিয়া দাঁড় করানো হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, স্বগত এবং স্বজাতীয় এই দুই প্রকার ভেদ শুধু যে কেবল পরস্পর হইতে বিভিন্ন তাহা নহে—উভয়ে পরস্পরের সাক্ষাৎ বিরোধী। এক-টিকে স্বীকার করিলে আর একটিকে অস্বী-কার করা হয়। অতএব ঐ দুই প্রকার ভেদের কোন্‌টি প্লেটোর অভিপ্রেত তাহা স্থির করা নিতান্তই আবশ্যক। প্লেটো যাব-তীয় জ্ঞানকে সামান্য এবং বিশেষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—এটা সুনিশ্চিত; সন্দেহের বিষয় কেবল এইটি যে, জ্ঞানের ঐ যে ভেদ উহা কি প্রকার ভেদ—স্বগত ভেদ না স্বজাতীয় ভেদ? যুগপৎ দুইই হইতে পারে না, যেহেতু একটি আরেকটির বিরোধী। সত্তা সম্বন্ধেও সামান্য বিশে-ষের ভেদ তিনি ঐরূপ সংশয়ের মুখে নি-ক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইলে উহার একটি স্থির সিদ্ধান্ত আবশ্যক।

নূতন পুস্তক।

বৈষয়িক তত্ত্ব। ২ ভাগ ১ সংখ্যা। ইহা একখানি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন উপযোগী নানা বিষয়ক ত্রৈমাসিক সমা-লোচন পত্র। তাহেরপুর হইতে প্রকাশিত। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা আসিয়া এ দেশে যেরূপ সমাজবিপ্লব ঘটাইতেছে তাহা

অতিশয় শোচনীয়। যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা ব্যথিত হৃদয়ে ইহার আলোচনা করিয়া থাকেন। এই পত্রের "দেশী ও বিলাতী আচার ব্যবহার" এই শিরস্ক প্রস্তাবটী তাহার জীবন্ত প্রমাণ। লেখক স্বদেশ ও বিদেশের বাসরীতি ভোজন স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি যে সকল বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ অনুসন্ধান করিয়া যেরূপে এ দেশের আবহমান কাল প্রচলিত প্রথা সমর্থন করিতেছেন তাহা এ দেশীয় ইংরাজী মোহান্ধ স্ত্রী পুরুষদিগের জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কাজ করিবে এই আশয়ে আমরা ঐ সুদীর্ঘ প্রস্তাবটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাঁহারা এখন ইংরাজদের দৃষ্টান্তে বাস ভোজন একান্নবর্ত্তি পরিবার প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন ও স্ত্রীস্বাধীনতার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতেছেন তাঁহারা যে ইংরাজী সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বৈষয়িক তত্ত্বের এই প্রস্তাবটী পাঠ করিলে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক এই মোহান্ধদিগের জন্য এই অঞ্জনশলাকার ব্যবস্থা করিয়া জনসমাজের বাস্তবিক একটী মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন এজন্য তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিলাম।

দেশী ও বিলাতী আচার ব্যবহার।

মানুষ পরিবর্ত্তন-প্রিয়। চিরকাল একভাবে অবস্থিত থাকিতে মানুষ অভ্যস্ত নহে। মানুষের চিরদিন সমান অবস্থায় যায় না। তুমি যখন বালক ছিলে, ধুলা মাটি পুতুলে তোমার আসক্তি ছিল, ক্রীড়া-সঙ্গিগণের প্রতি তোমার অনুরক্তি ছিল, রাঙ্গা কাপড়ে তোমার প্রীতি ছিল। যৌবনে ক্রীড়া-পুত্তলি তুচ্ছ বোধ হইল, নূতন নূতন বেশভূষা তাহার স্থান অধিকার করিল। ক্রীড়া-সঙ্গীর পরিবর্ত্তে ক্রীড়া-রঙ্গিণী তরুণীভার্য্যা আসিয়া হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। রাঙ্গা কাপড় অপেক্ষা রৌপ্য মুদ্রাই অধিক আদরের সামগ্রী হইল। আবার বার্দ্ধক্যে এ সকলের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া, আর এক মূর্ত্তি তুমি ধারণ করিবে।

যেমন তোমার এ[illegible] কথা [illegible] মানবজাতি বিশেষের [illegible] অবস্থায় ধনুর্ব্বাণ, মৃগ[illegible] মানবজাতির অধিক [illegible] উন্নত অবস্থায় জ্ঞান বি[illegible] বিষয়ের অনুশীলনে অধিক [illegible]র। মানবজাতির পরিণত অবস্থায় ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাই প্রবল হয়।

অবস্থার ক্রমিক পরিবর্ত্তনই যখন মানুষের জীবন্ত ভাবের প্রধান লক্ষণ, সে স্থলে বর্ত্তমান সময়ের নবীন যুবকগণ দেশী প্রাচীন আচার ব্যবহার অপেক্ষা পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের প্রতি অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিলে তুমি ন্যায়তঃ তাহাদিগকে দুষিতে পার না।

পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের পক্ষপাতিতা-জন্য এক্ষণকার শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা কখন [illegible] নহে, [illegible] করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি নাই। [illegible] দেশী ও বিলাতী আচার ব্যবহারের দোষগুণ সমালোচনা করিতে অবশ্য আমরা চেষ্টা করিতে পারি। এই প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়েরই আলোচনা করিতে [illegible]।

দুইটি বিষয়ের নিরপেক্ষ [illegible] উপস্থিত হইলে দুইখানি [illegible] উচিত। নানা কারণে [illegible] সেরূপ নিরপেক্ষ বিচার করিবার আমাদের [illegible] নাই। কিন্তু বিচার দূরে থাকুক কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইলেও তাহার দুইদিকেই দেখা কর্ত্তব্য।

বিলাতের কোটীশ্বর [illegible] রাজা মহারাজদের কথা, অথবা অপরদিকে বিলাতের অশনবসনহীন দুষ্কৃতনিবাসী কৃষক এবং এ দেশের পর্ণকুটিরের দুঃশয্যাশায়ী রাইয়ৎশ্রেণী লোকের কথা ত্যাগ করিয়া উভয় দেশেরই মধ্যশ্রেণী লোকের আচার ব্যবহার চাল চলনের কথা এই প্রস্তাবে আমরা আলোচনা করিব।

বিলাতে যাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় তিনিও একজন মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তি। এ দেশে [illegible]দিগকে লক্ষ্য করিয়া মধ্যশ্রেণী বলা হয়, [illegible] তাঁহাদের কোনরূপ লক্ষণা করা কঠিন; যাঁহার নূতন বার্ষিক পাঁচ শত হইতে দশ হাজার টাকা আয়ের লোককে আমরা মধ্যশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে পারি। এখন বিলাতে যাঁহাদের পাঁচ হাজার টাকা কিম্বা দশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়, কি নিয়মে তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় দেখা যাউক।

...কথার অর্থ অতি প্রশস্ত। বিলাতের ... লোকের সংসার-কার্য্যের ... বিস্তার করিয়া আলোচনা ... প্রয়োজন, বৈষয়িক-তত্ত্বের ... সংখ্যায় সে পরিমাণ স্থান সংগ্রহ ... নহে। একারণ দেশী ও বিলাতী প্রধান ও প্রয়োজনীয় কএকটি বিষয়ের মাত্র আলোচনা এ প্রস্তাবে আমরা করিব। আহার, পরিধান এবং বাস-প্রণালী—প্রধানত এই তিনটি আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

বিলাতে বিশিষ্টলোক ভিন্ন নিজের বাড়ীতে বাস করিতে পারেন এরূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। একারণ বিলাতে অনেকেই হোটেলে বা ভাড়াটে-বাড়ীতে বাস করিতে বাধ্য হয়েন। যার মাস ভাড়া দিয়া অন্যের বাড়ীতে থাকিতে হইলে, সীমাবদ্ধ আয়বান ব্যক্তি, যত অল্প ভাড়ায় অল্প স্থানে বাসের সুবিধা করিয়া লইতে পারেন তাঁহাকে সেই দিকেই চেষ্টা করিতে হয়। বিলাতে বাড়ী দুর্ম্মূল্য। মাসিক এক শত টাকা ভাড়াতেও বিলাতে ভাল বাড়ী পাওয়া যায় না। লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় সহরের কথা ত্যাগ করিয়া পল্লিগ্রামের কথা ধরিলেও, তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ, একটি স্নানাগার এবং রন্ধনশালাযুক্ত সামান্য বাড়ীও মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় পাওয়া কঠিন। যাঁহার বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়, বাড়ী ভাড়ার জন্য বৎসরে ছয় শত টাকা ব্যয় করিতে হইলেও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। বিলাতে যাঁহার পাঁচ হাজার টাকা আয় অন্ততঃ এক হাজার টাকা অর্থাৎ আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ কেবল এক বাড়ী ভাড়ার জন্যই তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয়। তবুও এ ভাড়াতেও ভাল বড় বাড়ী পাওয়া যায় না।

কেবল দুর্ম্মূল্য বলিয়া নহে, বড় বাড়ীর আরও অনেক অসুবিধা আছে। বাড়ী বড় হইলে, বাড়ীর উপযুক্ত চাকরও অধিক সংখ্যায় রাখিতে হয়। বড় বাড়ী হইলে তাহার গৃহসজ্জাও উপযুক্ত প্রয়োজন। বিলাতে এ দুইয়েতেই টাকার আবশ্যক। বিলাতে সামান্য দাসদাসীরও বেতন অত্যন্ত অধিক। কাজে কাজেই যাঁহার আয় পাঁচ সাত হাজার টাকা তাঁহাকে একটি ছোট খাট বাড়ীতেই অগত্যা সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। যে ক্ষুদ্র বাড়ীতে সর্ব্বসাকল্যে দুইটি কি তিনটি কুঠরী তাহাতে স্ত্রীলোকদের জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ এবং পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট রাখা সম্ভবে না। এ দেশের ন্যায় বিলাতে মধ্যশ্রেণীর লোকে "অন্দর বাহির বাড়ী" পৃথক নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে কেন রাখিতে পারে না, অতঃপর তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা নিষ্প্রয়োজন।

বিলাতে মধ্যশ্রেণীর ভদ্রপরিবারেরা সাধারণতঃ যেরূপ বাটীতে বাস করেন তাহাতে স্ত্রী পুত্র কন্যা একটি দাস বা দাসী এবং স্বয়ং বাটীর কর্ত্তা কোনক্রমে থাকিতে পারেন মাত্র। এরূপ ক্ষুদ্রায়তনের বাড়ীতে বহুপরিবার সহ কাহারও বাস করা সম্ভবে না। হিন্দুদিগের ন্যায় ইংরাজ-সমাজে যে আমরা বহুপরিবারে একত্রে বাসের প্রথা দেখিতে পাই না তাহার একটি কারণ যেমন ইংরাজ সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার স্বাবলম্বন এবং স্ব স্ব সুখ স্বচ্ছন্দানুরাগিতাভাবের আধিক্য, তেমনি মধ্যশ্রেণীর অর্থ অসচ্ছলতাও ইহার আর একটি কারণ। বিলাতে লর্ড, মারকুইস, ডিউক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ঘরে স্ত্রী পরিজনের অবস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ এবং গৃহস্বামী পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ এবং অভ্যাগত ভদ্রদের অভ্যর্থনার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। বোর্ডিয়র, ষ্টাড, ড্র ইংরুম, হল, ডাইনিংরুম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে এই সকল কক্ষ অভিহিত হয়, বিলাতের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারে মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতৃব্যানী, মাতৃস্বসা প্রভৃতির সহিত নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা এক বাটীতে রাখিবার রীতিও স্থল বিশেষে দেখিতে না পাওয়া যায় এরূপ নহে। ফলতঃ গৃহে প্রচুর স্থান এবং অর্থ সচ্ছলতা থাকিলে পরিবারস্থ লোক সংখ্যার আধিক্যে যে আনন্দ আছে সে আনন্দ উপভোগের জন্য বিলাতের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণেরই বা প্রবৃত্তি না জন্মিবে কেন বুঝা যায় না। বিলাতের লর্ড ডিউক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে এ বিষয়ে যেমন আমাদের দেশের রীতিনীতির ন্যায় কতকটা রীতি নীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথা সম্বন্ধেও সাধারণ ইংরাজ-পরিবার হইতে সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারে বিলক্ষণ একটু পার্থক্য আছে। বিলাতে লর্ড ইত্যাদির ঘরে আমাদের দেশের ন্যায় অবরোধ প্রথা আছে একথা আমি বলিতেছি না। তবে এখানে ইংরাজ মহলে সচরাচর যেরূপ স্ত্রীস্বাধীনতার চিত্র আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া থাকে, বিলাতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীস্বাধীনতা যে ঠিক সে ধরণের নহে তাহা আমরা বিশিষ্ট-সূত্রে অবগত আছি। কেবল হিন্দু বা মুসলমান সমাজেই যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে এরূপ নহে—যে জাতির কথাই ধরা যাউক, উচ্চশ্রেণী লোকের পারিবারিক অবস্থার প্রতি যতই দৃষ্টি করা যাইবে, ততই দেখা যাইবে তাঁহাদের

অধো স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্র বাসের দিকেই প্রবৃত্তি অধিক। সমাজের নিম্ন হইতে নিম্নতর শ্রেণীর দিকে যতই দৃষ্টি করা যাইবে ততই দেখা যাইবে স্ত্রীতে পুরুষে "মেশামিশি" ভাবের আধিক্য।

বিলাতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক স্বামী আপনার স্ত্রীর কক্ষে যাইবার কালেও সকল সময় আপনাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেন না। উপযুক্ত সময় ভিন্ন কার্য্য বশতঃ স্ত্রীর কক্ষে যাইতে হইলেও সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ইংরাজেরা সঙ্কুচিত হয়েন।

স্ত্রী এবং পুরুষ সর্ব্বক্ষণ এক স্থানে এক গৃহে বাস করিলে সর্ব্বক্ষণ পরস্পর পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারা উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত কঠিন, এমন কি অসম্ভব হইয়া উঠে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সঙ্কোচ এবং সম্ভ্রমের অভাব হইলে যে বিকট বীভৎস পশুভাবের ক্রমে প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে, সে পশুভাব ইংরাজেরাও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করেন। আচার ব্যবহার আহার বিহার বাসের দোষে ইংরাজ সমাজের নিম্নশ্রেণীতে এই বীভৎস পশুভাবের দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া অনেক সুশিক্ষিত ইংরাজ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এইরূপ নিম্ন শ্রেণীর যে সকল সাহেব ও ফিরিঙ্গি বাস করিতেছেন তাঁহাদের অধঃপতিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর আঃ সেক্রেটারী মিঃ টমাস্ ম্যাগুরি আক্ষেপ করিয়া কএকটি সুন্দর সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন * প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী এবং পুরুষজাতির মধ্যে পরস্পরের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বাসের উপায় বিধান করাই সঙ্গত। বিলা[illegible] শ্রেণীর ভদ্রগণ অর্থ-সংকীর্ণতা কারণেই [illegible] পুরুষে সন্তান সন্ততি সহ দিবারাত্রি [illegible] বাধ্য হয়েন। উহার কুফল এবং [illegible] জানিয়াও নিরুপায় হইয়া তাঁ[illegible] একত্রে অবস্থিতি করিতে [illegible] বাসোপযুক্ত স্থানের এবং বাড়ীর অপ্রতুল না থাকা সত্ত্বেও যদি এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ পৈতৃক বসতবাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চিরাগত "অন্দর বাহির বাড়ী" প্রথা সমূলে উৎপাটন করিয়া, বিলাতী রীতি নীতির অনুকরণের উদ্দেশ্যেই কেবল সাহেবি ধরণে স্ত্রী লইয়া "বাঙ্গালায়" বা বৈঠকখানা ঘরে বাস করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহাদের সে বিবেচনাকে সদ্বিবেচনা বা সে রুচিকে প্রশংসনীয় রুচি বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কেন আমরা এ প্রথার প্রশংসা করিতে পারি না তাহা ম্যাগুরি সাহেবের মন্তব্য-লিপি হইতেই পাঠক বুঝিতে পারেন—পাছে ঘৃণাকর বিষয়ের অধিক আলোচনায় পাঠকের চিত্তের অসুখ জন্মে তাই ম্যাগুরি সাহেবের ন্যায় আমরাও ইঙ্গিতে কেবল এই অমঙ্গলের ও অসুবিধার উল্লেখ মাত্র করিলাম। কিন্তু ইহা ভিন্ন বিলাতের মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণী লোকের স্ত্রী পুরুষে একত্রে বাসপ্রণালীর প্রতিকূলে আরও অনেক কথা বলিবার আছে—বিলাতি ধরণে কি বাড়ী প্রস্তুত কি বাস করা এ দরিদ্রদেশের লোকের পক্ষে যে কোন দিক দিয়াই সুবিধাজনক নহে তাহাও অনেক অকাট্য যুক্তি মূলেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আপাততঃ একটি সামান্য কথা ভাবিয়া দেখিলেও বিলাতী রীতি নীতিতে এদেশে বাড়ী প্রস্তুত বা বাস করা যে সুবিধাজনক নহে ইহা উপলব্ধি হইবে। বিলাতে মধ্যশ্রেণীর ভদ্রগণ যে প্রকারের বাড়ীতে যে প্রণালীতে পরিবার সহ বাস করেন তাহাতে তাঁহাদিগকে যেরূপ গুরুব্যয়ভার বহন করিতে হয়, এবং এদেশে সাবেক রীতি নীতিতে বাস করিতে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যে পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় এ দুইটিতে তুলন করিয়া দেখিলেও বুঝা যাইতে পারে যে, আমাদের এক্ষণে কোন পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য? এই বিষয়টি সুন্দররূপে পাঠকগণকে বুঝাইবার জন্য কেবল তাক মূলক যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া নিম্নে আমরা বিলাতের এবং এদেশের মধ্যশ্রেণীর ভদ্রপরিবারের সাংসারিক ব্যয়ের দুইটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। এদেশে যাঁহার বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়, দেশী চালচলনে থাকিতে হইলে

* "Occupying one of the partitioned rooms are, say, a father and mother, with, again, say, four, six, eight, or so many children, of ages varying from the young man and woman of sixteen to the child of a year or the infant of a month. Let it be remembered that the age of puberty is attained here earlier than in more temperate Climates, and that a precocity exists in this country which creates an evil at which I will do no more than hint; that this habitation is surrounded by others similarly occupied; that no segregation exists between the sexes; that they are blind to all feelings of morality; that their every sense of shame is blunted, and let any one imagine the natural and inevitable consequences of such a state of things."—(Destitute European in Calcutta, Page 6.)

তাহার কি পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন এবং বিলাতে [illegible] বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট লোক [illegible] ভাবে একটি বাড়ীতে বাস করিতে, [illegible] পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন, এ দুইটী [illegible] দিতেছি। প্রথমতঃ এইরূপ দুই গৃহস্থের [illegible] এবং সংসারের সাজসরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিতে কি পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা যাউক।

এদেশে মধ্যশ্রেণীর ভদ্র পরিবারের বাসোপযোগী গৃহসজ্জা সরঞ্জামাদি সমস্ত নূতন কিনিতে হইলে যে পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন প্রথমতঃ তাহারই তালিকা প্রদত্ত হইল।

* * ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যের মূল্য সমষ্টি ৩২৭।০

বিলাতে মধ্যশ্রেণী ভদ্র পরিবারের প্রয়োজনোপযোগী গৃহসজ্জা সরঞ্জামাদির তালিকা।

* * ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যের মূল্য সমষ্টি ২০১৩৵০

উপরের এই দুইটি তালিকার প্রথমটিতে মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের গৃহকার্য্যে যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন তাহা প্রায় সমস্তই ধরা হইয়াছে। ঐ সকল সামগ্রীর মূল্যও অল্প করিয়া ধরা হয় নাই। দ্বিতীয় তালিকাটি সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এই প্রবন্ধের প্রথমেই আমি পাঠককে বলিয়াছি সাহেবি চালচলন ও রীতিনীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার আমার তাদৃশ সুবিধা নাই। এই কারণে [illegible] তালিকা সংগ্রহ করিতে আমাকে [illegible] সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাঁহার [illegible] এই তালিকা প্রস্তুতের ভার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি এদেশে অল্প দিন আসিয়াছিলেন, তিনি অবিবাহিত [illegible] নিজের আয়ও তাদৃশ অধিক নহে। এই তালিকায় কোন ভ্রমপ্রমাদ বা অসম্পূর্ণতা যদি থাকে এই আশঙ্কা দূর করিবার উদ্দেশে আমার [illegible], কোন প্রাচীন উচ্চপদস্থ সাহেবের নিকটেও আমি ইহা দেখাইয়াছিলাম। তিনি সামান্য দুই একটি ভ্রম সংশোধন করিয়া তালিকাখানি প্রত্যর্পণ করতঃ আমাকে বলিয়াছিলেন যে দ্রব্যের সংখ্যা ঠিক [illegible] মোটের উপর মূল্যের পরিমাণ দ্বিগুণ [illegible] উচিত, যেহেতু "আমার বিলাতি চালচলনপ্রিয় স্বদেশীয় বন্ধুগণ বিলাতের মূল্যে এদেশে বিলাতি জিনিস পাইতে পারিবেন না!" [illegible] তালিকার অধিকাংশ দ্রব্যেরই বিলাতি মূল্য ধরা হইয়াছে। এদেশে আর বিলাতে সাহেবদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। [illegible] মনে না করিয়া তালিকায় যে পরিমাণ মূল্য ধরা হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে বিলাতে একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রের কেবল প্রয়োজনোপযোগী সামান্য দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতেই দুই হাজার টাকার প্রয়োজন।

বিলাতে একজন সামান্য অবস্থাপন্ন ভদ্রযুবক হোটেলে না থাকিয়া নিজে পৃথকভাবে একটি বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলে ঘর গৃহস্থালীর প্রথম সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্যই তাঁহাকে দুই হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে—দুই হাজার টাকা ব্যয় করিলে তবে তিনি ভদ্র সমাজে একরূপ করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন!

যে স্থলে ইংরাজ-সমাজে দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়াও সংসারের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভাল করিয়া সংগ্রহ হয় না, সমস্ত অভাব পূর্ণ হয় না; সেই স্থলে সাড়ে তিনশত টাকা ব্যয় করিলেই বাঙ্গালী ভদ্র লোকের যাহা কিছু প্রয়োজন যদি সমস্তই সুন্দররূপে পাওয়া যায় তবে এ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া বহুব্যয়সাপেক্ষ ইংরাজি চালচলন অনুকরণ করিবার আমাদের আবশ্যক কি?

যদি বল তক্তপোস তাকিয়া অপেক্ষা টেবিল চেয়ার কাঁটা চামচেতে সভ্যতা অধিক আছে। আমি তোমার ভ্রম দেখাইয়া দিতেছি। বিলাতের অতি ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত সাহেবগণ অনেক সময় দেশ পর্য্যটন বা শিকার করিতে বাহির হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের সঙ্গে একটি কি দুইটি পোর্টমেণ্ট ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কোচ টেবিল আলমারি চলে না। তবে কি তখন তাঁহাদিগকে অসভ্য বলিবে?

* * হিন্দুর বাড়ীর "অন্দর বহির্ব্বাটী" প্রথা, স্ত্রীলোকের এবং পুরুষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবার রীতি, এ দেশের বাড়ী প্রস্তুতের প্রণালী এ সকলই যে এ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী এ বিষয়েও সন্দেহের কোন কারণ নাই। স্বদেশানুরাগী ইংরাজজাতি স্বদেশের রীতিনীতি চালচলন সমস্তই ভাল চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তাঁহারা স্বদেশের স্ত্রীপুরুষে একত্রে থাকিবার রীতিতে যে বিশেষ কোন দোষ দেখিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। তথাপি কোন কোন প্রশস্তহৃদয় ইংরাজ, সংসারের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আপন দেশের রীতি অপেক্ষা আমাদের দেশের রীতিনীতিকেই অধিক প্রশংসা করেন; এদেশের একজন প্রধান রাজপুরুষ কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মিঃ জে, এস্, কটন সাহেব তাঁহার ভারত বিখ্যাত "New India" নামক গ্রন্থে এ দেশের "বহু পরিবার একত্রে বাস" বা "[illegible]

ব্যক্তির বাড়ী পৃথক পৃথক থাকার প্রথার” উপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াও সত্যের অনুরোধে স্থানে স্থানে উহার প্রশংসা না করিয়াও থাকিতে পারেন নাই। *

বিলাতে ইংরাজেরা যেরূপ গৃহে যে প্রণালীতে স্ত্রী-পুত্রাদিসহ বাস করেন তাহা অপেক্ষা এ দেশের বাস-প্রণালী যে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, অন্ততঃ এ দেশের পক্ষে যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট এ কথা, এক্ষণে অনেক ইংরাজের মুখে শুনা যায়। ইংরাজ জাতি নিজ মুখে নিজ দেশের রীতি নীতির নিন্দা না করিতে পারেন, কিন্তু এ দেশের শিক্ষিত যুবকগণ মধ্যে যাঁহারা বিলাতের সংবাদপত্র মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, যাঁহারা বিলাতের পার্লিয়ামেন্টের তর্ক বিতর্ক এবং আইন কানুনের তত্ত্ব রাখেন তাঁহারা অবগত আছেন বিলাতের লোক তাঁহাদের স্বদেশের কতকগুলি রীতি নীতির উপর মনে মনে কতই বিরক্ত। অন্য কথা এক্ষণে দূর থাকুক, ইংরাজেরা আপন আপন বাসগৃহের অসুবিধা কতদূরই কঠোররূপে যে অনুভব করিয়া থাকেন গত বর্ষের পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার বিবরণী পাঠ করিলেও তাহা কতক উপলব্ধি হইতে পারে। †

---

* "The domestic life of the Hindoo is indeed in itself not more immoral than that of a European home. Far from it; there is so much misconception on this point that it is desirable to state what the facts actually are. The affection of Hindoos for the various members of the family group is a praise-worthy and distinctive feature of national character, evinced not in sentiment only, but in practical manifestations of enduring charity; the devotion of a parent to a child, and of children to parents, is most touching. The normal social relations of a Hindoo family knit together by ties of affection rigid in chastity, and controlled by the public opinion of neighbouring elders and caste, command our admiration and in many respects afford an example we should do well to follow."

(Page 145, New India, by J. S. Cotton.)

† বিলাতে এই বিষয় লইয়া এই কয়েক বৎসর যাবৎ যে কত আন্দোলন হইয়াছে ইংলণ্ডের ১৮৬৬ সালের Labouring classes' Dwelling-house Act অথবা An act to provide better Dwellings (১৮৬৮) কিম্বা Dwellings Act (১৮৭৫ সালের) অ[illegible]নীর আর আর আইন দেখিলেও কতক [illegible] যাইতে পারে।

বিলাতের বাস-প্রণালীর দোষই এ পর্য্যন্ত আমরা কীর্ত্তন করিলাম। ইহার কতকগুলি গুণও [illegible] কিন্তু গুণ থাকিলেও এদেশে তাহার কি[illegible] নাই—যেহেতু সে সকল গুণের গ্রহণের [illegible]ের নাই। আমাদের দেশের বাস-[illegible] কোন কোন বিষয়ে দোষ এবং অসুবিধা না আছে এরূপ নহে।

বিলাতি ধরণে স্ত্রী পুরুষে একত্রে এক কক্ষে বাস-প্রথার অনুকূলে আমরা মত দিতে পারিলাম না বলিয়াই আমাদের দেশের "অবরোধ" প্রথার আমরা সম্পূর্ণ পক্ষপাতী পাঠক এরূপ বিবেচনা করিবেন না; বিলাতী প্রথার পক্ষপাতী নহি বলিয়াই যে কারাগারের নামান্তর করিয়া "অন্দর" গড়িয়া তাহাতে হিন্দুমহিলাগণকে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখা হউক এ পরামর্শ আমরা দিতে ইচ্ছুক পাঠক এরূপ জ্ঞান করিবেন না।

গৃহলক্ষ্মীকে স্বাধীন বিহঙ্গিনী করিয়া আকাশে উড়াইয়া তাহার নৃত্য দেখাইয়া শত লোকের বাহবা হাততালি আকর্ষণ করাকেও আমরা যেমন জঘন্য কার্য্য বোধ করি, পক্ষান্তরে বিবাহিতা স্ত্রীকে পাখীর ন্যায় মুষ্টিপরিমেয় আহার দিয়া লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখাকেও আমরা ততোধিক দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান করি। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে এমন কুরীতি কুত্রাপি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজেরা, অথবা ইংরাজ অপেক্ষাও দেশের অবস্থা অনভিজ্ঞ সমাজ-সংস্কারকেরা যাহাই বলুন না কেন, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অবরোধপ্রথাকে যাঁহারা শেষোক্ত প্রণালীর কারাগারের সহিত সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, সহরের অবস্থা ভিন্ন এ দেশের পল্লী গ্রামের অবস্থা যে তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য কলিকাতা ঢাকা বা কৃষ্ণনগর লইয়াই সমস্ত বঙ্গদেশ নহে। সহরগুলি সমাজদেহের স্ফোটক মাত্র। সহর দেখিয়া প্রকৃত দেশের অবস্থা অনুমান করিয়া লওয়া বিবেচিত কার্য্য নহে। দেশের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট ইহা অবিদিত নাই যে এ দেশের হিন্দু-সমাজে প্রয়োজনোপযোগী স্ত্রী-স্বাধীনতা বিলক্ষণই আছে।

অবরোধপ্রথা সম্বন্ধে মুসলমানদের অনুকরণ, এ দেশের রাজা, মহারাজ, বড় জমিদার, গবর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বা এক্ষণকার ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজে কিঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া গেলেও সাধারণ হিন্দু-সমাজে—অর্থাৎ পল্লিগ্রামস্থ মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজের যে অবস্থা অন্যরূপ ইহা নিশ্চিত।

ভদ্র পরিবারের স্ত্রীগণের এবং পুরুষগণের বাসের [illegible] স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ বহির্ব্বাটী ও অন্তঃপুর পৃথক [illegible] ভাবে নির্দ্দিষ্ট রাখিবার যে রীতি আমাদের [illegible] পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যে [illegible] জল বায়ু, প্রাকৃতিক অবস্থা, মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যদি তাহাই হয় তবে এবিষয়ে বিলাতি প্রথার অনুকরণ করা অপেক্ষা দেশীয় প্রথাটিই যাহাতে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে তাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

* * বিলাতে যাঁহার বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার টাকা, তাঁহার নিজের, স্ত্রী ও তিনটি সন্তান থাকিলে তাহাদের কেবল আহারাদি ব্যয় নির্ব্বাহ জন্যই বৎসরে অন্যূন দুই হাজার টাকার প্রয়োজন হয়।

এদেশের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে মদ্য মাংসাহারের প্রয়োজন অপ্রয়োজনতার তর্ক না তুলিয়া কেবল ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি করিলেও, এদেশের সংকীর্ণ আয়ের মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে বিলাতি আহার যে কোন প্রকারেই উপযোগী নহে তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইবে। এদেশের অবস্থাতে প্রধান প্রধান ইংরাজ ডাক্তারগণেরও মত এই যে এদেশে যত অল্প মাংসাহার ও মদ্যপান করিয়া থাকা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। বাঙ্গালিদের কথা দূরে থাকুক ইংরাজদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সার রাণাল্ড্ মার্টিন তাঁহার "Tropical Climates" গ্রন্থে বলিয়াছেন "এদেশে নবাগত ইংরাজগণ যেন সাদাসিদে রুটি মাখন চা কাফিতেই সন্তুষ্ট থাকেন। মৎস্য মাংস ডিম্বাদিতে অধিক অনুরক্ত না হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য।*

বিলাতে যাইয়া বঙ্গীয় যুবকগণ বিলাতি আহার্য্য বস্তুতে অনুরক্ত হইলেও তাহা কতক মার্জ্জনীয় হইতে পারে কিন্তু ইংরাজদিগকেই যে স্থলে এদেশে আসিয়া তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ আহার মদ্য মাংসের পরিবর্ত্তে এদেশীয় সাধারণ আহার সামগ্রীতে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, এমন স্থলে এদেশে থাকিয়া দেশীয় যুবকগণ যাঁহারা বিলাতি খাদ্যসামগ্রীতে অনুরক্ত হয়েন তাঁহারা কখনই নিজের শরীরের হিতৈষী নহেন। তাঁহারা জিহ্বার অনুগত সেবক হইতে পারেন, কিন্তু দেহের কর্ত্তব্য পরায়ণ ভৃত্য কখনই নহেন।

ফলতঃ এক্ষণে শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে অনেকেই অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, অম্লপীড়া অক্ষিপীড়া প্রভৃতিতে জড়িত এবং নববয়সে যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন, আহার সম্বন্ধে প্রাচীন নিয়মগুলি লঙ্ঘনই তাহার একটি গুরু কারণ।

* * মাংস।—ইংরাজদিগের প্রধান খাদ্য মাংস। মাংস মধ্যে আবার গো-মাংস শূকর-মাংস ইংরাজদের জিহ্বায় অধিক প্রিয় ও উপাদেয়। বিলাতে এই দুই শ্রেণীর মাংসই সচরাচর সকলের ভোজনের টেবিলে অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। গো-মাংস অত্যন্ত গরম এবং এদেশের উপযোগী নহে এ কথা অনেকের মুখে শুনা যায়, কিন্তু বিলাতেরও উপযোগী কি না দেখা যাউক। গো-মাংস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক রন্ধন শাস্ত্র বিশারদ এলেন জে ডিলেনিয়র তাঁহার কৃত "Wholesome Fare" গ্রন্থে বলেন—

গো-মাংস হয়ত মেষ-মাংসের ন্যায় দেহের পুষ্টিকারক বস্তু কিন্তু সহজে জীর্ণের সামগ্রী এটি কখনই নহে, একারণ ব্যবহার করিতে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।" *

গো-মাংস যে কেবল জীর্ণেই গুরু এরূপ নহে ইহার আরও দোষ আছে। গো-মাংসের মধ্যে এক প্রকার কীট হয়। কোন কোন গরুতে এ কীটগুলি এত বড় হয় যে অণুবীক্ষণ ব্যতিত কেবল খোলাচক্ষুতেও তাহা দেখা যাইতে পারে। এই কীটে গো-মাংসের এরূপ ভাবান্তর করে যে তাহা মানুষের পক্ষে

---

* "The newly-arrived European should content himself with plain breakfast of bread and butter, with Tea and Coffee and avoid indulgence in meat, fish, eggs or butter tost."

ইনি ঐ গ্রন্থেই আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"An old staff officer in Fort William used to say that he had known more duels, court-martial and dismissals, to result from the "tiffen" alone than any other cause."

Sir Ranald Martin's TROPICAL CLIMATES.

* Beef is perhaps the most nutritious of butcher's meat, mutton claiming equality with it in this respect ; but it certainly is not the most digestible, and must therefore be partaken of with considerable caution."

(Page 341, Wholesome Fare)

এই পুস্তকের আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—

"Beef, nevertheless, is a noble viand, of world-wide utility, as well as of heroic proportions. It is not the Ox's fault, but our misfortune and loss, if the effects our modern civilized life often compel us to re[illegible] with a cautious, even when with [illegible] eye."

অত্যন্ত অনিষ্টজনক হয়। বিখ্যাত ডাক্তর পার্কস্ তাঁহার "Practical Hygiene" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই কীট ভারতবর্ষের গরুতেই অধিক পরিমাণে জন্মে। *

ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে যে গো-মাংস ব্যবহার প্রথা কেন রহিত হইয়াছে তাহার কারণ বোধ হয় পাঠক এক্ষণে কতক অনুভব করিতে পারিলেন। পূর্ব্বকালের হিন্দু-ঋষিরা যে গাভির পদে পতিত হইয়া ভক্তি গদগদচিত্তে বলিতেন :—

"সদা গাবঃ প্রণম্যাস্তু মন্ত্রেণানেন পার্থিব।
নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এবচ॥
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমোনমঃ।"

ইত্যাদি।

ইহাতে যে কেবল তাঁহারা নানা উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা মাত্রই প্রকাশ করিতেন এরূপ নহে। গো-মাংসের উপকারিতা অপকারিতাও তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। এমন এক কাল ছিল যে সময়ে আর্য্য-ঋষিগণ গো-মাংস ব্যবহার ও করিতেন। †

আয়ুর্ব্বেদে গো-মাংসের গুণাগুণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। নিম্নে একটি শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"বলীবর্দ্দস্তু বৃষভ ঋষভশ্চ তথা বৃষঃ।
অনড্বান্ সৌরভেয়শ্চ গৌরুক্ষা ভদ্রউত্যপি।
সুরভিঃ সৌরভেয়ীচ মাহেয়ী গৌরুদাহৃতা॥
গোমাংস সুগুরু স্নিগ্ধং পিত্ত শ্লেষ্ম বিবর্দ্ধনম্।
বৃংহণং বাতহৃদ্ বল্যম পথ্যঃ পীনস প্রনুৎ॥"

ইত্যাদি

সাধারণে গো-মাংসকে অতিশয় উষ্ণ বিবেচনা করেন, কিন্তু হিন্দু আয়ুর্ব্বেদে উপরি উক্ত বচন দ্বারা সে সন্দেহ দূর করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে গো-মাংস স্নিগ্ধ। কিন্তু ইহার প্রধান দোষ বাতশ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে। পূর্ব্বকালে এদেশে চক্ষু-পীড়া, অজীর্ণ, অম্ল-পীড়া, এত অধিক ছিল না—বাতশ্লেষ্মাতেই অধিক লোকের মৃত্যু হইত। বাতশ্লেষ্মা পীড়ার চিকিৎসাও অত্যন্ত কঠিন। এ কারণ অন্য যত গুণই থাকুক যাহাতে মানুষের বাতশ্লেষ্ম পীড়ার কারণ উদ্ভব করে সে বস্তু কখনই আর্য্যঋষিগণ মানুষের খাদ্য বস্তু মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পারেন না।

যে সময়ে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে গো-মাংসের দোষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তখন এদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ঠিক এরূপ ছিল না। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত উদ্ভিজ এবং জীব জন্তুরও অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। গো-মাংসের যে সকল অপকারিতার বিষয় চরক সুশ্রুতাদিতে লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা যখন উহার অধিক দোষ আর্য্যঋষিরা জানিতে পারিলেন, তখনই হিন্দু-সমাজে গো-মাংস ব্যবহারের নিষেধ-আজ্ঞা প্রচারিত হইল। কলিযুগে গো-মাংস অভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। ইতিপূর্ব্বে এদেশের গো-মাংসে এক প্রকার ভয়ঙ্কর কীট বৃদ্ধির কথা পাঠকরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, হয়ত ঐ কীটের অস্তিত্ব জানিয়া অবধিই আর্য্যঋষিগণ গো-মাংসের প্রতি অধিক বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন এবং এরূপ দোষযুক্ত গো-মাংস যে আর কখনই কাহার ব্যবহার করা উচিত নহে, এরূপ নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন। সাধারণ ইংরাজগণ এদেশের গো-মাংসের অপকারিতা এপর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বিজ্ঞ ডাক্তারগণ নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া এক্ষণে

---

* "In the flesh of Cattle, or of the pig, Cysticerci may be found, They are generally visible to the naked eye as small round bodies; when placed under a microscope with low power their real nature is seen. ... ... In some countries they are extremely common in Cattle, and have been a source of considerable trouble in North-west India."

Page 215. Parke's Hygiene.

† "The idea of beef—the flesh of the earthly representation of the divine Bhagabati—as an article of food is so shocksug to the Hindoos, that thousand over thousands of the more orthodox among them never repeat the counterpart of the word in the vernaculars, and many and diro have been the sanguinary conflicts which the shedding of the blood of cows has caused in this country. And yet it would seem that there was a time when not only no compunctious visitings of conscience had a place in the mind of the people in slaughtering Cattle—when not only the meat of that animal was actually esteemed a valuable aliment—when not only was it a mark of generous hospitality, as among [illegible]ent Jews to slaughter the "fatted [illegible]onor of respected guests,—but [illegible] of beef was deemed an absolute [illegible] pious Hindoos in the journey from this to another world, and a cow was invariably kill to be burnt with dead."

Page 355, INDO-ARYANS by Dr. RAJENDRA LALL MITTRA.

নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেন প্রাচীন হিন্দুরা গো-মাংসের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে ইংরাজ-ডাক্তারগণ মধ্যে অনেকেই গো-মাংস ত্যাগ করিয়াছেন। বিলাতে বিশেষতঃ জর্ম্মাণদেশে অনেকে সর্ব্বপ্রকার মাংসাহারই ত্যাগ করিয়াছেন। বিলাতে লোভ-পরবশ হইয়া যাঁহারা গো-মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁহারাও ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যাইয়া কখনই গো-মাংস ব্যবহার করা উচিত নহে। *

শূকরমাংস।—বোধ হয় গো-মাংসের পরেই ইংরাজদের প্রধান খাদ্য শূকর-মাংস। শূকর-মাংসও যে গো-মাংসের ন্যায় অত্যন্ত অপকারি বস্তু তাহা এপর্য্যন্ত আমরা যে সকল ডাক্তারদের মতাদি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেই পাঠক কতক দেখিতে পাইয়াছেন।

গো-মাংস অপেক্ষাও শূকর-মাংস অধিক অপকৃষ্ট বস্তু। যদিও অতি পূর্ব্বকালে এদেশে গো-মাংস ব্যবহৃত হইত, কিন্তু আমার সম্মানাস্পদ অধ্যাপক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে তাঁহার "Beef in India" প্রবন্ধে গো-মাংস ব্যবহারের যেমন যুক্তি প্রমাণ সকল দিয়াছেন, শূকর মাংস সম্বন্ধে তেমন কোন অকাট্য প্রমাণই উপস্থিত করিতে পারেন নাই। শূকর মাংস যে প্রাচীন হিন্দুগণ ব্যবহার করিতেন [illegible] বলে এ কথা দুই একজন পণ্ডিতে বলিলেও, যে পর্য্যন্ত ইহার অকাট্য প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত না হইব সে পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ শূকর-মাংস যে অতি অপকারি বস্তু তাহা কেবল হিন্দুরা জানিতেন না, প্রাচীন কালের ইহুদি প্রভৃতি অন্যান্য জাতিতেও ইহা বিশ্বাস করিতেন।

গো-মাংসের ন্যায় শূকরের মাংসেও কীট আছে। শূকরের মাংসে যে কীট থাকে তাহার আকার বড় সংখ্যাও বেশী। এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি পরিমাণ বৃহৎ বৃহৎ কীটও শূকরের মাংসের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। † ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট গো-মাংস, মেষ-মাংস প্রভৃতি অনেক মাংসেই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এ গুলি অপকারি হইলেও আহার মাত্রেই মানুষের শরীরে কোন বৈলক্ষণ্য জন্মায় না, কিন্তু শূকর-মাংসে যে কীট আছে মাংসের সহিত তাহা উদরস্থ হইলে অতি অল্প সময় মধ্যেই শরীরে তাহার ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হয়। মাংস অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়া কীটগুলি একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে না পারিলে শূকর-মাংস মানুষের শরীরে ভয়ানক পীড়া উৎপাদন করে। ডাক্তার ডি, চুমন্ত তাঁহার সংগৃহীত "Hygione" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, অবস্থা বিশেষে শূকরের মাংসে পেটের অসুখ এমন কি ওলাউঠা বিসূচিকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। ‡

শূকরের এবং গরুর মাংসে কখন কখন এমন বিষাক্ত পদার্থ জন্মে যে, সে অবস্থায় শূকর-মাংস বা গো-মাংস অল্প পরিমাণ ব্যবহার করিলেও মানুষের মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। মাংসের বাহিক অবস্থা

* "The researches of Leuckart in Germany Dr. Cobbold in this country, as well as eminent surgeons in India, have fully decided the distinct nature of this tapeworm, and likewise traced its occurrence in man to the use of veal and beef which is imperfectly cooked. Such flesh is known as *measled* representing the conditions given in Fig 272."

Page 745, Armatage's Cattle Doctor.

ডাক্তার আর্মটেজ প্রণীত গো-চিকিৎসা সংক্রান্ত এই অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকের আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে---

"English people—invalids, returning from India are often suffering from tapeworm, which doubtless is much to do with their delicate health. The disease prevails also in Abyssinia, Germany, and many other countries where raw and imperfectly cooked veal and beef are used."

† "Monthly Microscopical Journal" নামক পত্রিকায় ডাক্তার কবোল্ড এতদ্বিষয়ক একটি সুন্দর প্রবন্ধে শূকর-মাংসের কীটের কতকগুলি চমৎকার ছবি ও ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। কীটের মূর্ত্তিগুলি দেখিতে অতি বিকট ও ভয়ঙ্কর। ইহার দুই একটি ছবি অঙ্কিত করিয়া এই স্থানে দেখাইতে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল।

‡ "Instances are not at all uncommon in which persons after partaking of butcher's meat, have been attacked with serious gastro-intestinal symptoms (vomiting, diarrhoea, and even cramp) followed in some cases by severe febrile symptoms; the whole complex of symptoms somewhat resembles cholera, at first, and afterwards typhoid fever. ... ... Among the *Ammalia* the flesh of pig sometimes causes diarrhoea—a fact noticed by Dr. Parkes in India, and often mentioned by others. The flesh is probably affected by the unwholesome garbage on which the [illegible] Sometimes pork, not obviously di[illegible], produced choleric symptoms."

Page 219, Practi[illegible]

পরীক্ষা করিয়া এই বিষাক্ত পদার্থ জন্মিয়াছে কি না তাহা স্থির করিবার কিছুই উপায় নাই। গো-মাংস এবং শূকর-মাংস ব্যবহার করিয়া বিষাক্ত হইয়া মানুষ যে মরিয়াছে বিলাতে ডাক্তারেরা এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। *

গো-মাংস এবং শূকর-মাংসের পরই বোধ হয় ইংরাজেরা মুরগ, হাঁস, টার্কি প্রভৃতি পাখীর মাংস অধিক পছন্দ করেন। বিলাতে এ শ্রেণীর মাংসের মূল্য অত্যন্ত অধিক। ধনী ভিন্ন সাধারণ লোকে বিলাতে মুরগী ব্যবহার করিতে পারেন না। মুরগী, ছাগ, ভেড়া, ঘোড়া, উট, শশক ও ভল্লুক প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকারের মাংসই সাহেবেরা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহার এক একটি পৃথকভাবে লইয়া তাহার দোষগুণ বিচার করিতে উপস্থিত হইলে জগতের ভূচর খেচর জলচর সমস্ত জীবজন্তুরই কথা ক্রমে ক্রমে উত্থাপন করিতে হয়। আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ, পাঠকগণের সময় ততোধিক অল্প। এ কারণ বিশেষ বিশেষ মাংসের দোষগুণ বিচারে ক্ষান্ত থাকিয়া সাধারণ মাংসাহার সম্বন্ধে একণে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে শরীর ধারণের পক্ষে মাংসাহার যে নিতান্তই আবশ্যক তাহা নহে—যদিও কিছু আবশ্যক বোধ হয়, ভারতবর্ষের ন্যায় দেশের পক্ষে সে প্রয়োজন এতই সামান্য যে প্রয়োজন নাই বলিলেও দোষ হয় না।

খাদ্যই আমাদের শরীরের প্রধান উপাদান। খাদ্য বস্তুর দোষগুণেই আমাদের দেহের যত কিছু ইষ্টানিষ্ট হয়। উদ্ভিদ অপেক্ষা জীব জন্তুর উপরেই পীড়ার প্রভাব কিছু অধিক, কাজে কাজেই উদ্ভিদ-খাদ্য ত্যাগ করিয়া মাংসাহারে অধিক অনুরক্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি পীড়া আক্রমণের সম্ভাবনাও শরীরে অধিক হইয়া দাঁড়ায়। বিলাতের প্রধান প্রধান চিকিৎসকেও এ কথা স্বীকার করেন। †

যাঁহারা বলেন মাংসাহার দ্বারা আমাদের শরীরে তেজ এবং বল যেরূপ বৃদ্ধি হইতে পারে—এ দেশী খাদ্য "ডাইল ভাত" দ্বারা তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহাদের এ বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। ডাক্তারদের মতে গো-মাংসে পুষ্টিকর বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গো-মাংসে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি আছে—

জল	... ...	৭৩'৪
দ্রব হইতে পারে এমন এলবিউমেন্		২'২৫
দ্রব হইতে পারে না এমন এলবিউমেন্		১৫'২
গিলেটিনেস্ পদার্থ	...	৩'৩
চর্ব্বি বা মেদ ...	...	২'৪৭
ক্রিয়েটিন প্রভৃতি	...	২'১১২

ইহার মধ্যে গিলেটিনেস্, এলবুমেন এবং চর্ব্বিই মানুষের শরীরের পুষ্টি সাধন করে। দুগ্ধে জলীয় অংশ ৮৬'৮ এলবুমেন ৪ চর্ব্বি ৩'৭ কার্ব্ব হাইড্রেট ৪'৮ এবং লবণের অংশ '৭ আছে। অন্নে জলীয় অংশ ১০ এলবুমেন ৫ চর্ব্বি ৮ কার্ব্বহাইড্রেট ৮৩'২ এবং লবণের অংশ ০'৫ আছে। ডাইলে জলীয় অংশ ১৫ এলবুমেন ২২ চর্ব্বি ২ কার্ব্বহাইড্রেট ৫৩ এবং লবণ ২'৪ ভাগ আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতে পারে যে মাংসাহার না করিলেও কেবল অন্নে ডাইলে এবং দুগ্ধে আমাদের শরীর উত্তম রূপে রক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের শরীরে যাহা কিছু প্রয়োজন অন্নে ডাইলে এবং দুগ্ধে তাহা সমস্তই আছে। কেহ কেহ বলেন কেবল এক দুগ্ধেই আমাদের শরীরের প্রয়োজনোপযোগী সমস্ত সামগ্রী পাওয়া যায়।*

ইংরাজ ডাক্তারেরা দুগ্ধের যত প্রশংসা করিয়া থাকেন আয়ুর্ব্বেদে তাহার শতগুণে দুগ্ধের প্রশংসা করে। শরীরতত্ত্ববিৎ আর্য্য-ঋষিগণ মাংসের উপকারিতাও জানিতেন কিন্তু দুগ্ধের তুলনায় মাংসকে তাঁহারা

* "Sausages and pork-pies and even beef-steakpies sometimes become poisonous from the formation of an as yet unknown substance, which is perhaps of a fatty nature. It is not trimethylamine, amylamine, or phenylamine—these are not poisonous. The symptoms are severe intestinal irritation, followed rapidly by nervous oppression and collapse."

Page 319, Practical Hygiene.

† "We should conclude from general principles that as all diseases must affect the composition of flesh, and as the composition of our own bodies is inextricably blended with the composition of the substances we eat, it must be of the greatest importance for health to have these substances as pure as possible. Animal poisons may indeed be neutralised or destroyed by the process of cooking and digestions, but the composition of muscle must exert an influence on the composition of our own nitrogenous tissues which no preparation or digestion can remove."

Page 218, Practical Hygiene.

* Milk contains all the four classes of aliment essential to health.

Page 251, Practical Hygiene.

অতি সামান্য দেখিতেন। আয়ুর্ব্বেদে মাংসের উপকারিতা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"মাংসং তু পিশিতং ক্রব্যমামিষং পললং পলম্।
মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রস পাকয়োঃ॥"

আয়ুর্ব্বেদ দুগ্ধ সম্বন্ধে যখন বলিতে উপস্থিত হইয়াছেন তখন তিন পঙ্‌ক্তিতে তাহা শেষ করেন নাই দুই একটি গুণ বলিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই।

"দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ংস্তনং বালজীবনমিত্যপি।
দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরম্॥
সদ্য শুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্ব্ব শরীরিণাম্।
জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজিকরং পরম॥
বয়ঃস্থাপকমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্।
বিরেকবান্তিবস্তিনাং তুল্যমোজোবিবর্দ্ধনম্॥
জীর্ণজ্বরে মনোরোগে শোকমূর্চ্ছাদিমেষুচ।
গ্রহণ্যাং পাণ্ডুরোগেচ দাহে তৃষি হৃদাময়ে॥
শূলোদাবর্ত্তগুল্মেষু বস্তিরোগে গুদাঙ্কুরে।
রক্তপিত্তেঽতিসারে চ যোনিরোগে শ্রমে ক্লমে॥
গর্ভস্রাবে চ সততংহিতং মুনিবরৈঃস্মৃতম।
বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণাঃ ক্ষুদ্‌ব্যবায়কৃশাশ্চ যে॥
তেভ্যঃ সদাতিশয়িতং হিতমেতমুদাহৃতম্॥" ইত্যাদি
গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষ ধাতুমলস্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু।
জরা সমস্ত রোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥

আয়ুর্ব্বেদে দুগ্ধের, বিশেষতঃ গো-দুগ্ধের যত গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে, সে গুলি সমস্ত উদ্ধৃত করিতে অনেক স্থানের প্রয়োজন। উপরে যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল তাহাতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন মাংস অপেক্ষা দুগ্ধ কত শ্রেষ্ঠ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৫ই আশ্বিন শনিবার "বালী ধর্ম্মসমাজের" পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনায় যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিবেন।

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৬ই আশ্বিন রবিবার কাননা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে প্রাতে ৭॥ ঘটিকা ও সায়াহ্নে ৭ ঘটিকার পর উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে। সকলে যোগ দান করিয়া উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

৫০। ৬০ বৎসর হইতে চলিল এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। এমন অনেক কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা এই সমাজভুক্ত। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা সমাজভুক্ত না হইয়াও ইহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই উভয় প্রকার লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। সম্প্রতি আমরা একটী ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। যে কোনরূপে হউক যাঁহারা এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮০৮ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান সনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান সনের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

স্বগত ভেদই প্লেটোর প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥ ১৩ ॥

এখানে দুই প্রকার ভেদের প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে—স্বগত ভেদ এবং স্বজাতীয় ভেদ; অথবা যাহা একই কথা—অবয়ব-ভেদ এবং জাতি-ভেদ। জ্ঞান বা বস্তু যদি এরূপ হয় যে তাহা সামান্যও বটে বিশেষও বটে—দুইই, তবে সামান্য-বিশেষের ভেদ—জ্ঞান বা বস্তুর স্বগত ভেদ; আর, যদি এরূপ হয় যে—হয় তাহা সামান্য—নয় তাহা বিশেষ—দুয়ের এক, তবে সামান্য-বিশেষের ভেদ জ্ঞান বা বস্তুর স্বজাতীয় ভেদ। বস্তু-সম্বন্ধীয়-স্বগত-ভেদের উদাহরণ;—পদ্ম-পুষ্প পুষ্পও বটে পদ্মও বটে—তাহা সামান্যতঃ পুষ্প এবং বিশেষতঃ পদ্ম; পদ্ম-পুষ্পে পুষ্পত্ব এবং পদ্মত্ব (সামান্য এবং বিশেষ) দুইই একাধারে বিদ্যমান; সুতরাং পদ্মত্ব এবং পুষ্পত্ব এ দুয়ের ভেদ পদ্মপুষ্পের স্বগত ভেদ। জ্ঞান-সম্বন্ধীয় স্বগত-ভেদের উদাহরণ;—জ্যোতিষ-জ্ঞানে জ্ঞানত্ব এবং জ্যোতিষত্ব (সামান্য এবং বিশেষ) দুইই একাধারে [বিদ্য]মান; সুতরাং জ্ঞানত্ব এবং জ্যোতিষত্বের ভেদ জ্যোতিষ-জ্ঞানের স্বগত ভেদ। স্বজাতীয় ভেদের উদাহরণ;—পদ্মপুষ্প—হয় শ্বেত বর্ণ—নয় নীল বর্ণ, পদ্মপুষ্পে শ্বেতবর্ণ এবং নীলবর্ণ একাধারে বিদ্যমান নহে—ভিন্নাধারে বিদ্যমান, সুতরাং নীল বর্ণ এবং শ্বেত বর্ণের ভেদ পদ্ম-পুষ্পের স্বগত ভেদ নহে কিন্তু স্বজাতীয় ভেদ। যদি এরূপ হয় যে, প্রতি পদ্ম-পুষ্পে যেমন পুষ্পত্ব এবং পদ্মত্ব একাধারস্থিত, তেমনি প্রতি বস্তুতে সামান্য এবং বিশেষ একাধার স্থিত, তবেই বলা যাইতে পারে যে সামান্য-বিশেষের ভেদ বস্তু-সকলের স্বগত ভেদ; কিন্তু যদি সামান্য এবং বিশেষ উল্লিখিত শ্বেতবর্ণ এবং নীলবর্ণের ন্যায় ভিন্নাধার-স্থিত হয়, তবে তাহাতে এইরূপ বুঝায় যে, সামান্য-বিশেষের ভেদ বস্তু-সকলের স্বজাতীয় ভেদ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে প্লেটোর মতে বস্তুগত এবং জ্ঞানগত সামান্য-বিশেষের ভেদ কিরূপ ভেদ? স্বগত ভেদ—না স্বজাতীয় ভেদ? যদিচ প্লেটোর লিখিত গ্রন্থে বর্ত্তমান প্রশ্নের কোথাও কোন স্পষ্ট মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার সমস্ত তত্ত্বালোচনার তাৎপর্য্য প্রণিধান করিয়া দেখিলে

নিঃসংশয় প্রতীয়মান হয় যে, স্বগত ভেদই তাঁহার অভিপ্রেত—স্বজাতীয় ভেদ নহে। তিনি যখন বলিয়াছেন যে, সকল সত্তাই—সকল জ্ঞানই—সামান্য এবং বিশেষ উভয় লক্ষণাক্রান্ত, তখন প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, কোন সত্তাই—কোন জ্ঞানই—কেবল মাত্র সামান্য লক্ষণাক্রান্ত অথবা কেবল-মাত্র বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত নহে। সত্তা সম্বন্ধে তাঁহার এ কথা কতদূর সত্য মিথ্যা তাহা পরে বিবেচ্য, কেননা সত্তা-বিষয়ক আলোচনা জ্ঞান-তত্ত্বের অধিকার-বহির্ভূত; কিন্তু জ্ঞান-সম্বন্ধে উহা যে, খুবই সত্য, তাহাতে আর ভুল নাই; যে-কোন জ্ঞান হউক না কেন—শিল্প জ্ঞানই হউক—জ্যোতিষ জ্ঞানই হউক—ঘট জ্ঞানই হউক—জ্ঞান মাত্রেতেই এক দিকে যেমন জ্ঞানত্ব, আর এক দিকে তেমনি বিশেষত্ব (যেমন জ্যোতিষ-জ্ঞানের জ্যোতিষত্ব—শিল্প-জ্ঞানের শিল্পত্ব এইরূপ বিশেষত্ব) দুইই একাধারে বিদ্যমান। প্লেটোর লিখিত বচনের ভাল মন্দ দুইরূপ অর্থ হইতে পারে—সত্য, কিন্তু ভাল অর্থটি ছাড়িয়া মন্দ অর্থটি জোর করিয়া তাঁহার স্কন্ধে চাপানো হয় কেন? প্লেটোর কৃত সামান্য বিশেষের ভেদকে যখন স্বগত-ভেদ বলিলেই স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, তখন তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ করিয়া গড়িয়া তুলিয়া তাঁহাকে অনর্থক দোষের ভাগী করা হয় কেন? এরূপ কার্য্যে প্লেটোর প্রতি নিতান্তই অন্যায় ব্যবহার। এক জন যদি বলে যে দধি—দুগ্ধ এবং অম্ল এই দুই অবয়বের সংঘাত, তবে সে কথার অর্থই এই যে, দুগ্ধ স্বয়ং দধি নহে, অম্ল স্বয়ং দধি নহে। তেমনি যদি বলা যায় যে, সত্তা-মাত্রই—জ্ঞান-মাত্রই—দুই অবয়বের সঙ্ঘাত, তবে তাহার অর্থই এই যে, সে দুই অবয়বের কোনটিই স্বয়ং—সত্তা বা জ্ঞান নহে। এই কথাই (আমাদের মতে) প্লেটোর কথা।

সাধারণতঃ লোকের মত এই যে, স্বজাতীয় ভেদই প্লেটোর অভিপ্রেত॥ ১৭॥

কিন্তু নানা প্রকার প্রতিবন্ধক বশত আমাদের এই মতটি সাধারণের আদর-ভাজন হওয়া দূরে থাকুক্—বোধায়ত্ত হইতেও পারিতেছে না। প্রধান প্রতিবন্ধক যেটি তাহা আমরা অনতি-পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি; তাহা আর কিছু নয়—অস্তিতত্ত্ব হইতে জ্ঞান-তত্ত্বের পার্থক্য রক্ষা না করা, আর, অস্তিতত্ত্বে হস্তার্পণ করিবার পূর্ব্বে জ্ঞান-তত্ত্বকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া সংগঠন না করা। এইরূপ ত্রুটিই প্লেটোর মর্ম্মগ্রহের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়া অভীষ্ট কার্য্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছে। প্লেটোর যে জ্ঞানতত্ত্ব, তাহা সবে কেবল মুকুলিত হইয়াছে মাত্র—রীতি মত পরিস্ফুট হয় নাই। প্লেটো আমাদের জ্ঞান-সমূহকে কেবল-মাত্র কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর একত্ব মঞ্চে—অসম্পূর্ণ সাধারণ-তত্ত্বে—অধিরূঢ় করিয়াই নিরস্ত ছিলেন, এবং সেই সকল সাধারণ তত্ত্বকে (যেমন মনুষ্যত্ব—জীবত্ব—সৌন্দর্য্য—এই-সকল তত্ত্বকে) তিনি ভাব-নামে ideas সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন। তৎপরে প্লেটোর সেই ভাবাখ্য তত্ত্ব-সকল সাধারণ এবং বিশেষ—জাতি এবং ব্যক্তি—এই দুই নাম পরিগ্রহ-পূর্ব্বক মধ্যমাব্দীয় দার্শনিক-দিগের অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। পরিশেষে মনোবিজ্ঞান কতকগুলি অপরিণাম-দর্শী মন্ত্র-বচনে তাহাদিগকে পাকে প্রকারে থামাইয়া রাখিলেন। কিন্তু প্লেটো ঐখানেই আটকিয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার ভাবাখ্য তত্ত্ব-সকলকে সর্ব্বোচ্চ একত্ব-মঞ্চে উত্থাপিত করিতে পরাভব মানিলেন। তিনি প্রকৃত সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বে—পরাকাষ্ঠা সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বে—উঠিতে না পারিয়া, কৃত্রিম সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব-সকলের মধ্যে পথ হারাইয়াছেন।

জ্ঞানের পরম সাধারণ তত্ত্ব—যাহা শুদ্ধ কেবল ব্যবচ্ছিন্ন (abstract) ভাব-মাত্র নহে, প্রত্যুত যাহা জীবন্ত সত্য, তাহা তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও স্থান পায় নাই। জ্ঞানের পরম সাধারণ তত্ত্ব যে, কি, তাহা তিনি কোথাও বলেন নাই, কাজেই তাঁহার জ্ঞান-তত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গীন নহে—ও সর্ব্বাঙ্গীন নহে বলিয়াই তাহা বোধগম্য নহে; কারণ, তত্ত্বজ্ঞান-রাজ্যে সর্ব্বাঙ্গীনতাই বোধগম্যতার মূল। প্লেটোর অস্তিতত্ত্ব আরো বিভ্রান্তি-জনক; একেতো তাহা তাহার নিজের দোষেই যথেষ্ট ভারাক্রান্ত, তাহাতে আবার অপরিপক্ক জ্ঞান-তত্ত্বের দোষ-গুলি তাহাতে উপসংক্রান্ত হইয়াছে। প্লেটোর এই অস্তিতত্ত্ব অংশটিই প্রধানতঃ পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞদিগের পথের সম্বল ও গতির নিয়ামক হইয়াছিল। যখন দেখা যায় যে, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধ এবং বিশেষ বিশেষ সত্তাতেই আপাদ মস্তক পরিপূর্ণ, তখন কাজেই মনে হয় যে, বিশেষ বিশেষ সত্তাই বহির্জ্জগতের সর্ব্বস্ব—বহির্জ্জগতে সাধারণ সত্তার আদবেই কোন অধিকার নাই; তখন মনে হয় যে, বহির্জ্জগতের সত্তা বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এই কথাই ঠিক্—তাহা সাধারণ এবং বিশেষ উভয় লক্ষণাক্রান্ত এ কথা কোন কাজের নহে। ইন্দ্রিয় বলিতেছে যে বহির্জ্জগতের সত্তা (যেমন গো-মনুষ্যের সত্তা) বিশেষ-ধর্ম্মী, বুদ্ধি বলিতেছে যে মানসিক ভাবের সত্তা (যেমন গোত্ব-মনুষ্যত্বের সত্তা) সামান্য-ধর্ম্মী; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সকল সত্তা উভয় ধর্ম্মী এ কথার বিরুদ্ধে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় উভয়েই খড়্গাহস্ত। এইরূপ আপাতদর্শী যুক্তিতেই পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞেরা স্থির করিলেন যে, শেষোক্ত রূপ কাঁচা কথা (অর্থাৎ সকল সত্তা উভয়-ধর্ম্মী—এ কথা) কখনও প্লেটোর লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে,—ইহাই ঠিক্ যে, প্লেটোর মতে মানসিক সত্তা সামান্য-ধর্ম্মী—ভৌতিক সত্তা বিশেষ-ধর্ম্মী—কোন সত্তাই উভয়-ধর্ম্মী নহে। ইঁহাদের বিবেচনায় প্লেটোর কৃত সামান্য-বিশেষের ভেদ বস্তু-সকলের স্বগত ভেদ নহে কিন্তু স্বজাতীয় ভেদ; অথবা যাহা একই কথা—প্লেটোর মতে প্রত্যেক সত্তাই, হয় সামান্য, নয় বিশেষ, দুয়ের এক; এমন নহে যে, প্রত্যেক সত্তা সামন্যও বটে, বিশেষও বটে—দুইই। এইরূপে, প্লেটো যে কথা কোন জন্মে বলেন নাই বরং প্রকারান্তরে অস্বীকার করিয়াছেন—পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞেরা তাহাই তাঁহাকে দিয়া বলাইয়াছেন।

আমাদের কৃত অভিযোগের টীকা ॥ ১৮ ॥

প্লেটোর পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞদিগের বিরুদ্ধে এই যাহা আমরা অভিযোগ করিতেছি ইহার কিঞ্চিৎ টীকা আবশ্যক। আমরা বলিতেছি যে, পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণতঃ প্লেটোর মত-টিকে উল্টা বুঝিয়াছেন, কিন্তু আমরা এ কথা বলি না যে, প্লেটোর মতের উল্টা অর্থটি তাঁহারা স্পষ্টরূপে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, অথবা তাহার প্রকৃত অর্থটি স্পষ্টরূপে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের ভ্রমও স্পষ্ট রকমের ভ্রম নহে। স্বজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ এ দুয়ের মধ্যে যে, কি প্রভূত ব্যবধান, তাহা তাঁহারা দেখিতেই পান নাই। আমাদের কৃত অভিযোগের তাৎপর্য্য কেবল এই যে, স্বজাতীয় ভেদের পক্ষেই তাঁহারা বেশী ঝোঁক দিয়া ছিলেন, এ নহে যে, তাহাতেই তাঁহারা একাগ্রতা সহকারে লাগিয়া ছিলেন। দুই বিপরীত পক্ষের পরস্পর বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন উভয়-পক্ষই নির্ব্বিবাদে অবলম্বিত হয় ও মনকে এইরূপ প্রবোধ দেওয়া হয় যে, দুয়ের প্রভেদ কেবল নাম-মাত্র, তখন

সেরূপ দুই নৌকায় পদার্পণকারী গ্রন্থকারের প্রকৃত মতের ঠিকানা না পাইয়া ইতিহাস-লেখক বড়ই বিপদে পড়েন। এরূপ স্থলে সুবিচারের এক উপায় কেবল এই যে, দুই বিরোধী মতের কোন্‌টির প্রতি গ্রন্থকারের বেশী ঝোঁক—তাহা লেখার ভাবভঙ্গী দৃষ্টে প্রকারান্তরে অবধারণ করিয়া, তাহারই জন্য গ্রন্থকারকে দায়ী করা। উপস্থিত মতামতের বিচার-টি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্লেটোর অনুপন্থীদিগের মধ্যে কেহই স্বজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদের পরস্পর-বিরোধিতা জ্ঞানে উপলব্ধি করেন নাই; তাই তাঁহারা কখনও বা এই ভাবে কথা কহিয়াছেন—যেন সামান্য বিশেষের ভেদ বস্তু-সকলের স্বগত ভেদ মাত্র, আবার, কিয়ৎপরেই তাঁহারা এইরূপ বিপরীত ভাবে কথা কহিয়াছেন—যেন তাহা বস্তু-সকলের স্বজাতীয় ভেদ। কিন্তু তাঁহাদের আদ্যোপান্ত কথার ভাবে এইরূপ বোধ হয় যে, তাঁহারা স্বজাতীয় ভেদেরই সবিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহাদের বিবেচনায় প্লেটোর মত এই যে, নিকৃষ্ট-জাতীয় এক প্রকার জ্ঞান আছে (বিশেষ ধর্ম্মী জ্ঞান—ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ) যাহা নিকৃষ্ট বিষয় (ঘট পটাদি ভৌতিক বিষয়) লইয়াই ব্যাপৃত হয়, এবং উৎকৃষ্ট-জাতীয় আর এক প্রকার জ্ঞান আছে (সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান) যাহা উৎকৃষ্ট বিষয় (সার্ব্বভৌমিক সত্য) লইয়া ব্যাপৃত [illegible] প্লেটোর মতের এইরূপ বিপরীত [illegible] পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত আশা ভরসা মাটি করিয়া দিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া তত্ত্বজ্ঞানের কথাবার্ত্তার ভাবভঙ্গী পদে-পদে একটি মহৎ ভ্রমাত্মক ব্যাপারের পরিচয় দিয়া আসিতেছে, সেটি এই—অবয়ব ভেদকে জাতিভেদ করিয়া গড়িয়া তোলা—জ্ঞানের আংশিক অবয়বকে তাহার পূর্ণাবয়ব করিয়া প্রতিপাদন করা।

তৃতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত। ১৯।

এইরূপ ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা কার্য্য—প্লেটোর মতের অর্থ-বিপর্য্যয়—অশেষ বাদানুবাদের তোড় উঠাইয়া অবশেষে বক্ষ্যমান প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত-টিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, এবং জ্ঞান-সম্বন্ধে (অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এখন কোন কথা তোলা হইতে পারে না) তাহাই প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের মতের নখ-দর্পণ স্বরূপ।

তৃতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত।

প্রত্যেক জ্ঞান—হয় বিশেষ—নয় সামান্য; অথবা যাহা একই কথা—এমন এক প্রকার জ্ঞান আছে যাহা স্বীয় অপরিবর্ত্তনীয় অবশ্যম্ভাবী এবং সার্ব্বভৌমিক অবয়ব ব্যতিরেকে শুদ্ধ কেবল স্বীয় পরিবর্ত্তন-শীল আগন্তুক এবং বিশেষ-অবয়ব-মাত্রেই পর্য্যবসিত, আবার, এমন আর-এক প্রকার জ্ঞান আছে যাহা স্বীয় পরিবর্ত্তনশীল আগন্তুক এবং বিশেষ অবয়ব ব্যতিরেকে শুদ্ধ কেবল স্বীয় অপরিবর্ত্তনীয় অবশ্যম্ভাবী এবং সার্ব্বভৌমিক অবয়ব-মাত্রে পর্য্যবসিত। সংক্ষেপে, এক জাতীয় জ্ঞান বিশেষাত্মক—আর এক জাতীয় জ্ঞান সামান্যাত্মক। বিশেষাত্মক জ্ঞান ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ বস্তু-বিষয়ক। অগ্রে বিশেষাত্মক জ্ঞান-সকল উপস্থিত হয়, পরে অন্বয়-ব্যতিরেক (Generalization and abstraction) দ্বারা তাহাদের মধ্য হইতেই সামান্যাত্মক জ্ঞান পরিগঠিত হয়। সামান্যাত্মক জ্ঞান বস্তুর পরিবর্ত্তে অবস্তু লইয়াই ব্যাপৃত হয়; অর্থাৎ বিশেষাত্মক জ্ঞানের বিষয় যেমন বিশেষ বিশেষ বস্তু, সামান্যাত্মক জ্ঞানের বিষয় সেরূপ সামান্য বস্তু নহে কিন্তু অবস্তু—তাহা অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা কৃত্রিম রূপে গড়িয়া তোলা মনের একটা ভাব-মাত্র। এই সকল সামান্যাত্মক জ্ঞান তাব [illegible]

সংস্থিত হয়, যেমন—মনুষ্য-ভাব—জীব-ভাব—বৃক্ষ-ভাব, অথবা মনুষ্যত্ব—জীবত্ব—বৃক্ষত্ব ইত্যাদি। মনুষ্য, জীব, বৃক্ষ প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দের ব্যবহার মাত্রেই ঐরূপ সামান্যাত্মক জ্ঞান সূচিত হয়।

ইহাতেই প্লেটোর পরবর্তী তত্ত্বজ্ঞদিগের দোষ সপ্রমাণ ॥ ২০ ॥

এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের উল্লেখ মাত্রেই আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হইতেছে যে, প্লেটোর পরবর্তী তত্ত্বজ্ঞেরা প্লেটোর কৃত ভেদ নিরূপণের অর্থ উল্টা বুঝিয়াছিলেন। প্লেটো যাহাকে জ্ঞানের মূল ধাতু বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাকেই তাঁহারা সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া অবধারণ করিলেন। কিন্তু জ্ঞানের মূল ধাতু কিরূপে জ্ঞান-শব্দের বাচ্য হইবে—দুগ্ধ অথবা অম্ল কিরূপে দধি-শব্দের বাচ্য হইবে? তাহা হইতেই পারে না। মনোবিজ্ঞানের মত যাহা এই তৃতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই এইরূপ দাঁড়ায় যে, গোত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সামান্যাত্মক জ্ঞান-সকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে—গো-মনুষ্য প্রভৃতি বিশেষাত্মক জ্ঞান-সকলকে মনোমধ্যে আশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে; তবেই হইতেছে যে, বিশেষাত্মক জ্ঞান এক-জাতীয় জ্ঞান এবং সামান্যাত্মক জ্ঞান আর-এক-জাতীয় জ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের এই যে, একটি মত, ইহা মনোবিজ্ঞান কোথা হইতে পাইল? অবশ্য পূর্ব্বের কোন সূত্র হইতে। সে সূত্র যে কি তাহা এখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা আর কিছু নয়—প্লেটোর কৃত ভেদ-নিরূপণের বিপরীত অর্থবোধ। যদি ঐ ভেদ-নিরূপণের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞদিগের বোধায়ত্ত হইত এবং তাহা সাধারণে প্রচারিত হইত, তবে এই তৃতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত তত্ত্বজ্ঞান রাজ্যে আধিপত্য পাওয়া দূরে থাকুক—স্থান পাইতেও পারিত না।

সাকল্য পর্য্যালোচনা ॥ ২১ ॥

সামান্য-বিশেষ সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্কে হস্তার্পণ করিবার পূর্ব্বে আমরা কোথায় আইলাম তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। প্লেটো জ্ঞান-সম্বন্ধীয় সামান্য বিশেষের যেরূপ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে। সে ভেদ—হয় অবয়ব-ভেদ—নয় জাতি-ভেদ; যদি তাহা অবয়ব-ভেদ হয়, তবে তাহা জাতিভেদ হইতে পারে না, যদি তাহা জাতিভেদ হয় তবে তাহা অবয়ব-ভেদ হইতে পারে না। দুইটি অর্থ পরস্পরের সাক্ষাৎ বিরোধী—কাজেই তত্ত্বজ্ঞান-রাজ্যে দোঁহার দুইটি পথ স্বতন্ত্র। ঠিক্ অর্থ হইতে (অর্থাৎ সামান্য বিশেষের ভেদ বস্তু-সকলের এবং জ্ঞান-সকলের স্বগত ভেদ—এই সত্য হইতে) যে পথটি প্রসারিত হইয়াছে তাহা কেহই অতিবাহন করেন নাই—এমন কি তাহাতে কেহ পদার্পণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ; পরন্তু, যে পথটি ভুল অর্থ হইতে (অর্থাৎ উক্ত ভেদ বস্তু-সকলের এবং জ্ঞান-সকলের স্বজাতীয়-ভেদ—এই ভ্রম সিদ্ধান্ত হইতে) প্রসারিত হইয়াছে—যাবতীয় তত্ত্ব-পন্থীরা সেই পথেই ধাবমান। প্লেটোর সময় হইতে মধ্যমাব্দ পর্য্যন্ত এবং মধ্যমাব্দ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই ভ্রমের পথটি[illegible] মতের সহিত নানা মতের সং[illegible] হইয়া তাহাদের ভগ্নাবশেষে উহা[illegible] মস্তক পরিকীর্ণ রহিয়াছে। এই-সকল তুমুল বাদানুবাদের মূল স্থানটিতে দাঁড়াইয়া—কোথা হইতে কোন বিবাদ-সূত্র প্রসারিত হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, এ জন্য সে-সকল বাদানুবাদের জটা ছাড়াইতে আমরাই কেবল সমর্থ; আর, এই ভ্রম-

পথের যাত্রীরা পরস্পরের মত-খণ্ডনে এতাধিক পটু হইয়াও কেন-যে তাঁহারা স্বস্বমতের সমর্থনে লেশমাত্রও কৃতকার্য্য হ'ন নাই, তাহাও আমরা দিব্য বুঝিতে পারিতেছি।

বিপরীত অর্থবোধের ফল ॥ ২২ ॥

এখন তবে আমাদের কাজ এই—তত্ত্বজ্ঞান-ক্ষেত্রে প্লেটোর মতের অর্থ-বিপর্য্যয়ের কোথায় কিরূপ ফল ফলিয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা। এই যে একটি ভ্রম-সিদ্ধান্ত যে, প্লেটো কর্ত্তৃক জ্ঞান-সকল (দুই অবয়বে নহে কিন্তু) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, ইহা স্থিরীকৃত হওয়াতে তাহার অব্যবহিত পরেই এই প্রশ্ন উঠিল—ঐ দুই বিভিন্ন-জাতীয় জ্ঞানের দুই বিভিন্ন জাতীয় বিষয় কিরূপ? বিশেষাত্মক জ্ঞানের বিষয় যে, কি, তাহা স্থির করা কঠিন নহে। ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ বস্তুই বিশেষাত্মক জ্ঞানের বিষয়। এ কথার মধ্যে নূতন কিছুই নাই—সাদা সীধা মানুষ মাত্রেই এ কথায় সায় দিবেন। এ কথার বাস্তবিক কোন অর্থ থাকুক্ বা না থাকুক্—উহা শুনিবা মাত্রই মনে হয় যে, উহার অর্থ অতীব সুস্পষ্ট।

সামান্য লইয়াই যত কিছু গোলোযোগ ॥২৩॥

কিন্তু সামান্যাত্মক জ্ঞানের বিষয় কিরূপ? এইখানটিতেই গোলোযোগ। জ্ঞান যদি দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত ও বিশেষাত্মক জ্ঞান যদি সামান্যাত্মক জ্ঞান হইতে ভি[illegible]জ্ঞান উপযোগী বিশেষ বিশেষ [illegible]ব্যাপৃত, তবে অবশ্য সামান্যা-[illegible] বিশেষাত্মক জ্ঞান হইতে ভিন্ন ও [illegible] উপযোগী কোন-না-কোন প্রকার বিষয় লইয়া ব্যাপৃত। কিন্তু সামান্যাত্মক জ্ঞানের আপন উপযোগী সেই যে বিষয় তাহা কি? তাহার প্রকৃতি কিরূপ—তাহার সত্তা কিরূপ সত্তা? মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, বৃক্ষত্ব, এই শব্দগুলিতে যে প্রকার জ্ঞান সূচিত হয়, সে জ্ঞানের উপযোগী বিষয় বহির্জ্জগতে কিরূপ? প্লেটোর মতের প্রকৃত অর্থটি যদি পরিগৃহীত হইত, তবে, তাহা হইতে যতই কেন কঠিন প্রশ্নের সূত্র উত্থাপিত হউক না —এই সকল অনর্থক বাদ-বিতণ্ডার তুমুল কোলাহল হইতে মুক্তি পাওয়া যাইত। প্লেটোর মতের বিপরীত অর্থ-পরিগ্রহের গতিকেই পরবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞেরা—বিশেষতঃ টোলের ভট্টাচার্য্যেরা—প্রশ্ন মীমাংসার কোন অন্ধি সন্ধি খুঁজিয়া না পাইয়া চিত্ত-বিভ্রান্তি এবং নৈরাশ্যের জ্বালায় ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সত্তাবাদ ॥২৪॥

যাঁহারা প্লেটোকে ভুল বুঝিয়াও তাঁহার নামের প্রতি এবং তাঁহার মতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা বলিলেন যে, বাহ্যজগতে যেমন বিশেষাত্মক বিষয় আছে—যেমন বিশেষ বিশেষ মনুষ্য, বিশেষ বিশেষ পশু বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, তেমনি সামান্যাত্মক বিষয়ও আছে—যেমন মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, বৃক্ষত্ব। এ ভিন্ন উপায় নাই—কেননা তাঁহাদের গুরু বলিয়াছেন যে, বিশেষাত্মক সত্তা এবং জ্ঞান অপেক্ষা সামান্যাত্মক সত্তা এবং জ্ঞান অধিকতর সত্য,—যদিচ প্লেটোর ভিতরকার অভিপ্রায় এই যে, অবয়ব হিসাবেই উহা অধিকতর সত্য—জাতি-হিসাবে নহে (অর্থাৎ জ্ঞান এবং সত্তার সামান্য এবং বিশেষ এই-যে দুইটি অবয়ব, তাহার মধ্যে সামান্য অবয়বটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক সুতরাং অধিকতর সত্য,—এই পর্য্যন্ত; এ নহে যে, দুই-জাতীয় জ্ঞান বা সত্তার মধ্যে সামান্য-জাতীয় জ্ঞান বা সত্তা অধিকতর সত্য)। কিন্তু প্লেটোর শিষ্যেরা তাঁহার বচনের নিগূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া শুদ্ধ কেবল তাঁহার বচনটিকেই সার করিলেন; তাঁহারা এইরূপ সোজাসুজি বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইলেন

যে, সামান্য এবং বিশেষ এ দুইটি পদার্থ জ্ঞানের দুইটি অবয়ব নহে—কিন্তু দুইটি জাতি,—অর্থাৎ একজাতীয় জ্ঞান সামান্য জ্ঞান—আর এক-জাতীয় জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান; আর বিশেষ বিশেষ গো বা মনুষ্য যেমন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বিষয়, তেমনি গোত্ব বা মনুষ্যত্ব সামান্য জ্ঞানের বিষয়। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বাস্তবিক-সত্তা বিষয়ে গোত্ব-মনুষ্যত্ব গো-মনুষ্য-অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে—গো-মনুষ্যের ন্যায় গোত্ব-মনুষ্যত্বও প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্ভূত। যদিচ গোত্ব-মনুষ্যত্ব শরীরী কি অশরীরী এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া তাঁহারা নানা প্রকার সংশয়ে আক্রান্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু উহাদের যে, বাস্তবিক সত্তা আছে, এ বিষয়ে তাঁহাদের অনুমাত্রও সংশয় ছিল না। এই গতিকে, সত্তাবাদ নামক যে একটি মত তত্ত্বজ্ঞান-রাজ্যে প্রসিদ্ধ, তাহা [illegible] অঞ্চলে আধিপত্য লাভ করিল; কারণ, ঐ মতটি প্লেটোর মত—তখনকার পণ্ডিতদিগের এইরূপ ধ্রুব বিশ্বাস, ও তখনকার ধর্ম্ম মতের সহিত উহার অনেকটা ঐক্য, এই দুয়ের বলে বলী হইয়া উহা কিয়ৎকাল ধরিয়া দিব্য নিরাপদে রাজত্ব করিতে থাকিল।

ভাববাদ মত।

সত্তাবাদ—তাহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ির সময়েও—এত ভ্রমাত্মক ছিল না যে, তাহার পরে আর যে দুইটি মত আসিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করিয়াছে উভয়ের কোন-টিই তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন। প্রথমে আইলেন—ভাববাদ। গোত্ব প্রভৃতি সামান্যাত্মক ভাব-সকলের স্বতন্ত্র সত্তা যেরূপ উপহাসাস্পদ ও বোধাতীত, তাহাতে, শুষ্ক অপেক্ষা জ্ঞানের প্রতি যাঁহাদের বেশী টান তাঁহারা যে তাহার অনুমোদন করিবেন—ইহা তো হইতেই পারে না, কাজেই তাঁহারা তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। গোত্ব প্রভৃতির স্বতন্ত্র সত্তা ঘুচিয়া গেল; এখন, তাহাদের পরতন্ত্র সত্তা কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহারা স্বতন্ত্র একটি মত সংস্থাপন করিলেন—তাহা এই; বাস্তবিক-সত্তা মাত্রই বিশেষ সত্তা—কোন বাস্তবিক সত্তাই সাধারণ সত্তা নহে: অপিচ, আমাদের জ্ঞান প্রথম উদয়-কালে বিশেষাত্মক; বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হইতেই মন যাত্রা আরম্ভ করে, তাহার পরে অন্বয়-ব্যতিরেক পদ্ধতি অনুসারে (অর্থাৎ বস্তু সকলের সাদৃশ্যের প্রতি মনের অন্বয় কি না মনোযোগ এবং বৈসাদৃশ্যের ব্যতিরেক কি না বর্জ্জন—এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে) গোত্ব-মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সামান্যাত্মক ভাব সমূহ রচনা করে; এই সকল ভাবের সত্তা মানসিক সত্তা—বাস্তবিক সত্তা নহে; বৃক্ষত্ব বলিতে বাস্তবিক কোন পদার্থ বুঝায় না—মনের ভাব-বিশেষ বুঝায়। এইরূপ মতকেই ভাব-বাদ কহে।*

---

* ভাব কি না ভাবনা-রূপ ক্রিয়ার ফল—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Concept। Feeling স্বতন্ত্র এবং Concept স্বতন্ত্র। রাগ-শব্দে feeling বুঝায়। ভাব এবং রাগ দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বলিয়া চলিত ভাষায় সকল সময়ে দুয়ের পার্থক্য রক্ষিত হয় না। ইংরাজিতেও I conceive এবং I feel এ দুই কথা অনেক সময়ে অভেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রাগ বহির্বস্তুর ছাপ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ভাব মনের ভাবনা হইতে উৎপন্ন হয়—এইটির প্রতি দৃষ্টি করিলেই দুয়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। ভাব ভাবনা [illegible] সিক ক্রিয়া (function) মূলক; [illegible] বহির্বস্তুর উপরে অর্থাৎ ছাপ [illegible] এই প্রভেদটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে [illegible] থাকে না। জড় বস্তুর সহিত [illegible] সম্বন্ধ—রাগের সহিত ভাবেরও সেইরূপ; [illegible] ছাড়িয়া জড় বস্তু থাকিতে পারে না এবং জড় বস্তুকে ছাড়িয়া গতি থাকিতে পারে না, সেইরূপ ভাবকে ছাড়িয়া রাগ থাকিতে পারে না এবং রাগকে ছাড়িয়া ভাব থাকিতে পারে না। পরাকাষ্ঠা অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য ভাব সৎশব্দের বাচ্য; তাহা স্বীয় আবির্ভাব দ্বারা রঞ্জিত হয়; আবির্ভাবের রাগাত্মক উৎস আনন্দ শব্দের বাচ্য; সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান যাহা সৎ এবং আনন্দের সম্বাত

সংজ্ঞাবাদ ॥ ২৬ ॥

তৎপরেই এই এক প্রশ্ন উঠিল—সামান্যাত্মক ভাব-সকলের মানসিক সত্তাই বা কিরূপ? ইহা অতীব সুস্পষ্ট যে বহির্জ্জগতে গোত্ব বা মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, তবে কি মনোমধ্যে সেরূপ কোন পদার্থ বিদ্যমান আছে? কই? মনোমধ্যে যখন আমরা গরু ভাবনা করি—তখন বিশেষ বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট—বিশেষ বিশেষ বর্ণ-বিশিষ্ট—গরু ভাবনা করি; হয় আমরা ছোটো গরু ভাবি—নয় বড় গরু ভাবি, হয় সাদা গরু ভাবি—নয় কালো গরু ভাবি; সাধারণ গরু যাহার বিশেষ কোন বর্ণ নাই, বিশেষ কোন আকৃতি নাই—যাহা শুদ্ধ কেবল গোত্ব মাত্র, তাহা আমাদের মনের ভাবনাতেও স্থান পাইতে পারে না। অতএব গোত্ব, মনুষ্যত্ব, এগুলি শুদ্ধ কেবল মুখের বচন—শব্দ—এ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাদের সত্তা না বহির্জ্জগতেই পাওয়া যায়, না মনোরাজ্যেই পাওয়া যায়; উহাদের বাস্তবিক সত্তাও যেমন—মানসিক সত্তাও সেইরূপ, দুইই সমান অমূলক। ইহাই সংজ্ঞাবাদ। সংজ্ঞাবাদের ভিতর এমন একটি সত্য প্রচ্ছন্ন আছে—যাহা বুঝিয়া দেখিলে অকাট্য।

ভাব বাদের স্বপক্ষ সমর্থন ॥ ২৭ ॥

কিন্তু সংজ্ঞাবাদের ভিত্তি-মূলের ভিতর সং[illegible]রা নিজেই ভাল করিয়া তলা-[illegible]নাই; তাই ভাব-বাদীরা তাঁ-[illegible]আপনাদের পক্ষ সমর্থন [illegible]তাঁহাদের সহিত মিট্‌মাট্‌ [illegible]পান। ভাব-বাদীরা বলেন [illegible] প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দের ব্যবহার কালে আমরা যে, কোনও বিষয়ই মনে ভাবি না—শুদ্ধ কেবল শব্দ উচ্চারণ করি—তাহা নহে; তৎকালে বিচিত্র বস্তু সকলের মধ্যে সাদৃশ্য যাহা লক্ষিত হয়, তাহাই আমাদের ভাবনার বিষয়। এবং সেই সাদৃশ্য-টিই গোত্ব প্রভৃতি জাতি-বাচক শব্দে সংজ্ঞিত হয়। কিন্তু এ কথা খাটে না। ভাববাদী যে, আপনার গোড়ার কথাটি চাপিয়া রাখিয়া আর-এক-প্রকার কথা আনিয়া আমাদের চক্ষে ধূলি দিবেন—তাহা আমরা তাঁহাকে করিতে দিব না। ভাববাদের গোড়ার কথা এই যে, জ্ঞান দুই অবয়বে নহে—কিন্তু দুই জাতিতে—বিভক্ত, (১) বিশেষাত্মক জ্ঞান যেমন প্রত্যক্ষ, (২) সামান্যাত্মক জ্ঞান—যেমন অনুভব। ভাববাদীর মতে অগ্রে বিশেষাত্মক-জ্ঞান উপস্থিত হয় (তখন সামান্যাত্মক জ্ঞান মূলেই জন্ম গ্রহণ করে নাই) পরে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সেই বিশেষাত্মক জ্ঞান-সকলের মধ্য হইতে সামান্যাত্মক জ্ঞান-সকল (গোত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সাধারণ ভাব সকল) পরিগঠিত হয়; ইহাতে অগত্যা এইরূপ দাঁড়ায় যে, গোত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সামান্য জ্ঞান পরিগঠিত হইবার পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ গো-মনুষ্যের জ্ঞান মনোমধ্যে একাধিপত্য করে, সুতরাং তখন সামান্যাত্মক জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া বিশেষাত্মক জ্ঞান আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত; তবেই হইল যে, তখনকার বিশেষাত্মক জ্ঞান সামান্যাত্মক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র; সুতরাং সামান্যাত্মক জ্ঞানও সেই বিশেষাত্মক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত এবং স্বতন্ত্র; ইঁহাদের মোট কথা এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সামান্য এবং বিশেষ এই দুই জাতীয় জ্ঞান পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, আর উভয়ের একটি আর একটির অপেক্ষা না রাখিয়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব

তাহা চিৎশব্দের বাচ্য। চিৎ = জ্ঞান × রাগ = সৎ × আনন্দ। অতএব সৎ চিৎ এবং আনন্দ—ভাব জ্ঞান এবং রাগ—এ তিনটি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

প্রধান। এ ভিন্ন, ভাববাদীর মুখে এ কথা শোভা পায় না যে, বিশেষের সঙ্গে সঙ্গেই সামান্য জ্ঞাত হয়—গো-সকলের সঙ্গে সঙ্গেই গোত্ব জ্ঞাত হয়—সদৃশ বস্তু সকলের সঙ্গে সঙ্গেই সাদৃশ্য প্রতিভাত হয়—প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি কার্য্য করে; কেননা তাহা হইলেই তাঁহাদের গোড়ার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে এইরূপ দাঁড়াইবে যে, প্রত্যেক জ্ঞানই সামান্য এবং বিশেষ এই দুই অবয়বে বিভক্ত—কোন জ্ঞানই কেবল মাত্র সামান্য-জ্ঞান অথবা কেবল-মাত্র বিশেষ জ্ঞান নহে। কিন্তু ভাববাদী গোড়াতেই এই বলিয়া আপনার মতের মূল পত্তন করিয়াছেন যে, কেবল-মাত্র বিশেষ বিশেষ জ্ঞানই প্রথমে আবির্ভূত হয়—পরে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সামান্যাত্মক জ্ঞান পরিগঠিত হয়; তবেই হইতেছে যে, তাঁহার মতে বিশেষাত্মক জ্ঞান সামান্যাত্মক জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন—কাজেই সামান্যাত্মক জ্ঞানও বিশেষাত্মক জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি যদি আপনার গোড়ার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে চা'ন, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, তিনি সামান্যাত্মক জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপন করেন—এইটি প্রমাণ করেন যে, প্রত্যক্ষ হইতে অনুভব—গরু হইতে গোত্ব—সদৃশ বস্তু-সকল হইতে তাহাদের সাদৃশ্য—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহা তাঁহার সাধ্যাতীত। আমরা সদৃশ বস্তু না ভাবিয়া সাদৃশ্য ভাবিতে পারি না—গরু না ভাবিয়া গোত্ব ভাবিতে পারি না; কাজেই গোত্বকে গো-হইতে বিযুক্ত করিলে তাহা শুদ্ধ কেবল শব্দ-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়—তাহার কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। ভাববাদ আপনার কথাতেই আপনি মারা পড়িল, সে কথা এই যে, সামান্য-বিশেষের ভেদ—জ্ঞানের অবয়ব ভেদ নহে কিন্তু জাতি-ভেদ। ভাববাদীর উভয় সংকট; হয় তিনি সামান্য-বিশেষের পরস্পর হইতে পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করুন—নয় অস্বীকার করুন। যদি উভয়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন—যদি বলেন যে, গোত্ব প্রভৃতি সাধারণ ভাব-সকল গো প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতঃ পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তবে গোত্ব প্রভৃতি ভাব-সকল গো-প্রভৃতি বস্তু-সকল হইতে বিযুক্ত হইয়া শুদ্ধ কেবল শব্দ-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়; কারণ, ব্যক্তি-ভাবনা ব্যতিরেকে জাতি-ভাবনা অসম্ভব। এখানে সংজ্ঞাবাদীরই জিত। আবার, ভাববাদী যদি উক্ত স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন, যদি বলেন যে, সামান্য জ্ঞান এবং বিশেষ জ্ঞান—গোত্বজ্ঞান এবং গো-জ্ঞান—উভয়ে পরস্পর-সাপেক্ষ, তাহা হইলে দাঁড়ায় যে, সামান্য জ্ঞান বিশেষ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে—তাহা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে; সুতরাং তাহা জ্ঞানের আংশিক অবয়ব-মাত্র তাহা সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান নহে; কিন্তু ইহার বিপরীতে ভাব-বাদীর গোড়ার প্রতিজ্ঞা এই যে, সামান্য এবং বিশেষ এই দুই জাতীয় জ্ঞান স্ব স্ব প্রধান অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকেই অন্যটির অপেক্ষা না রাখিয়া আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, এক কথায়—উভয়ের প্রত্যেকেই সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান। এইরূপ ঘোরচক্রে পড়িয়া ভাববাদী কোন [illegible] হইবেন তাহা স্থির করিতে [illegible] ক্রমাগতই ইতস্ততঃ করেন [illegible] বলেন সামান্য বিশেষের [illegible] য়ব ভেদ, কখনও বা বলেন [illegible] ভেদ, এইরূপ এ-পাশ ও-পাশ [illegible] হ'ন। মনে কর মনুষ্যকে প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই জাতিতে বিভাগ করা হইল (যেমন জ্ঞানকে সামান্য এবং বিশেষ এই দুই জাতিতে), তাহার পরে এইরূপ সিদ্ধান্ত

করা হইল যে পুরুষই কেবল সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্য, স্ত্রী—পুরুষের অঙ্গ বিশেষ (যেমন বিশেষ জ্ঞানই সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান, সামান্য জ্ঞান বিশেষ-জ্ঞানের অঙ্গ বিশেষ), এবং পরিশেষে এইরূপ স্থির করা হইল যে, পুরুষ যদিও স্ত্রী হইতে ভিন্ন কিন্তু পুরুষ হইতে স্ত্রী ভিন্ন নহে (যেমন বিশেষ জ্ঞান সামান্য-জ্ঞান হইতে ভিন্ন কিন্তু সামান্য জ্ঞান বিশেষ-জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে)। এইরূপ—ভাববাদের অশেষ পাকচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার জটা ছাড়াইবার জন্য আর আমরা বৃথা সময় নষ্ট করিব না।

সংজ্ঞাবাদের মর্ম্ম কথা। ২৮।

এতাবৎ কাল সংজ্ঞাবাদেরই জয় দেখিতে পাওয়া গেল; কিন্তু সংজ্ঞাবাদেরও পতন নিকটবর্ত্তী। সংজ্ঞাবাদের মর্ম্ম কথা এই;—সকল সত্তাই বিশেষাত্মক; আর, সকল জ্ঞানই প্রথম উদয়-কালেও যেমন—সর্ব্বকালেই তেমনি—বিশেষাত্মক। সাধারণ ভাব বলিয়া যে, একটা সামগ্রী, তাহা না বহির্জগতে—না [illegible] —কোন [illegible] নাই। [illegible] সামান্যাত্মক জ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—বাস্তবিক তাহা সামান্যাত্মক জ্ঞান নহে, তাহা বিশেষাত্মক জ্ঞান; তবে কি না- ভাবনার অধ্যবসায়-বলে তাহা সদৃশরূপী আর আর জ্ঞানের [illegible] অভিষিক্ত হয়। সাধা-[illegible] ভাবই মনে স্থান [illegible] মন যখন ত্রিভুজ [illegible] কোন বিশেষ প্রকা-[illegible], এবং সেই বিশেষ ত্রিভু-[illegible] ত্রিভুজের স্থলাভিষিক্ত করে; নানাবিধ বিচিত্র ত্রিভুজের মধ্যে মন একটি মাত্র ত্রিভুজ ভাবে, তবে, এইটুকু কেবল হাতে রাখে যে, উহাই সর্ব্বেসর্ব্বা নহে—উহা ব্যতীত আর আর অনেক-প্রকার ত্রিভুজ সম্ভবে। যখন আমরা মনে করি যে, আমরা একটি সাধারণ ভাব ভাবিতেছি, তখন প্রকৃত পক্ষে আমরা বিশেষ কোন না কোন বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত। এইরূপ, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষাত্মক;—যাহাকে আমরা মুখে বলি—সাধারণ, তাহা বাস্তবিক বিশেষ বই আর কিছুই নহে,—অন্যান্য বিশেষের সহিত সাধারণ-সংজ্ঞক বিশেষের প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে, শেষোক্ত বিশেষকে আমরা সদৃশ বিষয়-সকলের আদর্শ পদে অভিষিক্ত করি।

তৃতীয় সিদ্ধান্তের হস্তে সংজ্ঞাবাদের মৃত্যু। ২৯।

সংজ্ঞাবাদের ভ্রম এইটি যে, আমাদের সকল জ্ঞান, অথবা কোন একটি জ্ঞান, কেবল-মাত্র বিশেষ-ধর্ম্মী। ভাব-বাদের ভ্রম যেমন এই যে, সাধারণ জ্ঞান স্বতঃ (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক ব্যতিরেকেও) উপলব্ধি-গম্য, সংজ্ঞাবাদের ভ্রম তেমনি এই যে বিশেষ, বিশেষ জ্ঞান স্বতঃ (অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক ব্যতিরেকেও) উপলব্ধি-গম্য। বাস্তবিক-বিষয় সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতেছি না, কিন্তু জ্ঞাত-বিষয় সম্বন্ধে আমরা অতীব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, কোন জ্ঞাত বিষয়ই কেবল মাত্র বিশেষ-ধর্ম্মী হইতে পারে না; কেননা আমাদের এই তৃতীয় সিদ্ধান্তের গোড়াতেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, জ্ঞান-মাত্রই সামান্য এবং বিশেষ উভয় লক্ষণাক্রান্ত। বিশেষ-জ্ঞান যদি সাধারণের সহিত সম্পর্ক রহিত কেবল মাত্র বিশেষ বলিয়া গৃহীত হয়, তবে তাহা যেমন শুদ্ধ কেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়; সাধারণ জ্ঞান বিশেষের সহিত সম্পর্ক রহিত কেবল-মাত্র সাধারণ বলিয়া গৃহীত হইলে—তাহারও দশা সেইরূপ হয়। বিশেষ জ্ঞান যাহা সামান্য-গর্ভ নহে, ও সামান্য-জ্ঞান যাহা

বিশেষ-গর্ভ-নহে, উভয়ই সমান অসঙ্গত। কারণ (তৃতীয় সিদ্ধান্তের প্রমাণ দেখ) জ্ঞান-মাত্রেরই এমন একটি অবয়ব থাকা চাই যাহা সকল জ্ঞানেরই সাধারণ ধর্ম্ম, আবার, এমনও একটি অবয়ব থাকা চাই যাহা সেই জ্ঞানটির বিশেষ ধর্ম্ম। সকল জ্ঞানই সামান্য এবং বিশেষ এই দুই অবয়বের সঙ্ঘাত। এই যুক্তিতে সংজ্ঞাবাদ সমূলে বিধ্বস্ত হইতেছে।

মোট কথা ॥৩০॥

মোট কথা এই;—যে-সমস্ত মতের বিষয় উল্লিখিত হইল তাহাদের গুরু-পরম্পরা-ভুক্ত সমস্ত ভ্রমের মূল কেবল—জ্ঞানের অবয়বদ্বয়কে জ্ঞানের জাতিদ্বয় মনে করা; এইরূপ মনে করা যে, একজাতীয় জ্ঞান বিশেষ-শ্রেণীভুক্ত—আর-এক জাতীয় জ্ঞান সামান্য-শ্রেণী ভুক্ত। এই মতটি অস্তিতত্ত্বে সংক্রামিত হইয়া অধিকন্তু এই আর-একটি ভ্রম ডাকিয়া আনিয়াছে যে, আমাদের মনোমধ্যে যেমন সাধারণ জ্ঞান আছে—বহির্জগতে তেমনি তদুপযোগী সাধারণ সত্তা আছে। সত্তাবাদ ঘোষিত হইল। সত্তাবাদের সংশোধনার্থে ভাববাদ উপস্থিত হইল। ভাববাদ বলিল যে, সাধারণ সত্তা বলিয়া একটা সামগ্রী বহির্জগতে কুত্রাপি নাই; সাধারণ সত্তা শুদ্ধ কেবল মনোরাজ্যেই ভাব-রূপে অবস্থিতি করে। তাহা স্বীয় জন্ম ভূমি হইতে—মন হইতে—স্বতন্ত্র কিছুই নহে; তাহা বস্তু-গত নহে—মনোগত-মাত্র। সংজ্ঞাবাদের আক্রমণ বলে এ মতটি ধরাশায়ী হইল। সংজ্ঞাবাদ ঠিক্‌ই বলিল যে, সাধারণ সত্তা মনো-মধ্যে ভাব রূপেও স্থান পাইতে পারে না—উহা ব্যবচ্ছিন্ন (Abstract) ভাবও নহে; মন সাধারণ-সত্তা গড়িতেও পারে না—ভাবিতেও পারে না; সাধারণ সত্তাকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখিলে তাহা আর কিছুই নহে—কেবল একটা অর্থহীন সংজ্ঞা-মাত্র—শব্দ মাত্র। সংজ্ঞাবাদ আপনার এই মঙ্গল কৃত্যটি (ভাববাদের বিনাশ-কার্য্য) সমাপন করিয়া পরিশেষে আমাদের এই তৃতীয় সিদ্ধান্তটির তোপের মুখে প্রাণত্যাগ করিল। বিশেষ বিশেষ বিষয়-সকলের স্বতন্ত্র সত্তা বহির্জগতে আছে কি না—এ বিষয়ে জ্ঞানতত্ত্ব কোন কথাই বলিতেছে না; কিন্তু এ কথাটি জ্ঞানতত্ত্ব ধ্রুব রূপে প্রতিপাদন করিতেছে যে, ঐ সকল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপযোগী যে, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান, তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা মনোমধ্যে কুত্রাপি নাই; ব্যবচ্ছিন্ন ভাবরূপেও তাহারা মনোমধ্যে স্থান পাইতে পারে না! কারণ, এই তৃতীয় সিদ্ধান্তে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, কোন জ্ঞানেরই এরূপ সাধ্য নাই যে তাহা সামান্য-নিরপেক্ষ বিশেষকে—অথবা বিশেষ-নিরপেক্ষ সামান্যকে—আপন অভ্যন্তরে স্থান দান করে। তৃতীয় সিদ্ধান্তে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জ্ঞানই সামান্য এবং বিশেষ এই দুই অবয়বের সঙ্ঘাত। যাঁহারা আমাদের এ কথায় সায় দিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা প্রচলিত মতের নথ দর্পণ-স্বরূপ তৃতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই—যেটি তাঁহারা চা'ন সেইটি পাইয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন।

ব্যবচ্ছিন্ন এবং সংহত [illegible]

উপসংহারস্থলে এই [illegible] আবশ্যক যে, তত্ত্ব জ্ঞান [illegible] মনোবিজ্ঞানের দিকে যে [illegible] তাহার ভ্রম ঘনীভূত হ [illegible] মনোবিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের অ [illegible] য়াছে। বিশেষতঃ ব্যবচ্ছেদ-বাদ The [illegible] of Abstraction (যাহা মনোবিজ্ঞানের একটি সাধের সামগ্রী) তাহা কত যে ভ্রমের জন্মদাতা তাহার সংখ্যা করা যায় না। মনো-

বিজ্ঞানীরা যতই কেন চারিদিক বাঁচাইয়া আপনাদের মতের ব্যাখ্যা করুন না—কিন্তু ব্যবচ্ছেদন Abstraction বলিয়া যে একটি মানসিক বৃত্তি তাঁহারা মনুষ্যের স্কন্ধে আরোপ করিয়া থাকেন তাহার ন্যায় বিভ্রান্তি-জনক ব্যাপার কুত্রাপি সম্ভবে না। তাঁহারা মনে করেন যে,ব্যবচ্ছিন্ন ভাব-সকল সংগঠন করিবার একরূপ শক্তি আমাদের আছে; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা আমরা বলিয়াছি তাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, সেরূপ কোন শক্তিই আমাদের নাই; আর, কোন জ্ঞানই কোন প্রকার ব্যবচ্ছিন্ন ভাবে (যেমন বিশেষ হইতে ব্যবচ্ছিন্ন সামান্যে—অথবা সামান্য হইতে ব্যবচ্ছিন্ন বিশেষে) কোনক্রমেই পৌঁছিতে পারে না, পারে কেবল তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে। যখন আমরা কোন জ্ঞানের সামান্য অবয়ব অপেক্ষা বিশেষ অবয়বটির প্রতি অথবা বিশেষ অবয়ব অপেক্ষা সামান্য অবয়বটির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হই,তখন আমরা সেই ব্যবচ্ছিন্ন বিশেষের (যেমন গোত্ব-ব্যতিরিক্ত গোর—[illegible] অথবা সেই ব্যবচ্ছিন্ন সামান্যের (যেমন গো ব্যতিরিক্ত গোত্বের—ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত জাতির) অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হই—এই পর্য্যন্ত; তা ভিন্ন—তাহায় পৌঁছিতে পারা অসম্ভব; [illegible]—না যেহেতু জ্ঞানের ঐ দুই [illegible]বের একটিতে পৌঁছিতে [illegible] সমূলে উচ্ছেদ করিতে [illegible]চ্ছেদ হইলেই—অপর[illegible]ায় যা'ক্—উল্টা আরো [illegible] প্রাপ্ত হয়। বরং মনো[illegible] এই কথা বলিতেন যে, [illegible]তর এরূপ একটি বৃত্তি আছে যাহা ব্যবচ্ছিন্ন ভাব-সকলের নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রতিরোধ করে, তবে সে কথার মধ্যে অনেক সত্য থাকিত; কেননা ব্যবচ্ছিন্ন-বিষয়ক ভাবনা একটি স্ববিরোধী ব্যাপার—জ্ঞানের সংসারে তাহা দ্বারা কোন কার্য্য দর্শিতে পারে না। ব্যবচ্ছিন্ন-বিষয়ক ভাবনা বাস্তবিক কিছু আর ভাবনা নহে—তাহা ভাবনার ভান-মাত্র। সমস্ত জ্ঞানই—সমস্ত ভাবনাই—সংহত Concrete লক্ষণাক্রান্ত, এবং তাহারা সংঘাত লইয়াই ব্যাপৃত—যেমন সামান্য এবং বিশেষের সংঘাত। জ্ঞানের সংহত সত্তার মূলীভূত সেই সামান্য এবং বিশেষ যে, কি, তাহা পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তে ব্যক্ত হইতেছে।

ঋষি-জীবন।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের অরণ্য সকল এক সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা নিবসিত ছিল, যাঁহারা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বর ধ্যানে, ধর্ম্মচর্চ্চায়, বিদ্যালোচনায়, এবং গ্রন্থ রচনায় সময় যাপন করিতেন, যাঁহাদিগের হস্তে আর্য্যজাতির বালকদিগের শিক্ষাকার্য্য সমর্পিত ছিল, যাঁহারা রাজ্যের মঙ্গল সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, যাঁহারা রাজসভায় গিয়া রাজকার্য্য বিষয়ে উপদেশ দিতেন, যাঁহাদিগের আশ্রম হইতে সর্ব্বদা উত্থিত যজ্ঞধূম দ্বারা অরণ্যের বৃক্ষ পত্র সকল ম্লানীভূত হইত, এবং যাঁহাদিগের পবিত্র সামগান দ্বারা বন উপবন সকল সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইত। সে সম্প্রদায়ের লোক এখন আর দৃষ্ট হয় না। ঋষি সম্প্রদায় ভারতবর্ষ হইতে একবারে স্বপ্নবৎ অন্তর্হিত হইয়াছে।

ভট্ট মোক্ষমূলর বলেন যে ঋগ্বেদের সময়ে ঋষি সম্প্রদায় বলিয়া কোন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল না। সমস্ত আর্য্য অথবা হিন্দুজাতিই ঋষির জাতি ছিল। প্রত্যেক গৃহের কর্ত্তা নিজে প্রাত্যহিক হোম করিতেন ও বেদের স্তোত্র

সকল গান করিতেন। প্রত্যেক গৃহের কর্ত্তা ঋষি ছিলেন। ঋগ্বেদের স্তোত্রের শিরে এই সকল ঋষিদিগের নাম উক্ত আছে। তৎপরে যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এইরূপ জাতি বিভেদের সৃষ্টি হইল তখন ঋষি সম্প্রদায় বলিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। যে সকল ব্রাহ্মণ লোকালয়ে থাকিয়া ধ্যানের অথবা বিদ্যাচর্চ্চার অথবা গ্রন্থরচনার সুবিধা বোধ করিতেন না তাঁহারা স্ত্রী পুত্র সহিত অরণ্যে বাস করিতেন। ইঁহারাই পরে ঋষি বলিয়া আখ্যাত হয়েন। এই ঋষিশ্রেণী বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বী লোক দ্বারা পরিপুষ্ট হইত। শাস্ত্রে আছে যে বৃদ্ধ হইলে—

"পুত্রেষু দারান্ নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈববা।"

স্ত্রীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বনে যাইবে অথবা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। এখনও সকল দেশে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা অথবা বিদ্যাচর্চ্চা অথবা গ্রন্থরচনা জন্য নগরে বাস অনুকূল মনে করেন না তাঁহারা পল্লিগ্রামে গিয়া বাস করেন। এখনও যাঁহারা বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া অবশিষ্ট জীবন নির্জ্জন বাসে অতিবাহিত করিতে চাহেন তাঁহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া পল্লিগ্রামে বাস করেন। এই সকল লোকের সঙ্গে ঋষিদিগের তুলনাই হইতে পারে না। আমাদিগের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে মানব হৃদয়ে নির্জ্জনবাসের দিকে একটি প্রবণতা আছে যাহা ঋষিসম্প্রদায়ের সৃষ্টির কারণ। কিন্তু যিনি নির্জ্জনে বাস করেন তিনিই ঋষি নহেন। ঋষিদিগের ন্যায় লোক এক্ষণে কোথায় পাওয়া যাইবে? সেই দেবোপম মহাত্মা ব্যক্তিদিগের গভীর ধর্ম্মপ্রাণতা, বিদ্যানুরাগ, নিঃস্বার্থ লোকোপকার, বিপুল তেজস্বিতা এক্ষণে কোথায় মিলিবে? এই ঋষি সম্প্রদায় বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সময় হইতে ঋষি সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি এবং দণ্ডী পরমহংস প্রভৃতি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সকল উদিত হইয়াছে। এই সন্ন্যাসীদিগের প্রতি লোকের ভক্তি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল আর অরণ্যবাসী অথচ গৃহস্থ ধার্ম্মিকের প্রতি সম্মানের যত হ্রাস হইতে লাগিল তত ঋষি সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকিল। ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেই গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্র ছিল কিন্তু শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত সম্প্রদায়ের লোক সন্ন্যাসী। দার্শনিক বিষয়ে নানা প্রকার মত প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিন্তু ইঁহারা সকলে বৈদান্তিক মতাবলম্বী। ইঁহাদিগের ও প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী নামে এক সম্প্রদায় ছিল বটে যথা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাসী কিন্তু তখনও নিয়ম ছিল যে প্রথমোক্ত তিন আশ্রমের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া হউক অথবা গৃহস্থাদি তিন আশ্রমের মধ্যে উপযুক্ত হইলে যে আশ্রম হইতেই হউক সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারিত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের নিয়মানুসারে লোক একেবারে সন্ন্যাসী হইতে পারে। পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী [illegible] প্রস্থ ও সন্ন্যাসী কেবল [illegible] ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন [illegible] পারিত, কিন্তু শঙ্করাচা[illegible] শূদ্র জাতির লোকও [illegible] আর সন্ন্যাসী হইলে[illegible] প্রাচীন কালে সন্ন্যাসীর [illegible] সে নাম অত্যাশ্রমী। বৃহদা[illegible] নিষদে উক্ত আছে যে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যখন অত্যাশ্রমী হইবার মানস করিলেন তখন তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে তাঁহার বিত্ত বিভাগ

করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মৈত্রেয়ী নামক স্ত্রী এই কথা বলিয়া সেই বিত্তের অংশ লই-লেন না যে

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কি মহং তেন কুর্য্যাং।"

যাহাতে আমি অমৃত না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব? অত্যাশ্রমীরা সকল আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বেড়াইতেন।

"গাং পর্য্যটং ত্যুষ্টমনা গতস্পৃহঃ।"

তাঁহারা সকল স্থানে হতত্রপ অর্থাৎ লজ্জাবিহীন হইয়া অনন্তের নাম ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন।

"নামানি অনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্।"

তাঁহাদিগের আর এক নাম পরিব্রাজক ছিল। যাঁহারা বংশ পরম্পরাগত ঋষি তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আদৌ বি-বাহ করিতেন না। চিরকৌমার ব্রত অব-লম্বন করিয়া কেবল তপস্যায় ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন যাপন করিতেন।

প্রাচীন ঋষি সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রে-ণীতে বিভক্ত ছিল যথা দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি। ব্রাহ্মণ জাতীয় ঋষি ব্রহ্মর্ষি বলিয়া খ্যাত হইতেন। কেবল ক্ষত্রিয় রাজারা রাজর্ষি হইতে পারিতেন। তাঁহাদি-গের আর বনে বাস করিতে হইত না। রাজকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মযোগ করি-[illegible] রাজা রাজর্ষিদিগের মধ্যে [illegible] দেবর্ষিরা ব্রহ্মর্ষি অপেক্ষা [illegible]। ঋষি মুনির মধ্যে বি-[illegible] না। ঋষি শব্দ এমন [illegible]ৎপন্ন হইয়াছে যাহাতে [illegible] ব্রহ্মমননশীল ব্যক্তিই [illegible] আখ্যাত হইতেন। যাঁহারা তাঁ-হাদিগের অপেক্ষা অগ্রসর ও যাঁহাদিগের ব্রহ্ম দর্শন উজ্জ্বলতর তাঁহারা ঋষি নামে খ্যাত হইতেন।

ঋষিরা তপস্বাধ্যায়ে কালযাপন করি-তেন। এ দিকে যজ্ঞের সময় নৈসর্গিক পদার্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্রাদিকে আহুতি প্রদান করিতেন কিন্তু ধ্যানের সময় সেই নিরাকার অনন্ত পুরুষেরই ধ্যান করিতেন। তাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধনে হঠ যোগ অভ্যাস করিতেন না। হঠযোগ আধুনিক কালের সৃষ্টি। পাতঞ্জল সূত্রে বিবৃত সহজ-প্রণায়াম-প্রধান রাজ যোগ অভ্যাস করিতেন। ম-নের শক্তি ও শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা জন্য যোগের নিয়ম সকল পালন করিতেন। দিন রাত্রি স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ ধ্বনিতে ত-পোবন সকল প্রতিধ্বনিত হইত। বেদাঙ্গ শিক্ষা শাস্ত্রের নিয়মানুসারে স্বাধ্যায় কার্য্য সম্পন্ন হইত। বেদ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঋষি দ্বারা বিরচিত। ঋষিরা অনুমতি না দিলে কোন নূতন রচিত বেদ বেদ মধ্যে গণিত হইত না। ঋষিরা বে-দের পরিশুদ্ধতা রক্ষার্থে অতিশয় সতর্ক ছিলেন। তাঁহাদিগের মনোযোগ নিবন্ধন ব্রাহ্মণকুলে এই বেদের পরিশুদ্ধতার প্রতি যত্ন চিরকাল প্রবল আছে। এই জন্য কাশ্মীরে প্রাপ্ত বেদও কন্যাকুমারীকায় প্রাপ্ত বেদের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না। বরং রামায়ণ মহাভারতাদির পাঠে প্রভেদ লক্ষিত হয় কিন্তু বেদে সেইরূপ হয় না। প্রাচীন ঋষিরা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ বেদের এই ষড়ঙ্গানু-শীলনের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। ঋষিরা কেবল তপস্বাধ্যায় ও বেদাঙ্গের অনু-শীলনে কালযাপন করিতেন এমন নহে। অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা দ্বারা লোকের উপকার সাধনের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। তাঁহারা লোকের উপকার সাধন অভিপ্রায়ে রাজনীতি, ধনুর্ব্বিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, নৌচালনবিদ্যা, এইরূপ নানা

বিদ্যা বিষয়ে এমন কি ঘোড়ার নাল দেওয়া বিদ্যার বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিতেন। যাহাতে লোকের উপকার হয় এই অভিপ্রায়েই করিতেন। ঋষিরা রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থে এরূপ রাজনীতিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে ব্যবসায়ী রাজনীতিজ্ঞ পুরুষেরা কোথায় আছেন? তাঁহারা মধ্যে মধ্যে রাজসভায় গিয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ ও রাজনীতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিলে ঋষিদিগের শান্তিসম্পন্ন তপোবনে বিলক্ষণ গোলমাল পড়িয়া যাইত। রাজা অত্যাচারী হইলে তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহার অত্যাচার নিবারণ করিতেন। পুরাণে কথিত আছে যে বেণ রাজা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিলে সকল ঋষি একত্রিত হইয়া তাঁহার অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। অতএব পাঠক যদি এরূপ মনে করেন যে ঋষিরা সাংসারিক কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমের আর অবধি নাই। আইস আমরা বাল্মীকি ঋষির দৃষ্টান্ত লই, দেখি তিনি কি করিতেন। তিনি ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, প্রত্যহ পঞ্চ যজ্ঞ করিতেন, অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য অন্যান্য যজ্ঞ করিতেন, শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করিতেন, বৃহৎ কবিতাগ্রন্থ রামায়ণ রচনা করিতেন, সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করিতেন, শিষ্যদিগকে সঙ্গীত শিখাইতেন এবং রাজসভায় তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তাহাদিগের সঙ্গীতনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়াইতেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকের নিকট হইতেও ইহা অপেক্ষা আর অধিক কার্য্যশীলতা কি প্রত্যাশা করিতে পারা যাইতে পারে?

ঋষিদিগের শিষ্যেরা কিপ্রকারে কালযাপন করিতেন তাহা না লিখিলে ঋষিজীবনের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ হয় না। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রত্যেক দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্রকে বেদাধ্যয়ন জন্য ঋষির আশ্রমে কয়েক বৎসর যাপন করিতে হইত। ইহাঁরা ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত ছিলেন। কামাচরণ ও বিলাসিতা হইতে সম্যকরূপে তাঁহারা বিরত থাকিতেন এই জন্য তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকা হইত। তাঁহাদিগকে ঋষির ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে হইত, ঋষির গোচারণ করিতে হইত, ঋষির জন্য নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা করিতে হইত,* ঋষি যখন নিকটস্থ নদীতে স্নান করিতে যাইতেন তখন তাঁহার বল্কল বহির্ব্বাস হস্তে করিয়া লইয়া যাইতে হইত, গুরু না ভোজন করিলে তাঁহারা ভোজন করিতে পাইতেন না ইত্যাদি কঠোর নিয়ম সকল পালন করিতে হইত। এই সকল নিয়মের মুখ্য উদ্দেশ্য ছেলাবেলা হইতে কষ্ট সহিষ্ণুতা বিনয়, বশম্বদতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি অভ্যাস। ঋষিশিষ্য রাজপুত্রকে পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম পালন করিতে হইত। এই সকল নিয়ম পালন বশতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষে এত শূর বীর উৎপন্ন হইত। এক্ষণকার কলেজের ছাত্রদিগের ন্যায় ঋষিদিগের ছাত্র ছিল না। এক্ষণকার ধনীপুত্র কলেজের ছাত্র যেরূপ সৌখিন, লেবেণ্ডরের গন্ধ গায়ে ভুর-ভুর করিতেছে, ঋষিদিগের ছাত্রেরা সেরূপ ছিলেন না। এক্ষণকার ছা[illegible] ঋষিদিগের ছাত্রেরা উচ্ছৃ[illegible] প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন ছিলে[illegible]

হায়! হায়! এই [illegible] ছাত্র বৃন্দ ভারতবর্ষ হই[illegible] হইয়াছে। সেই সকল [illegible]

* ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত তাহাতে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের অনেক নিয়ম প্রচলিত আছে যেহেতু বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মসম্ভূত। ব্রহ্মদেশে ফুঙ্গী নামক ধর্ম্মযাজকদিগের শিষ্যেরা ফুঙ্গী জন্য নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা করে।

কল ঋষির আশ্রম কোথায় গেল? ঋষিরা যে সকল অরণ্যস্থ আশ্রমে বাস করিতেন তাহা পরম শান্তির আস্পদ ছিল। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলাতে যখন রাজা কণ্ব মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন তখন এই কথা বলিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন যে "শান্তমিদং আশ্রমপদং" এই আশ্রম কি শান্ত! বস্তুতঃ ভূধর, বনরাজি, স্রোতঃস্বতী প্রভৃতি অচেতন বস্তুর শান্তিরসাস্পদতা ও স্তব্ধ কিন্তু সজীব অমৃতভাব কি তাহা কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিরা উপভোগ করিতেন। বাহ্যে তাঁহাদিগের আশ্রমে যেমন শান্তি বিরাজ করিত ব্রহ্ম নিদিধ্যাসন নিবন্ধন তাঁহাদিগের অন্তরেও সেইরূপ শান্তি বিরাজ করিত। শকুন্তলার কণ্ব ঋষির আশ্রমের বর্ণনা এত উৎকৃষ্ট যে পাঠকবর্গকে একবার পুনরায় তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ঋষিরা কিরূপে কাল যাপন করিতেন নিম্নে ক্ষুদ্র নাটকচ্ছলে প্রদর্শিত হইল। এই নাটকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঋষির নাম উল্লেখিত হওয়াতে যে অব্দাশুদ্ধি দোষ ঘটিয়াছে পাঠকবর্গ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

স্থান—কোন অরণ্যে ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি—ঋষিবৃন্দ।

[illegible] ঋষি—ওহে কারায়ণ। তুমি সম্প্রতি নগরে [illegible] গিয়ে সেখানে কি দেখিলে বল।

[illegible] (কারায়ণ)—আমি যে দিন নগরে [illegible] মহারাজ ললিতাদিত্য শকদিগকে [illegible] র প্রবেশ কার্য্য সমাধা করেন [illegible] কি বর্ণন করিব? সেই দুন্দুভিরব, [illegible] র রণবাদ্য বাদন, রথচক্রের সংঘর্ষণধ্বনি, [illegible] শ্রেণীর শোভা ও তাহাদের পত পত শব্দ, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, বাতায়ন হইতে সীমন্তিনীগণের দ্বারা পুষ্প বর্ষণ, ধৌম্য পুরোহিত পুরোভাগে সাম ও যাম গান করত পূতোদক ঢালিতে ঢালিতে যাইতেছেন সে এক দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা কখন ভুলিব না। আমাদিগের রাজার ন্যায় * এমন রাজা কি আর হয়? এমন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা কোথায় দেখি নাই। তিনি তাঁহার সিংহাসনের নিম্নে উপবিষ্ট শাস্ত্রবিৎ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্য করেন না। দ্বিতীয় জনকের ন্যায় রাজ কার্য্যের সময়ে যোগে নিমগ্ন থাকেন অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়কার্য্য সমাধা করেন। শুনিতে পাই তাঁহার শাসন তীব্র। শাসন তীব্র কিন্তু কোন অধর্ম্ম করেন না। কেবল দুরন্ত লোকের সম্বন্ধেই তাঁহার শাসন তীব্র। শুনিতে পাই যে মধ্যে মধ্যে এইরূপ তীব্রতা প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া তিনি দুঃখিত। বৃদ্ধ রাজা শীঘ্র আমার শিষ্য তাঁহার পুত্র নীলধ্বজকে আশ্রম হইতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়া আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন।

ঋষিগণ সমস্বরে। সাধু! সাধু!

দ্বিতীয় ঋষি—নীলধ্বজের স্বভাব কি মধুর! যেমন রূপ তেমনি তাহার স্বভাব। তিনি সুকুমারবপু রাজকুমার হইয়াও ব্রহ্মচর্য্যের যে সকল কঠিন নিয়ম আছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন। সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষু নিম্নে পতিত হইয়া রহিয়াছে! গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাদিগের প্রতি একবারও তাকান না।

ঋষিগণ সমস্বরে—সাধু! সাধু!

তৃতীয় ঋষি—শুনিতেছি রাজমহিষী শীঘ্র নাকি ঋষিপত্নীদিগকে দেখিতে আসিবেন। তিনি যখনই আমাদিগের আশ্রমে আইসেন তখন পেটকে করিয়া ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যাদিগের জন্য স্বর্ণালঙ্কার লইয়া আইসেন। এমন ধর্ম্মপরায়ণা রাজ্ঞী আমরা কখন দেখি নাই। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকার্য্যের প্রতি তাঁহার কি অনুরাগ! এমন রাজার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী বটে!

ঋষিগণ সমস্বরে। সাধু! সাধু!

চতুর্থ ঋষি—শুনেতিছি, রাজা না কি শীঘ্র এক মহাযজ্ঞ করিবেন কিন্তু কি যজ্ঞ করিবেন তাহা নির্ণীত হয় নাই।

চতুর্থ ঋষি—সুসমাচার বটে। কেবল ফলমূল খাইয়া মরি। একদিন চর্ব্বচোষ্য লেহ্য পেয় খাইয়া পরিতুষ্ট হওয়া যাইবে।

প্রথম ঋষি—তুমি যে নিতান্ত ঔদরিকের ন্যায় কথাটা বলিলে হ্যাঁ।

চতুর্থ ঋষি—"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ" শ্রুতিই আছে।

---

* "আমাদিগের রাজা" এই শব্দ কি মনোহর! তখন ভারতের সকল খণ্ডের লোকে "আমাদিগের রাজা" এই প্রয়োগ করিতে সমর্থ ছিলেন। সে কাল আর আসিবে না।

আহার না থাকিলে মনুষ্য কি কখন জীবন ধারণ করিতে পারিত না কাজ করিতে পারিত? আহার অভাবে লোকে কি না করে ও কি কষ্ট না পায়। চক্রায়ণ ঋষি বুভুক্ষিত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে কুল্মাস খাইয়াছিলেন। এবং অন্য এক ঋষি বলিয়াছেন "অনসনাৎ ঋগাদয়ো ন প্রতিভাস্থিমে" "অনসনপ্রযুক্ত ঋক্ সকল আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না।"

প্রথম ঋষি—ওহে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা অনাহারে ক্লিষ্ট ঋষির মুখে শোভা পায়। তুমি যে পরিমাণে প্রত্যহ রসাল ফল সকল পার কর, তাহাতে তোমার মুখে অমন কথা শোভা পায় না।

চতুর্থ ঋষি—আশ্রমের কি কঠিন নিয়ম! এক দিনও ভাল খাইবার কথা বলিবার জো নাই।

পঞ্চম ঋষি—অধম আহারের কথা পরিত্যাগ করিয়া এস অন্য সকল কথা কহা যাউক। তপঃপ্রভাব ও দেবপ্রসাদ সম্পন্ন বরণীয়মূর্ত্তি শুভ্র শ্মশ্রুধারী মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর একটি নূতন উপনিষদ রচনা করিয়াছেন। তাহার অধিকাংশ শ্লোক অন্য উপনিসদ হইতে সঙ্কলিত কিন্তু তাঁহার নিজের রচিত শ্লোকও তাহাতে আছে। তিনি আমাকে সে উপনিষদ দেখাইয়াছিলেন। তিনি শীঘ্র আমাদিগের সংসদে তাহা পাঠ করিবেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তিনি তাহা পাঠ করিলেই এ অরণ্যের ঋষিগণ তাহা বেদ মধ্যে পরিগণিত হইতে আদেশ করিবেন। তাঁহার সংগ্রহ ভাল হইয়াছে। আমাদিগের এ অরণ্যে পাঠ করিয়া অন্যান্য অরণ্যের ঋষিদিগের সমুখে তাহা পাঠ করিবেন। সকল ঋষিরা যে উহা বেদ মধ্যে পরিগণিত হইতে সম্মতি প্রদান করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

প্রথম ঋষি—কাত্বায়ণ! আমি, মহাভাগের একটি স্তব রচনা করিব। যে দিন তিনি আমাদিগের আশ্রমে আসিবেন তাহার পূর্ব্বে অবশ্য আমাদিগকে সম্বাদ দিবেন। তুমি প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে আগমন করিয়া সেই স্তব গান করত তাঁহাকে আমাদিগের অরণ্য মধ্যে লইয়া আসিবে।

দ্বিতীয় ঋষি (কাত্বায়ণ) তথাস্তু। ইহা অপেক্ষা আনন্দজনক কার্য্য আর কি আছে?

প্রথম ঋষি—যে দিন মহাভাগ আমাদিগের আশ্রমে আসিয়া উপনিষদ শুনাইবেন, সে দিন কি শুভদিন! অনন্তের নাম কি মধুর। "স্বাদু স্বাদু পদেপদে" যে পূর্ণিমার রাত্রিতে আকাশ নির্ম্মল হয় সেই রাত্রিতে ঐ নাতি উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে উপবিষ্ট হইয়া সমস্তরাত্রি ব্রহ্মবিচারে ও ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তনে আমরা কি মধুররূপে যাপন করি! সেই ঋষিসঙ্ঘজুষ্ট পরম পবিত্র অমৃত পুরুষকে অভিবাদন করি।

ষষ্ঠ ঋষি—প্রথম ঋষির প্রতি—যাস্ক ঋষি যে নিরুক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা কি আপনি দেখিয়াছেন?

প্রথম ঋষি—দেখিয়াছি। অত্যন্ত প্রাচীন ঋকে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের তিনি প্রকৃত অর্থ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমি তাঁহাকে দেখাইয়া দিই যথা "অসুর" শব্দ। ঐ শব্দ ঐ সকল ঋকে দেবতা বুঝায়।

সপ্তম ঋষি—পরাশর তাঁহার কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ শেষ করিলেন বলে, তাহার বিলম্ব নাই।

অষ্টম ঋষি—সে গ্রন্থ সমাপ্ত হইলেই আমি তাহার এক প্রতিলিপি লইয়া নিকটস্থ গ্রামের কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিব তাহা হইলে তাহাদিগের মহোপকার হইবে।

নবম ঋষি—স্থূলহোত্রী ঋষি ঘোড়ার নাল বাঁধার বিষয়ে লিখিতে গেলেন কেন? আর কি লিখিবার বিষয় পেলেন না?

প্রথম ঋষি—স্থূলহোত্রী বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তিনি এক মহাশাল গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহার অনেক অশ্ব ছিল, অশ্ব বড় ভাল বাসিতেন, অশ্বের বিষয় উনি খুব জানেন, যে যাহা জানে তাহা দ্বারা লোকের উপকার করা এই আমাদিগের উদ্দেশ্য তুমি তাহাতে এত বিরক্ত কেন? এক্ষণে এসো আমরা একটি সাম গান করিয়া সংসদ ভঙ্গ করি।

সমস্বরে গান।

কি মাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং বং স্তোতারং জিঘাংসসি

সখায়ং। প্রতন্মে বোচো দূড়ভ সধাবোহব ত্বানেনা

নমসা তুর ইয়াং।*

আমরা আশা করি যে আমাদিগের বর্ত্তমান উপন্যাসরচয়িতাদিগের মধ্যে কেহ প্রাচীন ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিয়া একটী উপন্যাস রচনা করিবেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার বর্ণনাগর্ভ উপন্যাস অবশ্য ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইবে। আমাদিগের প্রার্থ[illegible] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম[illegible] ন্যাস রচনার ভার গ্রহণ[illegible]

* হে জ্যেষ্ঠ বরুণ! তোমার স্তোতা [illegible] সখা যে আমি কি পাপ করিয়াছি যে তুমি আমার অনিষ্ট করিতেছ। ইত্যাদি

যে মন্ত্রটি উপরে উদ্ধৃত হইল তাহা ঋক মন্ত্র। ঋক মন্ত্র ও সাম মন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে ঋক মন্ত্র সকল সাম বেদে গানে বসান হইয়াছে। সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঐরূপ।

উপদেশ।

অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাপং
চন্দ্রইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য
ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা—
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামি।

আমরা যাঁহার উপাসনা করি তিনি শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পরিশুদ্ধ ও অপাপগম্য। তাঁহার পবিত্র সহবাসের জন্য উৎসুক হইয়া কাতরপ্রাণে তাঁহার নিকটে গমন করিতে হইলে প্রথমে নিজ নিজ হীন ও মলিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে তাঁহার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সংসার ধন্দায় পতিত হইয়া আমারদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, আত্মা বিকল হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল বিকল উপাদান উপকরণ লইয়া আমরা কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইতে সাহস করিতে পারি। যখন সমল আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, তখন কেমন করিয়া পাপে তাপে শোকে গ্লানিতে ম্রিয়মান আত্মা তাঁহার অনন্ত উজ্জ্বল ভাব প্রতিফলিত করিবে। নিশ্চল সাগরবক্ষে পূর্ণচন্দ্রমা প্রতিবিম্বিত হইলেও সামান্য বায়ুহিল্লোলে যখন উহা সাগরের আবর্ত্তের অন্তর্ভূত হইয়া যায়, তখন অসুমার্জ্জিত আত্মা বিষয়ের প্রবল বিলোড়নের মধ্যে আর কতক্ষণ অনন্তদেবকে ধারণ করিয়া রাখিবে। আত্মার অমূল্য অধিকার বিস্মৃত হইয়া বিষয় সুখকে সর্ব্বস্বজ্ঞানে করিয়া ইতস্তত ভ্রাম্যমান হইতেছি, সেই জন্য বাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় আত্মার দৃষ্টি পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—সেই জন্য না পাইতে পাইতেই তাঁহাকে হারাইয়া ফেলি।

[illegible] আমারদের অবস্থা এমন শোচ[illegible] [illegible]রদের মধ্যে সাধনার এত অ[illegible] কেমন করিয়া আমরা ব্রহ্মধামে গমন [illegible]বার উপযুক্ত হইতে পারি। তবে কি আমারদের কোন আশা নাই, আমরা কি চিরকাল নিরাশার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মধাম সেই আনন্দধামের যে ক্ষীণালোক বিজলীর ন্যায় আমারদের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে উন্মীলিত হইতেছে, আমরা কি ইচ্ছা করিলে অধিকতর উজ্জ্বলরূপে ও স্থায়ী ভাবে তাহা দর্শন করিয়া হৃদয় মন আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিব না। আহার বিহার আমোদ প্রমোদ ধন ঐশ্বর্য্য বিষয়ের আকর্ষণ কই তাহারদের মধ্যে স্থায়ী সুখ কোথায়? "আজ আসে কাল চলে যায় জগতের বিশ্রাম কোথায়," প্রিয়যোগে অপ্রিয় বিনাশে যে আমরা পূর্ব্বাবস্থা হইতে সামান্য তৃণের ন্যায় শত যোজন অন্তরে নিপতিত হইতেছি, যখন আমারদের সুখ ঐশ্বর্য্যের অবস্থা এমন চঞ্চল তখন কেমন করিয়া আমরা তাহার উপর (রাজ) আনন্দের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া সুস্থির হইতে পারি। যদি দিবা সুখে সুখী হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে চাও, বিষয় হইতে প্রবল বহির্ম্মুখী ইচ্ছাকে প্রত্যাহার করিয়া আপনার শুদ্ধ স্বরূপের মধ্যে কেন্দ্রীভূত কর। আমরা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় বিলক্ষণ বুঝিয়াছি "নাল্পে সুখমস্তি," "বিষয়ের সুখ যাহা জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে"।

যখন বহির্বিষয়গত ইচ্ছাকে সংযত করিয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রবল করিতে থাকি তখন বুঝিতে পারি "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে শান্তিপ্রস্রবণ পরিশুদ্ধ পরমদেব বর্ত্তমান। তাঁহাকে অনিমিষ নয়নে সর্ব্বত্র সমানভাবে দর্শন করিতে হইলে পাপমলা প্রক্ষালিত করিতে হয়, হৃদয়কে পবিত্র করিতে হয়, সাধনার ভাবকে জাগ্রত করিতে হয়।

"অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাপং।"

অশ্বের ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে হইবে। অশ্বমেধ যজ্ঞে শ্বেতলোম অশ্বের প্রয়োজন। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্বেতকায় অশ্ব সুদুর্লভ বোধে কৃষ্ণবর্ণরোমরাজি উৎপাটিত করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে মেধ্য করিতে হয়। আমরাও যদি ঈশ্বরের মেধ্য হইতে চাই তাঁহার নিকটে আপনাকে উৎসর্গ করিতে চাই, পাপচিন্তা পাপালাপ পাপকার্য্য বিবর্জ্জিত হইতে হইবে।

চন্দ্রইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য।

আমরা বিমল হৃদয় লইয়া পৃথিবীতে

জন্মগ্রহণ করিলেও পাপ প্রলোভন হইতে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিতে না পারিয়া একান্ত তাহার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি। সহস্ররশ্মি পূর্ণচন্দ্র রাহুমুখ হইতে বিমুক্ত হইলে যেমন স্বস্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, আমরাও আপনাদিগকে পাপের করাল বদন হইতে রক্ষা করিতে পারিলে তবে তাঁহার সহবাসের যোগ্য হই।

ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামি।

আমাদের শরীর অকৃত অসংস্কৃত, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও উহাকে সংস্কৃত করিতে পারি না। বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য, ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিয়া শরীর মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিরোধ করে কাহার সাধ্য। "যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।" কিন্তু আত্মা কৃতাত্মা, যত সংস্কৃত করিবে ততই উহা উৎকর্ষলাভ করিবে, ততই উহার বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হইবে। ততই উহা যোগানন্দে প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া স্রষ্টার আনন্দজনন প্রেমোজ্জ্বল মুখ নিরীক্ষণে কৃতার্থ হইতে থাকিবে। আত্মা ঈশ্বরের সুকোমল হস্তে তাঁহার সুমহান লক্ষ্য সংসাধনের জন্য অনন্ত আয়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যতই ইহাকে জ্ঞানধর্ম্মে প্রীতি পবিত্রতায় অলঙ্কৃত করিয়া দিবে ততই সে দিব্যরূপ ধারন করিয়া লোকলোকান্তরে অনন্ত আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহার পদে পদে বিপদ, পদে পদে বিঘ্ন, পাপের কূটজাল বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। ইহার হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, সকলই শোভাময় সকলই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া পড়ে। শরীর আত্মার আবরণ, প্রাকৃতিক নিয়মে শরীর বিনষ্ট হইলে, কৃষ্ণরোমযুক্ত অশ্বের ন্যায়, রাহুমুখ নির্গত চন্দ্রের ন্যায়, বিগত পাপ কৃতাত্ম সংস্কার ব্যক্তি শরীর পরিত্যাগে ব্রহ্মলোক প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান।

(বিগত আষাঢ় মাসের পত্রিকার ৫২ পৃষ্ঠার পর)

কবে রবি শশী তারা তাঁহারে দেখায়?
কবে পাখী তাঁর গুণ তোমারে শুনায়?
কবে ফুল পরিমল, তাঁর প্রেম সুশীতল
সৌরভ বিতরি তব হৃদয় জুড়ায়?

যবে তাঁর তরে তব ব্যাকুল হৃদয়।
অন্তর-অন্তর হ'তে এই মনে হয়।
কেমনে তাঁহারে পা'ব, তাঁহার দুয়ারে যা'ব
তাঁরে না দেখিলে নয়, পাইলেই নয়॥

তাঁর সনে যুক্ত যবে তোমার পরাণ।
পর্ব্বত শেখাবে তোমা তাঁহার ধেয়ান।
নদী কল কল রবে, তাঁর কাছে ধায় যবে,
তোমারে উদ্যম তার করিবেক দান॥

যে দিকে চাহিবে তাঁর মহিমা দেখিবে।
তাঁর প্রেম দেখি তাঁর প্রেমেতে গলিবে।
জানি তিনি মাত্র সার, পাশরিবে এ সংসার,
তাঁহারে রাখিতে হৃদি সতত চাহিবে॥

একা অনুরাগ তাঁর সাধন যেমন।
যুক্তি তর্ক আলোচনা নহেত তেমন।
কর মলিনতা ত্যাগ, কর তাঁরে অনুরাগ,
এক মনে চাও তাঁরে পা'বে সেই ধন॥

যদি হের একবার তাঁর সে নয়ন।
সকল সংশয় তব হইবে ভঞ্জন।
পেলে তাঁর প্রেম বিন্দু, উথলিবে সুখ সিন্ধু,
হৃদয়ের তিনি হন পরশরতন॥

না রেখ বাসনা আর তাঁ ছাড়া অপর।
ক্রমিক তাঁহার পথে হ'ও অগ্রসর।
রাখি তাঁরে হৃদাসনে, শুদ্ধ হয়ে এক মনে,
ভক্তি পুষ্প দিয়া তাঁরে পূজ নিরন্তর॥

যখন তাঁহারে হৃদি পাবে দরশন।
দেখিবে তোমার তিনি আপনার হ'ন।
তুষিতে আত্মার ক্ষুধা, দেন স্বরগের সুধা,
কতই অমিয়-মাখা বলেন বচন॥

যেন নাহি সৃষ্টি মাঝে তোমা ভিন্ন জন।
এমতি তোমায় তিনি ভাবেন আপন।
মিথ্যে হরেন নাথ, কুটিল কামনা আশ,
তাঁর প্রেমে করি দেন হৃদয় নুতন॥

তব প্রীতি তাঁর কাছে করিবে গমন।
তাঁর প্রীতি শতধারে হৃদি আগমন।
তোমার হৃদয়াধারে, দুই প্রীতি দুই ধারে,
মিলে যবে হবে তবে সফল জীবন॥

অতএব তাঁর পথে হও হে পথিক।
একান্তে তাঁহার প্রেমে হও হে প্রেমিক।
তাঁর ভাবে পূর্ণ কর হৃদয় কন্দর।
সর্ব্বত্যাগী হয়ে হও তাঁর অনুচর।

প্রার্থনা।

হে নাথ! চাহি যে মোরা তব সঙ্গে থাকি।
তোমারে সতত স্মরি—হৃদি তোমা রাখি
বিষু কিবা মোহ আসি যে মত ফিরায়।
তোমাকে পাবার নাথ! কি হবে উপায়॥
ওহে প্রেম-সূর্য্য! দিয়া কিরণ আপন।
মোহের তিমির মম কর বিনাশন॥
বিষয়-বাসনা-শূন্য করহ অন্তর।
তব প্রেমে মজি যেন থাকি নিরন্তর॥
তোমার যে কায তাহা সাধন করণে।
সতত নিযুক্ত রাখ এ অধীন জনে॥
ইতি দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

সমালোচন।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড। শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক প্রকাশিত।

এই তুইখানি গ্রন্থে শারীরিক যন্ত্র, শরীরের পেশী ধমনী প্রভৃতির সংস্থান, আকৃতি, ক্রিয়া, প্রধান প্রধান শরীরযন্ত্রের চিত্র, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত দ্রব্য সকলের পর্য্যায়, প্রয়োগাদি, খাদ্য দ্রব্যের গুণ, রোগের উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ, পথ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রের জ্ঞাতব্য অতি প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয় সমূহ চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ, ধন্বন্তরি, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি নানাবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংকলিত ও [illegible] সরল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিনোদ বাবু এই বৃহৎ গ্রন্থ সমাপন করিয়া আর্য্য কীর্ত্তি সংরক্ষণ ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনেক গুলি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার দ্বারা জন সমাজের মহোপকার সাধন করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "ইহাতে চিকিৎসা সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই পরিত্যাক্ত হয় নাই। এতদ্দেশ প্রচলিত চিকিৎসা এবং সমস্ত ভিন্ন বহু দূরদেশ হইতে বহু যত্নে ও আয়াসে বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আনয়ন করিয়া তৎসমস্ত হইতে নূতন নূতন বিষয় সকল ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় নানা গ্রন্থ নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কতকগুলির কিয়দংশ মাত্র পাওয়া যায়। যেখানে যে গ্রন্থ বা যে গ্রন্থের অংশ পাওয়া যায় তাহা বহু ব্যয়ে ও বহু চেষ্টায় আনয়ন করা হয়।" তাঁহার ঈদৃশ পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যবসায়ের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ, যেহেতু তাহার ফল উপাদেয় হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থ কয়েকখানি সমাদৃত ও বহুলরূপে প্রচারিত হয় ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের জীবন চরিত— শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মহাত্মা জন হাউয়ার্ড পরোপকার রূপ মহাব্রত অবলম্বন করিয়া আত্মজীবন সমর্পণ পূর্ব্বক কিরূপে কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম এবং ইহা পাঠ করিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই যে আনন্দানুভব করিবেন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ উচ্চ আদর্শের গ্রন্থ যত প্রকাশিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৩ই আশ্বিন শনিবার "বালী ধর্ম্মসমাজের" পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ উপাসনায় যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

সিদ্ধান্ত ॥৪॥

জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়ব কি—তাহার বিশেষ অবয়বই বা কি।

অহংপদার্থ সকল জ্ঞানের সাধারণ অবয়ব বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধ হয়; জড়বস্তু জ্ঞানের (তাও আবার সকল জ্ঞানের নহে—কিন্তু কোন কোন জ্ঞানের) বিশেষ অবয়ব বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধ হয়। অথবা যাহা একই কথা, আমরা—আপনাদিগকে আমাদের জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় অবশ্যম্ভাবী এবং সার্ব্বভৌমিক অবয়ব বলিয়া জানি; ও জড়বস্তুর যতপ্রকার বৈচিত্র্য আছে সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া তাহাকে আমরা আমাদের (সকল জ্ঞানের নহে কিন্তু) বিশেষ একজাতীয় জ্ঞানের পরিবর্ত্তনীয় আগন্তুক এবং বিশেষ অবয়ব বলিয়া জানি। সংক্ষেপে, অহংপদার্থে আমরা সকল জ্ঞানেরই জ্ঞানত্ব উপলব্ধি করি, জড়বস্তুতে আমরা কোন কোন জ্ঞানের বিশেষত্ব উপলব্ধি করি।

প্রমাণ।

জ্ঞানের ইহা একটি অবশ্যম্ভাবী মুলতত্ত্ব যে, জ্ঞানে যাহা কিছু জ্ঞাত হয়, তাহারই সঙ্গে অহংপদার্থ আপনার নিকট আপনি জ্ঞাত হয় (১ সিদ্ধান্ত দেখ); অথবা, যাহা একই কথা—এরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না যাহাতে জ্ঞাতা আপনার নিকট আপনি জ্ঞাত নহে। এই কারণে অহংপদার্থ সকল জ্ঞানেরই সাধারণ অবয়ব বলিয়া—জ্ঞানগত সামান্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া—জ্ঞানে উপলব্ধ হয়। অপিচ, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই যে জ্ঞানে যাহা কিছু জ্ঞাত হউক না কেন তাহারই সঙ্গে জড়বস্তুকে জ্ঞাত হইতেই হইবে; অথবা যাহা একই কথা—এরূপ জ্ঞান থাকিবার কোন বাধা নাই যাহাতে কোন জড়বস্তুই বিষয়ীভূত নহে (যেমন কাল-জ্ঞান—কাল কিছু আর জড়বস্তু নহে)। অতএব জড়বস্তু সকল জ্ঞানেরই সাধারণ অবয়ব বলিয়া জ্ঞাত হয় না—কোন কোন জ্ঞানের (যেমন ঘটজ্ঞানের) বিশেষ অবয়ব বলিয়াই জ্ঞাত হয়। তবেই হইতেছে যে, অহংপদার্থ [illegible]র অপরিবর্ত্তনীয় অবশ্যম্ভাবী এবং সা[illegible]ক অবয়ব; ও জড়বস্তুর যত প্রকার [illegible] আছে সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া তাহা বিশেষ একজাতীয় জ্ঞানের

পরিবর্ত্তন-শীল আগন্তুক এবং বিশেষ অবয়ব।

চতুর্থ সিদ্ধান্তের অবতারণার উদ্দেশ্য ॥১॥

যদিচ বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত কতকদূর পর্য্যন্ত শুদ্ধ কেবল প্রথম সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি, কিন্তু জ্ঞানের যে দুইটি মৌলিক উপাদান পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অবধারিত হইয়াছে সে দুইটি উপাদান যে, কি, তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য এ সিদ্ধান্তটির অবতারণা আবশ্যক। এ শুধু বলিলে চলিবে না যে, জ্ঞান-মাত্রই সামান্য এবং বিশেষ এই দুইটি অবয়বের সঙ্ঘাত,—সেই সামান্য অবয়বটি কি এবং সেই বিশেষ অবয়বটিই বা কি, তাহা দেখানো চাই.—বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে তাহাই দেখানো হইতেছে। যাহা কিছু জানা হয় তাহারই সঙ্গে অহংপদার্থটি জানা হইতে চায়; এই জন্য বলি যে, অহংপদার্থটি সকল জ্ঞানের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যরূপে অনুস্যূত, উহা সকল জ্ঞানেরই স্থায়ী এবং সার্ব্বভৌমিক উপাদান। অহংজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। আর একদিকে দেখা যায় যে, জড় বস্তু অনেকানেক জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হয় বটে কিন্তু তাহা বলিয়া এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই যে, নির্দ্দিষ্ট কোন একটি জড়বস্তুর জ্ঞান (যেমন পট জ্ঞান) ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না; তা শুধু নয়—এমনও কোন বাধ্য-বাধকতা নাই যে, অনির্দ্দিষ্ট কোন-না-কোন জড়বস্তুর জ্ঞান (যেমন ঘট-জ্ঞান—না হয় পটজ্ঞান, না হয় অন্য কোন জড়বস্তুর জ্ঞান) ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না; কাল-জ্ঞান জড়বস্তু বিষয়ক জ্ঞান [illegible] অথচ তাহা জ্ঞান—সুখ-দুঃখ-জ্ঞান [illegible] বিষয়ক নহে অথচ তাহা জ্ঞান, ইত্যাদি। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, জড়বস্তু-সকল (সকল জ্ঞানের নহে কিন্তু) বিশেষ একজাতীয় জ্ঞানের পরিবর্ত্তনীয় আগন্তুক এবং বিশেষ অবয়ব।

অহংপদার্থ জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়বের সহিত ব্যাপ্তিতে যেমন সমান, জড়বস্তু জ্ঞানের বিশেষ অবয়বের সহিত ব্যাপ্তিতে সেরূপ সমান নহে ॥২॥

জ্ঞানের যত প্রকার বিশেষ অবয়ব আছে [illegible]ই যে, জড়বস্তু, তাহা নহে। জড়-বস্তু ভিন্ন—জ্ঞানের আরো নানা প্রকার বিশেষ অবয়ব আছে; যেমন মনের নানা ভাব—কালের নানা অংশ—জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয় অথচ তাহারা জড়বস্তু নহে। জ্ঞানের নানা জাতীয় বিশেষ অবয়ব আছে—জড়বস্তু তাহার মধ্যে বিশেষ এক-জাতীয় বিশেষ অবয়ব। পক্ষান্তরে, জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক এবং অপরিবর্ত্তনীয় অবয়ব শুদ্ধ কেবল-এক অহংপদার্থেই পর্য্যাপ্ত; কারণ, অহংপদার্থ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন কিছুকেই এরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে, তাহা জ্ঞান-মাত্রেরই নিরন্তর-বেদ্য। অহংপদার্থ, এইরূপ, জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়বের সহিত ব্যাপ্তিতে সমান, কিন্তু জড়বস্তু জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব অপেক্ষা ব্যাপ্তিতে অনেক কম। বাস্তব পক্ষে না হউক্ অন্ততঃ সম্ভব পক্ষে এরূপ মনে করিতে কোন বাধা নাই যে, জড়বস্তু ভিন্ন জ্ঞানের আরো অনেক প্রকার বিশেষ বিশেষ বিষয় আছে। জড়বস্তু জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী উপাদান নহে। সত্য বটে যে, জ্ঞান-মাত্রেতেই যেমন সার্ব্বভৌমিক অহংপদার্থ জ্ঞাত হওয়া চাই, তেমনি বিশেষ কোন-না-কোন-কিছু জ্ঞাত হওয়া চাই; কিন্তু সেই যে, বিশেষ কোন-না-কোন কিছু, তাহা জড় বস্তু না হইয়া আর কোন কিছু হইলেও হইতে পারে,—তাহা মনের ভাব বিশেষ—কালের অংশ বিশেষ—হইতে

পারে। অতএব জ্ঞানের সার্ব্ব-ভৌমিক অবয়ব বলিতে শুদ্ধ কেবল অহম্পদার্থই বুঝায়, তদ্ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব বলিতে শুদ্ধ যে কেবল জড়বস্তুই বুঝায় তাহা নহে, তদ্ভিন্ন আরো অনেক প্রকার বিষয় বুঝাইতে পারে।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অবতারণার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ॥৩॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অবতারণা এজন্যও আবশ্যক—যেহেতু ইহা পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তের প্রবেশ দ্বার।

এ সিদ্ধান্তটি যে বহুপূর্ব্বে সংস্থাপিত হয় নাই কেন—ইহাই আশ্চর্য্য ॥৪॥

জ্ঞানের সার্ব্ব-ভৌমিক, স্থায়ী, এবং অবশ্যম্ভাবী উপদানটিকে কেন যে বহু পূর্ব্বে আলোকে উদ্ধৃত করিয়া তাহার কার্য্য তাহাকে দিয়া করাইয়া লওয়া হয় নাই ও তাহার সমস্ত রস তাহা হইতে নিঙ্ড়াইয়া লওয়া হয় নাই, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহা দূরে থাকুক—কোথাও উহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে কি না সন্দেহ; এটা স্থির যে, কোথাও উহা রীতিমত অনুশীলিত হয় নাই। যখন দেখা যায় যে, প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিক চিন্তা জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় এবং সার্ব্বভৌমিক অবয়বের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত রহিয়াছে, তখন সহজেই এইরূপ মনে হয় যে, জ্ঞানের ঐ অবয়বটি আর আর সামগ্রী অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট অনেক কালের পরিচিত ও তাহাকে হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইতে পারে। কারণ, যাহাকে আমরা সর্ব্বদাই জানিতেছি, যাহাকে আমরা এক মুহূর্ত্তও না জানিয়া থাকিতে পারি না, তাহা অবশ্য আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত—তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের নিকটবর্ত্তী—তাহা আমাদের মুষ্টির অভ্যন্তরে। এই প্রকার ভাবনা হইতে স্বভাবতই এই প্রশ্নটি গা ঝাড়া দিয়া উঠে যে, সেই যে সামগ্রী, যাহার সহিত আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত, যাহাকে আমরা আমাদের সজ্ঞান অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও না জানিয়া থাকিতে পারি না, তাহা কি? ও তাহার প্রত্যুত্তর এ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না যে, সে সামগ্রী আমরা আপনারাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দার্শনিকদিগের হস্তে—না ঐ প্রশ্ন—না ঐ উত্তর—দুয়ের কোনটিই ধরা দিল না। জ্ঞানের ঐ সার্ব্বভৌমিক অবয়বটি দৈবাৎ কখন কোথাও যদি ইঙ্গিত-চ্ছলে অস্পষ্টরূপে সূচিত হইয়া থাকে—তবে সে কথা স্বতন্ত্র; তদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে কুত্রাপি উহার গুরুত্ব রীতিমত ঘোষিত হয় নাই, উহার ফল-রাশি রীতিমত সংগৃহীত হয় নাই। ডেলফি নগরের দেব মন্দিরের গাত্রে এই যে একটি অমোঘ বচন খোদিত রহিয়াছে যে, "আপনাকে জান," যাহার উচিত-মত টীকা করিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, "হে মনুষ্য! ভাল করিয়া প্রণিধান কর, তুমি আপনিই সেই বস্তু যাহাকে তুমি তোমার সম্মুখাগত সকল বিষয়ের মধ্যেই—সকল বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—জানিতেছ" এ দৈববাণীটি এ যাবৎকাল বৃথা হইয়াছে।

অনবধানতার কারণ নির্দ্দেশ ॥ ৫ ॥

আপনার প্রতি আপনার এই যে, অনবধানতা, ইহার অনেকগুলি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সে কারণ-গুলি সর্ব্বাংশে না হউক, অনেকাংশে, একটি-মাত্র প্রধান এবং গুরুতর কারণে পর্য্যব[illegible]ত; সে কারণটি ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়[illegible] (১ সিদ্ধান্ত, ৬ পরিচ্ছেদ দেখ), কি? [illegible]য়ের ঘনিষ্ঠতা। মনের বৃত্তি এবং আসক্তি সমূহের বল বিনাশ করিতে এ যেমন পারদর্শী এমন

আর কেহই নহে। এই সম্মোহক সেবনে বিহ্বল হইয়া মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ-সুলভ চিরপ্রসিদ্ধ বিষয়-সকল হইতে বিমুখ হয়, ও চিত্ত-চমৎকারী অপরিচিত বিষয়-সকলের চরণ-সেবায় প্রবৃত্ত হয়। কি আপনার বেলায়—কি অন্যের বেলায়—সকলেই এটি কোন না কোন সময়ে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে কোন বিষয় আমাদের চিরকালের অভ্যস্ত তাহার আন্দোলনে বিশেষ যে কোন ফল আছে—এটি কাহারো মনে হয় না। পুরাতন রোমীয় পণ্ডিত সিসিরো বলিয়াছেন "চির প্রচলিত আচার ব্যবহার মনকে অসাড় করিয়া ফেলে, আর, মনুষ্য যাহা প্রতিনিয়ত দর্শন করে তাহাতে সে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য উপলব্ধি করে না—তাহার ভিতরে তলাইয়া দেখিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না।" অসামান্য ঘটনা সকলই বিস্ময়ের উপজীবিকা; ইহার অনটন হইলেই আমাদের কৌতূহল মরণাপন্ন হইয়া অবশেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের এই যে একটি মনের স্বাভাবিক গতি—কি না প্রসিদ্ধ বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে আদরাধিক্য—যাহাকে যত অল্প দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে তত আশ্চর্য্য ও পূজার্হ মনে করা—ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই; মনুষ্যের প্রাত্যহিক আচার ব্যবহারে, বিজ্ঞানের চিরন্তন ইতিবৃত্তে এবং বিশেষতঃ বিজ্ঞানের পুরাতন ইতিবৃত্তে, সর্ব্বত্রই উহার দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান পড়িয়া আছে। অশিক্ষিত অন্ধের বিজ্ঞান প্রকৃতির অষ্টপ্রহর-সুলভ আবির্ভাব-সলককে হেয় জ্ঞান করে, ও ভূমিকম্প, চন্দ্র-গ্রহণ, সূর্য্য-গ্রহণ, এই সকল অসামান্য ঘটনা দেখিবামাত্র তাহার কৌতূহল উত্তেজিত হয় ও তাহাদের প্রতিই তাহার আগ্রহাধিক্য হয়। এরূপ বিজ্ঞান প্রত্যহ-সুলভ আলোকের প্রতি অন্ধ, প্রত্যহ-সুলভ শব্দের প্রতি বধির; ইহার চক্ষু কেবল বিদ্যুতেরই জন্য—ইহার কর্ণ কেবল বজ্রধ্বনিরই জন্য। এ বিজ্ঞান প্রকৃতির মহামহিমান্বিত নিয়ম সকলকে ছাড়িয়া প্রকৃতির সাময়িক ব্যতিক্রম সকলেরই পদে আশ্চর্য্য-রসের অঞ্জলি প্রদান করিতে বেশী তৎপর।

আমরা পরিচিত ছাড়িয়া অপরিচিতের কাঙ্গালী—তাই সত্য আমাদের হস্ত এড়াইয়া যায়॥ ৬॥

এইরূপে অশিক্ষিত লোকেরা ঘরের দেবতাকে ভুলিয়া বাহিরের দেব-প্রতিমা সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। কিন্তু এ প্রবৃত্তিটি শুদ্ধ কেবল অশিক্ষিত লোক-মণ্ডলীতেই আবদ্ধ নহে—রক্তমাংসের শরীর মাত্রেতেই এ রোগটি পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এ দুর্ব্বলতাটি সমস্ত মানব সমাজেই বদ্ধমূল। আমরা স্বভাবতই মনে করি যে, সত্য আমাদের—নিকটে নহে, কিন্তু বহুদূরে; মনে করি যে, নৈকট্য বশতঃ নহে কিন্তু দূরত্ব বশতঃ সত্য আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত; মনে করি যে, সত্য আমাদের ঘরের সামগ্রী নহে—উহা বাহিরের সামগ্রী; সত্য যত বেশী দূর হইতে আহৃত হয়, ততই তাহা আমাদের বেশী উপাদেয় মনে হয়—ততই তাহাকে আমরা বেশী সাঁচা মনে করি। প্রাকৃত অপেক্ষা অপ্রাকৃত অধিক পরিমাণে আমাদের চিত্ত আলোড়িত করে; আমরা মনে করি যে, ভূলোক অপেক্ষা দ্যুলোক নিগূঢ়তর রহস্যের ভাণ্ডার। এই কুসংস্কারটির চৌমাথায় দাঁড়াইয়া পণ্ডিত-মূর্খ পরস্পর কোলাকুলি করেন (তাহার সাক্ষী শক্তি চালনা বিদ্যা Mesmerism ও তাহার আনুসঙ্গিক অশেষবিধ পাগলামি), এবং এই উপধর্ম্মের নেশায় ভরপুর হইয়া পণ্ডিত মূর্খ উভয়েই দূরস্থ এবং অসামান্যের পীঠস্থানে সত্য অন্বেষণ করিয়া বেড়া'ন, তাঁহাদের এ

বোধ নাই যে, তাঁহাদের পুরাতন দেব মন্দির তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখেই বিরাজমান—কেবল তাহাকে অষ্টপ্রহর ক্রমাগত দেখার গতিকেই তাহা অদৃশ্য। কবি ঠিকই বলিয়াছেন যে,

> "That is the truly secret which
> lies ever open before us;
> And the least seen is that which
> the eye constantly sees."
> —Schiller.

> "নিগূঢ় রহস্য সেই, ব্যক্ত যাহা সম্মুখে সদাই।
> নিরন্তর নয়ন-সমক্ষে যাহা, অদৃশ্য তাহাই॥"
> —শিলর (জর্ম্মান দেশীয় কবি)।

কিন্তু এই কবি-বাক্যটির মর্ম্মের প্রতি হতচেতন হইয়া আমরা তাহার প্রত্যাখ্যাত ঐ ঘুমের ঘোরটি ঝাড়িয়া ফেলিতে—ঐ নতশ্রীর জড়তা হইতে আমাদের আত্মাকে উদ্ধার করিতে—কিছুমাত্র যত্ন করি না; যাহা আমরা অতিমাত্র দেখি বলিয়াই দেখি না তাহা দেখিবার জন্য—যাহা দেদীপ্যমান প্রকাশিত বলিয়াই অব্যক্ত তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য—আমরা একটুও কষ্ট স্বীকার করি না। আমরা ঘরের মর্য্যাদার প্রতি অন্ধ হইয়া পরের সহিত ঘর করিতেই তৎপর। এই গতিকেই আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়; আমরা একরূপ মত্ততার হস্তে সমর্পিত হই, আর তাহাকেই আমরা মনে করি—পরম বিজ্ঞতা। এই গতিকেই আমরা যন্ত্রে যন্ত্রিত হই ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভ্রমের পরিচর্য্যায় আপনি দীক্ষিত হই এবং অন্যকে দীক্ষিত করি; আমরা জ্ঞানের স্বাধীন এবং গভীরদর্শী সন্তান না হইয়া কৃত্রিম লৌকিকতার ক্রীতদাস হই। এই গতিকেই আমরা ঐশ্বরিক ব্যাপার সকলের যথার্থ মহিমা এবং অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতার প্রতি হতচেতন হই। কারণ, এ কোন ছার কথা যে, ঈশ্বরের কার্য্য—জগতের সুব্যবস্থা—যে অংশে চির-প্রসিদ্ধ সে অংশে তাহা আশ্চর্য্য নহে,—যে অংশে তাহা সুব্যক্ত সে অংশে তাহা মহিমান্বিত নহে, যে অংশে তাহা সর্ব্বসাধারণ সে অংশে তাহা চিত্ত-চমৎকারী নহে। কিন্তু মনুষ্য যে-সকল আশ্চর্য্য ঘটনা সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ করে তাহার প্রতি সে অন্ধ, ও যে বিষয়ে সে সত্যসত্যই অন্ধ তাহাকেই সে পরমাশ্চর্য্য জ্ঞান করে; দূরে লক্ষ্য করিয়াই সে সম্মুখে সটান বেগে ধাবিত হয়; পশ্চাৎ গমন করিয়া দূর হইতে নিকটে আসাই তাহার কর্ত্তব্য; কারণ তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় নিকট অঞ্চলেই পাওয়া যাইতে পারে; হইতে পারে যে, পরিণামে তাহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেইখানেই আসিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ সত্যে বঞ্চিত হওয়া তাহার ললাটে লিখিত আছে।

এই জন্য বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রতি লোকের অমনোযোগ॥ ৩৫

এতগুলি কথা যাহা বলা হইল—তাহার উদ্দেশ্য কেবল এই সাধারণ বৃত্তান্তটি ব্যক্ত করা যে, জ্ঞেয় বস্তুর সহিত পরিচয়ের আধিক্যে স্বভাবতই জ্ঞানের হ্রাস হয়। ঘনিষ্ঠতার মাত্রা যেখানে অত্যন্ত অধিক, জ্ঞানের মাত্রা সেখানে অত্যন্ত অল্প। এক কথায়—অভ্যাসের চক্রে পড়িয়া ব্যক্ত যাহা তাহা অব্যক্ত হইয়া দাঁড়ায়। এ যখন সুনিশ্চিত তখন জ্ঞানের স্থায়ী অবয়বটিকে তত্ত্বজ্ঞানীরা কেন যে উপলব্ধি করিতে—অন্ততঃ আপনাদের তন্ত্রের মধ্যে স্পষ্টরূপে স্থান দান করিতে [illegible] করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে [illegible] নহে। এই স্থায়ী অবয়বটি [illegible] যখন আমাদের জ্ঞান-সমক্ষে [illegible] তাহারই সঙ্গে অহম্পদার্থ উপস্থিত [illegible] সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হও-

থাকাতে ইহার সংসর্গে আমাদের এক প্রকার অরুচি জন্মিয়াছে; তাই ইহাকে আমরা দেখিয়াও দেখি না। এরূপ অবহেলা—হইবারই কথা। অহম্পদার্থের নিরন্তর বিদ্যমানতা অবিদ্যমানতারই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অহংপদার্থ এক মুহূর্ত্তও আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়া থাকে না বলিয়া ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যেন তাহা মূলেই আমাদের জ্ঞানে উপস্থিত নাই। আমাদের আপনার সহিত আপনার ঘনিষ্ঠতা যেহেতু যৎপরোনাস্তি অধিক, এই জন্য আমাদের আপনার প্রতি আপনার মনোযোগ যৎপরোনাস্তি অল্প। জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অপরিবর্ত্তনীয় এবং স্থায়ী অবয়বের অন্বেষণ যখন তত্ত্বজ্ঞদিগের একমাত্র লক্ষ্য, আর, তাহা যখন সর্ব্বক্ষণই তাঁহাদের জ্ঞানে বিদ্যমান তখন তাহা তাঁহাদিগকে ধরা না দিবার কারণ কি? অতিমাত্র ঘনিষ্ঠতাই তাহার একমাত্র কারণ।

আর একটি কথা ॥ ৮ ॥

আর একটি কথা এই যে, কোন একটি মূলতত্ত্ব সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্রই কিছু আর দর্শকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না—তাহা হইতে যখন প্রচুর পরিমাণে ফল ফলিতে আরম্ভ হয়, তখনই তাহার গুরুত্ব এবং বলবত্তা অনুভূত হয়। এখানে আমাদের সম্মুখে এমনি একটি অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, যাহার ফলোদয় কাল উপস্থিত হইলে তাহা জ্ঞানের দাত্র সমীপে অমূল্য সত্যের প্রচুর শস্য-রাশি স[illegible] ক্রটি করিবে না। কিন্তু আপা[illegible] হওয়া বিচিত্র নহে যে[illegible]ত্রেই সত্য—উহাতে[illegible]পারে না। উহার [illegible] যে এক অমূল্য রত্ন জাগিতেছে[illegible] ভয়ঙ্কর মহিমা অপেক্ষাও ভ[illegible] কি যে এক আধ্যাত্মিক গৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—অদ্যাপি লোকে তাহা জানিতে পারে নাই, এজন্য, উহা পড়িয়া পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে—অদ্যাপি কেহ উহাকে পুছিল না।

অহংপদার্থ জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ একত্ব-মঞ্চ ॥ ৯ ॥

ন্যায়-শাস্ত্রের মতে, অথবা যাহা আরো ঠিক্—অপক্ব অস্তিতত্ত্বের মতে, সত্তা যেমন বস্তু-সকলের সর্ব্বোচ্চ একত্ব-মঞ্চ, এখানকার সিদ্ধান্ত অনুসারে অহংপদার্থ তেমনি জ্ঞান-সমূহের সর্ব্বোচ্চ একত্ব-মঞ্চ। পূর্ব্বোক্ত একত্ব-মঞ্চ (সত্তা) "আছে মাত্র" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শেষোক্ত একত্ব-মঞ্চ (অহংপদার্থ) শুধু যে কেবল আছে মাত্র (অর্থাৎ ফাঁকায় বিদ্যমান—অজ্ঞান অন্ধকারে বিদ্যমান) তাহা নহে—তাহা আমাদের জ্ঞানে বিদ্যমান। অহংপদার্থকে যদি পরীক্ষিত বিষয়-সকলের অন্বয় ব্যতিরেক-সম্ভূত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও তাহার ঐ সর্ব্বোচ্চ একত্ব-পদবী স্থির থাকে। আমাদের বিচিত্র জ্ঞান সমূহের মধ্যে যত কিছু বৈসাদৃশ্য আছে সমস্তই দৃষ্টি-ক্ষেত্র হইতে অপসারিত কর—দেখিবে যে, তাহাদের সর্ব্বসাধারণ সাদৃশ্য-রূপে অহং পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহাকেই বলে অন্বয়-ব্যতিরেক—কি? না লক্ষ্য বিষয় সকলের সহিত শুদ্ধ কেবল তাহাদের সাদৃশ্যেরই অন্বয়-সাধন অর্থাৎ সংযোগ-সাধন এবং তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের বৈসাদৃশ্যের ব্যতিরেক-সাধন অর্থাৎ বহিষ্কার, এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে অনেকের মধ্যে একের উপলব্ধি; ইহাই অন্বয় ব্যতিরেক। কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বের অন্বয় ব্যতিরেকের সঙ্গে অস্তিতত্ত্বের অন্বয় ব্যতিরেক মিশাইয়া খিচুড়ি পাকাইলে চলিবে না—এইরূপ খিচুড়ি তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। আমরা কতকগুলি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ

প্রত্যক্ষ করিলাম; তাহাদের বৈসাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা এবং সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই সাদৃশ্যটির নাম দিলাম জীব। আমরা কতকগুলা তরু লতা তৃণ গুল্ম প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাদের বৈসাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা এবং সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই সাদৃশ্যটির নাম দিলাম—উদ্ভিদ্। পুনশ্চ, আমরা জীব এবং উদ্ভিদের বৈসাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা এবং সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সেই সাদৃশ্যটির নাম দিলাম—প্রাণভৃৎ। যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ। ব্যক্তি-সকলের বৈসাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা এবং সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা শ্রেণী গঠন করি; শ্রেণী-সকলের বৈসাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা এবং সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা জাতি গঠন করি; জাতি-সকলের বৈসাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা এবং সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা ব্যাপকতর জাতি গঠন করি; এইরূপ করিয়া পরিশেষে আমরা শুদ্ধ কেবল সত্তা-মাত্রে উপনীত হই, কেননা সত্তা নির্ব্বিশেষে সকল বস্তুতেই অন্বিত—কোন বস্তু হইতেই ব্যতিরিক্ত নহে; এইটিই প্রচলিত অস্তিতত্ত্বের এবং পাঠশালার ন্যায় শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ একত্ব-লক্ষ্য। এরূপ অন্বয় ব্যতিরেকের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। শুদ্ধ কেবল—এখানকার অভিপ্রেত নিম্ন-লিখিত অন্বয়-ব্যতিরেক পদ্ধতির সহিত উহার প্রভেদ প্রদর্শন করিবার জন্যই উহার উল্লেখ করা হইল।

জ্ঞানতত্ত্বের অন্বয় ব্যতিরেক আর এক প্রকার ॥১০॥

জ্ঞানতত্ত্বের অন্বয় ব্যতিরেক স্বতন্ত্র। বস্তু-সকলের সহিত জ্ঞানতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই, জ্ঞান-সকলের সঙ্গেই তাহার যাহা কিছু সম্পর্ক। আমাদের কতকগুলি জ্ঞান আছে—যেমন পশুজ্ঞান, পক্ষীজ্ঞান, কীটজ্ঞান, পতঙ্গজ্ঞান; এই জ্ঞান-গুলির (পশ্বাদি বস্তু-গুলির নহে কিন্তু পশ্বাদি জ্ঞান-গুলির) বৈসাদৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা এবং সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা সেই সাদৃশ্যটির নাম দিলাম—জীব। এইরূপে আমরা পূর্ব্বের মত অন্বয় ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর জাতিতে চলিতে থাকিলাম; প্রভেদ কেবল এই (এবং প্রভেদটি অতি গুরুতর প্রভেদ) যে, পূর্ব্বে বস্তু-সকলেরই সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল, এখন জ্ঞান-সকলের সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে "জীব" বলিতে পশ্বাদি বস্তু সকলের সাধারণ ঐক্যস্থল বুঝাইয়াছিল; এখন "জীব" বলিতে পশ্বাদি বস্তু সকলের নহে কিন্তু পশ্বাদি জ্ঞান-সকলের সাধারণ ঐক্যস্থল বুঝাইতেছে। এখানে মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, এই সকল শব্দে (বস্তুগত নহে কিন্তু) জ্ঞান-গত সামান্য (অর্থাৎ সমানতা), সাদৃশ্য, বা ঐক্যস্থল বুঝিতে হইবে। "প্রাণভৃৎ" শব্দে (জীব-পদার্থ এবং উদ্ভিদ্ পদার্থের নহে কিন্তু) জীব জ্ঞান এবং উদ্ভিদ্ জ্ঞানের ঐক্যস্থল বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও ঐ সকল শব্দে ব্যাপ্য এবং ব্যাপক নানা প্রকার সামান্য (অর্থাৎ ঐক্যস্থল) বুঝিতে হইবে, তবে কি না এখানে এইটি মনে রাখা চাই যে, উহা জ্ঞান-গত সামান্য—বস্তুগত সামান্য নহে। কিন্তু অহং-পদার্থটি যেমন জ্ঞানের ব্যাপকতম সামান্য (অর্থাৎ সর্ব্বসাধার[illegible]নন আর কেহই নহে। [illegible] মধ্যে আর আর য[illegible]মান্য) আছে, তাহা[illegible] দৃষ্ট হইলে বৈসাদৃশ্য হ[illegible]—জীব বলিতে এক দিকে যেম[illegible]াদি জ্ঞান সকলের সাদৃশ্য বুঝায়, আর একদিকে তে-

মনি বৃক্ষ-জ্ঞানের সহিত পশ্বাদি-জ্ঞানের বৈসাদৃশ্য বুঝায়। কিন্তু অহং বলিতে সকল-জ্ঞানেরই সাদৃশ্য বুঝায়—কোন জ্ঞানেরই বৈসাদৃশ্য বুঝায় না; কেননা আমার যত প্রকার জ্ঞান আছে বা হইতে পারে তাহারা সকলেই আমার আপনার জ্ঞান—এ বিষয়ে তাহাদের কাহারো সঙ্গে কাহারো লেশমাত্র বৈসাদৃশ্য নাই—পরন্তু সকলেরই সঙ্গে সকলের যৎপরোনাস্তি সাদৃশ্য রহিয়াছে। ঘটজ্ঞান ঘট-গর্ব্ভ কিন্তু পট-গর্ব্ভ নহে—পটজ্ঞান পট-গর্ব্ভ কিন্তু ঘটগর্ব্ভ নহে, কিন্তু সকল জ্ঞানই অহংগর্ব্ভ—ঘটজ্ঞানও আমার জ্ঞান সুতরাং অহংগর্ব্ভ—পটজ্ঞানও আমার জ্ঞান সুতরাং অহংগর্ব্ভ। অতএব জ্ঞানে জ্ঞানে যত কিছু প্রভেদ সমস্তই ঘট পটাদি বিষয়-মূলক, তাহার কোন-টিই অহং-মূলক নহে; প্রত্যুত, সকল জ্ঞানের সহিত সকল জ্ঞানের যে, সাদৃশ্য, তাহাই অহংমূলক। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অহংপদার্থই জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ঐক্যস্থল—অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা জ্ঞানতত্ত্ব ইহা অপেক্ষা আর উচ্চে উঠিতে পারে না। এখানকার এই জ্ঞানগত সার্ব্বভৌমিক ঐক্য-স্থল যাহা অহংশব্দের বাচ্য তাহা স্বতন্ত্র, আর, নৈয়ায়িকেরা যাহা লইয়া পরম সন্তোষে আছেন—যাহা "আছে মাত্র" কিন্তু কি যে তাহার ঠিকানা নাই—সেই সত্তা-নামধারী বস্তুগত সার্ব্বভৌমিক ঐক্যস্থল স্বতন্ত্র, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

অ[illegible] অন্বয়-ব্যতিরেক-[illegible]য়। [illegible] সাধারণ ঐক্য-স্থল [illegible] প্রতিপাদন করা হইল [illegible] এরূপ না মনে করেন যে, উহা শুদ্ধ কেবল অন্বয় ব্যতিরেকেরই প্রসাদাৎ হইতে পারিয়াছে। তাঁহার জানা উচিৎ যে, [illegible] অখণ্ডনীয় সার্ব্বভৌমিকতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা শুদ্ধ কেবল প্রজ্ঞারই বলে (স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানেরই বলে) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রজ্ঞাই পূর্ণ তেজের সহিত এই তত্ত্বটি উদ্গীরণ করিতে পারে যে, মনুষ্যই হউন্—দেবতাই হউন্—আর যিনিই হউন্, তাঁহারই জ্ঞানে—জ্ঞান-মাত্রেতেই—অহংপদার্থ সর্ব্বোচ্চ একত্ব-মঞ্চে অধিরূঢ়; তাছাড়া কোন অন্বয় ব্যতিরেকই অত তেজের সহিত ও-তত্ত্বটি উদ্গীরণ করিতে পারে না। পরীক্ষাই অন্বয়-ব্যতিরেকের একমাত্র পুঁজি; যতটুকু পর্য্যন্ত সে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে ততটুকু পর্য্যন্তই সে বলিতে পারে, তাহার বাহিরে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার অধিকার নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার পরীক্ষিত বিষয় সকলের উপরে অন্বয় ব্যতিরেক খাটাইয়া শুদ্ধ কেবল আপনার বেলাটিতেই এই কথা বলিতে পারেন যে, আমার পরীক্ষিত জ্ঞান সকলের আমিই কেবল একমাত্র সাধারণ ঐক্য স্থল; কিন্তু দেবতাদিগের জ্ঞান আমাদের পরীক্ষা বহির্ভূত—সেখানে আমাদের অন্বয়-ব্যতিরেক যাইতেই পারে না; তবে আমরা কিরূপে এ কথা বলিতে সাহসী হইতেছি যে, দেবতার জ্ঞানেও অহংপদার্থ সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিরূঢ়। প্রজ্ঞাই কেবল বলিতেছে যে, কি পরীক্ষিত—কি অপরীক্ষিত—সকল জ্ঞানই অহম্পদার্থকে নিরন্তর মস্তকে ধারণ করে। প্রজ্ঞা-প্রদর্শিত জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম, যাহা (শুদ্ধ কেবল আমার জ্ঞানে বা তোমার জ্ঞানে নহে কিন্তু) জ্ঞান-মাত্রেতেই বলবৎ তাহাই ঐ মূলতত্ত্বটির একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা। * কিন্তু অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব মাত্রে-

* এই কথাটির ভিতর একটি নিগূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেটি এই;—প্রজ্ঞার মূল নিয়ম এরূপ লঘু সামগ্রী নহে যে, তাহা আমার বেলায় একরূপ—অন্যের বেলায় অন্যরূপ, প্রত্যুত তাহা সর্ব্বত্র একইরূপ।

রই সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদিচ আত্ম-সমর্থনের জন্য তাহাকে পরীক্ষার দ্বারস্থ হইতে হয় না, তথাপি পরীক্ষিত বিষয়-সকলের অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতে না পারে এমন নহে; উপরে অহংপদার্থ সেই রূপেই প্রদর্শিত হইল; ইহার উদ্দেশ্য কেবল এই যে, ইহাতে করিয়া অহম্পদার্থের বিশেষ লক্ষণটি—সার্ব্বভৌমিক ভাবটি—স্পষ্টরূপে জ্ঞানার্থীর হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

প্লেটোর ভাব-তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা ॥১২॥

প্লেটোর ভাব তত্ত্বের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে এইটিই সমস্ত বিভ্রান্তির মূল যে, ভাব-সকল বস্তু-সকলের সাধারণ ঐক্যস্থল কি জ্ঞান সকলের সাধারণ ঐক্যস্থল—তাঁহার গ্রন্থে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। হইতে পারে—দুইই প্লেটোর অভিপ্রেত;—অস্তিতত্ত্বের সহিত অকালপক্ক জ্ঞানতত্ত্বের খিচুড়ি পাকানোর এই দেখ আর একটি উদাহরণ। কিন্তু প্লেটো তাঁহার স্বাভিপ্রেত ভাব-সকলকে জ্ঞান-সকলেরই সাধারণ ঐক্য-স্থল বলুন, আর বস্তু-সকলেরই সাধারণ ঐক্যস্থল বলুন, উভয় পক্ষেই উক্ত ভাব-সকলের কোনটিই সর্ব্বোচ্চ একত্বের পদারূঢ় নহে। ইহা সত্য বটে যে বৃক্ষত্ব-জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন বৃক্ষ জ্ঞানই সম্ভবে না; কিন্তু ইহা আরো উচ্চতর সত্য যে, অহংজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সম্ভবে না। জ্ঞানের আর আর যতপ্রকার জাতি এবং অবান্তর জাতি আছে—যেমন জড়-জ্ঞান, জীব-জ্ঞান, মনুষ্য-জ্ঞান ইত্যাদি—সমস্তই ব্যবচ্ছিন্ন এবং গৌণ একত্বের পরিচায়ক; ঐ সকল গৌণ একত্ব যে-পর্য্যন্ত না অহংরূপী মুখ্য একত্বের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হয়—অর্থাৎ ঐ সকল জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না আমা কর্ত্তৃক আমার বলিয়া—তোমা কর্ত্তৃক তোমার বলিয়া—অথবা আর কাহারো কর্ত্তৃক তাহার আপনার বলিয়া—অনুভূত হয়, সে পর্য্যন্ত উহাদের কোন অর্থই কাহারো বোধগম্য হইতে পারে না। অহংপদার্থের একত্বের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইলেই আমাদের জ্ঞান সংহত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তখনই আমাদের জ্ঞান বাস্তবিক সর্ব্বাঙ্গীন এবং সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। আমরা যখন একটা আম্রবৃক্ষ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন একটি মাত্র সংহত এবং অখণ্ড জ্ঞান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত; এবং সেই একটি-মাত্র জ্ঞান নিম্ন-লিখিত চারিটি অবয়বে বিভক্ত, কিন্তু সে অবয়ব-গুলির কোনটিই স্বয়ং জ্ঞান নহে;—প্রথম, জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ঐক্যস্থল—আমি আপনি; দ্বিতীয়, আর এক ধাপ নীচের ঐক্যস্থল—সাধারণ বৃক্ষ; তৃতীয়, আরো এক ধাপ নীচের ঐক্যস্থল—সাধারণ আম্র বৃক্ষ; চতুর্থ, বিশেষ আম্র বৃক্ষ—যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইরূপ অবয়ব সজ্ঞাত বাস্তবিকই আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, কিন্তু তাহা বহির্জগতে বাস্তবিক আছে কি না—এ প্রশ্নের সহিত আপাততঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। প্লেটোর ভাবাখ্য পদার্থ [illegible] যেমন বৃক্ষত্ব, মনুষ্যত্ব, ইত্যাদি [illegible] রিমাণে লৌকিক চিন্তার [illegible] ধন করে, কিন্তু তাহ [illegible] য়বে নাগাল পায় না [illegible] এক-দিকদর্শী—তাহা ব্যবচ্ছিন্ন ভাব সকলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় ও মনে করে যে, ব্যবচ্ছিন্ন

সকলেরই অহংপদার্থ একই আদর্শে পরিগঠিত; এক অদ্বিতীয় মূল অহংপদার্থ, যিনি সর্ব্ব-মূলাধার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী, তাঁহারই আদর্শে পরিগঠিত। প্রজ্ঞার ইহা একটি অব্যর্থ দৈববাণী যে, জীবাত্মা পরমাত্মারই আবির্ভাব। অন্বয় ব্যতিরেক নীচে হইতে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠে, প্রজ্ঞার দৈববাণী অযাচিত রূপে উপর হইতে অবতীর্ণ হয়। "ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।"

বিশেষ (যেমন সাধারণ বৃক্ষের ভাব হইতে ব্যবচ্ছিন্ন বিশেষ কোন একটি বৃক্ষ) জ্ঞানে উপলব্ধি-যোগ্য। কিন্তু প্লেটোর উদ্দিষ্ট ব্যবচ্ছিন্ন সাধারণ ভাব সকলও (যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ হইতে ব্যবচ্ছিন্ন বৃক্ষত্ব—বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হইতে ব্যবচ্ছিন্ন অহং-জ্ঞান—ইহাও) জ্ঞানে উপলব্ধি-যোগ্য নহে। দুয়ের সজ্ঘাতই জ্ঞানে উপলব্ধি-যোগ্য। প্লেটোর ভাবতত্ত্ব ঐ লৌকিক ভ্রমটি (অর্থাৎ ব্যবচ্ছিন্ন ভাব জ্ঞানে উপলব্ধি যোগ্য—এই ভ্রমটি) সমূলে উন্মূলন করিতে সমর্থ নহে। সহজ কথায় বলিতে হইলে সে লৌকিক ভ্রমটি আর কিছু নয়—বহির্বিষয়ের আলোচনা-কালে সত্য সত্যই আমরা যাহা জানি অথবা ভাবি তাহা অপেক্ষা অল্প জানিতেছি বা ভাবিতেছি বলিয়া মনে করা,—বাস্তবিক যেখানে আমরা সামান্য এবং বিশেষ দুইই জানিতেছি, সেখানে আমরা মনে করি যে, আমরা শুদ্ধ কেবল বিশেষটিই জানিতেছি। উপেক্ষিত সামান্য অবয়বটির প্রতি দর্শকের লক্ষ্য ফিরাইয়া ঐ লৌকিক ভ্রমটির প্রতিবিধান করিবার মানসেই প্লেটো তাঁহার ভাবতত্ত্ব উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ভাবতত্ত্ব অসম্পূর্ণ—তাই তাহা অভীষ্ট সাধনে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ একত্ব মঞ্চ—সার্ব্বভৌমিক অবয়ব—যাহার সহিত আমরা সকলেই সুপরিচিত ও যাহাকে লইয়া আমরা সকলেই বহুল পরিমাণে ব্যাপৃত—ততদূর তিনি হস্ত প্রসারণ করেন নাই; তাহা কি? না আ[illegible]

[illegible] [illegible]কলের যেমন, বস্তু সক-[illegible] [illegible]ঐক্য স্থল ॥ ১৩ ॥

[illegible]ন [illegible]আর একটি কথা বলা যাইতে পারে, যে যদিচ এখানে জ্ঞান-ঘটিত অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা অহংপদার্থ শুদ্ধ কেবল জ্ঞান সকলেরই সর্ব্বোচ্চ ঐক্য স্থল বলিয়া অবধারিত হইল, কিন্তু শেষে হয় তো এমনও দাঁড়াইতে পারে যে, উহা বস্তু সকলেরও সর্ব্বোচ্চ ঐক্য স্থল। তাহা যদি হয় তবে সত্তার ন্যায় একটা ব্যবচ্ছিন্ন এবং অনির্দ্দেশ্য সার্ব্বভৌমিক ভাবের পরিবর্ত্তে, আমরা একটি বাস্তবিক জীবন্ত এবং সুপরিজ্ঞাত সার্ব্বভৌমিক-ভাব সকল-বস্তুর শীর্ষস্থানে উপলব্ধি করিতে পারি। হয় আমরা এই সিদ্ধান্তটিই ঘাড় পাতিয়া লই—নয় আমরা এইরূপ একটা ভয়ানক সংশয়-বাদকে শ্রেয় করি যে, জ্ঞানের নিয়ম-সকলের সহিত সত্তার নিয়ম-সকলের কিছু মাত্র সৌসাদৃশ্য অথবা সমতানতা নাই সুতরাং কোন বাস্তবিক সত্তারই যথার্থ জ্ঞান সম্ভবে না—সত্তার কেবল একটা মিথ্যা অবভাসেরই মিথ্যা জ্ঞান সম্ভবে; তত্ত্বান্বেষীর সম্মুখে এই দুইটি পথ পড়িয়া আছে—চাই ইহাকে অবলম্বন করুন—চাই উহাকে অবলম্বন করুন—তদ্ভিন্ন তৃতীয় পথ নাই। শেষোক্ত ভয়ানক সংশয়-বাদের রসাতলের উপরে মনোবিজ্ঞান একগাছি সূত্র-অবলম্বনে ঝুলিতেছে; একটু কিছুর করস্পর্শ মাত্রে সূত্রটি ছিন্ন হইয়া তাহাকে অধঃপাতে দিবে; কিন্তু এখন সে ঝুলুক,—অস্তিতত্ত্ব আসুক—সে-ই তাহার নিপাত-কার্য্য সমাধা করিবে; জ্ঞান তত্ত্বের সে দিকে দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই; এখনো পূর্ব্বকৃত্য অনেক কাজ বাকি—জ্ঞান-তত্ত্ব তাহাতেই যত্ন সমর্পন করুক।

উপাসনা ও ইহার ক্রম।

(কাল্‌না উৎসবে পঠিত)

প্রার্থনা মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। যখন আমরা কোন বিষয় লাভের জন্য অগ্রসর হইয়া আপনাদিগকে ক্ষীণ-

বল দেখি তখন আমরা একেবারে হতাশ না হইয়া বাহির হইতে উপযুক্ত বললাভের জন্য অনুসন্ধান করিতে থাকি। আমরা অনুবৎ জীব, আমারদের বলবীর্য্য আমারদের বুদ্ধি আমারদের ধারণাশক্তি সকলই সসীম। এ ক্ষুদ্র জীবনে এমন কতশত অবসর উপস্থিত হয়, এমন কত প্রকার ভয় বিপদে কষ্টক্লেশে পতিত হইতে হয়, এমন কত অজ্ঞানিত সংসার-আবর্ত্তে পতিত হইয়া তৃণের ন্যায় ভাসমান হইতে হয়, যখন আমারদের ক্ষুদ্র পরাক্রম পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আইসে, উদ্ধারের কোন আশা থাকে না, সান্ত্বনার দিক অন্ধকার হইয়া যায়, যখন আপনার দিক হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন মনুষ্য-কণ্ঠ হইতে ক্ষীণস্বরে প্রার্থনা-বাণী সেই অভয়দাতার সিংহাসনের দিকে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে উঠিতে থাকে। এমন কত কৃপাপাত্র পাষণ্ডের বিষয় শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যাহারা আজীবন কাল সম্পদ ক্রোড়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবে শায়িত থাকিয়া ঈশ্বরের মধুময় নাম উচ্চারণ করিয়া জীবনকে সার্থক করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহার অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, বিপদের কঠোর কশাঘাতে তাহারদের চৈতন্যের উদ্রেক হইয়াছে। ঈশ্বরের আনন্দজনক প্রেমমুখ দর্শন করিতে যাহারা পারিল না, তাঁহার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং রূপ দর্শনে তাহারদের আত্মার মোহ-মেঘ অপসারিত হইয়া গেল। যাহারা সহজে তাঁহাকে ডাকিল না, ঈশ্বরের করাল মূর্ত্তি তাহাদিগকে জাগ্রত ও সচকিত করিয়া দিল। কত অভাব অনটনের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি, কত ভয় বিপদ আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, আমারদের অবস্থা কত চঞ্চল, আমারদের প্রাণ কত ক্ষুদ্র। এমন প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে কি মনুষ্য আপনার ক্ষুদ্র বলবীর্য্য জ্ঞানবুদ্ধির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে? বাহিরের সাহায্য না পাইলে তাহার আর গতি নাই। সেই জন্যই মনুষ্য সহজে তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। যখনই সে আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করে অমনি তাহার অন্তরালে সেই বিরাট পুরুষের অজেয় পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার সাহায্য লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। তিনি অনন্ত ও মহান আমরা তাঁহার সৃষ্ট ক্ষুদ্র জীব। এই সম্বন্ধ হইতেই একদিকে আশ্রয় অন্যদিকে আশ্রিতের ভাব সহজেই মনে প্রতিভাত হয়। সেই জন্যই আমরা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে পতিত হইলে স্বভাবতই তাঁহার অভিমুখীন হই। আমারদের উপাসনার ভাব নির্ভরের ভাব ঈশ্বরের সহিত আমারদের নিত্য সম্বন্ধ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইহা আমারদের নিজকৃত নহে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সহজজ্ঞানলব্ধ হইলেও, তাঁহার সহিত গাঢ় যোগের সূচনা তখনই আরম্ভ হয়, যখন আমরা রোগে শোকে ভয়ে বিপদে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার অমোঘ সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হই, সাংসারিক সুখে অতৃপ্ত হইয়া তৃষিত চাতকেরন্যায় তাঁহার নিকট অমৃতবারি আশে ধাবিত হই। ফলতঃ উপাসনাই ঈশ্বরের দ্বারের কুঞ্চিকা। ঈশ্বরের সহিত তখনও পর্য্যন্ত আমারদের কোন যোগই সংঘটিত হয় না যতক্ষণ না আমরা তাঁহাকে অন্তরতম প্রিয়তম সুহৃদ জানিয়া হৃদয়-কবাট অসঙ্কচিত্ত ভাবে তাঁহার নিকট উন্মুক্ত করি, হৃদয়ের সকল কামনা তাঁহার পদতলে আনিয়া দিই। পুত্র পিতাকে আপনার বলিয়া জানে বলিয়াই যেমন অকপটে প্রার্থনার বৈধতা অবৈধতা বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া সকল কাম

নাই তাঁহার গোচরে আনয়ন করে, আমরাও যদি সেইরূপ আমারদের সকল ইচ্ছা সেই বাঞ্ছাকল্পতরুর পদতলে আনয়ন করি, অন্তরের কামনা সকল পরিস্ফুটভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশ করি তখনই তাঁহাকে আত্মার নিজস্ব ধন বলিয়া বুঝিতে থাকি। ইহাই তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের প্রথম অবস্থা।

এ অবস্থা কতক পরিমাণে স্বার্থপরতার অবস্থা। এ অবস্থায় কেবল প্রার্থনার ভাব আমারদের মনে জাগরূক থাকে। শোকতাপে বিপত্তি বিষাদে পতিত হইয়া কেবল সংসারের কাণ্ডারীর নিকট হইতে অভয় প্রার্থনা করিতে থাকি। ভয় বিপদের মধ্যে তাঁহার নিকট অমোঘ সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকি। এ অবস্থায় কেবল তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে থাকি, বস্তুতঃ তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারি না।

ক্রমে যখন তাঁহার করুণায় তাঁহার প্রসাদে আমারদের বহু বিপত্তি তিরোহিত হইয়া যায়, তাঁহার অভয় কূলে আমরা স্থান পাই, তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব আমারদের মনে জাগরূক হয়, তাঁহাকে সকল মঙ্গলের নিদান বলিয়া বুঝিতে থাকি, তখন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে অন্তর্দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, কৃতজ্ঞতারসে হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়, প্রেমে আনন্দে আত্মার প্রাণ জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন কিসে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিব, কিসে তাঁহার অশেষ করুণার জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনাকে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইবার যোগ্য করিয়া তুলিব, তাহারই জন্য প্রাণমন ব্যাকুল হয়। যখন তাঁহার অপরিশোধ্য দয়ার বিষয় আলোচনা করি হৃদয় কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার পদতলে অবনত হয়, যখন আপনাকে তাঁহার অজস্র করুণার অনুপযোগী দেখি, তখন হৃদয়ে বিষম ব্যাকুলতার সঞ্চার হয়, আপনার ক্ষুদ্র বলবীর্য্য দেখিয়া নিরাশ হই, অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বহির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে থাকে। আমরা তাঁহার দীন হীন মলিন সন্তান, তিনি রাজগ[illegible] ত্রিভুবনপরিপালক, আমারদের উপরও তাঁহার এত দয়া। হায়! আমরা তাঁহার জন্য কিছু করিতে পারিলাম না, এমন দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম না, সম্পদে বিপদে তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে পারিলাম না, মৃত্যুর প্রতিকৃতি সংসারেই আকৃষ্ট হইয়া রহিলাম। আজন্মকাল তাঁহার করুণা আমারদের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইল, আমরা তাঁহার করুণার কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারিলাম না। আমারদের এ ক্ষোভ রাখিবার স্থান নাই।

হৃদয়ের মধ্যে যখন ঈদৃশ ব্যাকুলতার সঞ্চার হয় তখনই আমারদের প্রীতি তাঁহার দিকে ধাবিত হয়, তাঁহার অভিপ্রেত মঙ্গলকার্য্য সংসাধনে আমারদের নিষ্ঠা জন্মে। তখন তাঁহাকে বলি, ধনমান যৌবন সকলই তোমা হইতে পাইয়াছি, দারা সুত পরিজন সকলই দিয়াছ, বসুধাকে আমারই জন্য অক্ষয় শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছ, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের এত কি প্রেম আছে যে তা দিয়া আমি ইহার জন্য কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞ হইতে পারি। দেহ মনপ্রাণ ফলপুষ্পপত্র তোমারই দান, তোমারই দানে কেমন করিয়া তোমার তুষ্টি সাধন করিব। তোমাকে কি দিয়া পূজার্চ্চনা করিয়া হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি করিব। তোমার পূজার আয়োজন উপকরণ এখানে কোথায়? যাহা কিছু লইয়া তোমাকে অর্পণ করিতে যাই, তাহাতেই দেখি আমার ন্যায্য অধিকার নাই। আমার দ্বারা তোমার পূজা হইল না, তুমি আমার হৃদয় সিংহাসনে অবতীর্ণ হও

যে তোমার প্রসন্ন আনন দর্শন করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

এইরূপ যখন যে প্রীতি ঈশ্বরের দিকে বহমান হইয়াছে তাহাই আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া জগতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন সাধকের মনে ঘোর পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে। তখন তিনি স্বদেশের জন্য স্বজাতির জন্য, সমগ্র জগৎ সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্য সমগ্র প্রাণীর জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার প্রার্থনা হইতে স্বার্থপরতার দুর্গন্ধ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন তিনি সকলের কল্যাণ কামনা করেন, আপনার জীবন পরের হিতার্থে ব্যয় করিতে থাকেন। আপনার অমঙ্গল সত্ত্বেও পরহিতকর কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ হন না, আপনার প্রাণও যাউক তথাপি তাঁহার মুখ হইতে "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা এই মহাবাক্য জলদগম্ভীর স্বরে বহির্গত হইতে থাকে। ইহাই ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের দ্বিতীয় অবস্থা।

স্বার্থপরতামূলক প্রার্থনা একাকীই সম্ভবে। কারণ তাহা আপনার হিতের জন্য প্রার্থনা। অন্যের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ কি। আমরা এই প্রার্থনা মণ্ডপে নিজ নিজ স্বার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিতে পারিয়াছি তাই ইহা স্বর্গের সুষমা ধারণ করিয়াছে। আমরা বিগত-বিবাদ পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই জন্যই অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় আমারদের লক্ষ্য তাঁহার প্রতি স্থির রহিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাব আমারদের মধ্য হইতে তিরোহিত হইয়াছে। আমরা শান্তস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইয়া কি সংসারের কুটিল কামনাকে মনে স্থান দিতে পারি? যদি সামান্য বিবাদ কলহ আমারদের মনকে অধিকার করে তবে এত দিন যে আমরা পূর্ণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে ধরিয়া রহিলাম তাহার স্বার্থকতা কোথায় রহিল? যদি পৃথিবীর নিন্দাবাদে আমারদের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল তবে কোথায় ব্রহ্মজ্ঞান আমারদের মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইল। কোথায় চিত্তস্থৈর্য্য মনের দৃঢ়তা আমাদের মধ্যে স্থান পাইল। সকলের এক লক্ষ্য সকলের একগতি বলিয়া আমরা সকলে মিলিয়া শান্ত ভাবে শান্তস্বরূপের পূজার অধিকারী হইয়া নির্ম্মল তৃপ্তি অতুল্য চিত্ত প্রসাদ লাভ করিয়া বিগতপাপ বিগততাপ হইতেছি। তিনিও আমারদের হৃদয়-কবাট ভেদ করিয়া তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নিরবদ্য স্বরূপের উজ্জ্বলবিভায় আমারদের অন্তর্দেশ জ্যোতিষ্মান করিতেছেন।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা এক শ্রেষ্ঠ যোগ নিবদ্ধ করিবার অধিকার তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। যে অবস্থায় তিনি আমারদের বাক্যমনের অবিষয়ীভূত থাকিয়া স্বপ্রকাশরূপে আমারদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আমারদের অহংজ্ঞান চূর্ণ করিয়া দেন। তখন আমরা তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই পবিত্রতম সঙ্গমে আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। এ অবস্থায় বাহিরের কোন বিষয়ই আমারদিগকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। সে অবস্থা ধর্ম্মোন্মাদের অবস্থা নহে। সে অবস্থায় মন নিশ্চল স্থির হ্রদের ন্যায় অবস্থান করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন

> প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
> অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

প্রণব ধনুঃস্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ পরব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ; প্রমাদশূন্য হইয়া সেই

প্রণব ধনুর অবলম্বনে জীবাত্মারূপ শরদ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। শর যেমন লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তন্ময় হইবেক, অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইবেক।

কোথায় ঋষিদিগের গভীর সাধনা, আর কোথায় আমারদের ঘৃণিত দুর্ব্বলতা। আমারদের এতটুকু বল নাই এতটুকু স্থৈর্য্য নাই যাহার গুণে আমরা সাধক নামের যোগ্য হইতে পারি। বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম ওঙ্কারধ্বনি আমারদের হীন মলিন জিহ্বায়, কিন্তু অন্তর্দ্দেশ গরলে পরিপূর্ণ। বিশ্বজননি। তুমি কি তোমার হীন মলিন সন্তানদিগের দিকে একবার চাহিবে না, তাহারা আপনার বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া বিষম সঙ্কটে আপনাদিগকে আনয়ন করিয়া পথহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিপাত করিতেছে, জ্ঞানদীপ নির্ব্বাণ প্রায়, সম্মুখে বিপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য। তুমি আমাদিগকে সূর্য্যসম তেজস্বী অস্ত্র প্রদান করিয়া সুনীল আকাশ মেঘজালে পরিপূর্ণ করিয়া দিলে। আমরা দীনস্বরে ঊর্দ্ধমুখে তোমার অমোঘ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমারদের মধ্যে শান্তির রাজ্য বিস্তার কর, আমারদের পাপমলা ধৌত বিধৌত করিয়া দাও। সকলকে প্রেমডোরে আবদ্ধ কর। কুটিল ভাব, কুটিল চিন্তা বিদূরিত করিয়া দাও। যাহাতে আমরা তোমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারি, শান্তভাবে সাধুভাবে তোমার নাম দিক্ বিদিক্ ঘোষণা করিতে পারি, আমাদিগকে তাহার উপযুক্ত কর তোমার নিকটে বিনীতভাবে জোড়করে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

(উত্থান সঙ্গীত।)

১

অসীম সাগরে উঠিছে তুফান
উঠিছে গভীর ধ্বনি,
উঠে চারি ধারে কনক সোপান
করমের রণরণি!

২

ছুটে যায় সবে অমৃত পিপাসে
হলাহল দূরে ফেলে,
মেদিনী কাঁপায়ে হাসির বিভাসে
জগতের খেলা খেলে।

৩

হৃদয়ে সবার বিক্রম সঙ্গীত
চরণে বিক্রমভর;
চলিছে ধরিয়া সত্যের ইঙ্গিত
নাই ভাব জর জর।

৪

আমরা বাঙ্গালী প'ড়ে শুধু রব
মিথ্যা চাতুরী ল'য়ে?
গুণগুণ ব'সে পর কথা ক'ব
ভৃত্য সবার হ'য়ে।

৫

হয়নাকো লাজ দেখিয়া সবার
স্বাধীন চরণছাঁদ?
কোথায় সাহস বিপদ স'ধার?
শুধু মোহ উনমাদ!

৬

হায়, জানিরে কলহ ভায়েতে ভায়েতে
জানিরে টুটিতে প্রীত;
হায়, জানিনা "কেমনে প্রেমের দায়েতে
সাধিতে হয়রে হিত।"

৭

হায়, প'রে আছি মিছে মায়াআভরণ
স্বার্থ করি পরিমাণ;
ওই, চমকে চমকে ফেরে জাগরণ
জাগায়ে উদার গান,—

৮

শুনিব কেমনে? অনুদার হাসি
অনুদার ঘোর তান;
লইয়া প্রাণেতে পাপরাশি রাশি—
বিরহের পুষ্পবাণ।

৯

ঘুমায়ে র'য়েছি মোহের গিরিতে
অজগর সাপ যেন,
জগতে জগতে পারিনে ফিরিতে
ভুলিয়া "এসেছি কেন !"

১০

মাগি ভিখ পর-দুয়ারে ফিরিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা,
নিজেদের দোষে ফেলেছি করিয়া
স্বদেশেরে ঘোর কারা।

১১

স্বদেশে এমন উদার বাতাস
এমন শ্যামল ঠাঁই ;
বাঙ্গালীর প্রাণ কেননা মাতাস—
কেননা তোদের চাই ?

১২

কোথারে প্রেম স্বদেশের প্রতি
স্বদেশ থেকেও নাই ;
প্রেমহীন মোরা—মোহঘেরা মতি
যাতনা এতরে তাই।

১৩

পিশাচের বেশে কোণেতে লুকায়ে
ফেলিছি বিষাদশ্বাস ;
যেটুক আছেরে—যাইছে শুকায়ে
—পরাণের মধুবাস।

১৪

হৃদয় থানিরে আঁধারে ওটায়ে
হ'য়েছি সবার দাস,
স্বাধীনতাপদে পড়ি না লুটায়ে
হাসি-অধীনতা-হাস।

১৫

অনন্তের পাশে বসিনাকো কেন
অমৃত পরশ সুখ !
যাইবে সে সুখে দূরগতি হেন—
মোদের মলিন মুখ।

১৬

কোথাকে আছিস ভাই সব আয়
ভেসে যাই অসীমেতে,
দুন্দুভির ধ্বনি ছুটেছে কোথায
শোন্ সবে কান পেতে।

১৭

সুগভীর ঘোর মধুর নিনাদে
নাচিয়া উঠিবে প্রাণ,
ডুবে পরাজয়ে ? বাজাই বীণাদে
বাঙ্গালীর জয় গান।

১৮

আয় ভাই সব পরাজয় কেন
অসীমের সুধাকোলে ?
অসীমের শিশু নহি মোরা যেন
ব'সে আছি দুখে ভু'লে।

১৯

চল চল সবে এসেছি উঠিতে
আসিনি নাবিতে হেথা ;
অনন্তের রসে এসেছি ফুটিতে
আসিনি টুটিতে হেথা।

২০

কিসের বিষাদ ওঠ সবে ওঠ
জীবন কামনা কর।
জগত-কাননে ফোট সবে ফোট
আলোকের বেশ ধর।

২১

মলিনতা ত্বরা ঘুচাও ঘুচাও
প্রভাতে হেরিবে জাগো।
না যদি পারত থেক না কোথায়
জগত হইতে ভাগো।

২২

জগত চলিছে ঘুমালে হবে না
জগতের ঘরে এসে ;
ঘুমাও ঘুমাও রবেনা রবেনা
মিছে ঘুমে ভালবেসে।

৫০। ৬০ বৎসর হইতে চলিল এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। এমন অনেক কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা এই সমাজভুক্ত। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা সমাজভুক্ত না হইয়াও ইহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই উভয় প্রকার লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। সম্প্রতি আমরা একটী ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। যে কোনরূপে হউক যাঁহারা এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম সমাজের কার্য্যাধক্ষের নিকট সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাত্মনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা এপর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় দেয় মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। আশা করি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত ও আমাদিগের অনর্থক ডাকমাশুল ব্যয় করিতে হইবে না।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৮৮৩।৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩০৯১৸৵১০
সমষ্টি	৪৯৭৫॥০
ব্যয় ...	১৭৭৭॥ ১৫
স্থিত	৩১৯৭৸৶/৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১২২। ৫

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্ম সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য (১৮০৮ শকের মাঘ হইতে ১৮০৯ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত)	৩০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) (১৮০৮ শকের কার্ত্তিক হইতে মাঘ পর্য্যন্ত)	১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র দেব দাস	১১৸/০
" " কাশীনাথ দত্ত	২৲
" " বনমালী চন্দ্র	১৲
" " [illegible]ানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৲
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া)	৬৲
" " ক্ষেত্রমোহন [illegible] (উনাও)	১৲
" " কেদারনাথ মিত্র	২৲
" " রসিকলাল পাইন	৩৲
" " প্যারিমোহন রায়	১০৲

এককালীন দান।

পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২০৲
শ্রীযুক্ত বাবু রাধামোহন বসু (আঁচল)	১৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	১৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারি বড়াল	২৫৲
" " চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	।০
দানাধারে প্রাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ আয়	৫৬৶৫
	১২২।৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৩২।/৫
পুস্তকালয় ...	৩৬৶১০
যন্ত্রালয় ...	১২২১॥৵০
গচ্ছিত ...	৫৩/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১১ ৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৮০৲
দাতব্য ...	২৭৲
সমষ্টি	১৮৮৩।৵১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪০৶/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭২৶১৫
পুস্তকালয়	১১৮। ১৫
যন্ত্রালয়	৭০৯৸৶১০
গচ্ছিত	১২০॥৶১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৮০৲
দাতব্য	৩৬৲
সমষ্টি	১৭৭৭॥ ১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব।

জড় বস্তু ॥১৪॥

যদিচ তত্ত্বজ্ঞেরা জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী অবয়বটির সম্বন্ধে নিতান্তই হতবুদ্ধি হইয়া তাহাকে কি নামে নির্দ্দেশ করিবেন তাহা খুঁজিয়া পান নাই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিচিত অন্য অবয়বটির সম্বন্ধে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অবাধে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল—জ্ঞানের পরিবর্ত্তনীয় এবং বিশেষাত্মক অবয়বটি যে, কি, তাহা নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র কাঠিন্য অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের মতে তাহা ঐন্দ্রিয়ক অবভাস-সকলের অধিষ্ঠান-ভূমি—সমগ্র জড়-রাজ্য। ইহাই জ্ঞানের আগন্তুক বিশেষাত্মক এবং পরিবর্ত্তনীয় অবয়ব। জড়বস্তু উপলক্ষে পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তাহা সর্ব্বদাই অসমাপ্ত—কখনও পূর্ণাবয়ব নহে—তাহা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা এক প্রকার পুরাতন এবং অপ্রতিবিধেয় ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত।

বিভ্রান্তির মূল ॥১৫॥

এখানেও সেই পুরাতন গোলোযোগের কারণ দেখা দিতেছে—কি? না বস্তু-সকল যে অংশে শুদ্ধ কেবল আছে-মাত্র ও যে অংশে তাহারা জ্ঞানে বিদ্যমান—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ না দেখা। পুরাতন তত্ত্বজ্ঞেরা এই যে একটি কথা বলিতেছেন যে, জড়বস্তু-সকল চঞ্চল এবং পরিবর্ত্তন-শীল ইহা কিসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন? চঞ্চল অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, না চঞ্চল জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন? জড় বস্তুর প্রতি তাঁহারা যে আবির্ভাব-তিরোভাব-ধর্ম্ম আরোপ করিতেছেন, তাহা অস্তিত্বের আবির্ভাব-তিরোভাব—না জ্ঞানের আবির্ভাব-তিরোভাব—কিসের আবির্ভাব-তিরোভাব?

অস্তিত্বের আবির্ভাব-তিরোভাব হইতে পারে না ॥১৬॥

এ বিষয়ের একটা স্থির মীমাংসা আবশ্যক; কারণ, জড়বস্তু পরিবর্ত্তন-শীল—এ সিদ্ধান্তটিকে জ্ঞান-সম্বন্ধে যেমন অসঙ্কোচে শিরোধার্য্য করা যাইতে পারে—অস্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন নহে। টীকা ও ভাষ্য ব্যতিরেকে সহজে কেহ আর এ কথায় প্রত্যয় যাইতে পারেন না যে, পর্ব্বত ক্রমাগ-

তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রভূত অরণ্য এই আছে এই নাই—কঠিন প্রস্তর ক্ষয়-শীল—যে কাষ্ঠাসনে তিনি উপবিষ্ট তাহা নিরন্তর চলমান—সমস্ত বস্তুই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে পলায়মান। কেহ যেন এ-রূপ মনে না করেন যে, ও-কথার অর্থ কেবল এই মাত্র যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া জন্ম-মরণ ক্রমাগতই কার্য্য করিতেছে। অমন একটা সংসামান্য কথা পুরাতন তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রা-হ্যের মধ্যেই আসে নাই। এই যে একটি কথা যে, পৃথিবী ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হই-তেছে—তৃণময় ক্ষেত্র বাসন্তী বন ও বাতা-হত সমুদ্রতটের একমুহূর্ত্তও বিনা পরিবর্ত্তনে অতিবাহিত হয় না, একটি তৃণেরও একটি পত্রেরও আকার পরিবর্ত্তন—একটি বালুকারও স্থান পরিবর্ত্তন—এক মুহূর্ত্তও স্থগিত থাকে না, এ কথাটি লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানের আরো উচ্চতর লক্ষ্য ছিল। ও-কথাটি যদি বস্তু-সকলের অস্তিত্বের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহাতে এইরূপ দাঁড়ায় যে, সমগ্র জড়-জগৎ তাহার সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে তাহার স্থূলতম অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া স্থায়িত্বে একেবারেই বঞ্চিত, সমস্তেরই ঐকা-ন্তিক ধ্বংস এবং অকস্মাৎ উৎপত্তি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া ক্রমাগতই হইতেছে। এ মতটি এইরূপ অনাবৃত ভাবে প্রদর্শিত হইলে তাহা কোন জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরই অনুমোদনীয় হইতে পারে না,—যেহেতু তাহা কাহারো বোধগম্য নহে।

জড় বস্তু জ্ঞানে, অবশ্য, পরিবর্ত্তন-শীল॥১৭॥

আর এক দিকে এইরূপ দেখা যায় যে, জড়বস্তু পরিবর্ত্তন-শীল—এই কথাটিকে যদি জড়বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রয়োগ না করিয়া জড়বস্তুর জ্ঞান-সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহা অনায়াসে লোকের বোধগম্য হইতে পারে। একটা পর্ব্বত বাস্তবিকই পরিবর্ত্তন-শীল—এই আছে এই নাই;—কিন্তু কো-থায়? আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে। কেননা, কোন মনুষ্যই ক্রমাগত পর্ব্বত দেখিতে বা ভাবিতে বাধ্য নহে; তেমনি সমুদ্র; তে-মনি বিচিত্র ধন-ধান্য-শালী পৃথিবী ও বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত নভোমণ্ডল। যত কিছু বাহ্য বিষয় সমস্তই জ্ঞান সম্বন্ধে চলমান এবং অস্থায়ী; কেননা, এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, তাহাদিগকে সর্ব্বদাই অবিচ্ছেদে জ্ঞানে বিদ্যমান থাকিতে হইবে।

পুরাতন তত্ত্বজ্ঞেরা দুইকে মিসাইয়া একসাৎ করিয়াছেন॥১৮॥

প্রশ্ন এই যে, "জড়বস্তু অস্থায়ী" এই কথাটিকে পুরাতন তত্ত্বজ্ঞেরা কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন? প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, তাঁহারা উহাকে উভয় অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, কোনও অর্থেই তাহা তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিশ্চিত-রূপে গৃহীত হয় নাই। তাঁহারা জ্ঞানতত্ত্ব এবং অস্তিতত্ত্ব উভয়কেই যুগপৎ এক ছাঁচে ঢালিয়া একাকারে পরিণত করি-য়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানতত্ত্ব তাঁহাদের অস্তিতত্ত্বের মধ্যে কবলিত হইয়া রহিয়াছে; ও তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা উভয়কে পরস্পর হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখাইবার জন্য কিছু-মাত্র আয়াস পা'ন নাই। ভাষ্য-কারেরা পুরাতন গ্রন্থ-সকলের জ্ঞান-প্রধান অবয়বটির অপেক্ষা অস্তি-প্রধান অবয়বটির প্রতি সম-ধিক মনোযোগী হইয়াছেন, তাই সে সম-স্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। উপস্থিত বিষয়টি তাহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। "জড়-বস্তু ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে" এই কথাটিকে ভাষ্যকারেরা অস্তিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত

করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন ও জ্ঞানতত্ত্বের সহিত উহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নাই; এরূপ করাতে তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানেরও অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, ও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের বচন সকলের প্রকৃত অর্থ উল্টাইয়া দিয়া তাঁহাদেরও অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।

জ্ঞান-প্রধান অবয়টির প্রতি সমধিক মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য ছিল ॥ ১৯ ॥

জড়বস্তু পরিবর্ত্তন-শীল—এই কথাটির জ্ঞান-প্রধান অবয়বটির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইলে তাঁহারা ভাল করিতেন—তাহা হইলে তাঁহারা উহার অমোঘ যাথার্থ্য এবং প্রকৃত মূল্য অবগত হইতে পারিতেন। এটা তাঁহাদের বোঝা উচিত ছিল যে, জড়বস্তু-সকলের আবির্ভাব-তিরোভাবের বিষয় পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ কেবল এই যে, জড়বস্তু-মাত্রই কখনও বা আমাদের জ্ঞানে উপস্থিত—কখনও বা অনুপস্থিত। এইটিই পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞদিগের সমগ্র তাৎপার্য্য না হউক্—মুখ্য তাৎপর্য্য—তাহাতে আর ভুল নাই। বস্তু-রাজ্যে যাহাই হউক্ না কেন—কিন্তু এটা স্থির যে, আমাদের জ্ঞান-রাজ্যে জড়বস্তু-সকল ক্রমাগতই আবির্ভূত এবং তিরোভুত হইতেছে। পরিবর্ত্তনের সংক্রামক রোগ যখন জড়বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানে এই রূপ বদ্ধমূল, তখন তাহা জড়বস্তু-সকলের অস্তিত্বে উপসংক্রান্ত হইবে, ইহা খুবই সম্ভব; হয় তো পুরাতন তত্ত্বজ্ঞেরা "তাহাই হইয়াছে" মনে করিয়া এইরূপ বলিতে সাহসী হইয়াছেন যে, জড়বস্তুকে যদি মনোবৃত্তির পরিণাম-বিশেষ—সুতরাং জ্ঞান-বিশেষ—বলিয়া ধরা যায়, তবে তাহা অস্থায়ী জ্ঞান; আর, তাহাকে যদি বস্তু বলিয়া ধরা যায় তবে তাহা অস্থায়ী বস্তু; জড়বস্তু জ্ঞান-পক্ষে যেমন অস্থায়ী জ্ঞান, বস্তু-পক্ষে সেইরূপ অস্থায়ী বস্তু—দুইই; তাহা যদি হয়—তবে সে দোষ তাঁহাদেরও নহে—আমাদেরও নহে।

জড়বস্তু জ্ঞানে পরিবর্ত্তন-শীল ॥ ২০ ॥

জড়বস্তু-সকল অস্থায়ী এবং আগন্তুক বলিয়া আমাদের জ্ঞানে উপলব্ধ হয় কি না—ইহারই মীমাংসার জন্য জ্ঞানতত্ত্ব দায়ী; তদ্ভিন্ন, তাহারা বাস্তবিক অস্থায়ী এবং আগন্তুক কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা জ্ঞানতত্ত্বের অধিকার-বহির্ভূত। জড়বস্তু-সকল যে, আমাদের জ্ঞান-সমক্ষে নিতান্তই অস্থায়ী এবং আগন্তুক, তাহা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি আর একবার তাহা ভাল করিয়া প্রদর্শন করা যাইতেছে।

এইরূপ অস্থায়িত্বের প্রতিই জ্ঞানতত্ত্বের একমাত্র লক্ষ্য ॥ ২১ ॥

জড়বস্তু-সকল আমাদের জ্ঞানের অভ্যন্তরে উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে চলিয়া যায়; তাহাদের কাহারো এমন যোগ্যতা নাই যে, তাহা চিরকালের মত জ্ঞানে আড্ডা গাড়িয়া বসে; এমন কি—মনুষ্য তাহার নিজের শরীরকেও সর্ব্বক্ষণ জানিতে বাধ্য নহে। যদি বা কখনো এরূপ ঘটে যে, কোন এক ব্যক্তি তাহার শরীরকে অথবা অন্য কোন জড়বস্তুকে নিরন্তর জানিতেছে, তথাপি জ্ঞানের যখন এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, জড়বস্তুর জ্ঞান-ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন কোন জড়বস্তুই জ্ঞানাভ্যন্তরে চিরস্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। অশেষ বিচিত্র জড়বস্তুর মধ্যে একটিও সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে থাকে না—এ জন্য তাহাদের একটিও জ্ঞানে চিরস্থায়ী নহে; তাহাদের একটিও সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় না—এ জন্য তাহাদের একটিও জ্ঞানে সার্ব্ব-

ভৌমিক নহে; তাহাদের একটিও জ্ঞান-হইতে বহিষ্কৃত হইতে না পারে এমন নহে, এ জন্য তাহাদের একটিও অবশ্যম্ভাবী নহে। এইরূপে সহজেই দাঁড়াইতেছে যে, সমস্ত জড় জগৎ আমাদের জ্ঞানের একটি পরিবর্ত্তনীয় আগন্তুক এবং বিশেষ অবয়ব। এইরূপ অর্থেই পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞদিগের জড়বস্তু-বিষয়ক সিদ্ধান্ত সত্য এবং যুক্তিসঙ্গত। অস্তিতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে জড়বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতার কোন অর্থই বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহার অর্থ অতীব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

জড়বস্তুর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে গুটি দুই কথা ॥ ২২ ॥

অস্তিতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে উহার অর্থ যে, নিতান্তই বুঝিতে পারা যায় না, তাহাও নহে। জ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন বিষয় মাত্রই যখন প্রত্যক্ এবং পরাক্ এই দুই অংশের সংযোগ-সাপেক্ষ, তখন আশয়ের সম্বন্ধ-বহির্ভূত বিষয় অবশ্য অসম্পূর্ণ এবং অঙ্গহীন—কাজেই তাহা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। আশয়ের সহিত যোগযুক্ত হইলেই—জ্ঞানে আবির্ভূত হইলেই—জড় বস্তু সার্থক্য লাভ করে, আশয়-চ্যুত হইলেই—জ্ঞান হইতে তিরোভূত হইলেই—তাহা অর্থ-শূন্য হয়। এইরূপ আনর্থক্য হইতে সার্থক্যে উদ্ধার (কি না জ্ঞানে আবির্ভাব) এবং সার্থক্য হইতে আনর্থক্যে পতন (কি না জ্ঞান হইতে তিরোভাব) ইহাই জড়-সত্তার মর্ম্মগত পরিবর্ত্তন-শীলতা। দার্শনিক যুক্তি কৌশলে জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা বিষম এক দুর্বিপাকে নিক্ষিপ্ত হয়—কি? না ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন।

অহম্পদার্থ জ্ঞানে চিরস্থায়ী ॥ ২৩ ॥

এখন, জ্ঞানের অন্য অবয়বটির প্রতি চক্ষু ফিরাও—অহম্পদার্থের প্রতি—আপনার প্রতি; আর, এ অবয়বটির স্থায়িত্বের সহিত জড়বস্তুর অস্থায়িত্বের কিরূপ বিশাল অনৈক্য তাহা একবার তুলনা করিয়া দেখ। পর্ব্বত নদী বৃক্ষ প্রভৃতির ন্যায়—অহম্পদার্থ আমাদের জ্ঞানে ক্ষণে আবির্ভূত ক্ষণে তিরোভূত নহে; অহম্পদার্থ পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে তাহা জানে না। এই যে অহম্পদার্থ ইহা আমাদের জ্ঞানে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল—ইহা আমাদের জ্ঞান হইতে কখনই সমূলে তিরোভূত হয় না; ইহা আমাদের জ্ঞানে সার্ব্বভৌমিক, কেন না অহম্পদার্থ আমাদের সমস্ত জ্ঞানেই উপস্থিত; ইহা আমাদের জ্ঞানে অবশ্যম্ভাবী, কেননা অহংজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সম্ভবে না। এ দুই অবয়বের মধ্যে স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্বের প্রভেদ অতীব সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত।

চতুর্থ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ২৪ ॥

অহংপদার্থ বিশেষ-একটি জ্ঞানের বিষয় বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধ হয়—সকল জ্ঞানের সাধারণ বিষয় বলিয়া নহে; অথবা যাহা একই কথা—জড়বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান-সকল যেমন পৃথক্ পৃথক্ এক-একটি জ্ঞান, আত্মজ্ঞানও সেইরূপ পৃথক্ একটি জ্ঞান। আমাদের অনেকানেক বিশেষ বিশেষ জ্ঞান আছে—আত্মজ্ঞানও তাহাদের ভিতরকার একটি। জড়বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান-সকল যে ভাবে পরস্পর হইতে বিবিক্ত হয়, আত্মজ্ঞানও সেইভাবে জ্ঞানান্তর হইতে বিবিক্ত হয়; অর্থাৎ, উহার সর্ব্বগত ব্যাপকত্বের প্রতি লক্ষ করিয়া নহে—কিন্তু উহার বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ করিয়া আমরা উহাকে অন্যান্য জ্ঞান হইতে পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করি; উহা সকল জ্ঞানের সাধারণ ঐক্যস্থল বলিয়া নহে কিন্তু অনন্যসাপেক্ষ স্বতন্ত্র একটি জ্ঞান বলিয়া জ্ঞানান্তর হইতে বিবিক্ত হয়। ঘট-জ্ঞান শুদ্ধ কেবল ঘটগর্ভ; তা বই আর কিছুই নহে—ঘট-জ্ঞান

অহংগর্ভ নহে ; ঘট-জ্ঞান পটগর্ভ নহে ইহা যেমন সুনিশ্চিত, ঘট-জ্ঞান অহংগর্ভ নহে ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত। অহংজ্ঞান বলিয়া আমাদের বিশেষ একটি জ্ঞান আছে—তাহাই কেবল অহংগর্ভ, তদ্ভিন্ন আর কোন জ্ঞানই অহংগর্ভ নহে ; আমাদের সকল জ্ঞান নির্ব্বিশেষে অহংগর্ভ নহে।

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌকিক চিন্তার ভ্রমাত্মক মত ব্যক্ত করিতেছে ॥ ২৫ ॥

আত্ম-জ্ঞান-সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত লৌকিক চিন্তার ভ্রমাত্মক মতটি যেমন স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতেছে—ইতিপূর্ব্বে আর কেহ সে রূপ করে নাই। প্রতিপক্ষ বলিতেছেন যে, আমাদের বিশেষ একটি জ্ঞানই অহংগর্ভ—আমাদের সকল জ্ঞান অহংগর্ভ নহে। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের সকল জ্ঞান যদি অহংগর্ভ না হইল, তবে আমরা যে, আমাদের এক জ্ঞানের সহিত আর এক জ্ঞানের সাজাত্য উপলব্ধি করি—তাহা কি সূত্রে উপলব্ধি করি? এ বিষয়ে তিনি নিরুত্তর ; তবে যদি তিনি এইরূপ উত্তর দেন যে, সকল জ্ঞানই জ্ঞান—এই সূত্রে, সে তাঁহার উত্তর উত্তরই নহে। হস্তী-সকলের মধ্যে কি সূত্রে সাজাত্যের উপলব্ধি হয়—এ প্রশ্নের দুইরূপ উত্তর হইতে পারে ; এক উত্তর এই যে, তাহারা সকলেই হস্তী—এই সূত্রে ; এ উত্তর উত্তরই নহে ; আর-এক উত্তর এই যে তাহারা সকলেই শুণ্ডধারী—এই সূত্রে ; এই উত্তরই প্রকৃত উত্তর। তেমনি, জ্ঞান-সকলের মধ্যে কি সূত্রে সাজাত্যের উপলব্ধি হয়—এ প্রশ্নের অসদুত্তর (অথবা যাহা আরো ঠিক, অনুত্তর) এই যে, তাহারা সকলেই জ্ঞান—এই সূত্রে ; সদুত্তর এই যে, তাহারা সকলেই অহংগর্ভ—এই সূত্রে। প্রতিপক্ষ তাঁহার আপনার কথায় আপনি বাঁধা পড়িয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির সদুত্তর প্রদানে একান্তই অসমর্থ। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের মর্ম্ম-কথাটি যে কি তাহা নিম্নলিখিত সামান্য উদাহরণটির প্রতি দৃষ্টি করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে ;—আমি একটি ঘট জানিতেছি—লৌকিক চিন্তার মতে আমার এই ঘট-জ্ঞান একটি অনন্য-সাপেক্ষ সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান। আমি একটি পট জানিতেছি—আমার এই পট-জ্ঞানও লৌকিক চিন্তার মতে একটি অনন্য-সাপেক্ষ সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান ; এবং উপরি-উক্ত ঘট-জ্ঞান হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিবিক্ত। পুনশ্চ, আমি আপনাকে জানিতেছি—আমার এই আত্মজ্ঞানও লৌকিক চিন্তার মতে একটি অনন্য-সাপেক্ষ সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান এবং উপরি উক্ত জ্ঞান-দ্বয় হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিবিক্ত। এইরূপ পদ্ধতিই যে, আত্মজ্ঞান নিরূপণের প্রচলিত পদ্ধতি, এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভ্রম-সংশোধন ॥ ২৬ ॥

কিন্তু এরূপ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয় বিরুদ্ধ। ইহা স্ববিরোধী। ইহাতে এইরূপ দাঁড়ায় যে, সামান্য জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশেষ জ্ঞান সম্ভবে—আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে বস্তু-জ্ঞান সম্ভবে। সত্যসত্যই এরূপ কোথাও ঘটে না—"যেন ঘটে" এইরূপ মনে হয় মাত্র। বাস্তবিক যাহা ঘটে তাহা এই ;—ঘট এবং আমি আপনি দুয়ে মিলিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান ; পট এবং আমি আপনি দুয়ে মিলিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান ; এক কথায়—যে কোন বস্তু হউক না কেন তাহা এবং আমি আপনি দুয়ে মিলিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান সুনিষ্পন্ন হয়। জ্ঞান-মাত্রই যখন এই রূপ দ্বৈত-গর্ভ, তখন আর তাহাকে শুদ্ধ কেবল বিশেষাত্মক বলা সাজে না—তাহা বিশেষ (কোন-না-কোন বস্তু অথবা ভাব) এবং সামান্য (অহম্পদার্থ) এই দুয়ের

সজাত।* যখন আমি ঘট দেখি তখন আমি আপনাকে দ্রষ্টা বলিয়া উপলব্ধি করি; যখন আমি পট দেখি তখনও আমি আপনাকে দ্রষ্টা বলিয়া উপলব্ধি করি; যখন আমি রাম-রাবণের যুদ্ধ ভাবি, তখন আমি আপনাকে ধ্যাতা বলিয়া উপলব্ধি করি—ইত্যাদি (২. সিদ্ধান্ত ৪ পরিচ্ছেদ দেখ)। ইহাতেও কি প্রমাণ হইতেছে না যে. অহংপদার্থ আমাদের কোন বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ উপাদান নহে, কিন্তু সকল জ্ঞানেরই সাধারণ উপাদান? লৌকিক চিন্তার মুখপাত স্বরূপ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত তবে আর টেঁকেন কিরূপে?

প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানের মনোনীত॥ ২৭॥

ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, মনোবিজ্ঞান প্রতিপক্ষ-সিদ্ধান্তের আপাদ মস্তক সমস্ত কথাই শিরোধার্য্য করেন। বর্ত্তমান (অর্থাৎ চতুর্থ) প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত তৃতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল; তৃতীয় প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তই এই কথাটির সূত্রপাত করিয়াছে যে, আমাদের সকল জ্ঞানই—অন্ততঃ তাহাদের প্রথম আবির্ভাব কালে—বিশেষাত্মক। কি সূত্রে আমাদের জ্ঞান সকলের মধ্যে ঐক্যের বা সাজাত্যের উপলব্ধি হয়—কিসে আমাদের জ্ঞানের জ্ঞানত্ব হয়—এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞান কোন কথাই বলেন না। মনোবিজ্ঞান বলেন যে, বস্তু-সকলে সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ নিবিষ্ট করিয়া এবং সেই সাদৃশ্যের একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া আমরা তাহাদের জাতিগত ঐক্য হস্তে পাই। এই কথার প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান এ কথাও বলিতে পারিতেন যে, আমাদের জ্ঞান-সকলের সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ নিবিষ্ট করিয়া এবং সেই সাদৃশ্যের একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া আমরা তাহাদের জাতিগত ঐক্য হস্তে পাই; আর আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সেই যে জাতিগত ঐক্য, তাহার আশ্রয়-ভূমি আমরা আপনারাই; প্রত্যেক জ্ঞাতা নিজেই তাঁহার সমস্ত জ্ঞানের সাধারণ ঐক্যস্থল—তদ্ভিন্ন আর কেহ নহে—আর কেহ হইতেও পারে না। কিন্তু না; মনোবিজ্ঞান সে কথার দিক্ দিয়াও যা'ন না—তাঁহার কথার ভাবই স্বতন্ত্র। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মজ্ঞান একটি বিশেষ জাতীয় জ্ঞান; যেমন আর-আর জ্ঞান পরস্পর হইতে গণনায় বিভিন্ন, সেইরূপ আত্মজ্ঞানও আর আর জ্ঞান হইতে গণনায় বিভিন্ন। জ্ঞানের সর্ব্বসাধারণ মৌলিক উপাদান যাহা আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সাজাত্য সাধন করে, তাহা যে কি—মনো-বিজ্ঞানের সমস্ত পুঁথি উল্টাইলেও তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

আত্মার অভৌতিকতা প্রমাণ করা মনোবিজ্ঞানের কর্ম্ম নহে॥ ২৮॥

মনোবিজ্ঞানের এইরূপ ভ্রমাত্মক পদ্ধতির একটি সবিশেষ স্মরণার্হ ফল এই যে, আত্মার অভৌতিকতার প্রতিপাদক একমাত্র যুক্তি যাহা—তাহা তাঁহার হস্ত এড়াইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত এই দুয়ের উপরে সেই যুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত; মনোবিজ্ঞান যখন ও-দুইটি সিদ্ধান্ত

---

* ভগবদ্গীতা বলেন "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে;" আত্মা সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব—এ জন্য আত্মজ্ঞানের বেলায় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ বিশেষাত্মক বুদ্ধি খাটে না—সামান্যাত্মক বুদ্ধিই আত্মজ্ঞানের উপযোগী। যে বুদ্ধি এক বিষয় বাদ দিয়া আর-এক বিষয় গ্রহণ করে, তাহাই বিশেষাত্মক বুদ্ধি; আর যে বুদ্ধি সমস্ত কুড়াইয়া তাহার কেন্দ্রস্থানটি গ্রহণ করে, তাহাই সামান্যাত্মিকা বুদ্ধি। প্রকৃত পক্ষে উহা দুই বিভিন্ন জাতীয় বুদ্ধি নহে কিন্তু একই বুদ্ধির দুই বিভিন্ন অবয়ব; অথবা যাহা আরো ঠিক্—তাহা একই বুদ্ধির দুই বিভিন্ন বৃত্তি; অহং বৃত্তি এবং ইদং বৃত্তি;—তাহার মধ্যে অহং বৃত্তিটি সামান্যাত্মক, ইদংবৃত্তিটি বিশেষাত্মক।

প্রকারান্তরে অস্বীকার করিয়াছেন তখন আত্মার অভৌতিকতা তিনি যে আর কিসের উপর দাঁড় করাইবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শুধু কেবল জড়বাদীরা নহে—আধ্যাত্মবাদীরাও এই স্থানটিতে হাবুডুবু খাইয়াছেন—ইহা পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তে সপ্রমাণ হইবে।

সিদ্ধান্ত ॥৫॥

অহংপদার্থ জ্ঞানে কিরূপ।

অহংপদার্থ ভৌতিক বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; অর্থাৎ জ্ঞানের এমনি একটি অখণ্ডনীয় নিয়ম আছে, যাহা অহংপদার্থকে ইন্দ্রিয়গম্য হইতে দেয় না।

প্রমাণ।

অহংপদার্থ সকল-জ্ঞানেরই সঙ্গের সঙ্গী বলিয়া জ্ঞাত হয়; জড়বস্তু বিশেষ-একজাতীয় জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব বলিয়া জ্ঞাত হয় (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। যাহা সকল জ্ঞানের সাধারণ অবয়ব বলিয়া জ্ঞাত হয়, তাহা বিশেষ একজাতীয় জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারে না; কেননা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইবে যে, যে যাহা—সে তাহা নহে; ইহা স্ববিরোধী—সুতরাং অসঙ্গত (উপক্রমণিকা—২৪ পরিচ্ছেদ দেখ)।

পুনশ্চ; ভৌতিক বস্তু, তাহার সমস্ত বৈচিত্র্য সমেত, জ্ঞানের পরিবর্ত্তনশীল আগন্তুক এবং বিশেষ অবয়ব বলিয়া জ্ঞাত হয় (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। অহংপদার্থ যদি ভৌতিক বলিয়া জ্ঞাত হইত, তবে তাহাও জ্ঞানের পরিবর্ত্তন-শীল আগন্তুক এবং বিশেষ অবয়ব বলিয়া জ্ঞাত হইত। কিন্তু অহংপদার্থ জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয় অবশ্যম্ভাবী এবং সার্ব্বভৌমিক অবয়ব বলিয়াই জ্ঞাত হয় (৪ সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব অহংপদার্থ ভৌতিক বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে।

পুনশ্চ; জড়বস্তু তাহার সমস্ত বৈচিত্র্য-সমেত, জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব বলিয়া জ্ঞাত হয়। অহংপদার্থ যদি জড়বস্তুর ন্যায় ভৌতিক বলিয়া জ্ঞাত হইত, তবে উহাও জ্ঞানের কোন-না-কোন প্রকার বিশেষ অবয়ব বলিয়াই জ্ঞাত হইত; তাহা হইলেই এইরূপ দাঁড়াইত যে, অহম্পদার্থ আমাদের জ্ঞানের শুদ্ধ-কেবল একটি বিশেষ অবয়বমাত্র (অর্থাৎ সামান্য-নিরপেক্ষ বিশেষ অবয়ব)। কিন্তু ইহা তৃতীয় সিদ্ধান্তের বিরোধী; তৃতীয় সিদ্ধান্তের কথা এই যে, জ্ঞান-মাত্রই সামান্য এবং বিশেষ এই দুইরূপ মৌলিক উপাদানে পরিগঠিত। অতএব অহংপদার্থ ভৌতিক বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে।

অপিচ, "জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়ব" এ কথার অর্থই এই যে, তাহা জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব নহে; তেমনি আবার "জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব" এ কথার অর্থই এই যে, তাহা জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়ব নহে; সুতরাং অহংপদার্থ যখন জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়ব বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, আর, জড়বস্তু যখন জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, তখন ইহা আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উভয়ের একটি আর-একটি বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। অতএব অহংপদার্থ ভৌতিক বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; অথবা যাহা একই কথা—জ্ঞানের প্রত্যক্ অংশ তাহার পরাক্ অংশের সহিত সমধর্ম্মী বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে।

একটি বিশেষ লক্ষিতব্য ॥১॥

লক্ষ কর,—বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে এটি প্রমাণ করা হইতেছে না যে, অহংপদার্থ ভৌতিক

হইতে পারে না; এইটিই কেবল প্রমাণ করা হইতেছে যে, অহংপদার্থ কাহারো জ্ঞানে ভৌতিক বলিয়া উপলব্ধ হইতে পারে না। যদিচ বর্ত্তমান খণ্ডে (জ্ঞানতত্ত্বে) প্রসঙ্গ-ক্রমে অস্তিতত্ত্ব-ঘটিত কোন কথা উপস্থিত হইলে তাহার আন্দোলন করিতে কোন বারণ নাই, কিন্তু পাঠকের সর্ব্বদাই এটি মনে রাখা উচিত যে, এখানে (অর্থাৎ বর্ত্তমান খণ্ডে) যাহা কিছু শক্তরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে হইতেছে বা হইবে সমস্তই জ্ঞান-সম্বন্ধীয় কথা তাহার একটিও অস্তি-সম্বন্ধীয় কথা নহে। জ্ঞানে কি উপলব্ধ হয় বা না হয়—তাহাই এখানকার একমাত্র প্রমাণের বিষয়, বাস্তবিক কি আছে বা নাই তাহার প্রমাণের সঙ্গে এখানকার কোন সম্পর্ক নাই!

জ্ঞানের একটি গুরুতর নিয়ম ॥ ২।

উপরি-উক্ত প্রমাণ হইতে জ্ঞানের এই একটি গুরুতর নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, যাহার যে-কোন জ্ঞান হউক্ না কেন, তাহাতে জ্ঞাতা কোন-ক্রমেই ভৌতিক বলিয়া উপলব্ধি গম্য নহে। কোন-একজন মনুষ্যের আত্মাকে ভৌতিক-বেশে সাজাইয়া তাহার সমক্ষে ধারণ কর—তাহার মস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কের সারাংশ বাহির করিয়া একটি থালায় করিয়া তাহার সম্মুখে ধর ও তাহাকে বল যে, এই তুমি—এই তোমার অহংপদার্থ; এরূপ আত্ম-প্রদর্শন যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাতে তদ্দণ্ডেই প্রমাণ হইবে যে, প্রদর্শিত বস্তুটি দর্শক আপনি নহে; কারণ, দর্শক বলিবে যে, "ঐ দৃষ্ট বস্তুটির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপনাকে দ্রষ্টা বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি।" তবেই হইতেছে যে, ঐ দৃষ্ট বস্তু-টি—যাহা ভৌতিক মাত্র—তাহা ছাড়া দর্শক অতিরিক্ত আরো কিছু জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছে; আর, সেই যে অতিরিক্ত সামগ্রী (কি না দর্শক আপনি) তাহা তাহার আপনার নিকট আপনার যাবতীয় জ্ঞানের সঙ্গের সঙ্গী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু দৃষ্ট বস্তু-টি ঠিক্ তাহার বিপরীত; তাহা শুদ্ধ কেবল উপস্থিত জ্ঞান-টির সঙ্গাশ্রিত—আর কোন জ্ঞানেরই নহে। দর্শক আপনি আপনার জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক বিষয়—উপস্থিত দৃষ্ট বস্তুটি তাহার জ্ঞানের বিশেষ একটি বিষয়,—উভয়ের মধ্যে এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বে এটাকে ওটা অথবা ওটাকে এটা বলিয়া অবধারণ করা কোন-ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

পঞ্চম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ৩॥

এইখানটিতেই—আত্মার ভৌতিকতা এবং অভৌতিকতা সম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক তত্ত্বালোচনা বৃক্ষের স্কন্ধ-প্রদেশ হইতে শাখায়িত হয়। মনোবিজ্ঞান আত্মার ভৌতিকতার পক্ষই অবলম্বন করুন (যেমন কোন কোন মনোবিজ্ঞান করিয়া থাকেন) আর অভৌতিকতার পক্ষই অবলম্বন করুন্ (যেমন অপর কোন কোন মনো-বিজ্ঞান করিয়া থাকেন) তাঁহার এবং লৌকিক চিন্তার মত-ব্যঞ্জক পঞ্চম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত এই;—

পঞ্চম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত।

অহংপদার্থ ভৌতিক বলিয়া জ্ঞাত হইলেও হইতে পারে। জ্ঞানের এমন কোন অনতিক্রমণীয় নিয়ম নাই যাহা অহংপদার্থকে ইন্দ্রিয়-গোচরতা হইতে আটক করিয়া রাখে।

পঞ্চম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত জড়বাদী এবং অধ্যাত্মবাদী উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি ॥ ৪॥

এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তটি মনোবিজ্ঞানী-দিগের—কি জড়বাদী—কি অধ্যাত্মবাদী—উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ সম্পত্তি। জড়বাদীর মতে জড়বস্তু ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞানে

উপলব্ধি-গম্য নহে; এই জন্য তিনি বলেন যে, অহংপদার্থ কখনও যদি জ্ঞাত হয়, তবে তাহা ভৌতিক বলিয়াই জ্ঞাত হয়। অহং-পদার্থ এবং জড়-পদার্থের মধ্যে তিনি এই মাত্র প্রভেদ স্বীকার করেন যে, একটি জড়বস্তু—জ্ঞাতা, আর-একটি জড়বস্তু—জ্ঞাত। ইহাঁদের মতে—আত্মা অতীব সূক্ষ্ম-রূপী জড়বস্তু, অথবা, বিশেষ এক-জাতীয় জড়বস্তুর বা জড়বস্তু-সঙ্ঘের গুণ—একটা শারীরিক ব্যাপার-মাত্র। উদর-হইতে অথবা ঔদরিক স্নায়ু ব্যূহের অংশ-বিশেষ হইতে যেমন ক্ষুধা উদ্ভূত হয়, সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে জ্ঞান উদ্ভূত হয়। যাহাই হউক্ না—জড়বাদীর মতে জ্ঞানের এমন কোন অনতিক্রমণীয় নিয়ম নাই যাহা আত্মাকে জড়বস্তু বা জড়বস্তুর আশ্রয়াধীন কোন-কিছু বলিয়া জ্ঞাত হইতে দেয় না। আবার, অধ্যাত্মবাদী যদিও এ কথা স্বীকার করেন যে, আত্মা জড়বস্তু বলিয়া জ্ঞাত হয় না—কিন্তু সে কেবল পরীক্ষিত ঘটনা উপলক্ষে, জ্ঞানের অনতিক্রমণীয় নিয়ম উপলক্ষে নহে। তাঁহার ও-কথা আমাদের পঞ্চম সিদ্ধান্তের ন্যায় নিঃসন্দেহ নহে। উহা এক প্রকার মন-ভুলানো-রকমের কথা—উহার ভাব এই যে, সকল দিক্ বিবেচনা করিলে আত্মাকে অভৌতিক মনে করাই শ্রেয়ঃকল্প—এ নহে যে, আত্মাকে অভৌতিক বলিয়া জানা কোন জ্ঞানেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। জড়বাদ এবং অধ্যাত্ম-বাদ উভয়-কেই এখানে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

জড়বাদ ॥ ৫ ॥

উভয়-পক্ষই গোড়াতেই ভ্রমে লিপ্ত হইয়াছেন। প্রথমেই "আত্মা কি" ইহাই তাঁহারা স্থির করিতে গিয়াছেন,—তাঁহাদের উচিত ছিল "আত্মা জ্ঞানে কিরূপ উপলব্ধ হয়" অগ্রে ইহা স্থির করা—তাহা তাঁহারা করেন নাই। পূর্ব্বতন দেহ-তত্ত্বজ্ঞেরা আত্মাকে এক-প্রকার উষ্মা অথবা সূক্ষ্মতম বাষ্প—ক্ষীণতম জড়বস্তু—বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহারা কোন কালেই দেখাইতে পারেন নাই যে, আত্মা ঐরূপ বস্তু বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধ হয়। বিনা-প্রমাণেই তাঁহারা ঐ গুরুতর বিষয়টির বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি শুদ্ধ-কেবল উপমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, যথা;—জড়বস্তু সর্ব্বত্রই স্বরাজ্যে সকল বস্তুকেই জড়ধর্ম্মী দেখা যায়; মনুষ্যের শরীর ভৌতিক; তবে কেন মনুষ্যের আত্মা ভৌতিক না হইবে? শুদ্ধ কেবল এই উপমাটিকে সহায় করিয়া আত্মার ভৌতিকতা অম্লান-বদনে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই যে একটি কুসংস্কার যে, আত্মার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সূক্ষ্মতম জড়বস্তুর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, ইহা লোক-সমাজে এরূপ বদ্ধমূল যে, সকল ভাষাতেই আত্ম-বাচক শব্দ কোন-না-কোন প্রকার জড়বস্তু-বাচক শব্দ হইতে উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, [illegible] অনেক ঘটনা ঐ কুসংস্কারটির উন্মত্ততায় আহুতি প্রদান করিয়া উহাকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। ভূত-প্রেতের আবির্ভাব-কল্পনা উহার প্রাণ-রক্ষা-কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছে; আর, বর্ত্তমান কালের কতকগুলি লোকাদৃত উন্মত্ততা (যেমন ধ্যান-দৃষ্টি clairvoyance—প্রেতের ঠুক্কার-ধ্বনি spirit-rapping—এই সকল ব্যাপার) উহার সঙ্গে যোগ দিয়া উহার প্রশ্রয় আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এ-সকল ব্যাপার মনুষ্যের স্বাভাবিক কুসংস্কারের শ্রেণীভুক্ত নহে—অন্ততঃ তাহা না হইলেই ভাল। নিতান্ত অধম শ্রেণীর জড়বাদ অপেক্ষাও উহা অধম। এইরূপ

ব্যতিক্রম-সকল দুষ্ট কল্পনার এক প্রকার কণ্ডূয়নের—কামড়ানির—পরিচয় প্রদান করে; সেই দুষ্ট কল্পনা—যাহা সর্ব্বদাই তমসাচ্ছন্ন ঈশ্বর-ভ্রষ্ট জঘন্য গলি-ঘুচির মধ্যে অতীব সুপবিত্র বিষয়-সকলের জন্য হাতড়িয়া বেড়ায়। একে তো আমরা আমাদের স্বাভাবিক কুসংস্কারের সঙ্গেই পারিয়া উঠিতেছি না, তাহার উপর আবার মূঢ়তা প্রতারণা এবং ভ্রষ্টতার রীতিমত একটা ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসা—অথচ এইরূপ মনে করা যে, আমরা ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক-রাজ্যের চৌকাট মাড়াইতেছি, ইহা অতীব ভয়ানক। তোমরা এই যে বিকলীভূত স্নায়ু এবং বিকৃত অনুভূতি-সকলকে সত্যের উদ্ভাসক করিয়া দাঁড় করাইতেছ—যে চাবিতে স্বর্গের দ্বার এবং ভবিতব্যের সমস্ত রহস্য অপাবৃত হইবে সেই চাবি করিয়া গড়িয়া তুলিতেছ,—তোমরা এই যে রোগ-একটাকে সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারী পদে নিযুক্ত করিতেছ, এইরূপে মৃত্যু এবং অপদেবতাকে জগতের পরম প্রভু করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ,—তোমরা কি একটা ভাবিতেছ না যে, তোমাদের [illegible] ক্রমিক পশ্চাদ্গতি এবং অধোগতি হইতেছে! হা হতভাগ্য তন্ত্র-মন্ত্র-সাধকগণ! কবে তোমাদের এ বোধ জন্মিবে যে, ঈশ্বরের মহিমা এবং মনুষ্যের কল্যাণ সাধ্যের প্রশস্ত রাজপথে জগতের হাস্যময় সূর্য্যালোকে—দীপ্যমান; আর, সমস্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সমস্ত অসাধারণ প্রতিভা, আর কিছু নয়—শুদ্ধ কেবল সামান্য ব্যাপার সকলের মধ্যে অসামান্য আশ্চর্য্য দর্শনের ক্ষমতা।

আত্মার ভৌতিকতা অগ্রাহ্য ॥৬॥

অতএব ইহা অতীব স্পষ্ট যে, আত্মাকে ভৌতিক রূপে উপলব্ধি করা—অতীব সূক্ষ্ম জড়বস্তু রূপে উপলব্ধি করা—আত্মার উপলব্ধিই নহে। আত্মার ভাব উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আত্মাকে একটা বৃহৎ সমুদ্র-পোতের পঞ্চাশ মন ভারি নোঙড় বলিয়া উপলব্ধি করাও যা, আর সূতাতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর তন্তু যাহা কাহারো কল্পনার স্বপ্নে কখনও ভাসিয়া বেড়াইয়াছে তাহা বলিয়া উপলব্ধি করাও তা, দুয়ের কোনটিই আত্মার ভাবের কাছ দিয়াও যায় না। মনুষ্যের আত্মাকে কঠিনতম প্রস্তর বলাও যা, আর সূক্ষ্মতম বাষ্প বলাও তা, দুইই সমান। অতএব, এই যে একটি কথা যে, আত্মা অতীব সূক্ষ্ম জড়বস্তু-বিশেষ, ইহা একেবারেই অগ্রাহ্য।

আত্মাকে শারীরিক অবয়ব সঙ্ঘাতের ফলরূপে উপলব্ধি ॥৭॥

আর এক প্রকারের জড়বাদ, যাহা আত্মাকে শারীরিক অবয়ব সঙ্ঘাতের ফল বলিয়া ধার্য্য করে (যেমন মস্তিকতত্ত্ব Phrenology) তাহা অপেক্ষাকৃত গ্রাহ্যাস্পদ, এবং তাহার সহিত পারিয়া উঠা অপেক্ষাকৃত কঠিন। জড়রূপী পরমাণু পুঞ্জ বিশেষ-এক-প্রকার মূর্ত্তি এবং ব্যবস্থা পরিগ্রহ করিয়া মস্তিকরূপে পরিণত হয় ও তাহারই প্রসাদাৎ জ্ঞান আবির্ভূত হয়; আর, সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মস্তিকের আয়তন এবং তাহার পাকচক্রের সংখ্যা ও গভীরতা এই দুয়ের তারতম্য অনুসারে জ্ঞানের তারতম্য হয়। জড়বাদীরা বলেন যে, পরমাণু-পুঞ্জের সংযোগ-জাত আর আর ফল অপেক্ষা উপরি-উক্ত সহজ বৃত্তান্তটি কিসে যে এত বেশী আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় ও তাহা শিরোধার্য্য করিতে লোকের কেন যে এত বেশী ভার-বোধ হয়—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কার্য্য-কারণের ভাব যাহা আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তাহা শুদ্ধ কেবল—নিয়ত (অর্থাৎ নিয়ম-বদ্ধ) অনুবর্ত্তিতা, তাহার অধিক আর কিছুই নহে। যখন

কতক-গুলি পূর্ব্ব-সূত্র উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে কতকগুলি ফল অনুবৃত্ত হয়। আত্মার উৎপাদন-ক্ষম পূর্ব্ব-সূত্র-গুলি একত্র সমাগত হইলে আত্মা তাহা হইতে অনুবৃত্ত না হইবে কেন? মনুষ্য-দেহের অবয়ব সজোতই সেই পূর্ব্ব-সূত্র-গুলির যোটপাট—কাজেই আত্মা তাহা হইতে উদ্ভূত হয়। এইরূপে, আত্মাকে কতক-গুলি ভৌতিক পরমাণু-সঙ্ঘের আনুষঙ্গিক ফল করিয়া গড়িয়া তোলা হয়; আত্মা শরীরের অধীনে সংস্থাপিত হয়—বালির বাঁধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যাত্মবাদীর যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে ॥৮॥

অধ্যাত্মবাদের অস্ত্রাগারে এমন কি কোন অস্ত্র আছে যাহা ঐ কদর্য্য সিদ্ধান্তটিকে খণ্ডন করিতে পারে? জড়বাদের যেরূপ হীনাবস্থা—সেরূপ আর কোনটির হয় নাই। অধ্যাত্মবাদী এই যে একটি যুক্তি খাড়া করেন যে, মানসিক এবং শারীরিক এই দুই বিভিন্ন-জাতীয় গুণ একই মূল বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং মানসিক গুণের আধার যে, আত্মা, তাহা শরীর হইতে স্বতন্ত্র, এ যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। এই মৃদু বাক্‌চাতুরীটির বিশেষ কোন ভারিত্ব নাই। উহা সত্য সত্যই কিছু আর বক্তার মনোগত অভিপ্রায় নহে। কোন্ গুণ কোন্ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিবে—কোন্ কারণ হইতে কোন্ কার্য্য অনুবৃত্ত হইবে—ইহা প্রকৃতিকে শিক্ষা দেয় এমন কে আছে? বিস্তৃতি কাঠিন্য, গুরুত্ব, ক্ষুৎপিপাসা, তড়িৎ, ইহারা যেমন জড়বস্তুর গুণ বা জড়বস্তু-সম্ভূত ফল, আত্মাও সেইরূপ না হইবে কেন? কেন যে তাহা হইতে পারে না—মনোবিজ্ঞানীকে তাহার কারণ দেখাইতে হইবে; হয় তিনি বলুন—তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ, নয় তিনি বলুন—তাহা পরীক্ষা-বিরুদ্ধ। যদি তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ হয়, তবে কিসে তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ তাহা তিনি দেখা'ন; যদি তাহা পরীক্ষা-বিরুদ্ধ হয়, তবে কিসে তাহা পরীক্ষা-বিরুদ্ধ তাহা তিনি দেখা'ন। তাহা তিনি দেখাইতে পারেনও না, দেখাইতে চাহেনও না। তাঁহার যাহা কথা তাহা তিনি মুখে বলেন মাত্র—প্রমাণ করেন না। জড়বাদীদিগের কথাও তাঁহাদের মুখের কথা-মাত্র, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের কথাগুলিতে ঠিক্ যুক্তি না হউক—যুক্তির ভান বিলক্ষণই আছে। কি জড়বাদী কি অধ্যাত্ম-বাদী—উভয়েরই কথা এই যে, জড়বস্তুর সর্ব্ববাদী সম্মত সত্তা পূর্ব্বাহ্ণেই আসর অধিকার করিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা তেমন স্পষ্টরূপে এবং অভ্রান্তরূপে আসরে উপস্থিত নাই। উভয়েরই মনোগত অভিপ্রায় এই যে, জড়বস্তুই স্পষ্ট বস্তু—আত্মা অস্পষ্ট বস্তু। অতএব ইহা যদি মানিতে হয় যে, বিনা প্রমাণে সত্তা-স্থাপনা নিষিদ্ধ, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানসিক গুণ সকলের একটা স্পষ্ট আধার, (যেমন জড় বস্তু) এবং মানসিক কার্য্য সকলের একটা স্পষ্ট কারণ (যেমন ভৌতিক কারণ) নির্দ্দেশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অধ্যাত্মবাদী ঐ সকল গুণের একটা অস্পষ্ট আধার (যেমন আত্মা) এবং ঐ সকল কার্য্যের একটা অস্পষ্ট কারণ (যেমন আধ্যাত্মিক কারণ) নির্দ্দেশ করিতে অধিকারী নহেন। জড়বস্তু কেন যে মানসিক গুণ-সকলের আধার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, জ্ঞানের কি এমন অখণ্ডনীয় নিয়ম আছে যাহা তাহাদিগকে সেরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে দেয় না, তাহা অদ্যাপি কাহারো কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয় নাই।

উভয় পক্ষই আত্মাকে বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৯ ॥

আত্মার ভাব উপলব্ধি করিতে গিয়া যে কারণে অধ্যাত্ম-বাদী এবং জড়বাদী উভয়-পক্ষই গোলে পড়িয়াছেন, তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি; তাহা আর কিছু নয়—আত্মার ভাব জ্ঞানে কিরূপ উপলব্ধ হয় তাহা অবধারণ করিবার পূর্ব্বে, আত্মা কি—তাহা স্থির করিতে যাওয়া। সকল সত্তাই বিশেষ সত্তা এইটি তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হওয়াতে, আত্মার বিশেষ সত্তা কিরূপ এবং আত্মার বিশেষ লক্ষণই বা কিরূপ, তাহা-রই অনুসন্ধানে তাঁহারা ধাবিত হইলেন। জড়বাদী এইরূপ স্থির করিলেন যে, আত্মা—হয় বিশেষ এক জাতীয় জড়বস্তু—নয় ভৌতিক পরমাণু সংজ্ঞের বিশেষ এক প্রকার ফল। অধ্যাত্মবাদী এইরূপ স্থির করিলেন যে, প্রকৃত-পক্ষে আত্মা জড়বস্তু হইতে ভিন্ন বিশেষ একজাতীয় বস্তু—তাই তাহা অলৌকিক শব্দের বাচ্য। উভয়েরই মতে—আত্মা বিশেষ একটা-না-একটা কিছু।

আত্মা সার্ব্বভৌমিক বলিয়াই জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য ॥১০॥

সকল সত্তাই বিশেষ সত্তা কি না আর, অহম্পদার্থ ভৌতিকই হউক আর অভৌতিকই হউক তাহা বিশেষ একটা কিছু কি না, এ প্রশ্নের সহিত জ্ঞানতত্ত্বের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। অহম্পদার্থ জ্ঞানে কিরূপ উপলব্ধ হয় বা হয় না—জ্ঞানতত্ত্ব তাহারই বিচার-নিষ্পত্তির জন্য দায়ী। জ্ঞানতত্ত্ব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, আত্মা কোন প্রকার বিশেষ বস্তু বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে,—বিশেষ ভৌতিক বস্তু বলিয়াও উপলব্ধি-গম্য নহে—বিশেষ অভৌতিক বস্তু বলিয়াও উপলব্ধি-গম্য নহে; আত্মা শুদ্ধ কেবল সার্ব্বভৌমিক বলিয়াই—নির্বিশেষে সকল জ্ঞানের সাধারণ অবয়ব বলিয়াই—জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য। সকল জ্ঞানেই যাহা নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান, তাহাতে সার্ব্বভৌমিকতা ভিন্ন কোন বিশেষত্বই বর্ত্তিতে পারে না। আত্মাকে কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত বিশেষ বস্তু বলিয়া মনে করিতে গেলেই তাহার সার্ব্বভৌমিকতা বিশেষত্বে পরিণত হয়, অথবা সাহা একই কথা—আত্মার ভাব জ্ঞানে আরূঢ় হইতে না হইতেই তাহা জ্ঞান-হইতে কাটিয়া যায়।

আত্মাকে বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করাই জড়বাদীর ভ্রম ॥ ১১ ॥

এতক্ষণে আমরা জড়বাদী এবং অধ্যাত্ম-বাদী উভয়েরই মূল-গত ভ্রমটিকে মুষ্টির মধ্যে পাইলাম। জড়বাদীর মূল-গত ভ্রম এ নহে যে, আত্মা ভৌতিক বস্তু অথবা ভৌতিক বস্তুর ফল। এটা একটা ভ্রম বটে—কিন্তু ইহা আর একটি ভ্রমের জন্য দুঃখে জীবন ধারণ করিতেছে, সেইটিই মাতৃ ভ্রম; তাহা আর কিছু না—উপরের ঐ কথাটির সহিত "বিশেষ" এই শব্দ-টি যুড়িয়া দেওয়া, যথা,—আত্মা বিশেষ একজাতীয় ভৌতিক বস্তু অথবা ভৌতিক বস্তুর বিশেষ এক প্রকার ফল। জড়বাদীর এই যে একটি কথা যে, আত্মা ভৌতিক বস্তু, অথবা শারীরিক অবয়ব সঙ্ঘাতের ফল, এ কথার [illegible] যাহা কিছু-সম্ভবে সমস্তই ঐ মাতৃ-ভ্রমটির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মা বিশেষ এক প্রকার জড়বস্তু কি না—অথবা জড়বস্তুর বিশেষ এক প্রকার ফল কি না—তাহা লইয়া এখানে কোন কথা হইতেছে না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণোনাস্তি স্থির-সিদ্ধান্ত যে, আত্মা ওরূপ বস্তু বা ফল বলিয়া কাহারো জ্ঞানে উপলব্ধি-যোগ্য নহে। আত্মা যখনই জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, তখনই তাহা জ্ঞানের বিশেষ অবয়বের বিপরীত পক্ষ বলিয়াই—[illegible] সার্ব্বভৌমিক বলিয়াই—উপলব্ধ হয়; কা-

সেই আত্মাকে জড়বস্তু-বিশেষ বা জড়বস্তুর ফল-বিশেষ বলিয়া উপলব্ধি করিতে গেলেই আত্ম-জ্ঞানে অগত্যা বঞ্চিত হইতে হয়।

অধ্যাত্মবাদীরও ঐ ॥ ১২ ॥

অধ্যাত্মবাদীর ভ্রমও ঠিক ঐরূপ। তাঁহার মত এই যে, আত্মা অভৌতিক বস্তু। অধ্যাত্মবাদীর মনোগত অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে—তাঁহার এ মতটিও ভ্রমাত্মক; কারণ, আত্মা বিশেষ এক-জাতীয় বস্তু এইরূপ মনে করিয়াই তিনি আত্মাকে অভৌতিক বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহাই হউক—তাঁহার এই মতটি শুদ্ধ একটা কথার কথা মাত্র তাহার ভিতরে কোন পদার্থ নাই। জড়বাদীর ন্যায় অধ্যাত্মবাদীও মনুষ্যের একটা বঞ্চনা করিয়া দিয়াছেন; তিনি—আত্মা কি—এইটি আমাদিগকে শিখাইতে গিয়া, আত্মা স্থানে কিরূপে উপলব্ধ হয়—এ বিষয়ে আমাদিগকে অকূল পাথারে ফেলিয়া দেন; ইহাতে লাভের মধ্যে হয় এই যে, আত্মা কি তাহা তিনি বলিতে না পারিয়া—কতকগুলি অপক্ক কল্পনা যাহা জড়বাদ-অপেক্ষা শাস্ত্রসম্মত এবং প্রশংসনীয় বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ, তাহাদিগকেই তিনি আত্মার নাম করিয়া চালাইয়া দেন। প্রকৃত কথা এই যে, আত্মা বিশেষ ভৌতিক বস্তু বলিয়াও উপলব্ধি-গম্য নহে, বিশেষ অভৌতিক বস্তু বলিয়াও উপলব্ধি-গম্য নহে। ইতিপূর্ব্বে যেমন আমরা দেখাইয়াছি—আত্মা আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক এবং অপরিবর্ত্তনীয় অবয়ব বলিয়াই উপলব্ধি-গম্য। আমাদের জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব যাহাই হউক না কেন—কোন প্রকার ভৌতিক অবভাসই হউক, আর, কোন প্রকার অভৌতিক অবভাসই হউক—তাহা স্বতন্ত্র, আর, জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়ব স্বতন্ত্র; আত্মা শুদ্ধ কেবল শেষোক্ত অবয়ব বলিয়াই উপলব্ধি-গম্য। অভৌতিক শব্দ যদি সার্ব্বভৌমিক শব্দের নামান্তর বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তবেই এ কথা ঠিক যে, আত্মা অভৌতিক বস্তু; কিন্তু যদি কোন প্রকার বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ করিয়া অভৌতিক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তবে আত্মা যেমন ভৌতিক নহে তেমনি অভৌতিকও নহে। মনোবিজ্ঞানী শেষোক্ত অভিপ্রায়েই অভৌতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাই তিনি ভ্রমে পতিত হ'ন। আমি এই পুস্তক নহি, আমি আমার শরীর নহি, আমার সম্মুখস্থিত কোন বস্তুই আমি নহি; তবে কি আমি আমার অন্তরস্থিত বিশেষ-কোন-প্রকার ভাবনা অথবা বিশেষ-কোন-প্রকার অনুভূতি? * তাহাও নহে। যখন আমি ভীষ্মের মৃত্যু ভাবনা করি—তখন সে ভাবনা অভৌতিক বটে কিন্তু তাহা আমি নহি। যখন আমি কাহারো প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করি, তখন আমার সে অনুভব আমি নহি। যেমন—আমি আমার সম্মুখস্থিত পুস্তক বা লেখনী নহি, তেমনি আমি আমার অন্তরস্থিত ভাব বা সুখদুঃখ নহি। সেক্‌স্‌পিয়র-বিরচিত ঝটিকা নামক নাটকের ডাকিনীপুত্র কালিবান বলিয়াছে বটে যে "আমি একটা অবরুদ্ধ বেদনা" কিন্তু সে কেবল একটা অন্তরের উচ্ছ্বাস; এরূপ অত্যুক্তি কাব্য-মহলেই শোভা পায়—তত্ত্বজ্ঞান-মহলে নহে। বিশেষ-কোন-প্রকার ভৌতিক বস্তুই বা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হউক, আর, বিশেষ-কোন-প্রকার মানসিক ব্যাপারই বা আমার অন্তরে

---

* ভাবনা অর্থাৎ Thought; অনুভব অর্থাৎ feeling। অনুভব-শব্দের অর্থ Conception নহে কিন্তু feeling। সুখদুঃখ ভাবনা (Think) করা স্বতন্ত্র এবং সুখদুঃখ অনুভব (feel) করা স্বতন্ত্র। অবৈজ্ঞানিক ভাষায় Conception শব্দ কখনো কখনো feeling শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয়—এইরূপ স্থলেই Conception অনুভব।

আবির্ভূত হউক, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের সমস্তটাই যে আমি তাহা নহে; সে জ্ঞানের (এবং আমার আর আর সমস্ত জ্ঞানের) সার্ব্বভৌমিক অবয়বটাই কেবল আমাকর্ত্তৃক "আমি" বলিয়া উপলব্ধ হইতে পারে।

ভ্রমদ্বয় ॥ ১৩ ॥

জড়বাদীর ভ্রম এই যে, আত্মা বিশেষ-একজাতীয় ভৌতিক বস্তু অথবা ভৌতিক পরমাণু-সঙ্ঘের বিশেষ-এক-প্রকার ফল। অধ্যাত্মবাদীর ভ্রম এই যে, আত্মা বিশেষ-এক-জাতীয় অভৌতিক বস্তু। দুইই অনুমান মাত্র, অর্থহীন বাক্য-মাত্র। দুই বাদীর দুই মতই এই-একটি-কথায় নিধন প্রাপ্ত হয় যে, অহংপদার্থ বিশেষ-কোন-কিছু বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারেই না—অহংপদার্থের পরিচয়-লক্ষণ শুদ্ধ কেবল এই যে, তাহা সকল বিদিতের মধ্যে এক বিদিত।

পুনরাবৃত্তি ॥ ১৪ ॥

উপসংহার-স্থলে এই কথাটি সবিনয়ে নিবেদন হইতেছে যে, এই পঞ্চম সিদ্ধান্তই আত্মার অভৌতিকতার একমাত্র যুক্তি-সঙ্গত প্রমাণ। বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের ভিত্তি-মূল সংস্থাপন পক্ষে তৃতীয় এবং চতুর্থ সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। আত্মার ভৌতিকতা-অভৌতিকতা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিচারের নিষ্পত্তি তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম এই তিনটী সিদ্ধান্তের হস্তে নির্ভর করিতেছে—তদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। আত্মার অভৌতিকতা উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার একমাত্র পদ্ধতি এই যে, আত্মাকে তাহার যাবতীয় জ্ঞানের যাবতীয় বিশেষ অবয়বের প্রতিকূলে সকলেরই সার্ব্বভৌমিক অবয়ব বলিয়া উপলব্ধি করা। এই জন্যই চতুর্থ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন; সে সিদ্ধান্ত এই যে, অহংপদার্থ সকল জ্ঞানেরই সার্ব্বভৌমিক অবয়ব এবং জড়বস্তু তাহার সমস্ত বৈচিত্র্য সমেত বিশেষ একজাতীয় জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব। কিন্তু চতুর্থ সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে এইটী দেখানো আবশ্যক যে, প্রত্যেক জ্ঞানে—একদিকে যেমন সকল জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়ব, আর-এক-দিকে তেমনি তাহার নিজের বিশেষত্ব, দুইই বর্ত্তমান থাকা চাই। এই সত্যটী সংস্থাপন করিবার জন্যই তৃতীয় সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। বর্ত্তমান পঞ্চম সিদ্ধান্তটী তৃতীয় এবং চতুর্থ সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী ফল; পঞ্চম সিদ্ধান্ত বলে এই,—যাহা সমস্ত জ্ঞানেরই সার্ব্বভৌমিক অবয়ব তাহা কখনও বিশেষ কোন জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব হইতে পারে না; অতএব, ইহা যখন অকাট্যরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে যে, অহংপদার্থ সকল জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক অবয়ব বলিয়াই উপলব্ধি-গম্য এবং জড়বস্তু বিশেষ একজাতীয় জ্ঞানের বিশেষ অবয়ব বলিয়াই উপলব্ধি-গম্য, তখন আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অহংপদার্থ জড়বস্তু বলিয়া—ভৌতিক বলিয়া—উপলব্ধি-গম্য নহে। অভৌতিক শব্দ সার্ব্বভৌমিক অর্থেও পরিগৃহীত হইতে পারে; তাহা যদি হয়—তবে তো আ[illegible] আমাদের সকলেরই জানা কথা হইয়া দাঁড়ায়—কেন না কাহারো জ্ঞানে আত্মা সার্ব্বভৌমিক ভিন্ন অন্য কোন রূপে উপলব্ধি-গম্য নহে। এরূপ হইলে অধ্যাত্মবাদীর মতের সহিত আমাদের মতের একটুকুও বিরোধ থাকে না। কিন্তু তিনি আত্মাকে বিশেষ এক-জাতীয় অভৌতিক বস্তু বলিয়াছেন কি—অমনি আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব ও তাঁহার ঐ স্ববিরোধী মতের সহিত আমাদের মতের যে, কোন-অংশে

সাদৃশ্য আছে, তাহা একেবারেই অস্বীকার করিব।

মানবীকরণ।

(ANTHROPOMORPHISM)

ঈশ্বরেতে মানুষিকতা অর্থাৎ মনুষ্যের গুণ আরোপ করা সংক্ষেপে মানবীকরণ বলিয়া সংজ্ঞিত হইল। অনেকের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরেতে চেতন-ধর্ম্ম আরোপ করা মানবীকরণ, যেহেতু চেতন-ধর্ম্ম মনুষ্য প্রথমতঃ আপনাতেই উপলব্ধি করে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরেতে অচেতন-ধর্ম্ম আরোপ করা ভিন্ন—ঈশ্বরকে অন্ধ জড়-সত্তা-রূপে প্রতিপাদন করা ভিন্ন—আর আমাদের [illegible] না। এইরূপ করিয়া আমরা মানবী[illegible] হইতে রক্ষা পাই বটে, কিন্তু কিসের জন্য? জড়ীকরণের অন্ধকূপে নিপাতিত হইবার জন্য! মনুষ্য অপেক্ষা প্রস্তর পাষাণ উৎকৃষ্ট না অপকৃষ্ট—মানবীকরণ অপেক্ষা জড়ীকরণ ভাল না মন্দ? পাছে সৃষ্ট বস্তুর কোন গুণ ঈশ্বরেতে আরোপ করা হয়, এই ভয়ে তুমি তাঁহাকে সচেতন পুরুষ বলিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু শুধু কি কেবল মনুষ্যই একা সৃষ্ট বস্তু—জড় বস্তু কি সৃষ্ট বস্তু নহে? ঈশ্বরেতে মনুষ্য-ধর্ম্ম আরোপ করিতে তুমি বড়ই কুণ্ঠিত, অথচ তাঁহাতে জড়ধর্ম্ম আরোপ করিতে তুমি একটুও কুণ্ঠিত নহ, ইহার অর্থ কি? মানুসিকতা অপেক্ষা জড়তা কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী—মনুষ্য অপেক্ষা প্রস্তর-পাষাণ কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী—চেতন অপেক্ষা অচেতন কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী? প্রস্তর পাষাণ অপেক্ষা মনুষ্য যদি উৎকৃষ্ট হয়—অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান যদি উৎকৃষ্ট হয়—তবে অবশ্য জ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়াই মনুষ্যের ঊর্দ্ধগতি, এবং অজ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়াই মনুষ্যের অধোগতি; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়—ঊর্দ্ধগতির পথ না অধোগতির পথ—জ্ঞানের পথ না অজ্ঞানের পথ? ঈশ্বর স্বয়ং যদি অজ্ঞান হ'ন—তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতে হইলে কাজেই অধোগতির পথ—অজ্ঞানের পথ—অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ অধোগতির পথই যদি শ্রেয়ের পথ হইত, তাহা হইলে পৃথিবী উল্টিয়া যাইত; তাহা হইলে মনুষ্য পৃথিবীর মস্তকের উপর হইতে পদপ্রান্তে নিপতিত হইত এবং প্রস্তর পাষাণ পৃথিবীর পদপ্রান্ত হইতে মস্তকের উপরে আরোহণ করিত কেননা ঈশ্বর স্বয়ং প্রস্তর পাষাণের সমধর্ম্মী।

প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরকে সচেতন পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি করা মানবীকরণ নহে—মানবীকরণের অর্থ স্বতন্ত্র। জড়-বস্তুর 'সত্তা' আছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা বলিয়া কি ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিলেই ঈশ্বরেতে জড়-ধর্ম্ম আরোপ করা হয়—না মনুষ্যের সত্তা স্বীকার করিলেই মনুষ্যেতে জড়-ধর্ম্ম আরোপ করা হয়? জড়-বস্তুর যেমন সত্তা আছে তেমনি তাহার অচেতনতা আছে। সত্তা কিছু আর জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম নহে—অচেতনতাই জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম; সত্তা নহে কিন্তু অন্ধ সত্তা—জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম। মনুষ্যেতে যদি অন্ধ সত্তা আরোপ করা যায়, তবেই মনুষ্যেতে জড়-ধর্ম্ম আরোপ করা হয়; ঈশ্বরেতে যদি অন্ধ সত্তা আরোপ করা যায়, তবেই তাঁহাতে জড়ধর্ম্ম আরোপ করা হয়। জড়বস্তুর সত্তা আছে কিন্তু চেতন নাই; এখন দেখিতে হইবে যে, জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম কোন্‌টি—

সত্তা না অচেতনতা? যেখানে জীব এবং জড়ের প্রভেদের কথা হইতেছে সেখানে সত্তা কিছু আর জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম নহে—সেখানে অচেতনতাই জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম; তাই জড়-ধর্ম্মের আরোপ—জড়ীকরণ—বলিতে শুদ্ধ কেবল অচেতনতারই আরোপ বুঝায়, সত্তার আরোপ বুঝায় না। মনুষ্যের সত্তা আছে এবং চেতন আছে, কিন্তু পূর্ণতা নাই; এখন দেখিতে হইবে যে, মনুষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম কোনটি—সচেতন সত্তা না অপূর্ণতা? যেখানে জীবেশ্বরের প্রভেদের কথা হইতেছে সেখানে সচেতন সত্তা কিছু আর মনুষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম নহে, সেখানে অপূর্ণতাই মনুষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম; তাই সেখানে মানুষিকতার আরোপ—মানবীকরণ—বলিতে অপূর্ণতারই আরোপ বুঝায়, সত্তা অথবা চেতনের আরোপ বুঝায় না। জড় জীব এবং ঈশ্বর তিনের মধ্যে মূলগত প্রভেদ এই যে, জড়বস্তুর সত্তা অন্ধ সত্তা, মনুষ্যের সত্তা অপূর্ণ সচেতন সত্তা, ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা। ঈশ্বরেতে অন্ধ-সত্তার আরোপই জড়ীকরণ, অপূর্ণ সচেতন সত্তার আরোপই মানবীকরণ, পরিপূর্ণ সচেতন সত্তার আরোপই যথার্থ ঈশ্বর-জ্ঞান। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; তাহার মধ্যে জড়জগৎ শুদ্ধ কেবল সত্যং মাত্র; মনুষ্য সত্যং জ্ঞানং এই পর্য্যন্ত; ঈশ্বরই কেবল সত্যং জ্ঞানমনন্তং, মনুষ্য কদাপি তাহা নহে; অতএব ঈশ্বরকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং বলা মানবীকরণ নহে। পুনশ্চ যদি এইরূপ মনে করা যায় যে, যে সুখের অন্ত আছে—যে সুখ জরামরণ দ্বারা আক্রান্ত—সে সুখ সুখই নহে, অনন্তই সুখ—যেমন "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি" যিনি অনন্ত তিনিই সুখ, অল্প কিছুতে সুখ নাই; তবে দাঁড়ায় যে, অনন্তের ভাব—আনন্দ—ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম্ম; আর, পরিমিত ভাব, অপূর্ণতা, নিরানন্দ, জীবের বিশেষ ধর্ম্ম। ঈশ্বরের প্রসাদেই—ঈশ্বরের সহিত যোগেই—জীবের অপূর্ণতা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়, ও জীবের নিরানন্দ ক্রমে ক্রমে স্থায়ী আনন্দে পরিণত হয়। অতএব ঈশ্বরকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং বলা যেমন মানবীকরণ নহে, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলাও তেমনি মানবীকরণ নহে; মানবীকরণ বলি কাহাকে? না ঈশ্বরেতে অপূর্ণতা—নিরানন্দ ভাব—এই-সকল ধর্ম্ম আরোপ করা; ইহাই মানবীকরণ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা নিজে অপূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের পূর্ণতা কিরূপে উপলব্ধি করি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের সচেতন সত্তা যেমন অনুযোগিতা-সম্বন্ধ অনুসারে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাঁহার পূর্ণতা সেইরূপ প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধ অনুসারে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। আমাদের সচেতন সত্তা ঈশ্বরের সচেতন সত্তারই অনুপ্রকাশ—দুয়ের মধ্যে এইরূপ অনুযোগিতা-সম্বন্ধ; আমাদের অপূর্ণতা ঈশ্বরের পূর্ণতার প্রতি-প্রকাশ—দুয়ের মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধ। আমরা চক্ষে যখন অন্ধকার দেখি—আমাদের মন তখন যেমন আলোকের দিকে প্রধাবিত হয়; আমরা উদরে যখন ক্ষুধা অনুভব করি—আমাদের মন তখন যেমন অন্নের দিকে প্রধাবিত হয়; সেইরূপ আমরা যখন আমাদের আপনাদের অপূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আমাদের আত্মা ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে প্রধাবিত হয়। ঈশ্বর যেমন আমাদের চক্ষুর আকিঞ্চন সূর্য্যালোক দিয়া পূর্ণ করেন, উদরের আকিঞ্চন অন্ন দিয়া পূর্ণ করেন, শিশুর আকিঞ্চন মাতাকে দিয়া পূর্ণ করেন, সেইরূপ আত্মার আকিঞ্চন আপনাকে দিয়া পূর্ণ করেন।

কঠোর বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, এ কেবল আমাদের হৃদয়ের আকিঞ্চন-মাত্র—কল্পিত মাত্র; প্রকৃত সত্য যে কি তাহা ঠিক্ করা সুকঠিন। কোন চিন্তা নাই! সুকোমল হৃদয় একাকী অসহায় পড়িয়া নাই—কঠোর জ্ঞান তাহার হস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস করা চাই; সহস্র বৈজ্ঞানিক হউন্ না কেন—তিনি যদি তাঁহার আপনার জ্ঞানের কথায় আপনি বিশ্বাস না করেন—তবে তাঁহার সহিত কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিরই কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না। দুই বিন্দুর মধ্যে একের অধিক সরল রেখা সম্ভবে না—এ কথাটিতে যিনি অবিশ্বাস করেন, কোন শিক্ষকই তাঁহাকে জ্যামিতি শিখাইতে পারে না; তেমনি, সসীম আকাশ-মাত্রই অসীম আকাশকে অপেক্ষা করে, সাবলম্ব-মাত্রই নিরবলম্বকে অপেক্ষা করে—অপূর্ণ মাত্রই পূর্ণকে অপেক্ষা করে—পরতন্ত্র মাত্রই স্বতন্ত্রকে অপেক্ষা করে—এ কথাটি শুদ্ধ কেবল কোমল হৃদয়ের কথা নহে কিন্তু কঠোর জ্ঞানের কথা; এ কথায় যিনি বিশ্বাস না মানেন, তাঁহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের কর্ম্ম নহে; তিনি তাঁহার আপনার জ্ঞানকেই আপনি মানেন না, আমরা কোথাকার কে যে আমাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করিবেন।

বৈজ্ঞানিক বলিবেন সন্দেহ নাই যে, "ও তোমার তত্ত্বজ্ঞান রাখিয়া দেও—বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর যে তাহাতে পৃথিবীর কাজ দেখিবে। যাহা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না তাহা লইয়া সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? বিজ্ঞান ধূম-যন্ত্র ও তাড়িত বার্ত্তাবহ আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর কত লোকের কত উপকার সাধন করিয়াছে; তত্ত্বজ্ঞান তাহার কি উপকার করিয়াছে—কই কিছুই তো দেখিতে পাই না—তত্ত্বজ্ঞানের শুধু কেবল বকাবকি ঝকাঝকিই সার!" ইহার উত্তর এই যে, সকল জ্ঞান যে—সকল রকমে—পৃথিবীর উপকার সাধন করিবে, এরূপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়। গণিত বিদ্যা কিছু আর মনুষ্যের জ্বর-রোগ শান্তি করিতে পারে না; জ্যোতিষ বিদ্যা কিছু আর মনুষ্যের পুত্র শোক নিবারণ করিতে পারে না। যেরূপে মনুষ্যের দুঃখ নিবারণ করা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারায়ত্ত, সেইরূপেই সে মনুষ্যের দুঃখ নিবারণ করিতে পারে এবং করেও। "অস্থায়ী সাংসারিক সুখ এক সময়ে যেমন সুখ—সময়ান্তরে তেমনি দুঃখ, অতএব শরীরাদি হইতে যত নির্লিপ্ত থাকিতে পার চেষ্টা করিবে ও পরমাত্মাতেই চিরস্থায়ী সুখের মূল পত্তন করিবে" এ কথা কে বলে? অবশ্য তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু এ কথায় আমরা যদি বিশ্বাস না করি, তবে সে দোষ তত্ত্বজ্ঞানের নহে। শুষ্ক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন সাংসারিক কার্য্য-নির্ব্বাহের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। কিন্তু তাঁহার সে কথার কোন অর্থ নাই। অনেক লোক এমন আছেন যাঁহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনায় অষ্ট প্রহর মাথা বকাইয়া কাজের বা'র হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু সে দোষ কি বিজ্ঞানের দোষ? তত্ত্বজ্ঞান কিছু আর মনুষ্যকে কর্ত্তব্য-সাধনে অবহেলা করিতে পরামর্শ দেয় না—তত্ত্বজ্ঞান উল্টা আরো এই কথা বলে যে, "যত পারো অবিচলিত চিত্তে—অনাসক্ত মানসে—কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবে, মনকে আত্মার বশে রাখিয়া—আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত রাখিয়া—সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।" ইহা সত্ত্বেও যদি কোন তত্ত্বজ্ঞানী কর্ত্তব্য-বিমুখী সংসার-নির্ব্বাহে অবহেলা করেন তবে তাহার জন্য তত্ত্বজ্ঞান কোন অংশেই দায়ী নহে। সুখ

সাধন এবং দুঃখ মোচনের জন্য যাহা যাহা চাই তাহার আয়োজন করাই বিজ্ঞানের কার্য; কিন্তু প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে তাহা স্থির করা শুদ্ধ কেবল তত্ত্বজ্ঞানেরই কার্য। তত্ত্বজ্ঞানের কথা এই যে, সর্ব্বদিক্-দর্শী জ্ঞান যাহাকে সুখ বলে তাহাই প্রকৃত সুখ—অজ্ঞান যাহাকে সুখ বলে তাহার চারিদিক্ দুঃখে পরিবেষ্টিত সুতরাং তাহা দুঃখেরই নামান্তর। সহস্র সুখে সুখী হইলেও শরীরাদিতে তুমি যে পরিমাণে লিপ্ত থাকিবে সেই পরিমাণে তোমার দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য, আর, যে পরিমাণে তুমি দেহাদি হইতে নির্লিপ্ত থাকিবে ও পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকিবে, সেই পরিমাণে তোমার প্রকৃত সুখ-ভোগ অনিবার্য্য। যে ব্যক্তি প্রকৃত সুখে সুখী তাহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না।

শুষ্ক বৈজ্ঞানিকের প্রধান যুক্তি এই যে ঈশ্বর মনুষ্যের আদর্শেই পরিগঠিত, ঈশ্বর মনুষ্যের স্বকপোল-কল্পিত মনের একটা ভাব-মাত্র, মানবীকরণ মাত্র। আর, বৈজ্ঞানিক সত্য-সকল প্রথমে যদিচ আবিষ্কর্ত্তার মন হইতেই উদ্ভাবিত হয়, কিন্তু শেষে তাহা পরীক্ষা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়; ঈশ্বর বিষয়ক কোন তত্ত্বই পরীক্ষার গোচর নহে—সমস্তই শুদ্ধ কেবল মনের ভাব মাত্র—মানবীকরণ-মাত্র। ইহার উত্তর এই যে, বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার বিশেষ বিশেষ প্রণালী আছে; জলকে বিভাগ করিয়া তাহা হইতে অম্লজন এবং উদজন বায়ু * বাহির করা, একজন আনাড়ির কর্ম্ম নহে। আমি যদি সহস্র চেষ্টা করিয়াও জল হইতে ঐ দুই বায়ু বাহির করিতে না পারি, তাহা হইলেই কিছু আর প্রমাণ হইবে না যে, ঐ দুই বায়ুর জল-সাধকতা গুণ পরীক্ষায় টেঁকিল না—উহা রাসায়ণিকদিগের একটা স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্ত। যে পথে ঐশ্বরিক তত্ত্ব-সকলের পরীক্ষা প্রাপ্তি-সুলভ—বৈজ্ঞানিক সে পথই মাড়া'ন না, অথচ তিনি বলিতে ছাড়েন না যে, ঐশ্বরিক তত্ত্ব-সকল পরীক্ষা-সিদ্ধ নহে। তিনি যদি বৈধ-প্রণালী অনুসারে ঈশ্বরেতে মন সমাধান করিয়া দেখিতেন—ও দেখিয়া বলিতেন যে, তাহাতে অন্তঃকরণে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার হয় না—সৎপথে মতি হয় না—আত্মার তাপশান্তি এবং বিমল আনন্দ হয় না—তবেই যা হোক্, তাহা নয়—তিনি না দেখিয়া না শুনিয়া আগে ভাগেই বলিয়া বসেন যে, ঈশ্বর মনুষ্যের স্বকপোল-কল্পিত মনের একটা ভাব মাত্র। যাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা বলেন—মনুষ্যের আদর্শে ঈশ্বর পরিগঠিত নহেন, ঈশ্বরের আদর্শেই মনুষ্য পরিগঠিত। কিন্তু ঈশ্বরের আদর্শে পরিগঠিত বলিবার সর্ব্বাংশেই যে, মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত সমধর্ম্মী, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চেতন এবং সত্তা এই দুই বিষয়েই কেবল ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু পূর্ণতা বিষয়ে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই। আর, অনুযোগিতা সম্বন্ধ অনুসারে আমরা ঈশ্বরের সচেতন সত্তা উপলব্ধি করি—প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ অনুসারে আমরা তাঁহার পূর্ণতা উপলব্ধি করি। অপূর্ণ সচেতন সত্তা পরিপূর্ণ সচেতন সত্তার আদর্শে পরিগঠিত—ইহাই জ্ঞানসঙ্গত এবং পরীক্ষা-সিদ্ধ কথা। জ্ঞান-সঙ্গত বলি কেন—না যেহেতু "পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা অপূর্ণ সচেতন সত্তার আশ্রয়-স্থান" এই কথাতেই জ্ঞানের সায় পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার বিপরীত এই যে একটি কথা যে, অপূর্ণ সচেতন সত্তা পরিপূর্ণ সচে-

* Gas কে বাষ্প বলা ভুল—Steam ই বাষ্প, তাহা অপেক্ষা Gas কে বায়ু বলা ভাল।

তন সত্তাকে আপনার আদর্শে গড়িয়া খাড়া করে, সুতরাং অপূর্ণ সচেতন সত্তা পরিপূর্ণ সত্তার আশ্রয় স্থান—ক্ষুদ্র একটি কূপ সাগর-পরিমাণ জলের আশ্রয় স্থান—এ কথায় জ্ঞান কোন ক্রমেই সায় দিতে পারে না। পরীক্ষা-সিদ্ধ বলি কেন—না "ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ" ইহা বাস্তবিকই ঋষিদিগের পরীক্ষার কথা; পরমাত্মাতে যাঁহারা আত্ম সমাধান করিয়া দেখিয়াছেন—তাঁহারা বাস্তবিকই দেখিয়াছেন যে, পরমাত্মা হইতে আমাদের আত্মাতে ধী-শক্তি এবং আত্ম-শক্তির সঞ্চার হয়—পরমাত্মা যদি তাঁহাদের মনঃকল্পিত হইতেন তবে এটি হইতে পারিত না। তাহা শুধু নয় ঈশ্বরের সত্তাকে মনঃকল্পিত বলিবার উপায়ও নাই; কেন না এই যে একটি কথা যে, অপূর্ণ সত্তা মাত্রই পূর্ণ সত্তার আশ্রয়-সাপেক্ষ, ইহা কঠোর জ্ঞানের কথা—কল্পনার কথা নহে; কল্পনার ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা কুহেলিকায় নহে কিন্তু সুস্পষ্ট জ্ঞানের আলোকে আমরা ঐ তত্ত্বটিকে উপলব্ধি করি। অসীম পূর্ণ নিরালম্ব সত্তা আমাদের কল্পনার অগোচর—সহস্র কল্পনা করিলেও আমরা অসীম পূর্ণ নিরালম্ব ভাব মনশ্চক্ষুর সমক্ষে গড়িয়া তুলিতে পারি না,—শুদ্ধ কেবল তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই গোচর। আকাশ এই ঘরের ভিতরে ইহা যেমন ধ্রুব সত্য—আকাশ কোটি যোজন দূরে ইহা তেমনিই ধ্রুব সত্য—আকাশ অসীম ইহাও তেমনিই ধ্রুব সত্য; অথচ অসীম আকাশ আমাদের কল্পনার অগোচর। সাবলম্ব ঘটি বাটি যেমন ধ্রুব সত্য, নিরালম্ব ঈশ্বর তেমনিই ধ্রুব সত্য—অথচ তিনি কল্পনার অগোচর। এইরূপ, সকল দিক দিয়াই পাওয়া যাইতেছে যে, প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান মানবীকরণ হইতে উৎপন্ন হয় না; যেহেতু তাহা যথার্থ সত্য জ্ঞান—কৃত্রিম কল্পনা নহে।

কিন্তু মনুষ্য জাতির ইতিবৃত্তে যে সকল মানবীকরণের বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার দোষ তত্ত্বজ্ঞানের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। হাতুড়িয়া চিকিৎসকদিগের দোষ চিকিৎসা শাস্ত্রের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই মনুষ্য কিছু আর তত্ত্বজ্ঞানী হয় না,—জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যের প্রযত্ন-সাপেক্ষ। পথে নানা প্রকার বিভীষিকা—নানা প্রকার জঞ্জাল—নানা প্রকার ভ্রম-প্রবঞ্চক—ইহা সত্ত্বেও মনুষ্য গম্যস্থানের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে। কোন একালেই মনুষ্যের সমক্ষে সত্যের সমস্ত দ্বার একেবারেই খুলিয়া যায় না—মনুষ্যের সমক্ষে কালে কালে এক একটি করিয়া সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সত্যের যে দ্বার এখনো ভাল করিয়া উদ্ঘাটিত হয় নাই, তাহার ভিতরে কি আছে—না আছে—তাহা এখনো তর্কস্থল। কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যের যে সকল দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহার অভ্যন্তরস্থিত সামগ্রী-গুলিও কিছু আর তর্কস্থল নহে। কি তত্ত্বজ্ঞান—কি বিজ্ঞান—জ্ঞানের যে পথেই আমরা পদার্পণ করি না কেন, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পথ দিব্য সহজ ও সুগম; সম্মুখ দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাই যে, পথ অতীব দুর্গম এবং জটিল। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের বা বিজ্ঞানের একাংশ জটিল বলিয়া যে তাহার সর্ব্বাংশই জটিল, তাহা নহে; আর, ঈশ্বর-বিষয়ক কোন একটি তত্ত্ব এক সময়ে জটিল ছিল বলিয়া আজও যে তাহাকে জটিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—তাহারও কোন অর্থ নাই। সূক্ষ্ম অঙ্কের গণিত খুবই জটিল—তাহা বলিয়া সহজ তেরিজ জমা-খরচও কি জটিল? কৃষকেরা গণিত শাস্ত্র কাহাকে বলে তাহা জানে না—কিন্তু তাহা

বলিয়া তাহারা কি বেচা-কেনায় ক্ষান্ত থাকে? কৃষকেরা গণিত না পড়িয়া যতটুকু গণিত জানে, তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট এমনও অসভ্য লোক আছে যে, কেনা-বেচার জন্য যতটুকু গণিত আবশ্যক তাহাও তাহারা জানে না; সহজ গণিতও তাহাদের নিকটে জটিল; গণিতকে আদ্যোপান্ত জটিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ইহাদের মুখে যেমন শোভা পায়—আমাদের দেশের কৃষকেরও মুখে তেমন নহে। তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশকে জটিল বলা নিতান্ত বর্ব্বর জাতির মুখেই শোভা পায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন জাতির মুখে নহে—ভারতবাসীর মুখে তো নহেই, কেননা ভারতবর্ষ যেমন বিজ্ঞানের আদি গুরু—সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানেরও আদি গুরু। কি তত্ত্বজ্ঞান কি বিজ্ঞান, উভয়েরই মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যাহা আজ পর্যন্ত তর্কস্থল, কিন্তু তাহা বলিয়া সকলই কিছু আর তর্কস্থল নহে—এটা তর্কস্থল নহে যে, দুই বিন্দুর মধ্যে একের অধিক সরলরেখা স্থান পাইতে পারে না—এটাও তর্কস্থল নহে যে, সাবলম্বমাত্রই নিরবলম্বের আশ্রয়-সাপেক্ষ। অতএব ঈশ্বরের ভাব ঈশ্বর-হইতে মনুষ্যেতে অবতীর্ণ হয় বলিয়াই মনুষ্য ঈশ্বরকে জ্ঞানে উপলব্ধি করে; এবং যে ব্যক্তি যে পরিমাণে আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সচেতন-সত্তাকে আশ্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়; এইরূপ ব্যগ্রতা হইতে প্রার্থনা উদ্ভূত হয়; ব্যগ্রতা স্বয়ংই প্রার্থনা—প্রার্থনা বাক্য তাহার আনুষঙ্গিক উচ্ছ্বাস মাত্র। এইরূপ ব্যগ্রতার ভিত্তিমূল কোথায়? ঈশ্বর স্বয়ংই তাহার ভিত্তিমূল; কেন না, ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তা মূলে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহার প্রতিযোগেই আমরা আমাদের অপূর্ণতা উপলব্ধি করি—তাই তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হই। শিশু ক্রন্দন করিলে মাতা যেমন তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে করেন, ঈশ্বর সেইরূপ ব্যাকুল সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। ইহার কোন্ স্থানটিতে মানবীকরণ? কই কোথাও তো তাহার চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাওয়া গেল না।

বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে নির্ঘাত যুক্তি বলিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা এই;—জগতে অশেষবিধ অমঙ্গল দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ঈশ্বরবাদী জগৎকর্ত্তাকে মঙ্গল স্বরূপ বলিতে ছাড়েন না; ঈশ্বরবাদী, লোকহিতৈষী সাধু মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে, ঈশ্বরকে মনোমধ্যে গড়িয়া তোলেন,—ইহা মানবীকরণ নহে তো আর কি? ইহার উত্তর এই যে আমরা তত্ত্বজ্ঞানের উপদিষ্ট বৈধ প্রণালী অবলম্বন করিলে তবেই জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্য—জগতের সামঞ্জস্য এবং সুশৃঙ্খলা—আমাদের জ্ঞান নেত্রে আবির্ভূত হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, মঙ্গলই প্রকৃত সত্য যেহেতু তাহাই স্থায়ী—অমঙ্গল প্রকৃত সত্য নহে যেহেতু তাহা অস্থায়ী; অমঙ্গল অষ্টপ্রহর কেবল আত্মঘাতকতা-কার্য্যেই নিযুক্ত রহিয়াছে; অমঙ্গল আর কিছু নয়—মঙ্গল প্রসূত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ-জ্ঞাপক প্রসব-বেদনা। এখন কথা হইতেছে এই যে, মঙ্গলে পৌঁছিবার উপায় কি? তাহার উপায় বিলক্ষণই আছে; তবে কি না—যাঁহারা তাহার সাধনে নূতন ব্রতী তাঁহাদের পক্ষে তাহা কঠিন। কঠিন বিষয় অনেক আছে—জাহাজ চালানো কঠিন, বীণা বাজানো কঠিন, মনকে বশীভূত করা কঠিন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা মনুষ্যের অসাধ্য

নহে। রীতিমত ঘোড়ায় চড়া শিখিতে হইলে বারম্বার আছাড় খাইতে হয়, তাহা বলিয়া কেহ কি ঘোড়ায় চড়া শেখে না? প্রজ্ঞা-চক্ষু লাভ করিতে হইলে—অর্থাৎ যে চক্ষুতে জগতের অভ্যন্তরস্থিত নিগূঢ় সত্য এবং মঙ্গল উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় সেই চক্ষু লাভ করিতে হইলে—তাহার উপায় যে কি তাহা অতীব সংক্ষেপে উক্ত হইতে পারে, যথা; যিনি যে পরিমাণে জগতে আসক্ত, তিনি সেই পরিমাণে জগতে বিশৃঙ্খলা ও অমঙ্গল দৃষ্টি করেন; আর, যিনি যে পরিমাণে জগতে অনাসক্ত তিনি সেই পরিমাণে জগতে সুশৃঙ্খলা ও মঙ্গল দৃষ্টি করেন। আমরা যদি সমুদ্রে নিমগ্ন হই, তবে সমুদ্রের শোভা আমাদের চক্ষু হইতে [illegible] পড়িবে না তো আর কি? সং[illegible] নিমগ্ন হইলে সংসারের [illegible] উদ্দেশ্য—মঙ্গল উদ্দেশ্য—কাজেই আমাদের চক্ষু হইতে ঢাকা পড়িয়া যায়। বিষয়ে অনাসক্ত হইলে এই মনুষ্যই [illegible] নিজের ন্যায় [illegible] অমর এবং অশোক হইয়া [illegible] আনন্দামৃত উপভোগ করে। আত্মার অমরত্ব কাহাকে বলে তাহা ভিতরে বুঝিতে হইলে, সত্য সত্যই আমাদের একবার মরিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা মরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, কিছুতেই আমাদের মরণ নাই। মরিয়া দেখা—অর্থাৎ বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া বিষয়ে অনাসক্ত হওয়া। এইরূপে জীবদ্দশায় মৃত হইলে—লোকের কথায় নহে কিন্তু আমাদের নিজের পরীক্ষায়—আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, মৃত্যু যাহার হইতে পারে তাহারই হয়—বিষয়াসক্তি, ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ, অশান্তি, মরিতে কেবল ইহারাই মরে—মৃত্যুরই মৃত্যু হয়। ইহাদের মৃত্যুতে আত্মাতে নবজীবনের সঞ্চার হয়—তাহার হাড়ে বাতাস লাগে। জরা-মরণ-শীল দেহাদির দলে মিশিয়াই আমরা আপনাদিগকে মর্ত্ত্য মনে করি; কিন্তু যখনই আমরা দেহাদির সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-নিকেতনে প্রবেশ করি, তখনই দেখিতে পাই যে, কিছুতেই আমাদের মৃত্যু নাই; তখনই দেখিতে পাই যে, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিও ভস্মের ন্যায় নিস্তেজ নহে, দেহ-গ্রস্ত আত্মাও দেহের ন্যায় মরণ-শীল নহে। অতএব আত্মার অমরত্ব নিজের পরীক্ষায় উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার একমাত্র উপায়—বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা বিষয়ে অনাসক্ত হওয়া। বিষয়ে অনাসক্ত হওয়ার অর্থ জগৎকে পরিত্যাগ করা নহে,—জ্ঞান যেমন আমাদের পরিত্যাজ্য নহে তেমনি আমাদের জ্ঞানের বিষয় এই যে বিচিত্র জগৎ ইহাও আমাদের পরিত্যাজ্য নহে। আমাদের আত্মা নিস্তেজ নীরস [illegible] নহে—আত্মা তেজস্বী রসপূর্ণ উজ্জ্বল [illegible] এবং শক্তিমান; আত্মার নিকটে পরমাত্মা [illegible] তাঁর [illegible] ঐশ্বর্য্য-জগৎ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; তাই, [illegible] যেরূপ সারথীর পরিত্যাজ্য নহে কিন্তু বশীকার্য্য, জগৎ সেইরূপ আত্মার বশীকার্য্য। যে পরিমাণে আমরা জড়-জগৎকে জ্ঞান দ্বারা—বিদ্বেষকে প্রেম দ্বারা—অমঙ্গলকে মঙ্গল দ্বারা—পরাজয় করিব, সেই পরিমাণে আমরা জগতে অনাসক্ত হইব, আর, সেই পরিমাণে—একদিকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং আর একদিকে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য উভয়ই ব্যাপ্তি এবং গভীরতা লাভ করিবে, সেই পরিমাণে আমাদের দৃষ্টিতে বহির্জগৎ অন্তর্জগতে পরিণত হইবে, জড়জগৎ আধ্যাত্মিক জগতে পরিণত হইবে, অমঙ্গল রাজ্য মঙ্গল রাজ্যে পরিণত হইবে; সেই পরিমাণে জগতের এক দিক নহে কিন্তু সর্ব্বদিক্ আমাদের নয়ন-গোচর হইবে; জগতের শুদ্ধ কেবল পরিধি মাত্র নহে—

জগতের কেন্দ্র পর্য্যন্ত আমাদের নয়নগোচর হইবে। সর্ব্বদিক্‌দর্শী এবং গভীর-দর্শী প্রজ্ঞা-চক্ষুই কেবল দেখিতে পায় যে "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" যিনি মহান্‌ তিনিই সুখ স্বরূপ, অল্প কিছুতে সুখ নাই। অতএব জগৎকে মঙ্গলে পরিণত করা আমাদের প্রতি-জনের সাধন-সাপেক্ষ; সাধন-দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যোগ-যুক্ত হইলে আমরা কারিও মঙ্গল—দেখিও মঙ্গল; কাজেই তখন সমস্ত মঙ্গলের মূলাধার-রূপে ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান-নেত্রে প্রকাশিত হ'ন। ইহাতে মানবীকরণের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই।

৫০। ৬০ বৎসর হইতে চলিল এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। এমন অনেক কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা এই সমাজভুক্ত। আবার এমনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা সমাজভুক্ত না হইয়াও ইহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই উভয় প্রকার লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। সম্প্রতি আমরা একটী ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। যে কোনরূপে হউক যাঁহারা এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা এপর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় দেয় মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। আশা করি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত ও আমাদিগের অনর্থক ডাকমাশুল ব্যয় করিতে হইবে না।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল বালী গ্রামে একটি "ধর্ম্ম-সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত প্রতিপাদিত বিশ্বজনীন সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক মতালোচনা এবং ধর্ম্মাবহ পুণ্য পরাৎপর পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করাই এই সমাজ সংস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদিন জনৈক ভদ্রলোকের নিকেতন মধ্যে উক্ত সমাজের কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে তথায় উপাসনা কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নানাবিধ দুর্নিবার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে একটি স্বতন্ত্র স্থানের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানের পর সমাজের উপযোগী একটি স্থান ১০০০৲ টাকায় পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেবল ২১০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হওয়াতে আমরা উহা ক্রয় করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে ধর্ম্মোৎসাহী দেশ-হিতৈষী মহাশয় জনগণের নিকট সকাতরে আমাদের এই নিবেদন যে যদি তাঁহারা স্ব স্ব বদান্যতা-গুণে আমাদিগকে কিছু অর্থ সাহায্য বিধান করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইব। শ্রদ্ধার সহিত যিনি যাহা দান করিবেন তাহা উক্ত সমাজের সম্পাদক অথবা আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। অলমতিবিস্তরেণেতি।
তাং ১৭ কার্ত্তিক ১৮০৯ শক।

বালী গাঙ্গুলী পাড়া
উত্তরপাড়া ডাকঘর

শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক "বালী ধর্ম্মসমাজ"।

আগামী ৫ পৌষ সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ
সরস্বতী তীর।
১৮০৯ শক ৩ কার্ত্তিক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
প্রথম ভাগ
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮

৫৩৩ সংখ্যা — ১৮০৯ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদঃ।

তত্র দশমে মণ্ডলে একাদশেঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং।

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো
নোব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমা-
সীদ্গহনং গভীরং॥ ১॥

'তদানীং' সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে 'ন অসৎ আসীৎ' অসৎ ছিল না। 'নো সৎ আসীৎ' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। 'ন আসীৎ রজঃ' এক কণা রেণুও ছিল না। 'নো ব্যোমা' ঐ মহান্ আকাশও ছিল না। নাপি 'পরঃ যৎ' উপরে যে দ্যু-লোক তাহাও ছিল না। 'কিং আবরীবঃ' যেমন আকাশকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? 'কুহ কস্য শর্ম্মণ্' কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু। 'অম্ভঃ কিং আসীৎ গহনং গভীরং' এই যে গহন গভীর সমুদ্র, তাহাও কি তখন ছিল? ১

সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই মহান্ আকাশও ছিল না। উপরে যে দ্যুলোক তাহাও ছিল না। যেমন আকাশকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু? এই যে গহন গভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন্ ছিল? ১

মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন
আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন
পরঃ কিঞ্চনাস॥ ২॥

'মৃত্যুঃ আসীৎ অমৃতং ন তর্হি' মৃত্যু অমৃত তখন্ কিছুই ছিল না। 'ন রাত্র্যা অহ্নঃ আসীৎ প্রকেতঃ' রাত্রির সহিত দিনের কোন প্রজ্ঞানও ছিল না। 'আনীৎ অবাতং স্বধয়া তৎ একং' তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। 'তস্মাৎ হ অন্যৎ ন কিঞ্চন আস' তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 'ন পরঃ' এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না॥ ২

মৃত্যু অমৃত তখন্ কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনের কোন প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না। ২

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং স-
লিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছোনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্ম-
হিনাজায়তৈকং ॥ ৩ ॥

'তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ং অগ্রে' অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 'অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বং আঃ ইদং' এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহাশূন্য-সমুদ্র ছিল। 'তুচ্ছোন আভু অপিহিতং যৎ আসীৎ' 'একং' তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্ব কার্য্যের বীজ ছিল 'তৎ' 'তপসঃ মহিনা অজায়ত' তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩

অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহাশূন্য সমুদ্র ছিল। তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্ব কার্য্যের বীজ ছিল, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি মনসোরেতঃ
প্রথমং যদাসীত্।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্হৃদি প্রতীষ্যা
কবয়োমনীষা ॥ ৪ ॥

'মনসঃ প্রথমং রেতঃ যৎ আসীৎ' মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল 'কামঃ' সেই যে প্রেম 'তৎ অগ্রে অধিসমবর্ত্তত' তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। 'সতঃ অসতি সতের সহিত অকৃত কারণের বন্ধুং' যে বন্ধন, সেই প্রেম বন্ধন; সেই প্রেম বন্ধনকে 'কবয়ঃ' কবিরা 'হৃদি' হৃদয়ে 'মনীষা' বুদ্ধির দ্বারা 'প্রতীষ্যা' প্রতীষ্য বিচার করিয়া 'নিরবিন্দন' জানিলেন। ৪

মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল, সেই যে প্রেম, তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। সতের সহিত অকৃত কারণের যে বন্ধন সেই প্রেম বন্ধন; সেই প্রেম বন্ধনকে কবিরা, হৃদয়ে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া জানিলেন। ৪

তিরশ্চীনোবিততোরশ্মিরেষামধঃ স্বি-
দাসী৩দুপরিস্বিদাসী৩ত্।
রেতোধা আসন্ মহিমানআসন্ত্স্বধা
অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

'এষাং' এই কার্য্য কলাপদিগের 'তিরশ্চীনঃ বিততঃ রশ্মিঃ' সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ও সুবিস্তৃত যে রশ্মি তাহা 'অধঃ স্বিৎ আসীৎ' অধঃস্থিত এই পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে 'উপরিস্বিৎ আসীৎ' কি উপরের স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। 'রেতোধাঃ আসন্' এই সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে অগণ্য জীব জন্তু রহিয়াছে 'মহিমানঃ আসন্' এবং মহা অন্ন জল প্রভৃতি মহা বিস্তৃত ভোগ্য বস্তুতে পূর্ণ রহিয়াছে। সেই ভোক্তৃ ভোগ্যের মধ্যে 'স্বধা' অন্ন প্রভৃতি ভোগ্য প্রপঞ্চ 'অবস্তাৎ' নিকৃষ্ট 'প্রয়তিঃ' এবং নিয়ন্তা ভোক্তা যে জীব তাহা 'পরস্তাৎ' উৎকৃষ্ট। ৫

এই কার্য্য কলাপদিগের সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ও সুবিস্তৃত যে রশ্মি, তাহা অধঃস্থিত এই পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে কি উপরের স্বর্গ হইতে আসিয়াছে? এই সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে অগণ্য জীব জন্তু রহিয়াছে এবং মহা অন্ন-জল প্রভৃতি মহাবিস্তৃত ভোগ্য বস্তুতে পূর্ণ রহিয়াছে। সেই ভোক্তৃ ভোগ্যের মধ্যে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্য প্রপঞ্চ নিকৃষ্ট এবং নিয়ন্তা ভোক্তা যে জীব, তাহা উৎকৃষ্ট। ৫

কো অদ্ধাবেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আ-
জাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কোবেদ
যতআবভূব ॥ ৬ ॥

'কঃ অদ্ধা বেদ' কে ঠিক জানে 'কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি। 'কঃ ইহ প্রবোচৎ কুতঃ আজাতা' কে বা এখানে বলিয়াছে যে কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে। 'অর্বাক্ দেবাঃ অস্য বিসর্জ্জনেন' দেবতারা এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন। 'অথা কঃ বেদ' তবে কে জানে 'যতঃ আবভূব' যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

কে ঠিক জানে কোথা হইতে এই বিচিত্র

সৃষ্টি? কে বা এখানে বলিয়াছে যে কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে? দেবতারা এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন। তবে কে জানে যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' এই বিচিত্র সৃষ্টি 'যতঃ আবভূব' যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে 'যদি বা দধে' যদি ইহাকে কেহ ধারণ করিয়া থাকেন তবে তিনিই তাহা ধারণ করিয়া আছেন; 'যদি বা ন' যদি বা তিনি নাই ধারণ করিয়া থাকেন। 'পরমে ব্যোমন্' পরম আকাশে 'যঃ অস্য অধ্যক্ষঃ' যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, 'সঃ অংগ বেদ' তিনি অবশ্য তাহা জানেন। 'যদি বা ন বেদ' কিম্বা যদি নাই জানেন। ৭

এই বিচিত্র সৃষ্টি যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, যদি ইহাকে কেহ ধারণ করিয়া থাকেন তবে তিনিই তাহা ধারণ করিয়া আছেন—যদি বা নাই ধারণ করিয়া থাকেন। পরম অকাশে যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, তিনি অবশ্য তাহা জানেন, কিম্বা যদি নাই জানেন। ৭

তাৎপর্য্য।

১। এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সৃষ্টির পুর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই মহান্ আকাশ ও দ্যুলোক কোথায়, এক কণা রেণুও ছিল না। কোথায় বা এই সকল জীব জন্তু, কোথায় বা তাহারদের ক্রিয়া কলাপ, কোথায় বা তাহারদের সুখ সৌভাগ্য—তখন্ ইহার কিছুই ছিল না। অগণন নক্ষত্রপুঞ্জ যে এই আকাশকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও তখন ছিল না। গভীর সমুদ্র ছিল না, এক বিন্দু জলও ছিল না। এই সকল যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৎবস্তু, তাহা কিছুই ছিল না। তবে কি তখন্ অসৎ ছিল? অসৎও ছিল না। যদি অসৎ থাকিত, তবে কোথা হইতে এই সতের উৎপত্তি হইত? 'কথমসতঃ সজ্জায়েত' অতএব সতের কারণ, সত্যের সত্য, অকৃত অমৃত একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম ছিলেন।

২। সেই পরব্রহ্মই অবাত নিঃশ্বাসে প্রাণিত ছিলেন। যখন্ মৃত্যু ছিল না, মর্ত্ত্য জীবও ছিল না; যখন্ অমৃত ছিল না, অমরণধর্ম্মা দেবতারাও ছিলেন না; যখন রাত্রির সহিত দিনের কোন প্রকার প্রজ্ঞানও ছিল না, রাত্রি দিন ঋতু সম্বৎসর কালের কোন অবয়ব ছিল না তখন কালের কাল সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই জীবিত ছিলেন। সকল অভাবের মধ্যে সেই মহাপ্রাণই স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি সেই-আশ্চর্য্য-শক্তি-সমন্বিত ছিলেন, যাহা হইতে এই বর্ত্তমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

৩। তখনকার সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে, অপ্রজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য জ্যোতিহীন শূন্যের গর্ভে পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরেতে এই জগৎ কার্য্যের যে একটি বীজ নিহিত ছিল, তাহা তাঁহার জ্ঞান-আলোচনাতে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল।

৪। পরমেশ্বরের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হইল আর এই বিশ্ব সংসার প্রকাশ পাইল। প্রথমে প্রেমের আবির্ভাব, পরে জ্ঞানের আলোচনা, তাহার পরে তাঁহার ইচ্ছাতে দেশ কাল সূত্রে এই জগৎ অনুস্যূত হইল। প্রেমই মনের বীর্য্য, সেই প্রেমেরই প্রভাবে প্রভাকর প্রভা পাইল, সুধাকর শোভার আধার হইল, এই বিশ্ব সংসার এক প্রেমের সংসার হইয়া উঠিল। যখন পুরাতন ঋষি-

দের মনে প্রেমের ছায়া পড়িল, তখন তাঁহারা আলোচনা করিয়া জানিলেন, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের যে বন্ধন সে কেবল প্রেমের বন্ধন। এখনকার কবিরাও প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া গান করিতেছেন "যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি।"

৫। ঋষিরা তাঁহারদের নবীন চক্ষুতে অসংখ্য জীব জন্তু ও ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ এই বিশাল বিশ্ব-ক্ষেত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন এবং ইহার উৎপত্তির মূল স্থির করিতে না পারিয়া অতিবিহ্বল চিত্তে তখন বলিয়াছিলেন, ইহা এই অধঃস্থিত পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে কি উপরিস্থিত স্বর্গ হইতে আসিয়াছে?

৬। প্রজাপতি ঋষি এই বিচিত্র সৃষ্টি দেখিয়া বলিতেছেন যে এ সৃষ্টি কোথা হইতে আইল? কে বা জানে কেই বা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে যে কোথা হইতে ইহা আইল। মনুষ্যের জানিবার সাধ্য কি? দেবতারাও জানেন না।

৭। এই প্রকাণ্ড জগৎ কোথা হইতে আসিল? যিনি ইহার অধ্যক্ষ, যিনি ইহার ঈশ্বর, কেবল তিনিই তাহা জানেন। ইহা বলিয়াও ঋষির মন নির্ম্মল হইল না—সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া বলিলেন, এমনও হইতে পারে যে তিনিও তাহা জানেন না। এই প্রকাণ্ড জগতে অগণ্য নক্ষত্র-লোক-সকল শূন্যে শূন্যে নিরালম্বে যে রহিয়াছে, তাহার ভার কে ধারণ করিয়া আছে। যাঁহা হইতে এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে তিনিই এই সকল ধরিয়া আছেন। ইহা বলিয়াও আবার ঋষির মনে সংশয় উঠিল—তিনি যদি এই সকল নাই ধরিয়া থাকেন। ঋষি নিঃসংশয় হইয়া জানিতে পারিলেন না যে কে এই সকল ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ইহা জানিয়াও জানিলেন না। ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। "কে জানে মহিমা বিভু তোমার?" সেই জানে যাহাকে তুমি জানাও—আর কেহই জানিতে পারে না। ঋষি মুনিরাও ইহাতে মুগ্ধ হইয়া যান।

সমাধি বস্তুটা কি?

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশশুদ্ধ লোক সভ্যতা সভ্যতা করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য আর্য্য করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; এখন আবার, আমাদের দেশের ললাটে—সমাধি সমাধি করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কেহ মনে করিবেন না যে আমরা বলিতেছি—সভ্যতা কিছুই নহে, অথবা আর্য্য ধর্ম্ম কিছুই নহে, অথবা সমাধি কিছুই নহে; উল্টা আরো আমরা বলি এই যে, উহাদের সকলের মধ্যেই নানা প্রকার অমূল্য রত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—কিন্তু আবার এটাও বলি যে, সেই রত্নগুলির প্রকৃত মর্য্যাদার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া—শুদ্ধ কেবল ঐ শব্দগুলি লইয়া বাহু আস্ফালন এবং অনর্থক প্রলাপোক্তি করা অপেক্ষা চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়; কেননা, শুদ্ধ কেবল ঐ শব্দ-গুলি লইয়া তুমুল কাণ্ড করিলে তাহাতে লাভের মধ্যে হয় কেবল—সভ্যতার নাম করিয়া স্বেচ্ছাচার প্রচার করা—আর্য্যধর্ম্মের নাম করিয়া কুসংস্কার প্রচার করা—সমাধির নাম করিয়া অন্ধশক্তি-বাদ ও নিষ্কর্ম্মতা প্রচার করা—এই মাত্র।

সমাধি আমাদের দেশের একটি পৈতৃক সম্পত্তি বটে, কিন্তু আমাদের দেশের এখন যেরূপ ভাবগতি—তাহাতে শাস্ত্রোক্ত কোন

একটি সুনিশ্চিত সত্যেরও নামোল্লেখ করিতে ভয় হয়; মনে হয় যে, সভ্যতা মহল হইতে প্রত্যুত্তর আসিবে—"ঐ গুলা—ঐ ছেলে-ভুলানো উপন্যাস-গুলা—আমাদের দেশ হইতে যতদিন না উঠিয়া যাইতেছে ততদিন আমাদের দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই;" আর্য্য-মহল হইতে প্রত্যুত্তর আসিবে "এত যুক্তিই বা কেন—এত তর্কই বা কেন—উহা ঋষি-বাক্য তো? না আর কিছু? ক্ষুদ্র একটি ঋষি-বাক্য একদিকে, আর, সমস্ত ইংরাজি পুঁথি একদিকে—কিসে আর কিসে! দুইকে তুলাদণ্ড ধরিয়া তুলনা কর—দেখিবে যে, ঋষি-বাক্যের গুরুভার ভূতল স্পর্শ করিয়াছে ও গিল্টি-করা ইংরাজি ছাইভস্ম-গুলা কড়িকাটে ঠেকিয়াছে; অতএব উহা যদি ঋষি বাক্য হয়, তবে উহার উপর দ্বিরুক্তি করিও না—উহার ভিতর যাহা কিছু আছে তাহার ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই নির্ব্বিচারে মানিয়া যাও;" সমাধি-মহল হইতে প্রত্যুত্তর আসিবে—"বলিতেছ বটে কিন্তু ঋষি-বাক্যের মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করা কি তোমার আমার কর্ম্ম—না কোন ম্লেচ্ছ ইংরাজের কর্ম্ম? কোন একজন অলৌকিক মহাপুরুষের উপদেশ ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য যে, উহার ভিতর দন্তস্ফুট করে।" এই তো ব্যাপার। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়-দ্বয়ের অভক্তি এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় দ্বয়ের অতিভক্তি, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যতই থাকুক না কেন—একটি বিষয়ে দুয়ের মধ্যে খুবই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়,—কি? না অন্ধতা। সভ্য সম্প্রদায় ঋষি-বাক্যের নাম শুনিয়াছেন কি—আর অমনি জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারেই ছুট করিয়া উড়াইয়া দেন; ইহারই নাম অন্ধ অভক্তি। তেমনি আবার আর্য্যাদি সম্প্রদায় ঋষি-বাক্যের নাম শুনিয়াছেন কি—আর অমনি গলিয়া গিয়া তাহাকে মাথায় করিয়া পূজা করেন; ইহারই নাম অন্ধ অতিভক্তি। একদিকে অন্ধ অভক্তি এবং ছটপটি, আর একদিকে অন্ধ অতিভক্তি এবং গোঁড়ামি, এইরূপ উভয় সঙ্কটের দায় হইতে মুক্তি পাইবার অভিলাষে আমরা একটি সহজ উপায় মনঃস্থ করিয়াছি—তাহা এই;—আমাদের দেশের শাস্ত্রোক্ত কোন-একটি কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ঐরূপ উভয়-সংকট অনিবার্য্য হইয়া উঠে; কিন্তু কোন একটি সুবিখ্যাত ইউরোপীয় গ্রন্থে যদি ঐ কথাটিই নূতন মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে নিঃশঙ্ক-চিত্তে তাহার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে; কেননা, প্রথমতঃ তাহাকে ছুট করিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে, যেহেতু তাহা করিলে আপনারই মূর্খতা আপনি ঘোষণা করিয়া লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহা যুক্তিগর্ভ বিজ্ঞান-বচন; তাহা বল-গর্ভ শাস্ত্র-বচন নহে যে, কেহ তাহাকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়া পার পাইবেন। বল-গর্ভ শাস্ত্র-বচনই লোকের গোঁড়ামি আকর্ষণ করে—যুক্তি-গর্ভ বিজ্ঞান-বচন উল্টা আরো লোকের স্বাধীন চিন্তা আকর্ষণ করে। অতএব, এখানে অভক্তি এবং অতিভক্তি দুয়েরই পথ অবরুদ্ধ। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমেই আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়টির বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয় মূর্ত্তি পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার পরে তাহার দেশী শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি পর্য্যালোচনা করিব। আমাদের গম্য-স্থান একই—প্রভেদ কেবল এই যে, প্রথম-বারে আমরা ইউরোপ হইতে যাত্রারম্ভ করিব; দ্বিতীয়বারে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রারম্ভ করিব। এইরূপে একই

সত্যে দুইদিক্‌ দিয়া পৌঁছিতে পারা—সত্যের সার্ব্বভৌমিক মাহাত্ম্যের বিশেষ একটি পরিচয়-চিহ্ন। সত্য এদেশে একরূপ—আর এক দেশে আর একরূপ—নহে; সত্য সর্ব্বদেশেই সমান; ইহাই সত্যের সার্ব্বভৌমিক মাহাত্ম্য।

জর্ম্মান-দেশীয় তত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে হেগেল সর্ব্বাগ্রগণ্য। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার লেখা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া তাহার ভিতর তলাইতে গিয়া অনেকেই ভগ্নোদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসেন; কিন্তু সকলেই কিছু আর শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসেন না; যিনি যেমন ডুবুরী তিনি সেইরূপ কতকগুলি রত্ন তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনেন। নিম্নলিখিত জ্ঞানের ক্রম-পদ্ধতি সেইরূপ একটি কুড়াইয়া পাওয়া রত্ন;—

জ্ঞান ক্রিয়ার তিনটি সোপান-পংক্তি;—(১) Immediate knowledge—Apprehension অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান—ধারণা;—(২) Mediate knowledge—Reflection, অর্থাৎ ভাবনাত্মক জ্ঞান—ধ্যান; (৩) Comprehension অর্থাৎ সম্যক্‌ জ্ঞান—সমাধি।

প্রথম, ধারণা। পরীক্ষা-লব্ধ অসম্বদ্ধ (অর্থাৎ খাপছাড়া) এক-একটি বৃত্তান্ত ধারণার গ্রাহ্য বিষয়। বস্তু-সকল প্রথমেই যে-মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, ধারণা তাহাই সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করে। ধারণা সম্মুখে যাহা উপলব্ধি করে, তাহাই তাহার নিকটে যৎপরোনাস্তি সত্য।

দ্বিতীয়, ধ্যান। ধ্যান সম্মুখস্থিত বস্তুকে চিন্তারূঢ় অন্যান্য নানা বস্তুর সহিত মিলাইয়া দেখে; এইরূপ করিয়া দেখিতে পায় যে, প্রত্যেক বস্তুই অন্যান্য নানা বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত—কোন বস্তুই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে। ধারণার নিকটে সকল বস্তুই স্ব স্ব প্রধান; অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত—প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণরূপে বাস্তবিক—প্রত্যেক বস্তুই সর্ব্বতোভাবে সৎ শব্দের বাচ্য। কিন্তু ধ্যান—বস্তু সকলের মধ্যে, ভেদাভেদ, আশ্রয়-আশ্রিত, ইত্যাদি নানা প্রকার সম্বন্ধ-সূত্র অনুসরণ করিয়া দেখিতে পায় যে, প্রত্যেক বস্তুই সমস্তের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। ধ্যানের কথা এই যে, একটি বালুকাকণাও যদি সমূলে বিলুপ্ত হয়—তবে নিখিল জগৎ বিকলীভূত হইয়া সেই সঙ্গে লোপ পাইয়া যায়, কেননা সমস্ত জগৎ সেই বালুকণাটির সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত। মনুষ্য যখন বাল্যক্রীড়ার অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারে উপনীত হয়, তখন সে আর নূতন নূতন বস্তুর নূতন নূতন চাকচিক্যে মোহিত হয় না—অকস্মাৎ কোন একটি নূতন সামগ্রী দেখিলে তাহাতেই সে স্বর্গ হাতে পায় না; তখন সে বস্তু-সকলের [illegible]ত হইয়া বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ গুণের সন্ধান প্রা[illegible] হয়। কিন্তু যে-কোন বস্তুর যত কিছু গুণ—সমস্তই অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞাপক। বস্তুর গুণ কোথায় বস্তুর নিজত্ব প্রতিপাদন করিবে—তাহা না করিয়া উল্টা আরো বস্তুর গুণ বস্তুর নিজত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে; কেননা আপনাতে বদ্ধ না থাকিয়া পরের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত হওয়ার নামই গুণবত্তা। আপনার গুণ প্রকাশ করিবার জন্য সকলেই পর-কে চায়; উদজন বায়ু আপনার জলোৎপাদকতা গুণ প্রকাশ করিবার জন্য অম্লজন বায়ুকে চায়; নবাভ্র আপনার শস্যোৎপাদকতা গুণ প্রকাশ করিবার জন্য পৃথিবীকে চায়; আলোক আপনার ঔজ্জ্বল্য গুণ

প্রকাশ করিবার জন্য চক্ষুকে চায়; ইত্যাদি। ধারণার নিকটে যাহা পাকা পোক্ত সুদৃঢ় এবং সুস্থির বলিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, ধ্যান দেখিতে পায় যে, তাহার যত কিছু গুণ—সমস্তই পরের উপরে নির্ভর করিতেছে; সূর্য্যমণ্ডলে কোথায় কি পরিবর্ত্তন ঘটিল—হয় তো তাহার প্রভাবে পৃথিবীর জল-বায়ুর গুণ একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; প্রত্যেক বস্তুরই নিজ-সত্তা পর-সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক বস্তু পরের সত্তা লইয়াই সৎ—তাহার সত্তা সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজের নহে; অতএব জগতে যাহা কিছু সৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা সতের ছদ্মবেশ-ধারী অসৎ বই আর কিছুই নহে; ধারণা সকলকেই সৎ দেখে—ধারণার নিকট অসতের দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ। ধ্যানের সাক্ষিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অসতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। অসৎ বলিয়া যে একটা সামগ্রী, ধারণার নিকট তাহা শূন্য বই আর কিছুই নহে; কিন্তু ধ্যানের নিকট [illegible] একটা গুরুতর ব্যাপার, তাহা সৎ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে; কেন না প্রত্যেক বস্তুর নিজ-সত্তা, পরসত্তার সহিত জড়িত; আর, যে অংশে তাহাতে পরসত্তার প্রাদুর্ভাব, সেই অংশে তাহাতে নিজ সত্তার অভাব—সেই অংশে তাহা অসৎ। ধ্যান সকল-বস্তুতেই শুদ্ধ কেবল আপেক্ষিক সত্য অবলোকন করে, কোন বস্তুতেই সমগ্র সত্য—সর্ব্বাঙ্গীন সত্য—মোট সত্য—প্রকৃত সত্য—খুঁজিয়া পায় না। ধ্যানের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, বস্তু-সকল প্রথমে যে মূর্ত্তিতে দেখা দেয় তাহা পারমার্থিক সত্য (Noumenon) নহে, তাহা শুদ্ধ কেবল প্রাতিভাসিক সত্য (Phenomenon); প্রাতিভাসিক সত্যের ভিত্তি-মূল যাহা—তাহা তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহাই প্রকৃত সত্য—তাহাই পারমার্থিক সত্য। কিন্তু সে পারমার্থিক সত্য যে, বস্তুটা কি, ধ্যান তাহার কিছুই স্থির করিতে পারে না। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে কাণ্টের প্রণীত দর্শন-শাস্ত্রের সার মর্ম্মটি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক; তাহা এই;—

বস্তু-সকলের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যত কিছু গুণ—সমস্তই আকাশ এবং কালে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আকাশ এবং কাল এ দুয়ের কোনটি-কেই আমরা কোন ইন্দ্রিয়েরই আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরিয়া পাই না—না আমরা হস্ত দ্বারা তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে পারি, না চক্ষু দ্বারা তাহার রূপ দর্শন করিতে পারি, না রসনা-দ্বারা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারি,—একান্ত-পক্ষেই তাহা ইন্দ্রিয়ের অগম্য। আকাশ এবং কাল শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতেছে, বাহিরের কোন বস্তুকে নহে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সমূহ যখন আকাশ এবং কাল ভিন্ন আর কোথাও প্রতিভাত হইতে পারে না, আর, আকাশ এবং কাল উভয়ই যখন আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়া স্বতঃ কিছুই নহে, তখন কাজেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকল আমাদের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া স্বতঃ কিছুই নহে। উভয়তঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকল আমাদের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া স্বতঃ কিছুই নহে—সমস্তই প্রাতিভাসিক (Phenomenal)—এ কথা স্বীকার করিলাম; কিন্তু সেই সকল গুণের অভ্যন্তরে তাহাদের আধার-ভূত বস্তু যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা তো আর প্রাতিভাসিক নহে; সেই আধার-বস্তুর গুণ-গুলি বটে—যতক্ষণ আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে ততক্ষণই আছে, কিন্তু তাহা নিজে তো আর সেরূপ নহে; তাহা আমাদের জ্ঞানে

প্রকাশ পাইলেও তাহা আছে—আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলেও তাহা আছে, তাহা চিরকালই আছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকল বটে এই আছে এই নাই; শব্দ যতক্ষণ আমার বা আর কাহারো কর্ণে প্রবেশ করিতেছে ততক্ষণই তাহা আছে; কিন্তু যতগুলা ব্যক্তি শব্দ শুনিতেছে, সকলেই যদি স্ব স্ব কর্ণ আচ্ছাদন করে, তবে আর শব্দের [illegible]-মাত্রও থাকে না; কিন্তু শব্দের মূল-স্থিত বস্তু যাহা—তাহা পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে—তাহা চিরকালই সমান; শব্দের বিলোপেও তাহার বিলোপ হয় না—শব্দের উৎপত্তিতেও তাহার উৎপত্তি হয় না—তাহা যাহা ছিল তাহাই আছে ও যাহা আছে তাহাই থাকিবে। অনিত্য গুণসত্তা ঐরূপই বটে—আমরা যতক্ষণ তাহা জানিতেছি ততক্ষণই তাহা আছে, আমরা না জানিলেই নাই; কিন্তু বস্তু-সত্তা আমরা জানিলেও আছে, আমরা না জানিলেও আছে; বস্তু-সত্তা নিত্য এবং নির্ব্বিকার। ইহার উত্তরে কাণ্ট্ বলেন যে, শব্দ যেমন তোমার বা আমার বা আর কাহারো শ্রবণকে আশ্রয় করিয়াই আছে, তেমনি, তুমি যাহাকে আধার-বস্তু বলিতেছ তাহা তোমার বা আমার বা আর কাহারো ভাবনাকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তিতেছে; প্রভেদ কেবল এই যে, ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য নাকি কালের অভ্যন্তর প্রদেশেই আবদ্ধ থাকে, তাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সকল অনিত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়; আর, বিশুদ্ধ ভাবনার লক্ষ্য নাকি কালের মূল প্রদেশে—কালের অতীত প্রদেশে—অভিনিবিষ্ট হয়, তাই বিশুদ্ধ ভাবনার বিষয়-সকল নিত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। যখন তুমি একটা আম্র-ফল দেখিতেছ, তখন তুমি তাহার বর্ণ, গন্ধ, আস্বাদ, প্রভৃতি নানা প্রকার গুণ একত্র উপলব্ধি করিতেছ, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু যাহা তুমি চক্ষে দেখিতেছ না, নাশিকায় আঘ্রাণ করিতেছ না—রসনায় আস্বাদ করিতেছ না—এইরূপ একটা নির্গুণ বস্তুকে আনিয়া তুমি যে, তোমার সেই সব দেখা-শুনা গুণ-গুলির স্কন্ধে চাপাইতেছ—তাহা তুমি কোথা হইতে পাইতেছ? চক্ষু হইতে নহে—নাসিকা হইতে নহে—রসনা হইতে নহে, বাহিরের কোন স্থান হইতেই নহে, তবে কি? না তোমার আপনার মন হইতেই তুমি তাহা উদ্ভাবন করিতেছ। যদি বল যে, "ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণসকলকে যেমন আমি বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাহাদের বন্ধন-সূত্রকেও তেমনি আমি বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং সেই প্রত্যক্ষ-গোচর বন্ধন-সূত্রকেই আমি আধার-বস্তু বলিতেছি—সুতরাং তাহা আমার মনের ভাব-মাত্র নহে" তবে সে কেবল একটা কথার কথা; কেননা সে তোমার বন্ধন-সূত্র সূতাও নহে, দড়িও নহে, আটাও নহে যে, তুমি তাহাকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবে; সূতা, দড়ি, আটা, সমস্তই সগুণ; কিন্তু তুমি যে-বন্ধন সূত্রের কথা বলিতেছ তাহা একেবারেই নির্গুণ; সূতা, দড়ি, আটা, সমস্তই বহির্জ্জগতে পাওয়া যায়, কিন্তু নির্গুণ বস্তু বহির্জ্জগতের কুত্রাপি পাওয়া যায় না—তাহা শুদ্ধ কেবল মনকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তিয়া থাকে। কাণ্ট্ এই যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহার দৌড় অনেকদূর পর্য্যন্ত—ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকল যেমন আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে—তাহাদের আধার-ভূত বস্তুও সেইরূপ আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে; জ্ঞান দুয়েরই মূলাধার সুতরাং জ্ঞানই পারমার্থিক সত্য। কিন্তু কাণ্ট্ নিজে এতদূর পর্য্যন্ত যাইতে সাহসী

হ'ন নাই। সকলেই জানে যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনিত্য গুণ-সকল জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে; কাণ্টের নূতন আবিষ্কার এই যে, তাহাদের নিত্য আধার-বস্তুও জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে; কিন্তু হইলে হয় কি—কাণ্ট্ দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; একদিকে তিনি বলিতেছেন যে, বস্তুসত্তা একটি অপরিহার্য্য জ্ঞানগত ব্যাপার আর-এক-দিকে তিনি বলিতেছেন যে, তাহা একটি জ্ঞান-বহির্ভূত অনির্দেশ্য ব্যাপার। তাহাই যদি হয়—বস্তু-সত্তা যদি একেবারেই অনির্দেশ্য হয়, তবে সেই অনির্দেশ্য সত্তাকে তিনি যে পারমার্থিক ও নিত্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তাহা কিসের বলে করিতেছেন? অনির্দেশ্য বিষয়ের নির্দেশই বা কিরূপ? পেড়াপিড়ি করিয়া ধরিলে কাণ্ট্ এখানে বিষম এক ভজকটে পড়িয়া হাবুডুবু খা'ন। ধ্যানের নিকটে পারমার্থিক সত্য এইরূপ একটা অনির্দেশ্য ব্যাপার। ধ্যান কেবল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত যে, জগতে সকলই পরতন্ত্র, সকলই সীমাবদ্ধ, সকলই অপূর্ণ; কিন্তু স্বতন্ত্র যে কি, অপরিসীম যে কি, পূর্ণ যে কি,—সে বিষয়ে স্থির কিছুই বলিতে না পারিয়া জগতের মূল প্রদেশ নিতান্তই শূন্য রাখিয়া দেয়! সমাধিই কেবল সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিতে পারে—তদ্ভিন্ন আর কেহ তাহা পারে না।

তৃতীয়, সমাধি। সমাধি যে, বস্তুটা কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে কাণ্টের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে। কাণ্টের দর্শনাভ্যন্তরে বাম-দক্ষিণ দুইটি পথ দুই দিকে চলিয়াছে; দক্ষিণ পথটি অবলম্বন করিলে তত্ত্বপন্থী আলোক হইতে আলোকে পদনিক্ষেপ করেন, বাম পথটি অবলম্বন করিলে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে পদনিক্ষেপ করেন। বাম পথটি অবলম্বন করিয়া কম্‌টি ঐহিকতা-বাদে, স্পেন্‌সর অজ্ঞেয়তা-বাদে, এবং হামিল্টন জ্ঞান-বৈফল্য-বাদে উপনীত হইয়াছেন। দক্ষিণ-পথটি অবলম্বন করিয়া হেগেল্ ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন যে, কাণ্ট্ তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমালোচনা নামক গ্রন্থে কিছুই স্থাপন করেন নাই—সকলই উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেটি তাঁহাদের বড়ই ভুল। হিউম্ বটে—তাঁহার দর্শন-গ্রন্থে সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছেন—কিছুই স্থাপন করেন নাই। কাণ্ট্ হিউমের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিও যদি হিউমের ন্যায় সমস্তই উড়াইয়া দিবেন তবে আর কি হইল? কাণ্ট্ তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমালোচনা গ্রন্থে দিব্য একটি অমূল্য সত্য সংস্থাপন করিয়াছেন—কিন্তু তাহার দর্শন পাওয়া যে-সে চক্ষুর কর্ম্ম নহে; তাহার দর্শন পাইতে হইলে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা জ্ঞান-চক্ষুকে বিশেষ রূপে মার্জ্জিত করা আবশ্যক। বস্তুর বাস্তবিক সত্তা সম্বন্ধে কাণ্ট্ বলিয়াছেন বটে যে, তাহা (অর্থাৎ বাস্তবিক সত্তা) মানসিক ভাব-মাত্র (subjective concept); কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, কাণ্টের অভিপ্রায় উহা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাঁহারা ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। হিউম্‌ও তো বলেন যে, বস্তু-সত্তা ও কারণ-সত্তা আমাদের মনের সংস্কার মাত্র—কাণ্ট্‌ও কি তাহাই বলেন? তাহা যদি হয়, তবে তো কাণ্ট্ হিউমেরই শিষ্য! কিন্তু কাণ্ট্ হিউমের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই জগতে বিখ্যাত; অতএব কাণ্টের প্রকৃত অভিপ্রায় কি—তাহা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখা আবশ্যক। কাণ্ট্ একদিকে যেমন বলেন যে, বস্তু-সত্তা মানসিক ভাব-মাত্র, আর-এক-দিকে তেমনি বলেন যে, সেই যে মানসিক

ভাব, তাহা শুদ্ধ কেবল মনেতেই আবদ্ধ নহে কিন্তু তাহা বহির্জগতের সর্ব্বত্রেই বলবৎ; ভাবটি মানসিক (subjective) বটে, কিন্তু সেই ভাবটির বলবত্তা যাহা—তাহা বাস্তবিক (objectively valid)। কান্টের এই কথাটির মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে—বুদ্ধি এবং মন এই দুয়ের প্রভেদের প্রতি প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। কল্পনা যেমন মনের উপজীবিকা, বাস্তবিক সত্য সেইরূপ বুদ্ধির উপজীবিকা; বুদ্ধি যখন স্থির করে যে, অঙ্কুরোদ্‌গমের কোন-না-কোন কারণ আছে, তখন তাহার অর্থ এই যে, বাস্তবিকই অঙ্কুরোদ্‌গমের কোন-না-কোন কারণ আছে; এ নহে যে, "আমার মনের সংস্কার এইরূপই বটে যে, অঙ্কুরোদগমের কোন-না-কোন কারণ আছে—কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে হয় তো তাহার কোন-কারণই নাই।" আমার মনের সংস্কার (যেমন হাঁচি পড়িলে কার্য্যহানি হয়—এইরূপ একটি সংস্কার) আমারই সংস্কার, তাহাকে যে বাস্তবিকই সত্য হইতে হইবে এমন কোন লেখা পড়া নাই। কিন্তু আমার বুদ্ধির এই যে একটি তত্ত্ব যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে, ইহা শুধু যে কেবল আমারই বুদ্ধির তত্ত্ব, তাহা নহে,—উহা বাস্তবিকই সত্য এবং সর্ব্ববাদী সম্মত—উহা সকল-বুদ্ধিরই তত্ত্ব। হিউম্‌ বলেন যে, পরিবর্ত্তন-মাত্রেরই কারণ আছে—গুণ-মাত্রেরই আধার-বস্তু আছে—এগুলা কেবল আমাদের মনের সংস্কার; কেননা, কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিকে ঘটি-বাটীর ন্যায় বাহিরেও কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় অন্তরেও কেহ অনুভব করে নাই; তাহা প্রত্যক্ষ এবং অনুভব দুয়েরই বা'র; তাহা অনুমানেরও গম্য নহে—কেননা অনুমান প্রত্যক্ষ এবং অনুভবকে অবলম্বন করিয়াই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়;—বহ্নি এক সময়ে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল বলিয়াই সময়ান্তরে ধূম-দৃষ্টে বহ্নি অনুমিত হয়; কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি কোনকালেই কাহারো কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা অনুভূত হয় নাই—তবে আর তাহা কিরূপে অনুমিত হইবে; তবেই হইতেছে যে, কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি (অথবা কারণ সত্তা) শুদ্ধ কেবল আমাদের মনের সংস্কার-মাত্র। সর্পের গাত্রে কিছু আর বিষধর হিংস্র জন্তু বলিয়া লেখা নাই—অথচ একটা বানর সর্প দেখিয়াছে কি আর অমনি তাহাকে হিংস্র জন্তু মনে করিয়া সচকিত হয়; সেইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিবামাত্রই আমরা মনে করি যে, তাহার কোন-একটা কারণ আছেই আছে; ওটা যেমন বানরের মনের সংস্কার, এটা তেমনি মনুষ্যের মনের সংস্কার; দুইই মনের সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার বিরুদ্ধে কাণ্ট্‌ এইরূপ বলেন যে, সংস্কারকে বিশ্বাস নাই—তাহা অধীনস্থ ব্যক্তিকে সত্য-মিথ্যা বাছিতে দেয় না—শুধু কেবল নাশায় রজ্জু দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়ায়। একটা বানর সোলার সর্প দেখিলেও ভয়ে জড়-সড় হয়; কাক কোকিল-শাবককে কাক মনে করিয়া প্রতিপালন করে; কুক্কুটী ভিন্ন মনে করিয়া চাখড়িতে তা দেয়; সংস্কার মাঝে মাঝে এইরূপ অধীনস্থ ব্যক্তির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে। শঙ্খ-ধ্বনি শুনিবামাত্র আমরা মনে করি যে, ঠাকুর পূজা হইতেছে,—এটা শুদ্ধ কেবল আমাদের মনের সংস্কার; এরূপ যত কিছু সংস্কার সমস্তই সংশয়াত্মক, একটিও নিশ্চয়াত্মক নহে। শঙ্খ-ধ্বনি শুনিয়া আমরা শুদ্ধ কেবল এই পর্য্যন্তই বলিতে পারি যে, খুব সম্ভব—ঠাকুর পূজা হইতেছে; এরূপ বলিতে পারি না যে, নিশ্চয়ই ঠাকুর পূজা হইতেছে; এমন হইতে পারে যে, কোথাও কিছু নাই—একটা বালক ক্রীড়াচ্ছলে শঙ্খধ্বনি করিতেছে। তা ছাড়া—বাহার

সংস্কার তাহারই সংস্কার,—একের সংস্কারের সঙ্গে অন্যের কোন সম্পর্ক নাই ; একজন নবাগত ইংরাজ খালাসী শঙ্খ শ্রবণ করিলে কখনই তাহার মনে ঠাকুর পূজার ভাব উদিত হইবে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কোন মানসিক সংস্কারই নিশ্চয়াত্মক অবশ্যম্ভাবী এবং সার্ব্বভৌমিক সত্যের পরিচায়ক নহে। কিন্তু যদি বলা যায় যে, অঙ্কুরোদ্গমের কোন-না-কোন কারণ আছে, তবে তাহার অর্থ এ নহে যে, খুব সম্ভব—তাহার কোন-না-কোন কারণ আছে ; তাহার অর্থ এই যে, নিশ্চয়ই তাহার কোন-না কোন কারণ আছে—তাহার একটা-কোন কারণ আছেই আছে—তাহা না থাকিলেই নয়। কারণের সত্তা যখন এইরূপ অবশ্যম্ভাবী, তখন আর কারণের ভাবকে মনের সংস্কার-মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। আবার, পরিবর্তনের কারণ আছেই আছে, ইহা শুদ্ধ কেবল তোমারই বা আমারই বা আর যে-কেহ হউক্ তাহারই মনের সংস্কার মাত্র নহে—উহা সর্ব্ববাদি-সম্মত সার্ব্বভৌমিক সত্য। এখন হিউমের সঙ্গে কান্টের কোথায় ঐক্য এবং কোথায় অনৈক্য তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ; বস্তুর বাস্তবিক সত্তা সম্বন্ধে—হিউম্‌ও বলেন যে, তাহা মানসিক ভাব-মাত্র (subjective concept), কান্টও বলেন যে, তাহা মানসিক ভাব-মাত্র ; কিন্তু তাহা যে, বহির্জ্জগতেও বলবৎ, এ বিষয়টিতে হিউম সংশয়ান্বিত—কান্ট নিতান্তই নিঃসংশয়-চিত্ত। কান্ট অকুতোভয়ে বলিয়াছেন যে, সমস্ত জগৎ আমাদের মনঃসম্ভূত মূলতত্ত্ব-সকলকে মানিয়া চলিতে বাধ্য। কান্ট বলেন "The understanding is itself the lawgiver of nature." বুদ্ধি আপনিই প্রকৃতির নিয়ামক। উদাহরণ ;—এই যে দুইটি মূল-নিয়ম যে, বস্তুসত্তাকে আশ্রয় না করিয়া কোন গুণই থাকিতে পারে না—কারণ-দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইয়া কোন পরিবর্ত্তনই উপস্থিত হইতে পারে না—সমস্ত জগৎই এই দুই নিয়মের বশবর্ত্তী ; অথচ এ-দুই নিয়ম আমাদেরই বুদ্ধি-সম্ভূত। কান্টের সংশয়বাদের মূল কি—এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। একদিকে তিনি বলিতেছেন যে, মূলতত্ত্ব-সকল আমাদেরই বুদ্ধি-সম্ভূত, আর একদিকে বলিতেছেন যে, তাহারা সমস্ত প্রকৃতিময় পরিব্যাপ্ত ; এই যে তাঁহার দুই ভাবের দুই কথা—এ দুই কথার সমন্বয় না করিয়া দুটিকে পৃথক্‌-ভাবে গ্রহণ করাতেই কান্ট নিজে এক দ্বৈধের তরঙ্গে দোলাইত হইয়াছেন। প্রকৃতিকে তিনি জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে তিনি Thing in itself —অর্থাৎ স্বরূপতঃ বস্তু—বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি হইতে যদি সমস্ত মূলতত্ত্বকে টানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রকৃতির থাকে কি? প্রকৃতির অভ্যন্তর হইতে বস্তুর ভাব টানিয়া লও—তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে বস্তুসত্তা নাই ; বস্তু না থাকিলে গুণ কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? অতএব গুণও নাই। প্রকৃতির অভ্যন্তর হইতে কারণের ভাব টানিয়া লও—তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে কারণ-সত্তা নাই ; কারণ না থাকিলে কার্য্য কাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হইবে? অতএব কার্য্যও নাই। তবে আর প্রকৃতির রহিল কি? এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, মূলতত্ত্ব-বহির্ভূত—জ্ঞান-বহির্ভূত—প্রকৃতি প্রকৃতিই নহে, কিছুই নহে। কান্ট জ্ঞান-বহির্ভূত প্রকৃতিকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পান নাই। কেমন করিয়াই বা খুঁজিয়া পাইবেন? যাহা

নাই—যাহা অসম্ভব—যাহা আকাশ কুসুম অপেক্ষাও অলীক—তাহাকে খুঁজিয়া না পাওয়াতেই বা কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইতেছে? তাহা পাওয়া গেল না বলিয়া এত আক্ষেপই বা কেন—এত তুমুল কোলাহলই বা কেন? প্রকৃতি বলিবা-মাত্রই জ্ঞান-সঙ্গত প্রকৃতি বুঝায়; জ্ঞান-বহির্ভূত প্রকৃতি শুদ্ধ কেবল একটা অর্থশূন্য শব্দ—তা বই আর কিছুই নহে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সমূহের মধ্যে—তাহাদের আধার-ভূত বস্তু যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা কি সত্য-সত্যই জ্ঞান-বহির্ভূত বস্তু? তাহা যদি হয় তবে "তাহা নাই" বলিলেই এক কথায় ফুরাইয়া যায়; যাহা আমার জ্ঞান-বহির্ভূত তাহা আমার সম্বন্ধে নাই, যাহা তোমার জ্ঞান-বহির্ভূত তাহা তোমার সম্বন্ধে নাই, যাহা একেবারেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল-জ্ঞানেরই অধিকার-বহির্ভূত তাহা একেবারেই নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ সকলের আধার ভূত বস্তুকে কান্ট নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—সুতরাং তিনি আর তাহাকে "নাই" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। তাহা আছে ইহা না মানিলেই নয়, সুতরাং তাহা জ্ঞানাশ্রিত ইহাও না মানিলেই নয়; কেননা তাহাকে জ্ঞান-বহির্ভূত বলিলেই প্রকারান্তরে তাহাকে "নাই" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। কান্টের এই যে দুই রকমের দুইটি কথা—কি? না বস্তু-সত্তা মানসিক ভাব-মাত্র, অথচ আবার তাহা সমস্ত প্রকৃতিময় পরিব্যাপ্ত, এ দুই কথার সমন্বয় করিয়া আমরা যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা এই;—মনে কর যে, কোন একজন যোগী মহাপুরুষ কোন-একটি বস্তুর সমস্ত বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরতম সত্তাতে উপনীত হইতে পারিয়াছেন; তাহা হইলেই দাঁড়ায় যে, সে বস্তুটিকে তিনি সম্যকরূপে জ্ঞানায়ত্ত করিয়াছেন; সুতরাং তাহার অশেষ বিচিত্র সমস্ত গুণই জ্ঞানায়ত্ত করিয়াছেন; কিন্তু সে সমস্ত গুণ সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞাপক; প্রত্যেক বস্তুই সমস্তের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত; অতএব তিনি যখন লক্ষ্য বস্তুটিকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানায়ত্ত করিয়াছেন, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি সমস্ত জগৎকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানায়ত্ত করিয়াছেন, এক কথায়—তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কোন বস্তুর অন্তরতম সত্তাকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানায়ত্ত করিতে হইলে সর্ব্বজ্ঞতা ব্যতিরেকে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। তবেই হইতেছে যে, যে-কোন বস্তু হউক না কেন—বালুকণাই হউক্ আর পর্ব্বতই হউক্, তাহা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে যেমনটি প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাহার অন্তরতম সত্তা। বস্তুর অন্তরতম সত্তাকে হয় বল যে, তাহা জ্ঞান-বহির্ভূত সুতরাং তাহা কিছুই নহে, নয় বল যে, তাহা জ্ঞানাশ্রিত; যদি বল যে, তাহা আছে সুতরাং তাহা জ্ঞানাশ্রিত, তবে উপরের যুক্তি অনুসারে দাঁড়ায় এই যে, তাহা সম্যক্‌রূপে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষেরই জ্ঞানাশ্রিত এবং তাঁহার প্রসাদাৎ কিয়ৎপরিমাণে অন্যান্য জ্ঞানবান্ জীবের জ্ঞানাশ্রিত। আর-এক দিক্ দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্তু-তত্ত্ব এবং কারণ-তত্ত্ব প্রভৃতি মূলতত্ত্ব-সকল ব্যক্তিবিশেষের সংস্কার-বিশেষ নহে, কিন্তু সকল জ্ঞানেরই সাধারণ সম্পত্তি; অতএব কোন ব্যক্তি-বিশেষ নহে—জীবাত্মা নহে—কিন্তু সর্ব্বগত এবং সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মাই ঐ সকল মূলতত্ত্বের মূলাধার। এখন বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ধারণা ধ্যান এবং সমাধি—এই তিনটি প্রকরণ আত্মাতে পরমাত্মাকে

দর্শন করিবার তিনটি সোপান-পংক্তি,যথা; । প্রথমে আপনার আত্মাকে কল্পনাতে যিনি যেরূপ উপলব্ধি করেন (আপনার আত্মা-সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ সংস্কার) তিনি তাহাতেই মনঃ সমাধা করিবেন—ইহাই ধারণা;তাহার পরে কল্পনাকে ক্রমে সরাইয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ জ্ঞানকে জাগাইয়া তুলিবেন ; উপরে দেখিয়াছি যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্চয়াত্মক তত্ত্ব-সকল শুদ্ধ কেবল আমাদের মনের ভাব মাত্র নহে, কিন্তু তাহা ভূর্ভুবঃস্বঃ সমস্ত জগৎময় পরিব্যাপ্ত ; এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে ক্রমে ক্রমে জাগাইয়া তোলাই ধ্যান। তাহার পরে সেই কল্পনা-মুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করিবেন, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, যথা;—সমস্ত জগতের মূলতত্ত্ব-সকল বিশুদ্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভূত—সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞান ভূর্ভুবঃস্বঃ সমস্ত জগতের নখদর্পণ-স্বরূপ ; কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূল তত্ত্ব-সকল সামান্য-রূপেই সমস্ত জগতের পরিচয় প্রদান করে—বিশেষ রূপে নহে—সম্যক্-রূপে নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞানে, এক দিকে আমরা সমস্ত জগৎকে সামান্য-রূপে উপলব্ধি করি, আর একদিকে—"আমরা একটি বালু-কণারও বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানি না"—আপনাদের এইরূপ প্রগাঢ় অজ্ঞতা উপলব্ধি করি। বিশুদ্ধ জ্ঞানের এক পৃষ্ঠে সর্ব্বজ্ঞতার আদর্শ; আর-এক পৃষ্ঠে প্রগাঢ় অজ্ঞান-অন্ধকার। সর্ব্বজ্ঞতার আদর্শটি আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা ঈশ্বরের বাস্তবিক সর্ব্বজ্ঞতার আশ্রয়াধীন ; যদি তাহার মূলে বাস্তবিক সর্ব্বজ্ঞতা না থাকে তবে তাহা কিছুই নহে ; কেননা, মূলই যদি নাই,তবে আদর্শ ঐ-যে উ-টি—উহা কাহার আদর্শ? মূলে যদি বাস্তবিক সর্ব্বজ্ঞতা না থাকে, তবে তাহার আবার আদর্শ কিরূপ? অতএব সর্ব্বজ্ঞতার ঐ যে সামান্য-রূপী আদর্শ, উহা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকারের প্রতিকূলে—পরিপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের প্রতি আমাদের জ্ঞান-নেত্রকে ফিরাইয়া দেয় ; এবং ভক্ত-হৃদয়ের গভীর অভ্যন্তর হইতে

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্মএধি"—

"অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও, আমার নিকট প্রকাশিত হও"—এইরূপ অমোঘ প্রার্থনা উন্মুক্ত করিয়া দেয়; তাই আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভ্যন্তরে—আত্মার অভ্যন্তরে—পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। কেননা আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূলতত্ত্ব-সকল শুদ্ধ কেবল আমাদের নিজের নিজের মানস-ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নহে—কিন্তু তাহা সমস্ত জগৎময় পরিব্যাপ্ত ; মূলতত্ত্ব-সকল আমারও অভ্যন্তরে যেমন কার্য্য করিতেছে, তোমারও অভ্যন্তরে তেমনি কার্য্য করিতেছে—সমস্ত জগতেরই অভ্যন্তরে অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করিতেছে; মূল-তত্ত্ব-সকল যে-অংশে আমার জ্ঞানাভ্যন্তরে—আমার পরীক্ষা-ক্ষেত্রে—কার্য্য করিতেছে, সে অংশে আমিই তাহাদের আধার ; কিন্তু যে-অংশে তাহারা সর্ব্বাভ্যন্তরে—সর্ব্ব-ক্ষেত্রে—কার্য্য করিতেছে, সে অংশে কোন পরিমিত জীবই তাহাদের আধার হইতে পারে না। এক এক ব্যক্তি এক এক অংশে মূলতত্ত্ব-সকলের আধার—সর্ব্বাংশে নহে। সর্ব্বগত পরমাত্মাই কেবল সর্ব্বাংশে মূলতত্ত্ব-সকলের আধার—তিনিই মূলতত্ত্ব-সকলের মূলাধার। এইরূপে পরমাত্মাকে আমাদের সমস্ত জ্ঞানের মূলাধার—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—জানিয়া যখন তাঁহার দন তাঁহাকেই সমর্পণ করি—সমস্ত

বুদ্ধি-বৃত্তি তাঁহাতে সমর্পণ করি—তখন সেই রূপ আত্মসমর্পণই সমাধি শব্দের বাচ্য। ভক্তজন পরমাত্মাকে যাহা কিছু দে'ন, তাহা তাঁহার আন্তরিক প্রেমের দান; তিনি—দে'ন প্রেম, পা'ন আনন্দ; দে'ন মঙ্গল-কার্য্যে যোগ, পা'ন আধ্যাত্মিক বল; দে'ন মন, পা'ন জ্ঞান; দে'ন আপনাকে, পা'ন আপনা হইতেও অন্তরতর অন্তরতম পরমাত্মাকে; যতই দে'ন ততই পা'ন; আরো দে'ন আরো পা'ন; আবার আরো দে'ন আবার আরো পা'ন; এরূপ দেওয়া-পাওয়ার অন্তও নাই, আর, দুয়ের মধ্যে ব্যবধানও নাই। এই প্রকার অন্তরতম আদান-প্রদানের পথই জীবাত্মার অনন্ত উন্নতির পথ। এইরূপে—পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া—জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাই সমাধি, প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হওয়া সমাধি নহে।

ঈশোপনিষদে একটি শ্লোক আছে; সহসা দেখিলে বোধ হয় যে তাহার গোড়া'র সঙ্গে আগা'র মিল নাই—তাহা বাতুলের প্রলাপোক্তি; কিন্তু কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য-সহকারে তাহার মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এমন সার-গর্ভ অমূল্য বচন এত সহজে—শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম সরলভাবে—উদ্গীরিত হওয়া এক যা-কেবল বেদের অভ্যন্তরেই দেখিতে পাওয়া যায়—অন্য কুত্রাপি নহে। শ্লোকটি এই;—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"

অন্ধ তিমিরে তাঁহারা প্রবেশ করেন—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করেন; তাহা অপেক্ষা আরো যেন ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করেন—যাঁহারা বিদ্যাতে রত; যাঁহারা বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে এক সঙ্গে জানেন, তাঁহারা অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত উপভোগ করেন।

এই যদৃচ্ছা-বিনির্গত সরল ঋষি-বাক্যটির সঙ্গে এখনকার কষ্ট-কল্পিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইতেছি;—ধারণা সম্মুখস্থিত আপেক্ষিক সত্যকেই সম্পূর্ণ সত্য মনে করে—পারমার্থিক সত্যের আবশ্যকতাই হৃদয়ঙ্গম করে না, সুতরাং তাহা অবিদ্যাতেই রত; ধ্যান আপনার বিদ্যার মধ্যদিয়া দম্ভ সহকারে পারমার্থিক সত্যে উপনীত হইতে যায়—তাই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসে। ধ্যান মনে করে যে, পারমার্থিক সত্য আমার ভাবনার উপরেই নির্ভর করিতেছে; কাজেই ধ্যানের খদ্যোত-জ্যোতিতে অন্ধকার দূরীভূত না হইয়া উল্টা আরো ঘনীভূত হয়। সমাধি আপনার অবিদ্যার মধ্য দিয়া—অজ্ঞতার মধ্য দিয়া—শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয়ে উপনীত হয়; তাই প্রকৃত সত্যে, পারমার্থিক সত্যে, উপনীত হয়; "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত উপভোগ করে। কেননা, পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব সত্তার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন অপূর্ণ পরতন্ত্র এবং আপেক্ষিক সত্তা এক মুহূর্ত্তও আপনাতে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না; কাজেই আপনার অপূর্ণ জ্ঞানকে—অবিদ্যাকে—যদি আমরা পরম জ্ঞান মনে করি, তাহা হইলে আমরা সত্যে বঞ্চিত হই। কিন্তু যখন আমরা আপনার জ্ঞানে আপনার অবিদ্যা—অজ্ঞতা—উপলব্ধি করি, তখন সেই সঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয় উপলব্ধি করি; এইরূপে অবিদ্যার মধ্যদিয়া বিদ্যাতে উপনীত হই, এবং সেই পরিশোধিত বিদ্যা দ্বারা অমৃত-রস উপভোগ করি।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকলেই জানে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকল জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-সাপেক্ষ; "শব্দ আছে" বলিলেই বুঝায় যে, তাহা কাহারো না কাহারো জ্ঞানে প্রকাশিত আছে; কিন্তু তাহাদের আধারভূত নিত্য বস্তুও যে, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-সাপেক্ষ ইহা কান্টের নূতন একটি আবিষ্কার। সমাধির কথা এই যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ সকলের তাৎকালিক সত্তা (অর্থাৎ তাহারা যে যে সময়ে উপস্থিত হয় তাহাদের সেই সেই সময়ের সত্তা) যেমন তাৎকালিক কোন না-কোন জ্ঞানের আশ্রয়সাপেক্ষ, সেইরূপ তাহাদের আধার-বস্তুর নিত্য সত্তা নিত্য-জ্ঞানের—পরমাত্মার—আশ্রয়-সাপেক্ষ; কেননা শব্দাদির সত্তা সময়ে সময়ে আছে অথচ তাহা সেই সেই সময়ে কোন জ্ঞানেই প্রকাশিত নাই—ইহাও যেমন আর, ইহাও তেমনি যে, তাহাদের আধার বস্তু চিরকালই আছে অথচ চিরকাল কোনও জ্ঞানে প্রকাশিত নাই,—দুইই সমান অসঙ্গত। কাণ্ট্ বলিয়াছেন যে, নিত্য বস্তু-সত্তা আমাদের ভাবনাকে ছাড়িয়া কিছুই নহে; কিন্তু তাঁহার বলা উচিত ছিল যে, নিত্য বস্তু-সত্তা নিত্য জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে; কেননা, নিত্য বস্তু-সত্তা যদি এরূপ হয় যে, আমরা ভাবিলেই তাহা আছে ও আমরা না ভাবিলেই তাহা নাই তবে আর তাহার নিত্যতা কোথায়? তবে তো তাহা শব্দ-স্পর্শাদির ন্যায়—এই আছে এই নাই—অনিত্য। কিন্তু বস্তু-সত্তার নিত্যতা না মানিলেই নয়। আমরা ক্রমাগতই দেখিতেছি যে, পূর্ব্বে যাহা বরফ ছিল—এখন তাহা জল হইয়াছে, ও পূর্ব্বে যাহা জল ছিল, এখন তাহা বাষ্প হইয়াছে; কিন্তু এরূপ যত কিছু পরিবর্ত্তন সমস্তই গুণ-গত—একটিও বস্তু-গত নহে। জল কাঠিন্য গুণ পরিত্যাগ করিয়া তারল্য গুণ প্রাপ্ত হইতেছে, তারল্য গুণ পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পত্ব গুণ প্রাপ্ত হইতেছে; বর্ত্তমান গুণ পরিত্যাগ করিয়া গুণান্তর প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু তাহার আধার বস্তু পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে এবং চিরকালই তাহাই থাকিবে; কোন কালেই জল তাহার আধার-বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া বস্তুন্তর প্রাপ্ত হইতে পারে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বস্তু-সত্তা নিত্য এবং নির্ব্বিকার—ইহা না মানিলেই নয়। কিন্তু অনিত্য গুণ-সত্তাই হউক—আর নিত্য বস্তু-সত্তাই হউক—দুইই—সত্তামাত্রই—জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-সাপেক্ষ; জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন সত্তাই কিছুই নহে; কেননা, জ্ঞানে যাহা সত্তা-রূপে প্রকাশ পায় অথবা প্রকাশ পাইতে পারে, তাহাই সত্তা; যাহা কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পায়ও না—প্রকাশ পাইতে পারেও না—তাহা কিছুই নহে। অতএব, যদি বলা যায় যে, শব্দাদি গুণ-সকলের আধার বস্তু পূর্ব্বে কোন জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ছিল না—এখন কেবল আমার ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতেছে, তবে তাহাতে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, সে আধার-বস্তু পূর্ব্বে ছিল না—এখন তাহা নূতন দেখা দিয়াছে। তোপের ধ্বনি যেমন সূর্য্যাস্ত-কালে কাহারো জ্ঞানে প্রকাশিত ছিল না—তাই ছিল না; রাত্রি নয়টার সময় জ্ঞানে প্রকাশিত হইল, তাই তখন তাহা বর্ত্তমান; ক্ষণ পরেই তাহা জ্ঞান হইতে তিরোহিত হইল, তাই তখন আর তাহা নাই; বস্তু-সত্তাও কি সেইরূপ? বস্তু-সত্তাও কি এইরূপ যে, তাহা পূর্ব্বে কোন জ্ঞানে প্রকাশিত ছিল না, তাই ছিল না, এখন আমার ভাবনাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাই আছে; ক্ষণ-পরে তাহা যখন আমার

ভাবনা হইতে চলিয়া যাইবে তখন আর তাহা থাকিবে না? তাহা যদি হয়, তবে আর তুমি বস্তু-সত্তাকে নিত্য বলিতে পার না; তবে তোমার বলা উচিত যে, শব্দ যেমন শুনিলেই আছে—না শুনিলেই নাই, তাহার মূল-স্থিত বস্তু সত্তাও তেমনি ভাবিলেই আছে না ভাবিলেই নাই;—দুইই এই আছে এই নাই—দুইই অনিত্য। কিন্তু বস্তু-সত্তা অনিত্য এ কথা একেবারেই জ্ঞান-বিরুদ্ধ; মূল বস্তু-সত্তা নিত্য—ইহা না মানিলেই নয়। অতএব, এ কথা কোন কাজের কথা নহে যে, বস্তু-সত্তা আমাদের ভাবনাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাই আছে; কেননা তাহা হইলে তাহার নিত্যতা কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না; তবে কি? না বস্তু-সত্তা নিত্য জ্ঞানে প্রকাশিত—তাই তাহা নিত্য বিদ্যমান। যদি বল যে, নিত্য বস্তু-সত্তা কাহারো জ্ঞানে বিদ্যমান নাই—অথচ তাহা আছে, তবে সে কথা বলাও যা—আর এ কথা বলাও তা যে, শব্দ কাহারো কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না—অথচ তাহা আছে; দুই কথাই অর্থ-শূন্য শব্দ-মাত্র। "আছে" শব্দের অর্থই এই যে, জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে;—আমার জ্ঞানে না হউক আর কাহারো জ্ঞানে—প্রত্যক্ষে না হউক স্মরণে—স্মরণে না হউক যুক্তিতে—প্রকাশ পাইতেছে; অতলস্পর্শ সমুদ্রের তল, চন্দ্রের ও-পৃষ্ঠ, আমাদের প্রত্যক্ষে প্রকাশ না পাইলেও তাহা আমাদের যুক্তিতে প্রকাশ পায়, তাই আমরা বলি "তাহা আছে"। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকলের আধার-বস্তু—আমাদের ইন্দ্রিয়-সমক্ষে নহে—শুদ্ধ কেবল বিশুদ্ধ যুক্তিতে—অতীন্দ্রিয় ভাবনাতে—নিত্য বলিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু আমাদের পূর্ব্বে তাহা যদি আর কোন জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া না থাকে—তবে আমাদের পূর্ব্বে তাহা ছিল এ কথার আদবেই কোন অর্থ থাকে না। কেননা ছিল যদি—তবে কোথায় ছিল? আকাশে? না; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকলই কেবল আকাশে বিস্তৃত-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে। কালে? না; শব্দাদির ন্যায়—ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায়—যাহার উৎপত্তি-বিনাশ আছে, তাহাই কালে প্রকাশ পাইতে পারে। তবে কি তাহা ইতিপূর্ব্বে আদবেই ছিল না? না; তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনো আছে, পরেও থাকিবে,—যেহেতু তাহা নিত্য। তাহা ঘটি-বাটীর ন্যায় দেশাভ্যন্তরে ছিল না, ক্ষুধা-তৃষ্ণার ন্যায় কালাভ্যন্তরে ছিল না, দেশ কালের ন্যায় কাহারো জ্ঞানাভ্যন্তরে ছিল না,—তবে "তাহা আদবেই ছিল না" এ কথা না বলিয়া "তাহা ছিল" এ কথা বলিবার অর্থ কি? তবেই হইতেছে যে, "তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, এবং চিরকালই থাকিবে" এ কথার অর্থই এই যে, পূর্ব্বেও তাহা জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল, এখনো তাহা জ্ঞানে বিদ্যমান আছে, এবং চিরকালই তাহা জ্ঞানে বিদ্যমান থাকিবে,—তাহা নিত্য জ্ঞানে নিত্য বিদ্যমান। ধ্যান কেবল এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত যে, জগতে সকলই পরতন্ত্র—সকলই সীমাবদ্ধ, সকলই সাবলম্ব; সুতরাং তাহার মূলে স্বতন্ত্র, অপরিসীম, নিরবলম্ব, একটা-না-একটা কিছু আছেই আছে; কিন্তু তাহা যে, কি, ধ্যান সে বিষয়ে স্থির কিছুই বলিতে না পারিয়া জগতের মূল প্রদেশ নিতান্তই শূন্য রাখিয়া দেয়। ধ্যান যেস্থানটিতে এইরূপ অন্ধকার দেখে, সমাধি সেই স্থানটি জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ দেখিতে পায়;—ধ্যান যেখানে জগতের অপূর্ণ সত্তা—জগতের নেতি নেতি—অবলোকন করে, সমাধি সেইখানে পরমাত্মার পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা অবলোকন করে। ধ্যানের প্রবাহ একমুখা—তাহা শুদ্ধ কেবল জগতের অপূ-

র্ণতা প্রতিপাদন করিয়াই ক্ষান্ত। সমাধির আকর্ষণ দুইমুখা—তাহা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় নিরন্তর দোলায়িত হইতেছে। এক দিকে তাহা জীবাত্মার অপূর্ণ সত্তার মধ্য দিয়া পরমাত্মার পরিপূর্ণ সত্তায় উপনীত হইতেছে—আর এক দিকে তাহা পরমাত্মার পরিপূর্ণ সত্তার মধ্য দিয়া জীবাত্মার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব সমর্থন করিতেছে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ধারণার নিকটে সম্মুখস্থিত বিষয়ই পরম সত্য; ধ্যানের নিকটে—অব্যক্ত বস্তু-সত্তাই পরম সত্য, এবং আপনার ভাবনাই পরম জ্ঞান, সুতরাং ধ্যানের নিকটে সত্য এবং জ্ঞান উভয়ে ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর হইতে বিভিন্ন; সমাধির নিকটে পরমাত্মাই পরম সত্য এবং পরমাত্মাই পরম জ্ঞান—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সুতরাং সমাধির নিকটে সত্য এবং জ্ঞান দুয়ের মধ্যে ব্যবধান নাই; সমাধির গভীর দৃষ্টিতে জগতের সমস্ত জড়তা এবং অন্ধকার জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠে। সমাধি দেখিতে পায় যে, পূর্ণতার অসীম সমুদ্র আপনার শক্তি দ্বারা আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছেন, আর, সমস্ত তরঙ্গের সহিত আপনার অভেদ ও প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত অন্যান্য তরঙ্গের এবং আপনার প্রভেদ—দুইই একসঙ্গে সমর্থন করিতেছেন। এইরূপ ভেদাভেদ এবং দ্বৈতাদ্বৈত স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মহাকাল এবং খণ্ডকালের ভেদাভেদের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। কালের আদ্যোপান্ত সমস্ত মুহূর্ত্ত গুলিকে যদি সমষ্টিরূপে ধরা যায়, তবে সেই মুহূর্ত্ত-সমষ্টির সহিত মহাকালের অভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সহিত আর আর মুহূর্ত্তের এবং মহাকালের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; এ যেমন, তেমনি—সমস্ত জগতের মূলীভূত শক্তির সহিত পরমাত্মার অভেদ এবং প্রত্যেক বিশ্ব-ব্যাপারের সহিত আর-আর বিশ্বব্যাপারের এবং পরমাত্মার প্রভেদ,—সমাধির নিকটে দুইই যুগপৎ প্রকাশিত হয়। উপরে যাহা বলা হইল তাহা সংক্ষেপে এই;—ধারণার চক্ষে সকল বস্তুই স্ব স্ব প্রধান, ধ্যানের চক্ষে সকল বস্তুই পরাপেক্ষী, সমাধির চক্ষে সকল বস্তুই পরমাত্মার আবির্ভাব। সমাধি প্রত্যেক বস্তুতেই সর্ব্বতঃ প্রসারিত সম্বন্ধ কিরণ দেখিতে পায়, এবং সেই সূত্রে প্রত্যেক বস্তুতে সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জগতের কেন্দ্রস্থিত পরমাত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায়; কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এবং অকাশের প্রত্যেক খণ্ডাংশে মহাকাল এবং মহাকাশের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে। ব্রহ্মাণ্ড মনে কর যেন একটি চক্র; ধারণা সেই চক্রের পরিধির এক-একটি খণ্ডাংশেই সন্তুষ্ট থাকে; ধ্যান সেই খণ্ডাংশগুলির একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ অনুসরণ করিয়া সমস্ত পরিধিময় ঘুরিয়া বেড়ায়; সমাধি পরিধি-হইতে কেন্দ্রে অভিনিবিষ্ট হইয়া চক্রের সমগ্র ভাবটি জ্ঞানায়ত্ত করে। এই গেল—ইউরোপীয় দর্শনের সার সংগ্রহ; এখন আমাদের স্বদেশের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্।

সম্প্রতি আমাদের দেশে সমাধি সমাধি বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, সমাধি এক প্রকার জ্ঞান-শূন্য অবস্থা। জর্ম্মান দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মার্মট বলিয়া একরূপ জন্তু আছে—তাহারা সারা শীতকাল কুঁকড়িয়া সুঁকড়িয়া অচেতন প্রায় পড়িয়া থাকে; ইংরাজিতে ইহাকে বলে Hybernation অর্থাৎ হিম পোহানো বা হিমোদ্‌যাপন; কেহ কেহ বলেন যে এইরূপ হিমোদ্‌যাপনের অবস্থাই সমাধির অবস্থা। কেহ বা পাণ্ডিত্য

প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সমাধিতে জ্ঞান জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক হইয়া যায় সুতরাং তিনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সবই তো ইনি বুঝাইলেন—আর সবই তো আমরা বুঝিলাম। জ্ঞান জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় যেখানে জমাট বাঁধিয়া একীভূত হইয়া যায়, সেখানে তো জ্ঞানের উজ্জ্বলতা আরো বেশী হইবারই কথা—জ্ঞান নিভিয়া যাইবে কেন? দীপ প্রকাশক—গৃহ প্রকাশ্য; গৃহ শুদ্ধ কেবল প্রকাশ্য—গৃহ প্রকাশক নহে; দীপ আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং দীপ আপনিই আপনার প্রকাশক এবং আপনিই আপনার প্রকাশ্য; দীপে, প্রকাশক প্রকাশ্য এবং প্রকাশ তিনই জমাট বাঁধিয়া একীভূত হইয়া রহিয়াছে; তাহা বলিয়া দীপের উজ্জ্বলতা কি দীপালোকিত গৃহের অপেক্ষা কোন অংশে কম? না উল্টা আরো বেশী? দীপ যেমন আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, আত্মা সেইরূপ আপনি আপনাকে জানিতেছে—আত্মাতে জ্ঞান জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় তিনই জমাট বাঁধিয়া একীভূত হইয়া রহিয়াছে; ইহাতে জ্ঞানের উজ্জ্বলতা আরো বৃদ্ধি পাইবারই কথা—জ্ঞানের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির তো কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। দীপ—প্রকাশ প্রকাশক এবং প্রকাশ্য এ তিনের অভেদ-স্থান বলিয়াই অধিক পরিমাণে উজ্জ্বল; আত্মা—জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার অভেদ-স্থান বলিয়াই অধিক পরিমাণে জ্ঞানোজ্জ্বল; কিন্তু তুমি একেবারে উল্টা কথা বলিতেছ; ফলে, আপনি না বুঝিয়া অন্যকে বুঝাইতে যাওয়াই ঝকমারি! যে-কোন ব্যক্তি যাহা কিছু বোঝে—সমস্তই জ্ঞান দিয়া বোঝে; অজ্ঞান দিয়া কেহ কোন বিষয়ই বুঝিতে পারে না; তুমি বলিতেছ যে, সমাধি-কালে তোমার জ্ঞান ছিল না—সুতরাং তোমার সেই সমাধির অবস্থা তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি কর নাই, সুতরাং সমাধি যে, কি, তাহা তুমি জান না—তুমি নিজে জানো না অথচ আমাকে তাহা বুঝাইতে আসিতেছ,—কেন এ বৃথা কর্ম্ম-ভোগ! এ কথার প্রত্যুত্তরে ইঁহারা এইরূপ বলেন যে, প্রগাঢ় নিদ্রার অচেতন অবস্থা হইতে যখন আমি জাগিয়া উঠি, তখন এটা আমি বিলক্ষণই বুঝিতে পারি যে, আমি অনতি-পূর্ব্বে নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম; সেইরূপ, সমাধি-কালে আমার চেতনা না থাকা সত্ত্বেও সমাধি-ভঙ্গের সময় আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, অনতিপূর্ব্বে আমি সমাধিস্থ ছিলাম। এ কথার মধ্যে যদি কোন অর্থ থাকে তবে তাহা এই যে, জাগরণ হইতে ক্রমে ক্রমে নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িবার সময়টুকু, এবং নিদ্রা হইতে ক্রমে ক্রমে জাগরণে ভাসিয়া উঠিবার সময়টুকু, এই দুই সময়ের বৃত্তান্ত যাহা আমরা অস্ফুটরূপে জ্ঞানে উপলব্ধি করি, নিদ্রাভঙ্গে তাহারই প্রতি লক্ষ করিয়া আমরা বলি যে, আমি নিদ্রা হইতে উঠিলাম অথবা কল্য রাত্রে নিদ্রা গিয়াছিলাম; কিন্তু মাঝের সময় টুকুর কোন বৃত্তান্তই নিদ্রাভঙ্গের সময় আমাদের জ্ঞানে উদিত হয় না;—সেই মাঝের সময়টিতে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবল-বেগে বহিয়াছে কিন্তু আমরা তাহার কিছুই জানি না; হয় তো আমাদের নাশাধ্বনিতে আশ-পাশের লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার কিছুই জানি না; হয় তো আমরা ঘুমের ঘোরে কত কি প্রলাপোক্তি করিয়াছি, কিন্তু আমরা তাহার কিছুই জানি না। আমরা রাত্রিকালের কোন সংবাদই জানি না, তবে আমরা কি সূত্রে বলি যে, আমরা সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম? আমরা যে, ওরূপ কথা বলি তাহার তাৎপর্য্য

শুদ্ধ কেবল এই যে, কল্য যখন আমি শয্যায় শয়ন করিয়াছি, তখন আমি রাত্রির সবে মাত্র প্রারম্ভ দেখিয়াছিলাম, এখন জাগিয়া উঠিয়া প্রভাত দেখিতেছি; ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, মাঝের সময়টি—অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি—আমি নিদ্রায় অতিবাহন করিয়াছি। কিন্তু যদি ঘড়ি না থাকিত, এবং জগতের ঘড়ি সূর্য্য না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কুম্ভকর্ণের ন্যায় ছয়মাস ধরিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন থাকিলেও—আমরা ছয়মাস, কি ছয় মুহূর্ত্ত, কি ছয় বৎসর নিদ্রা গিয়াছি—তাহা বলিতে পারিতাম না। সমাধি যদি প্রগাঢ় নিদ্রার ন্যায় অচেতন অবস্থা হয়, তবে দাঁড়ায় এই যে, প্রগাঢ় নিদ্রা যেমন আমাদের জ্ঞানে অপ্রকাশ—সমাধিও সেইরূপ আমাদের জ্ঞানে অপ্রকাশ, সুতরাং দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যে, কি, তাহাও আমাদের জ্ঞানে অপ্রকাশ, তাহা হইলে দাঁড়ায় যে প্রগাঢ় নিদ্রার অবস্থা এবং মুর্চ্ছার অবস্থা,—এ দুয়ের মধ্যে যেমন কোন প্রভেদ নাই; সমাধির অবস্থা এবং সুষুপ্তির অবস্থা এদুয়ের মধ্যেও সেইরূপ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করেন; এমন কি বেদান্ত-দর্শন ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতির ন্যায় নিদ্রাকর্ষণকে সমাধির বিঘ্নের মধ্যে ধরিয়াছেন; যথা শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে;

> সমাধৌ ক্রিয়মাণে তু বিঘ্নান্যায়ান্তি বৈ বলাৎ।
> অনুসন্ধান-রাহিত্যং আলস্যং ভোগলালসং॥
> লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা।
> এবং যদ্বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রহ্মবিদা শনৈঃ॥

এই শ্লোকটিতে সমাধির আট প্রকার বিঘ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা; অনুসন্ধান-রাহিত্য, আলস্য, ভোগ-লালস, লয়, তম, বিক্ষেপ, রসাস্বাদ, শূন্যতা; ইহার মধ্যে লয় শব্দের অর্থ নিদ্রাকর্ষণ। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রানুসারে সমাধি সুষুপ্তির ন্যায় অচেতন অবস্থা নহে। যুক্তিতে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই;—আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাধারণ কেন্দ্র-স্থল; সুতরাং আত্মার নিজাভ্যন্তরে তিন অবস্থাই ঘনীভূত হইয়া একাকারে পরিণত হইয়াছে; আর সেই যে, তিনের একাকার ভাব, তাহা ঐ তিন অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র চতুর্থ আর একটি অবস্থা; এই জন্য সমাধির অবস্থা বেদান্ত-শাস্ত্রে তুরীয় (অর্থাৎ চতুর্থ) অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার একটি উপমা; একখানি বেলোয়ারির কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্য-কিরণ সঞ্চারিত হইলে, সেই কিরণ প্রধানতঃ তিন বর্ণের তিনটি ছটায় বিভক্ত হয়, পীত, লোহিত, এবং নীল। সূর্য্য মনে কর যেন আত্মা; তাহার কাচ-প্রভিন্ন পীতবর্ণ ছটা মনে কর যেন জাগ্রৎ অবস্থা; লোহিত বর্ণ ছটা স্বপ্নাবস্থা; নীল বর্ণ ছটা সুষুপ্তি অবস্থা; আর মূলস্থিত সূর্য্য-কিরণে ঐ তিন বর্ণ ঘনীভূত হইয়া যে-এক শ্বেতবর্ণে পরিণত হইয়াছে সেই শ্বেতবর্ণ মনে কর যেন সমাধির অবস্থা। সেই শ্বেত-বর্ণের মধ্যে, নীলবর্ণ কিনা সুষুপ্তির আরাম, লোহিত বর্ণ কিনা স্বপ্নের মনোরাজ্য, এবং পীতবর্ণ কি না জাগ্রৎকালের জ্ঞানরাজ্য, তিনই একত্র ঘনীভূত; অথচ সেই শ্বেতবর্ণ নীলবর্ণও নহে, লোহিত বর্ণও নহে, পীত বর্ণও নহে, কিন্তু তিন হইতেই স্বতন্ত্র চতুর্থ আর একটি বর্ণ। সমাধি কি নহে, এতক্ষণ ধরিয়া কেবল তাহারই ব্যাখ্যা করা হইল; শাস্ত্র এবং যুক্তি দুইকে মিলাইয়া এই-রূপ পাওয়া গেল যে, সমাধি সুষুপ্তির ন্যায় অচেতন অবস্থা নহে। এখন শাস্ত্র অনুসারে সমাধি বস্তুটা কি—তাহা দেখা যা'ক।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা॥ ১॥
—পাতঞ্জল যোগ-সূত্র।

কোন একটি লক্ষ্য প্রদেশে চিত্ত-বন্ধনের নাম ধারণা। পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে, সম্মুখস্থিত লক্ষ্য বিষয়কে অন্যান্য বিষয় হইতে স্বতন্ত্র-রূপে অবধারণ করাই ধারণা। এখানে পূর্ব্বাপর স্পষ্টই মিল রহিয়াছে।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং॥ ২॥

সেই লক্ষ্য বিষয়টির প্রতি একটানা চিন্তার স্রোতই ধ্যান। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, লক্ষ্য বিষয়ের সহিত আর আর নানা বিষয়ের সম্বন্ধ অবধারণ করাই ধ্যান। আপাততঃ মনে হয় যে, এ দুই কথার মধ্যে বিশেষ কোন ঐক্য নাই; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ও দুই কথা একই কথার এ-পিট ও-পিট। আমাদের মন যখন বিশেষ কোন একটি লক্ষ্য বিষয়েতে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহার প্রতি আমাদের চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তখন অনেকানেক বিচিত্র বিষয় সেই চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে; সেই-সকল আগন্তুক বিষয়ের সহিত লক্ষ্য বিষয়ের সম্বন্ধ যতক্ষণ না অবধারিত হয়, ততক্ষণ সেই অসম্বদ্ধ বিষয়-গুলা লক্ষ্য বিষয় হইতে মনকে বিচলিত করিয়া ধ্যানের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। কিন্তু ধ্যাতার ধ্যান-সমক্ষে আগন্তুক বিষয়-সকলের সহিত লক্ষ্য বিষয়ের নানা প্রকার সম্বন্ধ-সূত্র যতই ঘনীভূত হয়, ততই সেই সকল সম্বন্ধ-সূত্রের মধ্য দিয়া লক্ষ্য-বিষয়টি ভাবনাতে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। মনে কর যেন একটা গরুর প্রতি ধ্যাতার লক্ষ্য নিবিষ্ট রহিয়াছে, সহসা তাঁহার মনোমধ্যে রাখালের ভাব এবং কৃষকের ভাব উদিত হইল; এখন এ-দুয়ের সঙ্গে গরুর যে, কি সম্বন্ধ, তাহা যদি তাঁহার মনে প্রতিভাত না হয়, তবে তাঁহার মন গরু হইতে বিচলিত হইয়া রাখালে এবং কৃষকে আটকিয়া পড়ে; কিন্তু গরু এবং কৃষকাদি উভয়ের মধ্যগত সম্বন্ধটি যদি তাঁহার মনে জাগরূক হয়, তবে সেই সম্বন্ধের মধ্য দিয়া গরুরই নানা প্রকার গুণ তাঁহার মানসক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়; যেমন রাখালের-সম্বন্ধ-সূত্রে গরুর দুগ্ধ-দাতৃতা—কৃষকের সম্বন্ধ-সূত্রে গরুর হলকর্ষণ ক্ষমতা, ইত্যাদি; ইহাতে করিয়া গরুরই ভাব তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়—রাখালের ভাবও নহে, কৃষকের ভাবও নহে। এইরূপ, চিন্তাস্রোতে-ভাসিয়া-আসা নানা ভাবের সহিত লক্ষ্য বিষয়ের সম্বন্ধ অবধারণ করা এবং সেই সম্বন্ধের মধ্য দিয়া লক্ষ্য বিষয়ের নানা-প্রকার গুণে উপনীত হওয়া ইহারই নাম ধ্যান। এখানে এইটি দেখা উচিত যে, কোন লক্ষ্য বিষয়েরই সত্তা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে; প্রত্যেক লক্ষ্য বিষয়েরই সত্তা সমস্ত জগতের সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ধ্যাতার নিকটে যদি সমস্ত জগতের সত্তা প্রকাশিত হয়, তবে সেই সম্বন্ধেই তিনি লক্ষ্য বিষয়ের সত্তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন—নচেৎ তিনি তাহা পারেন না; কেননা লক্ষ্য বিষয়ের সত্তা সমস্ত জগতের সত্তার সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত। কিন্তু সমস্ত জগতের সত্তা ধ্যাতার মনে কিরূপে প্রতিভাত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, ধ্যাতার নিকটে—যাহা তাঁহার ধ্যানে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকাশিত হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহাই জগৎ; ধ্যাতার নিকটে তাঁহার ধীশক্তিই সমস্ত জগতের প্রতিনিধি স্বরূপ। সমস্ত জগদ্ব্যাপী সত্তার ভাব যাহা ধ্যাতার ধীশক্তিতে নিহিত আছে, ধ্যাতা তাহার মধ্য দিয়াই লক্ষ্য বিষয়ের বাস্তবিক সত্তাতে উপনীত হ'ন। লক্ষ্য বস্তুটির পরিচ্ছিন্ন

সত্তার অভ্যন্তরে তিনি তাঁহার সেই চিন্তাবি-নিঃসৃত জগদ্ব্যাপী অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা উপলব্ধি করেন, এবং সেই চিদাশ্রিত সত্তাকেই তিনি লক্ষ্য বিষয়ের বস্তু-সত্তা —বা বাস্তবিক সত্তা—বা পারমার্থিক সত্তা—বলিয়া অবধারণ করেন। এই জন্য ধ্যান-সন্নিধানে এইরূপ একটি সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, বাস্তবিক সত্তা যাহা আমি লক্ষ্য বিষয়েতে অবলোকন করিতেছি, তাহা তো আমারই চিন্তা-বিনিঃসৃত—তবে আর তাহা বাস্তবিক কিরূপে ? জগদ্ব্যাপী অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধ কেবল আমার আপনারই মনের ভাব—পক্ষান্তরে তাহাই লক্ষ্য বস্তুর অন্তর্নিহিত বলিয়া প্রতিভাত হয়; তবে তাহাকে মানসিক সত্তা না বলিয়া বাস্তবিক সত্তা বলি কেন ? সমাধি আসিয়া ধ্যানকে এইরূপ একটা বিষম দ্বৈধ এবং সংশয়ের চক্র হইতে উদ্ধার করে।

তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপ-শূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩॥

ধ্যান যখন আপনাকে ভুলিয়া শুদ্ধ কেবল লক্ষ্য বিষয়েতেই তন্ময়ীভূত হয়,তখন তাহা সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, সমাধি পরমাত্মাকেই পারমার্থিক সত্য বলিয়া অবধারণ করে। এই দুই কথার মধ্যে ঐক্য কিরূপ দেখা যাউক,—

সমস্ত জগদ্ব্যাপী একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তার ভাব আমাদের ধীশক্তিতে প্রকাশিত আছে—তাই আমরা বলিতেছি যে, আমাদের ধীশক্তি জগতের নথ-দর্পণ স্বরূপ। কিন্তু ছবির পৃষ্ঠভূমি (Back ground) যেমন ছবি নহে—সেইরূপ জগদ্ব্যাপী সত্তার ভাব জগৎ নহে। জগদ্ব্যাপী সত্তার ভাব শুধু নহে কিন্তু জগৎ স্বয়ং যে জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত, সে জ্ঞান বাস্তবিকই জগতের সার-সর্ব্বস্ব। প্রত্যেক বস্তুর বাস্তবিক সত্তা সেই-জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত, এবং সেই-জ্ঞানই আমাদের অপূর্ণ ধী-শক্তির মূলাধার। সে জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাই ? এইরূপে পাই;—জ্ঞানে ইহা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে, বহির্ব্বস্তু-সকলের আপেক্ষিক এবং অপূর্ণ সত্তা আপনাতে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না,আমাদের অপূর্ণ ধী-শক্তিও আপনাতে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। অপূর্ণ সত্তা যেমন পূর্ণ সত্তার আশ্রয়-সাপেক্ষ,অপূর্ণ জ্ঞানও সেইরূপ পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয়-সাপেক্ষ। এই জন্য, কোন একটি বস্তুতে (যেমন আত্মাতে) চিত্ত সমাহিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি সাধকের জ্ঞান-নেত্রে জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং সাধকের জ্ঞান সেই অসীম জ্ঞানাভ্যন্তরে কবলিত হইয়া গিয়া ব্রহ্ম-সংস্পর্শের অপার আনন্দে পরিপ্লুত হয়। ইহাতেই "স্বরূপ-শূন্যমিব" যেন আমি আপনি নাই— "অর্থমাত্র নির্ভাসং" ধ্যেয় বস্তুই সর্ব্বস্ব, এই-রূপ ভাব সমাধি কালে সাধকের মনোমধ্যে উদিত হয়। এখানে 'ইব' অর্থাৎ "যেন"—এই শব্দটির প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে আমরা বলি যে, "আমি আপনাতে আপনি নাই;" ইহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ঐ কথাটির সঙ্গে "যেন" এই শব্দটি যুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক—যেন আমি আপনাতে আপনি নাই। কেননা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে সত্য সত্যই কিছু আর আমি আপনা হইতে একেবারেই অবসৃত হই না—বিলোপ প্রাপ্ত হই না। এ বিষয়ে স্থানান্তরে যাহা বলিয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"সমাধি কালীন বৃত্তি-বিলোপ সত্যসত্যই কিছু আর বৃত্তিবিলোপ নহে,—তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। বৃত্তি-বিলোপের অর্থ আর কিছু

নয়—যে-বৃত্তি আমাদের অযত্ন-সুলভ তাহার প্রতি আমাদের উপেক্ষা (অর্থাৎ আপেক্ষিক অমনোযোগ) জন্মে, ইহারই নাম বৃত্তি-বিলোপ। পাঠশালার শিশু পুস্তক পড়িবার সময় প্রতি-অক্ষর যত্নের সহিত বানান করিয়া পড়ে,—বানান-কার্য্যে তাহার এখনো রীতিমত ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই; কিন্তু আমরা যখন কোন বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করি তখন আমরা যে, বানান করিয়া পড়িতেছি, ইহা আমাদের মনেই থাকে না; বানান কার্য্য আমাদের নিতান্ত অযত্ন-সুলভ বলিয়া তাহার প্রতি আমাদের এতাদৃশ উপেক্ষা। বাস্তবিকই যে আমরা আদবেই অক্ষর বানান না করিয়া পাঠ করি, তাহা নহে; আমাদের বানান-রূপী বৃত্তি এরূপ সড়গড় হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরি না,—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা স্বকার্য্যে ক্ষান্ত থাকে না। সাধনাবস্থায় সাধকের প্রণিধান বৃত্তি প্রযত্ন-সাপেক্ষ, তাই তাহার প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি পড়ে; কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় তাহা অযত্ন-সুলভ তাই তাহার প্রতি তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ থাকে না—অর্থাৎ এত অল্প মনোযোগ থাকে যে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; ইহারই নাম বৃত্তি-বিলোপ; এতদ্ভিন্ন, বৃত্তি-বিলোপ সমাধিও যে বৃত্তি-বিস্মরণ তাহা নহে। আমাদের মনোবৃত্তি যখন লক্ষ্য বস্তুতে সবিশেষ সমাহিত হয়, তখন সেই লক্ষ্য বস্তুটিই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়—বৃত্তিটিকে আমরা ভুলিয়া যাই; কিন্তু তাহা বলিয়া বৃত্তিটিকে এত ভুলি না যে, তাহাকে চালনা করিতে ক্ষান্ত থাকি; তবে কি না—তখনকার সে বৃত্তি-চালনা এরূপ অযত্ন-সুলভ যে, তাহা আমরা আদবেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরি না; ইহারই নাম সম্যক্ বৃত্তি-বিস্মরণ—ইহারই নাম বৃত্তিবিলোপ। এরূপ বৃত্তি-বিলোপের অবস্থা অচেতন অবস্থা হওয়া দূরে থাকুক—উহা সচেতন অবস্থার পরাকাষ্ঠা। শিশুরা যেমন অনেক বানান করিয়া অল্প পাঠ করে, আমরা তেমনি অনেক বৃত্তি খরচ করিয়া অল্প জ্ঞান লাভ করি,—সমাধিস্থ ব্যক্তি অতীব অল্প বৃত্তি-ব্যয়ে (অর্থাৎ অতীব অল্প প্রযত্নে) অতীব মহৎ জ্ঞান লাভ করেন; সুতরাং সমাধির অবস্থা অতীব সজ্ঞান অবস্থা। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে সমাধিকে তাই জ্ঞান-সংজ্ঞিক বলিয়াছেন, অজ্ঞান সংজ্ঞিক বলেন নাই; যথা,—

"বৃত্তি-বিস্মরণং সম্যক্ সমাধি র্জ্ঞান-সংজ্ঞিকঃ।"

বৃত্তি বিস্মরণ শব্দের অর্থ যে বৃত্তি-বিলোপ নহে—অজ্ঞানাবস্থা নহে—ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছি—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য উপরি-উক্ত ঐ কথাটি বলিয়া তাহার কিয়ৎ পরেই বলিয়াছেন—

"ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্য বৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্ব মভ্যসেৎ॥
যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দ্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবন ত্রয়ং॥
যেষাং বৃত্তিঃ সমাবৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ।
তে বৈ সদ্‌ব্রহ্মতাং প্রাপ্তা নেতরে ব্রহ্মবাদিনঃ॥
কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিনঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥"

বৃত্তিমান্ সাধকের প্রশংসাবাদ এবং বৃত্তি-হীন ব্রহ্মবাদীর নিন্দাবাদ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না; ইহাতে জলের ন্যায় স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, সমাধিস্থ ব্যক্তির বৃত্তি-বিলোপ শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ।

চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ অবশ্য সন্ন্যাসির পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়—কিন্তু বৃত্তি-নিরোধকে বৃত্তি-বিলোপ বলা কোন অংশেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ কাহাকে বলে এবং তাহা কেন আবশ্যক

তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত দেখিলে সহজেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। মনে কর, আত্মা কি—তুমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছ; আত্মা যে কি, তাহা আত্মাই জানে এবং আত্মাই বলিতে পারে,—কিন্তু তোমার কল্পনা-বৃত্তিটি চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহে; আত্মা কোন কথা বলিতে না বলিতেই, কল্পনা শত শত মনগড়া বিষয় আনিয়া তোমার সম্মুখে ধরিতেছে ও বলিতেছে "এই দেখ আত্মা"। অতএব আত্মার নিজের মুখ হইতে তাহার নিজের বৃত্তান্ত শুনিতে হইলে ঐ দুর্দ্দান্ত বালকটিকে ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। কল্পনা বৃত্তিটিকে যেন আমি নিরোধ করিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমি আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান-বৃত্তিকে বিদায় দিয়া—সত্যের অনুসন্ধানে একেবারেই ক্লান্ত হইয়া—দিব্য আরামে নিদ্রা যাই, তাহা হইলে কি আমি আত্মার নিকট হইতে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর পাই? কখনই না। কল্পনাকে নিরোধ করিলে হয় এই—যে-পথ দিয়া সত্য আগমন করিবে সেই পথ পরিষ্কার করা; কিন্তু শুধু পথটি পরিষ্কার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—কখন্ সত্য আগমন করে তাহার প্রতীক্ষায় সেই পথে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমস্ত বৃত্তিকে উন্মুখ করিয়া রাখিতে হইবে। অতএব চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ বলিতে অসম্বদ্ধ কল্পনা-বৃত্তিরই নিরোধ বুঝায়—বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তির নহে। কঠোপনিষদে স্পষ্টই রহিয়াছে যে

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

[illegible] সর্ব্ব ভূতে নিগূঢ় এই যে আত্মা ইনি সহজে প্রকাশ পা'ন না; কেবল সূক্ষ্ম-দর্শী ব্যক্তিরা একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি-দ্বারা ইঁহার দর্শন লাভ করেন।" সমস্ত অসম্বদ্ধ কল্পনা নিরোধ করিয়া আমরা যখন আমাদের কল্পনা-শূন্য প্রশান্ত বুদ্ধিকে আত্মার আবির্ভাব পথে সংযত করি, তখনই আমরা আত্মার নিজের মুখ হইতে তাঁহার নিজের বৃত্তান্ত শুনিয়া—প্রকৃত সত্য অবগত হইয়া—কৃতকৃতার্থ হই। অতএব বৃত্তিনিরোধের অর্থ শুদ্ধ কেবল কল্পনা-নিরোধ—বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি-নিরোধ নহে। যোগ-শাস্ত্রে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাস্ত্র জ্ঞান, মিথ্যা-জ্ঞান, অর্থ-শূন্য শাব্দিক জ্ঞান, নিদ্রা এবং স্মৃতি এই সাতটি বৃত্তিই বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আমরা যাহাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি বলিতেছি তাহা এ সাতটির কোনটিই নহে, সুতরাং তাহার নিরোধ যোগ-শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ নহে; অনুমান, শাস্ত্র-জ্ঞান, মিথ্যা-জ্ঞান, শাব্দিক জ্ঞান এবং স্মৃতি, সমস্তই প্রত্যক্ষ মূলক—সুতরাং তাহাদের কোনটিই বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি নহে; নিদ্রার কথা ছাড়িয়া দেও—কেহই বলিবে না যে, নিদ্রা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি; তবে যাঁহারা সমাধিকে পরম সুষুপ্তি বলিয়া জানেন—তাঁহারা একদিন এ কথা বলিলেও বলিতে পারেন যে, নিদ্রাই বিশুদ্ধ জ্ঞান। কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি না, কল্পনা করিতেছি না, স্মরণ করিতেছি না, অনুমান করিতেছি না—জ্ঞানের এইরূপ অপক্ষপাতী অবস্থাতেই তাহাতে যথার্থ আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশিত হয়; এইরূপ অবস্থাপন্ন স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক জ্ঞানকেই আমরা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি বলিতেছি। এইরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি ব্যতীত আর কোন জ্ঞানেই আত্মার ভাব উপলব্ধিগম্য নহে। আর একদিক্ দিয়া পাওয়া যায় যে, ধারণা—প্রত্যক্ষ বা অনুভব দ্বারা লক্ষ্য বিষয়েতে আবদ্ধ হয়; ধ্যান—অনুমান বৃত্তি দ্বারা সেই লক্ষ্য বিষয়ের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে অব্যক্ত শক্তি উপ-

লব্ধি করে; সমাধি—বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সেই অব্যক্ত শক্তি ভেদ করিয়া পরমাত্মার জ্ঞানময় সত্তা উপলব্ধি করে। সমাধিতে এইরূপ যখন বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি—অন্তর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তি—স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠে, তখন ধারণার প্রত্যক্ষ এবং ধ্যানের অনুমান এ দুই বহির্মুখী বৃত্তির নিরোধে অন্তর্মুখী বৃত্তি নির্ব্বিঘ্নে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। যে সাধক সমাধিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি সেই অন্তর্মুখী বৃত্তি-দ্বারা আপনার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মার অভ্যন্তরে আপনাকে অবলোকন করেন—তাঁহার জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির সীমা পরিসীমা নাই, তিনি দেখেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

না সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায়, না চন্দ্র তারা; না এই বিদ্যুৎ সকল প্রকাশ পায়, কোথায় এই অগ্নি; তিনি প্রকাশ পাইতেছেন, আর তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত প্রকাশ পাইতেছে—সমস্তই তাঁহার প্রকাশেরই অনুপ্রকাশ। ইহাই সমাধি। কে বলে যে, সমাধি সম্যক্ জ্ঞানের অবস্থা নহে কিন্তু অচেতন অবস্থা! সর্ব্বশেষে এই একটি কথা বক্তব্য যে, জাগরণ হইতে যেমন আমরা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া সুনিদ্রায় বিলীন হই, নিদ্রা হইতে তেমনি স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে জাগ্রত হই। জাগরণের শুভ ফল নিদ্রাতে সংক্রামিত হয়, এবং নিদ্রার শুভ ফল জাগরণে সংক্রামিত হয়। তেমনি সমাধির শুভ ফল ব্যুত্থান অবস্থায় সংক্রামিত হয়, ব্যুত্থানের শুভ ফল সমাধি-অবস্থায় সংক্রামিত হয়। সমাধির শুভ ফল কি? না ব্রহ্মরসামৃত পান; ব্যুত্থানের শুভ ফল কি? না জগতের মঙ্গলসাধন; দুইই পরস্পরের উপকারী। জগতের হিতসাধন করিলে মনোমধ্যে যেরূপ আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়, তাহা সমাধি-সাধনের পক্ষে পরম উপকারী; আবার সমাধি সাধন করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ আধ্যাত্মিক রস এবং আধ্যাত্মিক বলের সঞ্চার হয়, তাহা জগতের হিত সাধনের পক্ষে পরম উপকারী। অতএব এই দুই বিষয়ে যুগপৎ সিদ্ধি লাভ করাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ।

দ্বাদশ কল্প
প্রথম ভাগ
মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮
৫৩৪ সংখ্যা
১৮০৯ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

অষ্টপঞ্চাশ সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতলগৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রাহ্মধর্মের বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন অংশে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম তাহা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কোন্ অংশে বিশেষ-ধর্ম্ম এ বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার ভুল বোঝেন; তাহা শুধু নয়—অনেকে মনে করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম—তাহা কোন অংশেই বিশেষ ধর্ম্ম নহে, যেন—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে বিশেষ ধর্ম্ম বলিলেই তাহার সার্ব্ব-ভৌমিকতা উল্টাইয়া দেওয়া হয়। শুধু কেবল বৃক্ষ—সাধারণ বৃক্ষ—কিন্তু কোন প্রকার বিশেষ বৃক্ষ নহে, তাল বৃক্ষ নহে, ওক্ বৃক্ষ নহে, আম্রবৃক্ষ নহে, আপেল বৃক্ষ নহে,—এরূপ বৃক্ষ কে কোথায় দেখি-য়াছে? পুনশ্চ, শুদ্ধ কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্র—সাধারণ বিজ্ঞান শাস্ত্র—কিন্তু বিশেষ কোন প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র নহে—জ্যোতিষ শাস্ত্র নহে, চিকিৎসা শাস্ত্র নহে, যন্ত্র বিজ্ঞান নহে, রসায়ণ বিদ্যা নহে, অধ্যাত্ম বিদ্যা নহে,—এরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র কে কোথায় দেখিয়াছে? অথচ তুমি এরূপ একটি ধর্ম্ম চাহিতেছ যাহা শুদ্ধ কেবল সাধারণ ধর্ম্ম—যাহা কোন অং-

শেই বিশেষ ধর্ম্ম নহে; এরূপ ধর্ম্মকে কোথায় দেখিয়াছে? তাহাতে তোমার প্রয়োজনই বা কি তাহাও তো বুঝি না। আম্র-বৃক্ষ হইতে আম্র ফল পাওয়া যাইতে পারে—এইজন্য তাহা প্রয়োজনীয়; কিন্তু সাধারণ বৃক্ষ হইতে কি ফল পাইতে পার? সাধারণ বৃক্ষের যতকিছু গুণ সমস্তই তো আম্রবৃক্ষে আছে—সাধারণ বৃক্ষের (অর্থাৎ সাধারণতঃ সকল বৃক্ষের) একটি গুণ এই যে, তাহা মূল-দ্বারা রসাকর্ষণ পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হয়; আম্র-বৃক্ষে সে গুণের অভাব নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া আম্র-বৃক্ষের এরূপ কতক গুলি অনন্য-সাধারণ গুণ আছে যাহা দেশ কালের সবিশেষ উপযোগী। প্রখর গ্রীষ্মের সময় আম্রবৃক্ষ যেমন আমাদের দেশের উপকারে লাগে, এমন আর কোন দেশেরই নহে। আম্র-বৃক্ষের এই যে বিশেষত্ব, ইহা কি তাহার বৃক্ষত্বের পক্ষে কোন অংশে হানি জনক? তবে কেন এরূপ মনে করা হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব তাহার সার্ব্বভৌমিকতার বিরোধী। এরূপ মনে করা ভ্রান্তির পরাকাষ্ঠা। এত কথায় প্রয়োজন করে না—ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন অংশে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম এবং কোন অংশে বিশেষ ধর্ম্ম তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা যা'ক্—তাহা হইলেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যাইবে।

ঈশ্বরেতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন—এই দুইটি কথা সকল ধর্ম্মেরই সার কথা, ব্রাহ্মধর্ম্মেরও তাহাই। এই হিসাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। কোন মনুষ্যই যদি বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে জন্ম গ্রহণ না করিত, প্রত্যেক মনুষ্যই যদি সকল দেশে ও সকল কালে জন্ম গ্রহণ করিত; তাহা হইলে ঈশ্বর-প্রীতি এবং ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কার্য্যের কোথাও কোন বিশেষত্ব থাকিত না—সকলেরই ঈশ্বর-প্রীতি এবং ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কার্য্য একই রূপ হইত। আরো সংক্ষেপে—পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্য যদি একটি মাত্র মনুষ্য হইত, তবে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ভিন্ন কোন প্রকার বিশেষ ধর্ম্মেরই আবশ্যকতা থাকিত না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি সকল দেশে ও সকল কালে জন্ম গ্রহণ করিত, তবেই যা হৌক—কিন্তু বাস্তবিক তাহা তো আর নহে; ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের এই দেশে এবং আমাদের এই কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ইহাতে আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম একটি বিশেষ ধর্ম্ম; আর, যে অংশে তাহা বিশেষ ধর্ম্ম সেই অংশে তাহা বিশেষতঃ আমাদের এই দেশের এবং বিশেষতঃ আমাদের এই কালের উপযোগী। কিন্তু তাহা বলিয়া এটি ভুলিলে চলিবে না যে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মই আমাদের দেশোচিত এবং কালোচিত বিশেষ আকার ধারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম পরিগ্রহ করিয়াছে; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অংশে সার্ব্বভৌমিক সে অংশে তাহা সকল দেশের এবং সকল কালের উপযোগী; ব্রাহ্মধর্ম্মের এই যে একটি কথা যে, ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা, ইহা সকল দেশেরই এবং সকল কালেরই উপযোগী। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব যে কি তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষতঃ আমাদের এই দেশের এবং বিশেষতঃ আমাদের এই কালের উপযোগী—ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মধর্ম্মের যাঁহারা মূল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহারা যদি বিশিষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্তে পরিগঠিত এবং ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত না হইতেন তবে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে কালোপযোগী করিতে গিয়া দেশকে ভুলিয়া যাইতেন

ও দেশোপযোগী করিতে গিয়া কাল'কে ভুলিয়া যাইতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা দেশ এবং কাল দুয়েরই উপযোগী করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—ইহাতে ঈশ্বরেরই হস্ত দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। ধরিতে গেলে অভ্রভেদী পর্ব্বতেও যেমন ঈশ্বরের হস্ত দেদীপ্যমান, একটি ক্ষুদ্র তৃণেতেও সেইরূপ ঈশ্বরের হস্ত দেদীপ্যমান। একজন অসাধারণ মহৎ ব্যক্তি ও যেমন ঈশ্বর-প্রেরিত—একজন ক্ষুদ্র কৃষকও সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেরিত। একজন দীনহীন কৃষক হয় তো ভিতরে ভিতরে অসামান্য মহৎব্যক্তি—কিন্তু আমরা তাহাকে চিনিতে পারি না। অনেকের যিনি মঙ্গল সাধন করিয়াছেন—অনেকের নিকটে যিনি মহৎ বলিয়া পরিচিত—তাঁহার কার্য্যেই আমরা ঈশ্বরের হস্ত বিশিষ্টরূপে উপলব্ধি করি। বাস্তবিক ধরিতে গেলে সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত, কিন্তু আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ মহাজনেরাই ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া গণ্য হয়েন। আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে অহরহই দেখিতেছি যে, যাঁহারা দেশের মর্য্যাদা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারা কালের মর্য্যাদার প্রতি নিতান্তই অন্ধ; আবার, যাঁহারা কালের মর্য্যাদা বিশিষ্ট-রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন তাঁহারা দেশের মর্য্যাদার প্রতি নিতান্তই অন্ধ; এইরূপ অন্ধতার প্রতিযোগেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-প্রতিষ্ঠাতাদিগের বিচক্ষণতা আমাদের চক্ষে দেদীপ্যমান পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহারা আমাদের দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে সার সার বচন-গুলি সঙ্গ্রহ করিয়া যেরূপ একত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—কেহই বলিতে পারিবেন না যে তাহা আমাদের এখনকার এই জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর অনুপযোগী; এবং আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাঁহারা যেরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন সংক্রামিত করিয়াছেন—কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তাহা আমাদের দেশের অনুপযোগী। ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ দেশ-কালের সবিশেষ উপযোগী হওয়াতে তাহার একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য দাঁড়াইয়াছে, তাহা এমনি—যে, কোন প্রকৃত রসজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে তাহা ঢাকা থাকিতে পারে না। তবে কি না—যাঁহারা চিরকাল যাত্রার গীত শুনিয়া আসিয়াছেন, ধ্রুপদ তাঁহাদের ভাল না লাগিতে পারে;—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য সাধারণ লোকের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে একটু সময় লাগিবে,—কেননা যাহারা কাচকে মণি বলে এবং মণিকে কাচ বলে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু যাঁহারা মণিকে মণি বলেন এবং কাচকে কাচ বলেন—এরূপ জহরী লোকের চক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের অমায়িক সৌন্দর্য্য কখনই ঢাকা থাকিতে পারে না। তাহার সাক্ষী—ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বরের এই যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং"—

ইহা এমনি দেশ-কালের উপযোগী যে, কি হিন্দুস্থানী খোট্টা—কি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—কি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সাধুজন—সকলেরই মুখ হইতে ইহা মুক্ত কণ্ঠে, শোভন স্বরে, প্রসারিত হৃদয়ে, উচ্চারিত হইতে পারে; কোন আর্য্যসন্তানের মুখে ইহা বাধে না। ইহা আমাদের স্বদেশীয় সামগ্রী অথচ সমস্ত পৃথিবীর পূজার্হ; ইহা ভারতবাসীদিগের একটি স্বজাতীয় বন্ধন-সূত্র অথচ ইহা সার্ব্বভৌমিক। এই যে প্রার্থনা

"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"

আর আর ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত প্রার্থনার সহিত এ প্রার্থনার তুলনা করিয়া দেখ—দেখিবে

যে, এরূপ উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক প্রার্থনা অন্য কুত্রাপি নাই। যাঁহার আত্মা কখনো ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে এবং এই প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে অপার শান্তি-সুধাতে পরিপ্লুত হইয়াছে—তিনিই জানেন—এ প্রার্থনা কি সজীব প্রার্থনা—কি আধ্যাত্মিক প্রার্থনা—কি অন্তরতম প্রার্থনা। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মোক্ত যোগের এই যে পদ্ধতি

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে,
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ"

ইহাই অধ্যাত্ম-যোগের নিগূঢ় তত্ত্ব। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, মন স্থির করিবার জন্য একটা কোন অবলম্বন আবশ্যক; এবং অনেকে ঐ কথার ছুতা করিয়া প্রতিমা পূজার বিধেয়তা সমর্থন করেন। কিন্তু এখনকার এই জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীতে কোন প্রতিমাই জ্ঞানবান্ লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না—এই জন্য প্রতিমা-পূজা এখনকার কালের অনুপযোগী। মন স্থির করিবার জন্য "প্রণবো ধনুঃ" ইত্যাদি বস্তু স্বরূপ—ওঁকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—এ বিষয়ে আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্য। সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া নিরন্তর কার্য্য করিতেছে—সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের মহতী শক্তি বিচেষ্টিত হইতেছে; ওঙ্কার শব্দের উচ্চারণ দ্বারা ঈশ্বরের সেই পরা শক্তি আমাদের ধ্যান গোচরে আবির্ভূত হয়। তাই, ওঙ্কার অবলম্বন করিয়া নিবাতে নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির চিত্তে জীবাত্মা জগতের এ-পার হইতে ও-পারে—পরম সত্য পরম জ্ঞান এবং পরম আনন্দের অমৃত-ধামে—পরমাত্মার আলিঙ্গন-পাশে নিমগ্ন হয়। এইরূপ অধ্যাত্ম যোগ যেমন দেশোপযোগী তেমনি কালোপযোগী। এখনকার কালের সংশয়বাদী বৈজ্ঞানিকেরাও স্থূল জগতের অভ্যন্তরে মূল শক্তির বিচেষ্টা অবলোকন করেন; এই জন্য প্রতিমা বা স্থূল জগৎ অপেক্ষা ওঙ্কারের অবলম্বন এখনকার কালোপযোগী; কেননা ওঙ্কার ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্বের—মহতী শক্তির—বাচক শব্দ।

মনের কিরূপ অবস্থা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপযোগী তাহা মহাত্মা ঈশা অতীব অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা,—"Blessed are the pure in heart; for they shall see God" শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য, কেননা তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবেন; ব্রাহ্মধর্ম্মে এই কথাটি এমনি সুন্দর-রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, তাহা শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিবামাত্রই মর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়; যথা,

"শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি, নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"

পূর্ব্বজন্ম এবং পরলোক সম্বন্ধীয় কতক গুলি কথা আছে—যে বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম "হাঁ" কি "না" কোন-কিছুই বলেন না; ইহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব। ঈশ্বরের বিধাতৃত্বের (Moral Government) প্রতি লক্ষ করিয়াই আমাদের দেশের সমুদায় শাস্ত্র একবাক্যে পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম দেখিতে চায় যে, যে যত পুণ্য করিবে সে তত সুখের ভাগী হইবে, ও যে যত পাপাচরণ করিবে সে তত দুঃখের ভাগী হইবে; অন্যকে যে পীড়া দিবে সে আপনি পীড়িত হইবে—অন্যকে যে প্রবঞ্চনা করিবে সে আপনি প্রবঞ্চিত হইবে—ইত্যাদি। ইহার বিপরীত ঘটনা ধর্ম্মের চক্ষুঃশূল।

এই জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা এইরূপ একটি মত প্রচার করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব জন্মে যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়াছে, এ জন্মে সে দুঃখীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিবে; ইত্যাদি। ইহার স্বপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে—বিপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। স্বপক্ষের প্রধান যুক্তি এই যে, ঐশী শক্তি শুদ্ধ কেবল অন্ধ যান্ত্রিক (Mechanical) শক্তি নহে কিন্তু অভিসন্ধি-পূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি। জগতের অভ্যন্তরে নিগূঢ় অভিসন্ধি যদি কিছু থাকে তবে তাহা এই যে, যে যত সুখ-ভোগের উপযুক্ত পাত্র, সে তত সুখ-ভোগ করিবে; অতএব যে ব্যক্তি সুখ-ভোগ করে, সে ব্যক্তি সুখ-ভোগের অধিকারী বলিয়াই—পূর্ব্ব জন্মে পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছিল বলিয়াই—সুখ-ভোগ করে। বিপক্ষের যুক্তি এই যে, পূর্ব্ব জন্ম যখন ফল-ভোক্তার স্মরণাতীত তখন পূর্ব্ব জন্মের ফল এ জন্মে ভোগ করাও যা, আর, এক জনের পুণ্যের ফল আর এক জন ভোগ করাও তা, দুইই সমান। কোন শিক্ষক যদি কোন বালককে শাস্তি দেয়—কিন্তু কি দোষের জন্য শাস্তি দেওয়া হইতেছে বালক যদি তাহা না জানে এবং তাহাকে যদি তাহা বলিয়া দেওয়া না হয়, তবে সেরূপ শাস্তির কোন অর্থ নাই—কেননা তাহাতে বালকের দোষ সংশোধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা সর্ব্বজ্ঞ নহি—জগতের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি; যিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ তিনি তো সর্ব্বজ্ঞ—ইহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। জাহাজ কিরূপে চালিত হইতেছে এবং কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইতেছে—কোনও যাত্রীই তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানে না; কিন্তু এটা সকলেই জানে যে, কর্ণধার জাহাজের সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত আছে এবং ঠিক্ পথ দিয়া জাহাজ চালাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত যে,

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ

তিনি প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত রূপে কর্ম্মফল বিধান করিতেছেন। কেহ যদি বলেন যে, পৃথিবীতে তবে তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয় কেন? ধার্ম্মিক ব্যক্তি দুঃখ পায় কেন—অধার্ম্মিক ব্যক্তিই বা সুখে কালাতিপাত করে কেন? ইহার উত্তর এই যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির দুঃখ তাহার সুখের সোপান ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির সুখ তাহার দুঃখের সোপান। কেননা, ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মার অভ্যন্তরে সুখের গোড়া পত্তন হইতেছে ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মার অভ্যন্তরে দুঃখের গোড়া পত্তন হইতেছে—এ বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ হইতে পারে না। যাহা সুখের সোপান তাহাই প্রকৃত সুখ ও যাহা দুঃখের সোপান তাহাই প্রকৃত দুঃখ—পদের সুখদুঃখ প্রকৃত সুখদুঃখ নহে। আসল ধরিতে গেলে স্বাধীনতাই সুখ ও পরাধীনতাই দুঃখ। স্বর্ণ-পিঞ্জর অপেক্ষা অরণ্য নিকেতন পক্ষীর সুখের আলয়। যে ব্যক্তি বিষয়ের ক্রীতদাস সে ব্যক্তি সুখী হইলেও দুঃখী ও যে ব্যক্তি আত্মতৃপ্ত সে ব্যক্তি দুঃখী হইলেও পরম সুখী। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার দ্বার দিয়াই পুণ্য পাপের সহিত সুখদুঃখের যোগ সংঘটিত হয়। আত্মার স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার সম্বন্ধে দার্শনিক তর্ক বিতর্ক অনেক আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে কাজের কথা যেটি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে সবিস্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—সেটি এই যে, স্বাধীন ব্যক্তিই প্রেমের অধিকারী। প্রেম বলের বাধ্য নহে; স্বাধীন-ভাবে যে যাহাকে ভালবাসে, সেই তাহার ভালবাসাই ভাল-

যায়। প্রেম ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী নহে—শক্তাশক্তির সামগ্রী নহে—তাহা মুক্ত হৃদয়ের স্বাধীন উচ্ছ্বাস। যে ব্যক্তির হৃদয় নিখিল জগতের হৃদয়ের সহিত একতানে স্পন্দিত হয়—সেই ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। নিখিল জগতের হৃদয়ের সহিত—পরব্রহ্মের সহিত—হৃদয়ের যোগ দিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যই একা কেবল অধিকারী; ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব আত্মার স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই;—(১) স্বাধীন জীবই প্রেমের অধিকারী; (২) মনুষ্য ঈশ্বর-প্রেমের অধিকারী; (৩) অতএব মনুষ্য স্বাধীন। জীবাত্মাকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাহাকে আপনার প্রেমের অধিকারী করাই পরমাত্মার মঙ্গল অভিপ্রায়; তিনি চা'ন মনুষ্য পুণ্যাচরণ করিয়া স্বাধীন হউক—প্রেমী হউক; তিনি চা'ন যে, মনুষ্য স্বাধীনভাবে জগতের ভিতরকার মর্ম্ম বুঝুক্—বুঝিয়া তাহার রস গ্রহণ করুক্—রস গ্রহণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হউক্;—এই জন্যই মনুষ্যের স্বাধীনতার এত মূল্য। তাই, স্বভাবতই এই বিশ্বাসটি মনুষ্যের মনে প্রবল যে, মৃত্যুর পরে ঈশ্বর তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করিবেন না—সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিফল করিবেন না। জীবাত্মা যখন পরমাত্মার প্রেমের অধিকারী তখন অবশ্যই পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা তাহার সে প্রেম নিত্য-কালই বর্দ্ধিত হইবে; পুণ্যকৃৎ স্বাধীন ভক্ত কখনই ঈশ্বর-প্রেমে বঞ্চিত হইবেন না। যতক্ষণ না পুত্রের পেট ভরে ততক্ষণ মাতা তাহাকে অন্নদানে বিরত হ'ন না,—যতক্ষণ না জীবাত্মার অনন্ত প্রেম পিপাসা চরিতার্থ হয় ততক্ষণ পরমাত্মা তাহাকে প্রেমদানে বিরত হইবেন না; ইহাই আত্মার অমরত্বের দৃঢ় ভিত্তিমূল। এই আধ্যাত্মিক প্রমাণের উপর ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণতঃ বলেন যে, "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" তিনি নিত্যকাল প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত কর্ম্ম ফল প্রদান করেন। কিন্তু মনুষ্য যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ নহে, এজন্য পরলোকের বিশেষ বৃত্তান্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন স্থানেই নাই। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় শিশু দন্তহীন হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়—যখন তাহার দন্ত আবশ্যক তখন তাহার দন্ত বাহির হয়; তেমনি, পরলোকের বিশেষ বৃত্তান্ত-সকলের জ্ঞান এখন আমাদের নাই—যখন তাহা আবশ্যক হইবে তখন তাহা পরিস্ফুট হইবে; এ বিষয়টিতে অবশ্য আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। শিশু মাতার উপর নির্ভর করিয়া কেন না নিশ্চিন্ত থাকিবে—পত্নী পতির উপর নির্ভর করিয়া কেনন৷ নিশ্চিন্ত থাকিবে—নৌকা-যাত্রী কর্ণধারের উপর নির্ভর করিয়া কেনন৷ নিশ্চিন্ত থাকিবে? মাতার স্নেহের প্রতি—পতির প্রেমের প্রতি—কর্ণধারের ক্ষমতার প্রতি—কাহারো সংশয় জন্মিলে তাহার মনের যেরূপ সন্দিগ্ধ অবস্থা কি ভয়ানক অবস্থা? ঈশ্বরের প্রতি মনের সেরূপ অবস্থা আরো কত না ভয়ানক? সেরূপ অবস্থায় মনুষ্য যে উন্মাদ হইয়া যায় না—ইহাই যথেষ্ট। এরূপ সংশয়ের অবস্থা মনুষ্য-মনের উপরে-উপরেই তরঙ্গিত হয়—আত্মার ভিতরকার মর্ম্মস্থলটিতে দখল পায় না—তাই যা রক্ষা। নহিলে মনুষ্য সত্যসত্যই উন্মাদ হইয়া যাইত; সে অবস্থায় মনুষ্য কখন্ যে কি করে—আত্মহত্যাই বা করিয়া বসে—কোন কিছুরই ঠিকানা থাকে না। অরণ্যের পক্ষীকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে দুই দিনেই সে পাগল হইয়া যায়; মনুষ্যের মহতী আশাকে পৃথিবীতে পিঞ্জর-বদ্ধ করিয়া রাখিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই বিলুপ্ত হইয়া

যায়। স্বাধীনতাই আত্মার পক্ষ, প্রেমই আত্মার উপজীবিকা, পরমাত্মাই আত্মার প্রেমদাতা এবং শান্তি-নিকেতন; আত্মার যদি পক্ষ ছিন্ন হইয়া যায়—উপজীবিকা নষ্ট হইয়া যায়—নিকেতন ভগ্ন হইয়া যায়—সঙ্গের সঙ্গী চলিয়া যায়, তবে আর আত্মার থাকে কি? সেরূপ আত্মা আত্মাই নহে। সে জন্য আত্মা সৃষ্টও হয় নাই—আর সেরূপ গুরুতর বিপদ্ আত্মাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। এইরূপ আধ্যাত্মিক প্রমাণের উপরেই আত্মার স্বাধীনতা এবং অমরত্ব অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাতেই পরম পরিতুষ্ট। ইহার উপরে অধিকন্তু আর যিনি যাহা বলুন্ না কেন—কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সে সকল অজ্ঞাত অপরিচিত মিথ্যা বিষয়ের কল্পনা এবং জল্পনা হইতে একেবারেই পৃথক্ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—পারলৌকিক বিশেষ বৃত্তান্তের অনধিকার চর্চায় তাঁহার প্রয়োজনই বা কি? এইখানেই যিনি ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় প্রেম-নিকেতনে বাস করিতেছেন—অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন? তিনি ধ্রুবরূপে জানিতেছেন যে, মৃত্যুর সাধ্য নাই যে, তাঁহার সে শান্তি-নিকতনের একটি বালুকণাও অপহরণ করে। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ ভরপুর। পরলোকের বিশেষ বৃত্তান্ত না জানাতে তাঁহার মনোমধ্যে একটুও দ্বিধা নাই—একটুও দুঃখ নাই। ঈশ্বর—যিনি তাঁহার চিরজীবনের সখা ও সমস্ত জগতের নিয়ন্তা—তিনি তো তাহা জানিতেছেন, তাহা হইলেই হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ বৃথা কল্পনা এবং জল্পনা হইতে নির্লিপ্ত রহিয়া তাহা বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর সবিশেষ উপযোগী। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব যে কি তাহা বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে; প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের দেশের এরূপ উপযোগী যে, তাহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক-সূত্রে বন্ধন করিতে পারে; এমনি সহজ-ভাবে—যে, কেহ তাহা জানিতেও পারে না। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনকার এই জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর এরূপ উপযোগী যে, যতই জ্ঞানালোক বর্দ্ধিত হউক্ না কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাকে আগ্রহ সহকারে আলিঙ্গন করেন; কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম পেচক-বৃত্তি অবলম্বন করেন না। এইরূপ দেশ-কালের সবিশেষ উপযোগিতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন সত্য আলিঙ্গন করিতে ভীত নহেন—ইহার অর্থ কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে, নূতন-মাত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত। ধর্ম্মের জন্য যে-সকল সত্য সাধারণতঃ অত্যাবশ্যক, এবং বিশেষতঃ আমাদের এই দেশে এবং আমাদের এই কালে অত্যাবশ্যক, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্ম-বিষয়ক আরো অনেকানেক সত্য আছে—এবং অনেকানেক ধর্ম্ম গ্রন্থে তাহা পত্রে পত্রে পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়ানো রহিয়াছে। সত্য অসংখ্য—এ কথা সকলেরই শিরোধার্য্য। কিন্তু তাহা বলিয়া যে যখন যাহা বলিবে তাহাই যে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। সত্য অসংখ্য হইলেও সত্যের সহিত সত্যের এমনি সদ্ভাব যে, যাহা এক সত্যের বিরোধী তাহা সকল সত্যেরই বিরোধী: আর, যাহা এক সত্যের অনুমোদিত তাহা সকল সত্যেরই অনুমোদিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে যে-সকল সত্য আছে তাহাকে যদি ক বলা যায় এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে যে সকল সত্য আছে তাহাকে যদি খ বলা যায়, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, যাহা

ক'য়ের বিরোধী তাহা খ'য়েরও বিরোধী ও যাহা ক'য়ের অনুমোদিত তাহা খ'য়েরও অনুমোদিত। অতএব যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মোক্ত সত্যের বিরোধী তাহা সকল ধর্ম্মোক্ত সত্যের বিরোধী; এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মোক্ত সত্যের বিরোধী কোন প্রকার নূতন মত কোন সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মেরই গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল-প্রকার নূতন সত্য আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত কিন্তু সকল প্রকার নূতন মত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত নহে। বর্ত্তমান কালে শুদ্ধ কেবল ব্যক্তি-বিশেষের মতের উপর কাহারো শ্রদ্ধা হইতে পারে না; মত সত্য হওয়া চাই। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বর্ত্তমান কালের অনুপযোগী কেন? না যেহেতু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মত স্বতন্ত্র এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্য স্বতন্ত্র। ঈশা মনুষ্যের আরাধ্য দেবতা ইহা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মত বটে কিন্তু সত্য নহে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের—মতও যা—সত্যও তা, একই সামগ্রী; কেননা যাহা সত্য নহে শুদ্ধ কেবল মতমাত্র—তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পাইতে পারে না। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর সবিশেষ উপযোগী।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব যে কি—উপরে তাহার কিয়ৎমাত্র আভাস দেওয়া হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান কালে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারের উপযোগী—এইটিই তাহার বিশেষত্ব। একজন চীন দেশের লোককেও আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, তুমি ঈশ্বরকে প্রীতি করিবে ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে; কিন্তু সে ব্যক্তি যখন জিজ্ঞাসা করিবে যে, কিরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করিব এবং কিরূপে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, তখন আমি তাহাকে কি বলিব? আমি চীন দেশের আচার ব্যবহার রীতি নীতি কিছুই অবগত নহি, কিরূপ ভজনা-পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি চীন দেশের উপযোগী তাহার আমি কিছুই জানি না; এ অবস্থায় হঠাৎ যদি আমি তাহাকে আমাদের দেশের আদর্শ অনুযায়ী কোন একটি উপাসনা প্রণালী দেখাইয়া দিই, তবে তাহা কখনই তাহার মনঃপূত হইবে না। এই জন্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না করিয়া চীন দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে আপাততঃ কোনক্রমেই শোভা পায় না; কেননা যে-টা সুহজ সে-টাই যখন আমরা রীতিমত পারিয়া উঠিতেছি না, তখন যে-টা কঠিন সে-টাতে হস্তক্ষেপ করা পাগলামি। প্রচার করিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভারতবর্ষে প্রচার করাই ভারতবাসীর মুখ্য কর্ত্তব্য। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপ আকার পরিগ্রহ করিলে তাহা—ভারতবর্ষের এবং বর্ত্তমান কালের—দুয়েরই উপযোগী হয়, তাহার প্রতি প্রচারকের সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঠিক্ এই দেশীয় এবং এই কালীয় পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেই তাহার বিশেষত্ব রক্ষা পায়; এ ভিন্ন তাহাকে কোন প্রকার বৈদেশিক অথবা বৈকালিক পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেই তাহার বিশেষত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইবে; এরূপ হইলে এদেশে এবং একালে প্রচারিত হওয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মেরা যদি সাধ করিয়া সুসাধ্য বিষয়কে দুঃসাধ্য করিয়া তোলেন—তাহা হইলে পরিণামে তাঁহারা আপনারাই ঠকিবেন। একালের বালকেরাও যাহার অসারতা বুঝিতে পারে—এমন সকল বিষয়কে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করানো হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই বৈকালিক মূর্ত্তি কখনই একালের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবে না; আবার, যাহা এ দেশের কোন ধারই ধারে না এমন-সকল বিষয় ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যন্তরে স্থান জুড়িয়া বসিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের

সেই বৈদেশিক মূর্ত্তি কখনই এদেশের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

পুরাকাল এবং বর্ত্তমান কাল দুয়ের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, পুরাকালে জ্ঞান-চর্চা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ ছিল, বর্ত্তমান কালে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞানচর্চা জনসমাজের চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য এখনকার কালে গুরু যিনি—তিনি শিষ্যের নিকট শুদ্ধ কেবল গুরুত্ব করিয়াই পার পাইতে পারেন না;—"আমি যাহা বলিব তাহাই বেদবাক্য"—এখন আর এ কথা খাটে না। এখনকার শিষ্য শুদ্ধ কেবল মুখের কথায় বা ভাব ভঙ্গীর কুহকে ভুলে না—সকল কথারই বিশিষ্টরূপ প্রমাণ চায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই যে একটি কথা বলেন যে, "সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং" গুরু শিষ্যকে যথার্থরূপে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ করিবেন, এখনকার কালের সহিত এই কথাটির সবিশেষ সংলগ্ন হয়। এখনকার কালে কোন গুরু যদি শুদ্ধ কেবল ——ভড়ং করিয়া শিষ্যের গুরু-ভক্তি উদ্দীপন করিতে যা'ন, তবে তিনি সহস্র লোকের নিকট ধরা পড়েন। এখনকার কালে শিষ্য আগে চায় সত্য এবং তাহার জ্ঞান-সঙ্গত পন্থা—তাহার পরে আর যাহা কিছু। এরূপ অবস্থায় গুরু সত্যকে কল্পনা ও কৃত্রিমতা হইতে যত বেশী দূরে রাখেন ও জ্ঞান যত বেশী প্রদান করেন, ততই তিনি প্রকৃত গুরুপদের উপযুক্ত হ'ন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই কথাটি—কি না "সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং" গুরু শিষ্যকে ঠিক্ ঠাক্ যথার্থরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিবেন, এইটি ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের হৃদয়ে চির-মুদ্রিত থাকা আবশ্যক। শিষ্য যদি প্রকৃত সত্য-লাভে বঞ্চিত হইল, তবে শুদ্ধ কেবল গুরুভক্তি লইয়া তাহার হইবে কি? গুরু নিজে যদি শিষ্যকে জ্ঞান-দান না করিয়া ভ্রম-দান করেন, তবে গুরুভক্তির কি-এমন সাধ্য যে, শিষ্যের আত্মাভ্যন্তরে জ্ঞান-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়? তবে যদি বল "গুরুভক্তিই কালে জ্ঞান-দান করিবে"—সে কেবল উপস্থিত ছাড়িয়া অনুপস্থিতে আশা। সেকেলে সঙ্গীতের ওস্তাদ্ পঞ্চাশ বছর ধরিয়া সাক্রেৎকে সা রে গা মা সাধা'ন কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যাটি শীঘ্র ছাড়েন না—তাহা যতদূর পারেন আপনার হাতে রাখেন; সঙ্গীত বিদ্যার পরিবর্ত্তে গুরু-ভক্তি প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা দে'ন; তাহার পর, শিষ্যের কেশ এবং গুরুভক্তি দুয়েরই সমধিক পক্কতা দর্শনে গুরুর কঠিন হৃদয়ে যখন একটু দয়ার সঞ্চার হয়, তখন তিনি রীতিমত বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হ'ন; কিন্তু এরূপ রীতিমুক্ত বিদ্যাদান এখনকার কালের অনুপযোগী ইহা বলা বাহুল্য। আমি যেন ভড়ংএর মোহিনী মন্ত্রে চমক লাগাইয়া শিষ্যের গুরুভক্তি উদ্দীপন করিলাম, কিন্তু শিষ্যের তাহাতে কি উপকার দেখিবে এটাও তো একবার আমার ভাবা উচিত! অতএব মেকি টাকা চালানো—কল্পনা-মিশ্রিত কৃত্রিম সত্যের প্রচার—এখনকার কালোচিত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অকৃত্রিম সত্যের পক্ষপাতী বলিয়া তাহা বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান কালের উপযোগী; ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশেষত্বটি যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহার প্রতি সকল ব্রাহ্মেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

এই স্থানে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন প্রণীত "[illegible] ব্রহ্ম" নামক একটি প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য লেখকার বলেন—"ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান আরাধনা প্রণালীতে ব্রহ্মের ক্রিয়া-

শীলতার ভাব বিশেষ-ভাবে উল্লেখ না থাকায় আরাধনা প্রণালী অসম্পূর্ণ রহিয়াছে অতএব তাহা বিবেচনার্থ ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট নিবেদন।" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে দুইরূপ কথাই দৃষ্ট হয়, যথা, "তিনি চলেন" "তিনি চলেন না"; নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" "স্বভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ";

"অনেজ দেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্ব মর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।"

ইহার অর্থ- "পরব্রহ্ম একমাত্র। তিনি অচল অথচ মন হইতে বেগবান্; ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে।" এখন, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই যে, দুইরূপ কথা, ইহা দুই ভাবের দুইরূপ কথা নহে, কিন্তু একই ভাবের দুইরূপ কথা। সূর্য্য স্থির রহিয়াছে ও পৃথিবী তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, অতএব বলা যাইতে পারে যে, সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা নিষ্ক্রিয়; আবার, সূর্য্যের আকর্ষণ-বলে পৃথিবী এবং যাবতীয় গ্রহ ঘূর্ণিত হইতেছে, অতএব বলা যাইতে পারে যে, সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা সক্রিয়। নেপোলিয়নের সৈন্যেরা হস্ত-পদ চালনা-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছে— নেপোলিয়ন সেই সময়ে একটা পাহাড়ের উপরে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন; সৈন্যেরা সক্রিয়-ভাবে যুদ্ধ করিতেছে—নেপোলিয়ন নিষ্ক্রিয়-ভাবে যুদ্ধ করিতেছেন;— নেপোলিয়ন নিষ্ক্রিয় অথচ সকল সৈন্য অপেক্ষা অধিক সক্রিয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে আছে "তাঁহার এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে কোটি কোটি জগৎ ভ্রাম্যমান হইতেছে," ইহার ভাব এই যে, ঈশ্বর শুদ্ধ কেবল ইচ্ছা মাত্রে জগৎ চালাইতেছেন—জগতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভ্রাম্যমান হইতেছেন না; এই অর্থেই তিনি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, জগতে যত কিছু ক্রিয়া চলিতেছে সমস্তেরই তিনিই মূল প্রবর্ত্তক—অতএব তিনি যেমন সক্রিয় এমন আর কেহই নহে।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

ইহাতে ঈশ্বরের জাগ্রত জীবন্ত ভাব কেমন মূর্ত্তিমান প্রকাশ পাইতেছে? অতএব ঈশ্বর কি ভাবে নিষ্ক্রিয় এবং কি ভাবে সক্রিয়—ভাবুক লোকের তাহা অগোচর থাকিতে পারে না। তিনি জগতের ন্যায় ভ্রাম্যমান হইতেছেন না—এই ভাবেই তিনি নিষ্ক্রিয়; আর, তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে জগৎ চলিতেছে—এই ভাবে তিনি সক্রিয়; ঈশ্বরারাধনা-কালে এই দুই ভাবের কোনটিই উপেক্ষনীয় নহে। তবে, যাঁহারা ঈশ্বরকে জিহোবার ন্যায় অসঙ্গত ক্রিয়াশীল মনে করেন,—রাগ দ্বেষাদিতে বিচলিত মনে করেন—ব্রাহ্মধর্ম্মে এখনো তাঁহাদের অধিকার জন্মে নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের কালোচিত মূর্ত্তি যেমন বাঞ্ছনীয়—দেশোচিত মূর্ত্তিও তেমনি বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশের সহিত ইউরোপ দেশের প্রভেদ এই যে, ইউরোপে লাটিন গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা একেবারেই মৃত হইয়া গিয়াছে—আমাদের দেশে মৃতকল্প সংস্কৃত-ভাষা এখনো অনেক পরিমাণে সজীব আছে। আমাদের দেশের ভাষা-সকল এখনো পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা হইতে

রসাকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে। সংস্কৃত ভাষা সমস্ত ভারতবর্ষের মাতৃ-ভাষা। আমাদের দেশের যেখানকার যতকিছু লোকাচার ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সমস্তই সংস্কৃত-মূলক। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্কৃত পরিচ্ছদ যেমন ভারতবর্ষে সাধারণতঃ প্রচারোপযোগী এমন আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ উপনিষদ ও মন্বাদি শাস্ত্রের শ্লোক সংগ্রহ যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তাহা আমাদের দেশের যাবতীয় ভজন পূজন ও আচার-ব্যবহারের ভিত্তিমূল, সুতরাং আমাদের দেশে তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। একজন মহারাষ্ট্রীয়কে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দেখাও-সে তাহা মাথায় করিয়া লইবে; একজন পঞ্জাবী নানকপন্থীকে দেখাও—সে বলিবে "এ তো গুরুজীরই অন্তরের কথা।" ভারতবর্ষে এমন একটিও স্থান নাই যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ সাধুলোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষকে এক ধর্ম্ম-সূত্রে বন্ধন করিতে এইরূপ যে সক্ষম—ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অপর একটি বিশেষত্ব। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে বাঙ্গলা বা হিন্দী বা আর-কোন প্রচলিত ভাষায় প্রচার না করিয়া শুদ্ধ কেবল তাহাকে সংস্কৃত ভাষাতেই প্রচার করা হউক; আমাদের অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, সংস্কৃতকে মূল করিয়া প্রচার করা হউক। রামায়ণ মহাভারত যেমন সমস্ত ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে—সেইরূপে প্রচারিত হউক্—সংস্কৃতকে মূল করিয়া প্রচারিত হউক্—তাহা হইলেই প্রচার-কার্য্য দেশোপযোগী হইবে; এবং কুসংস্কার রাশি বাদ দিয়া বিশুদ্ধ সত্য প্রচারিত হউক, তাহা হইলেই প্রচার-কার্য্য কালোপযোগী হইবে—সোনায় সোহাগা হইবে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া তাহা কি সার্ব্বভৌমক ধর্ম্ম নহে? মনুষ্য শরীরী জীব বলিয়া মনুষ্য কি আধ্যাত্মিক জীব নহে? একই মনুষ্য গৃহস্থ এবং ব্রহ্মস্থ দুইই। মনুষ্য যে অংশে গৃহস্থ সেই অংশে তাহার একটি বিশেষ দেশীয় এবং বিশেষ কালীয় বিশেষ ধর্ম্মের আবশ্যক; আর মনুষ্য যে অংশে ব্রহ্মস্থ সেই অংশে মনুষ্যের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ঈশ্বরকে প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে—ইহা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ঈশ্বর-প্রীতি এবং মঙ্গল কার্য্য—এ দুয়ের সামান্য আদর্শ যাহা আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে আছে, তাহা সকল মনুষ্যেরই সধারণ সম্পত্তি; সেই সামান্য আদর্শটির প্রতি লক্ষ করিয়াই আমরা বলিতেছি যে, ঈশ্বর-প্রীতি এবং মঙ্গল-সাধন এ দুইটি কর্ত্তব্য-কার্য্য মনুষ্যের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। কিন্তু সেই সর্ব্বসাধারণ আদর্শটি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিশেষ বিশেষ আকারে পরিস্ফুট হইয়া বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে এবং তাহা না হইলেও চলে না; কারণ, গৃহস্থ-মনুষ্যের গৃহধর্ম্ম চাই—পিতৃপুরুষ এবং সন্তান-সন্ততিদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি চাই; দেশস্থ মনুষ্যের দেশধর্ম্ম চাই—স্বদেশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি চাই; ইহার উপরে, সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত ধর্ম্ম নিয়মিত হওয়া চাই—ঈশ্বর-প্রীতি দ্বারা সমস্ত প্রীতি পরিশোধিত এবং পরিপোষিত হওয়া চাই। সমস্তই চাই,—ইহার একটি-কোন-কিছুর ত্রুটি হইলেই ধর্ম্মকার্য্য অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে। আর-একটি কথা এই যে, ধর্ম্মের সর্ব্বসাধারণ আদর্শ অপরিবর্ত্তনীয়—ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ আকার পরিবর্ত্তন-শীল। কিন্তু ধর্ম্মের সেই যে, আকার-পরিবর্ত্তন, তাহা দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী হওয়া চাই—নহিলে তাহা অশেষ বিপত্তির কারণ হইয়া

উঠে। ধর্ম্মের আকার এবং পরিচ্ছদ দেশ-কালের উপযোগী না হইলে লোকে ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরাভব মানে—এক বুঝিতে আর-এক বুঝে। দেশ-কালোচিত পরিচ্ছদ জনসমাজের চিরাভ্যস্ত; সুতরাং তাহা কাহারো চক্ষু আকর্ষণ করে না। সকলেই জানে যে, তাহা পরিচ্ছদ বই আর কিছুই নহে। কিন্তু বৈদেশিক এবং বৈকালিক পরিচ্ছদ লোকের চক্ষে এরূপ ধাঁদা লাগাইয়া দেয় যে, এক দল লোক ধর্ম্মের বন্ধনে তত নয় যত সেই পরিচ্ছদের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যায়; আর এক দল লোক সেই কিম্ভূত কিমাকার পরিচ্ছদ দূরে মর্ম্মে জ্বলিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকের এইটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে, হিন্দুধর্ম্ম দেশকালোচিত পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ এবং কাল দুয়েরই উপযোগী; আর, এইরূপ উপযোগিতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম শুধু কেবল দেশ-কালের উপযোগী নহে, তাহা আত্মার উপযোগী; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু উপসংহার-স্থলে এই বিষয়টি পাঠকের মনে স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা তাহার বিশেষত্বের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক—ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতাও তাহার বিশেষত্বের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে; কেননা "সার্ব্বভৌমিক" শব্দটাই বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর সবিশেষ উপযোগী। কথা কহিবার সময় একজন শিশুও ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কথা কয়, একজন পণ্ডিতও ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কথা ক'ন; কিন্তু শিশু জানে না যে, সে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কথা কহিতেছে—পণ্ডিত তাহা জানেন; তেমনি, চিরকালই যদিচ ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক নিয়মানুসারে সাধু লোকেরা ধর্ম্ম আচরণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি করা এখনকার কালের একটি বিশেষ লক্ষণ। ধর্ম্মবিষয়ক সার্ব্বভৌমিক সত্য-সকলই—আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য সকলই—দেশোচিত এবং কালোচিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র পদবীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ সত্য-সকলই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র, এবং দেশ-কালোচিত শোভন পরিচ্ছদই তাহার উপযুক্ত পরিচ্ছদ। এইরূপ শোভন বেশী সার্ব্বভৌমিকতা—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান একটি বিশেষত্ব। বর্ত্তমান প্রস্তাবের সার মর্ম্ম অতীব সংক্ষেপে ব্যক্ত হইতে পারে, যথা;—ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অংশে সার্ব্বভৌমিক, সেই অংশে তাহা—ধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অংশে দেশোপযোগী সেই অংশে তাহা—হিন্দুধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অংশে দেশোপযোগী এবং কালোপযোগী দুইই, সেই অংশে তাহা বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম। মোট কথা এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিকও বটে, দেশোপযোগীও বটে, কালোপযোগীও বটে। অথবা যাহা একই কথা—ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণতঃ—ধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম সামান্যতঃ হিন্দুধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম। তিন কথায়—(১) আত্মার উপযোগিতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা; (২) দেশকালের উপযোগিতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব; (৩) সার্ব্বভৌমিকতা এবং বিশেষত্ব এই দুয়ের যোগ হইলেই মণি-কাঞ্চনের যোগ হয়।

বাল্যবিবাহ।

রক্ষণশীলতা লোকসমাজের কেন্দ্রবর্ত্তিনী শক্তি। উন্নতিশীলতা উহার কেন্দ্রবর্জ্জিণী শক্তি। এই দুই শক্তি দ্বারা যেমন গ্রহগণ চালিত হইতেছে তেমনি লোকসমাজও চালিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের ইংরাজী প্রথা, ইংরাজী ধরণধারণের প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল; এক্ষণে সমাজের গতি বিপরীত দিকে হইতেছে। এক্ষণে যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই ভাল ইহা লোকে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। ইহাতে আমরা আহ্লাদিত আছি। বঙ্গদেশের লোকের এইরূপ রক্ষণশীলতা গুণ যদি আদোবে প্রকাশ না পাইত তাহা হইলে আমরা মনে করিতাম যে বাঙ্গালীরা অতি অপদার্থ। রক্ষণশীলতা গুণ লোকসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। যদি লোক আজ এক রকম প্রথা, কাল আর এক রকম প্রথা অবলম্বন করে তাহা হইলে লোকসমাজের কোন মতে মঙ্গল নাই। উপরোক্ত রক্ষণশীলতা প্রকাশিত হওয়াতে প্রমাণ হইতেছে যে বাঙ্গালী সমাজের মেরুদণ্ড আছে, বাঙ্গালীরা চিঙ্গড়ীমাছের মত অতি ভ্যাদভেদে নরম অপদার্থ বস্তু নহে। কিন্তু এরূপ রক্ষণশীলতার আতিশয্য আমরা ভাল বলি না। যেমন আমরা আমূল সংস্কার ভাল বলি না তেমন একেবারে একপাও নড়িব না এইরূপ স্থাবরত্বও ভাল বলি না। হিন্দু সমাজ ধর্ম্মভাবপ্রধান সমাজ। এই ধর্ম্মভাবপ্রধানতা যে কোনরূপে বিলুপ্ত হয় তাহা আমরা চাহিনা কিন্তু এই ধর্ম্মভাবপ্রধানতা বজায় রাখিয়া অল্প অল্প পরিবর্ত্তন আবশ্যক। প্রাচীন ঋষিরা কালানুসারে বিধির পরিবর্ত্তন করিতেন। মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও কলির স্মৃতিকর্ত্তা পরাশরের গ্রন্থ এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। ঋষি সম্প্রদায় যদি অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিতেন তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের উপযোগী নিয়ম সকল প্রণয়ন করিতেন সন্দেহ নাই।

হিন্দুসমাজ যে ধর্ম্মভাব প্রধান সমাজ তাহার আর সন্দেহ নাই। বিলাতে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের আদর বেশী আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাবের আদর বেশী। বিলাতের লোকেরা স্ত্রীলোককে "My beauty" "আমার সুন্দরী!" এই বলিয়া সম্বোধন করে। আমরা স্ত্রীলোককে পবিত্র প্রতিপালিকা ও ধাত্রী স্বরূপ জ্ঞান করিয়া "মা" বলিয়া সম্বোধন করি। ইওরোপে সৌন্দর্য্যের আদর বেশী, আমাদিগের দেশে সতীত্বের আদর বেশী। এই জন্য ধর্ম্মপ্রাণ ভারত সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শনারী প্রসব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহাতে সতীত্ব রক্ষা হয় এই চেষ্টা। এই জন্য বাল্যবিবাহ, এই জন্য পূর্ব্বরাগ প্রথার (Courtship) এর অভাব, এই জন্য অন্তঃপুরবদ্ধতা এই জন্য একান্নবর্ত্তিতা। যদি সতীত্ব রক্ষা চাও তবে এইরূপ সমাজের গঠন রাখা কর্ত্তব্য; যদি তাহা না চাও তাহা হইলে অন্য জাতি যাহাদিগের মধ্যে সতীত্বের এইরূপ আদর নাই তাহারা যেমন আপনাদিগের সমাজকে গঠন দিয়াছে সেইরূপ গঠন প্রদান কর। অন্তঃপুরবদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদিগের এখানে বলা কর্ত্তব্য যে বঙ্গদেশের নগরের অন্তঃপুরবদ্ধতার আমরা পক্ষপাতী নহি। আমাদিগের পল্লিগ্রামে অথবা মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রদেশে সেরূপ অন্তঃপুরবদ্ধতা আছে আমরা তাহার পক্ষপাতী। ঐ সকল স্থানে স্বাধীনতা আছে অথচ অন্তঃপুরবদ্ধতা আছে। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে প্রকার অন্তঃপুর

নিরঙ্কুতা ছিল, আমরা তাহার পক্ষপাতী। একান্নবর্ত্তিতা সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে একান্নবর্ত্তিতা দশজনের মধ্যে থাকা লইয়া আইসে, তাহা সাধ্বীতার একটি বিলক্ষন রক্ষক। আমাদিগের দেশে Poorrate নাই। একান্নবর্ত্তিতা তাহার কাজ করিয়া থাকে। একান্নবর্ত্তিতা অনেক দয়ার কার্য্য ও ত্যাগ স্বীকার করায়। তাহা উচ্চ ধর্ম্মসাধনের অনেক অনুকূল। কিন্তু একান্নবর্ত্তিতার একটি দোষ, ইহা আলস্যের প্রশ্রয় দেয়, আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি।

কেহ কেহ বলেন যে আমাদিগের বিবাহ প্রণালী আধ্যাত্মিকতাশূন্য। আমরা ইহাতে সায় দিতে পারি না। আমাদিগের জাতি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া ডাকে। স্ত্রী পুরুষের একত্রে যজ্ঞ ও পূজাদি করিতে হয় এই জন্য আমাদিগের দেশের লোকেরা স্ত্রীলোককে সহধর্ম্মিণী বলিয়া ডাকে। সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্ত্রীকে ডাকা হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রথা নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক বিবাহ।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং।"

পুত্র উৎপাদন জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিবে; পুত্র কি জন্য প্রয়োজন? না পিণ্ড প্রদান জন্য। পরকালে সদ্গতির জন্য পুত্রের প্রয়োজন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে হিন্দুসমাজে বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক।

"গোপয়েৎ স্বজনান বন্ধুন্ এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ।"

এই উপদেশ স্ত্রী স্বামী উভয়েতেই প্রযোজ্য। স্বজন বন্ধুদিগকে প্রতিপালন করা যেমন স্বামীর কর্ত্তব্য তেমনি স্ত্রীরও কর্ত্তব্য। খাটি হিন্দু যাঁহারা তাঁহারা স্ত্রীসহবাস ক্রিয়াতে পর্ব্বাহের নিয়ম পালন করেন। দয়া ধর্ম্ম কামরিপু দমন ধরিলে প্রকৃত হিন্দু স্বামীকে এক প্রকার চিরব্রহ্মচারী ও প্রকৃত হিন্দুস্ত্রীকে এক প্রকার চিরব্রহ্মচারিণী বলিতে হয়।

বিবাহের আধ্যাত্মিকতা রক্ষার জন্য বাল্য বিবাহ আবশ্যক। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্র হইবার আশঙ্কা। অধিক বয়সে বিবাহ দিতে হইলে পূর্ব্বরাগ প্রথা প্রবর্ত্তনের আবশ্যক কিন্তু পূর্ব্বরাগ প্রথা স্বাধিতা রক্ষা জন্য অনুকূল নহে। পূর্ব্বরাগ প্রথা আমাদিগের দেশে নাই বলিয়া স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রীতির অভাব আছে এমন ত সাধারণতঃ দেখা যায় না। পূর্ব্বরাগ প্রথা অবলম্বন না করিলে কন্যার বাল্যকালে পিতা মাতার পাত্র নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। অতএব বাল্য বিবাহ আবশ্যক কিন্তু আমাদিগের বঙ্গদেশে যেরূপ বাল্যবিবাহ প্রচলিত তাহার কতকগুলি দোষ প্রতীয়মান হইতেছে। রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীসহবাস জঘন্য প্রথা। ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হইলে প্রসব হইতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে যে সন্তান হয় তাহা দুর্ব্বল হয় ইহা বিজ্ঞান ও আমারদিগের হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র ও আমাদিগের সকলের নিজের দর্শন প্রমাণ করিতেছে। এই নিয়মের দুই একটি ব্যভিচার স্থল হইতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায় যে ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে যে সন্তান হয় তাহা দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য হয়। বিজ্ঞান ও হিন্দু চিকিৎসা গ্রন্থ ও স্বচক্ষে যাহা দেখিতেছ তাহার প্রতি একেবারে চোক বুজিয়া থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এই সকল অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? একটি প্রাচীন হিন্দু প্রথা (যে প্রথা অন্যান্য হিন্দু প্রদেশে এখনও প্রচলিত আছে) আমাদিগের বঙ্গদেশে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিলেই এই সকল অনিষ্ট নিবা-

রিত হইতে পারে। তাহা হইলে সকল গণ্ডগোল চুকিয়া যাইতে পারে। সে প্রথা দ্বিরাগমনের প্রথা। বিবাহের পর স্বামীর নিকট স্ত্রীকে শয়ন করিতে না দেওয়া ও চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীকে স্বামীগৃহে না রাখা ঐ দ্বিরাগমন প্রথার অঙ্গ। এই প্রথা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে প্রচলিত থাকাতে বাল্য বিবাহের অনিষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়া থাকে। কেবল ইন্দ্রিয়লোলুপ বঙ্গদেশে বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর শয়নাদি প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দু সমাজের এক জন অগ্রণী আমাদিগের এক-জন অতি মান্য রক্ষণশীল বন্ধু যিনি বাল্য বিবাহের পক্ষ হইয়া বাল্য বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে বিলক্ষণ অংশ লইতেছেন তিনি তাঁহার পরিবারের মধ্যে এই নিয়ম করিয়াছেন যে পুত্রবধূর রজঃপ্রবৃত্তি না হইলে তাহাকে স্বীয় গৃহে আনয়ন করিবেন না। তাঁহার এই সাধু উদ্যমকে আমরা হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করি। স্ত্রীলোকের রজঃপ্রবৃত্তি সচরাচর ত্রয়োদশ বৎসরে হইয়া থাকে। আমাদিগের বন্ধু যদি পুত্রবধূ আনয়ন কার্য্য আরো দুই বৎসর অপেক্ষা করেন তাহা হইলে সকল দিকে ভাল হয়। এক্ষণে কোন কোন গাঢ় হিন্দু পরিবারেও পিতা তাঁহার কন্যাকে ত্রয়োদশ বৎসরে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েন। কন্যার শ্বশুর পুত্রবধূ আনয়ন কার্য্য যদি বিবাহের পর দুই বৎসর স্থগিত রাখেন তাহা হইলে তাহা হইতে অতি শুভ ফল উৎপন্ন হয়। বিবাহের পর হইতে স্বামীগৃহে আশা পর্য্যন্ত কন্যার পিতা মাতা তাহাকে বাটীতে পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা ও ধর্ম্মশাসন এবং সাহিত্য ও পাক বিদ্যা ও কলা বিদ্যা শিখাইবেন ও সূক্ষ্ম দুঃসঙ্গ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। যদি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কন্যার কিছুমাত্র দুশ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা দেখেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পতিগৃহে পাঠাইতে পারেন কিন্তু ভদ্র গৃহে সুবিজ্ঞ পিতার নিয়ন্তৃত্বে এরূপ দুশ্চরিত্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ইহা আমাদিগের বলা কর্ত্তব্য যে আমরা পূর্ব্বরাগপ্রথার বিরোধী কিন্তু এক্ষণে আপনা আপনি এই বিষয়ে যে প্রথা হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে অর্থাৎ বরের নিজে গিয়া পাত্রী দেখা ও তাহাকে কথা কহানো ও তাহার সহিত বাক্যালাপ করা তাহার বিরোধী নহি। গাঢ় হিন্দু হইলেও অনেক সুবিজ্ঞ পিতা সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে এক্ষণে পুত্র অথবা কন্যার মত লইয়া থাকেন।

বাদ প্রতিবাদ।

কএক বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে কিছু আন্দোলন চলিতেছে। আন্দোলনের হেতু এই যে গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যে প্রণালীটি স্থির করিয়াছেন অনেক ব্রাহ্ম মনে করেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে* গোস্বামীর প্রচার প্রণালী লইয়া একটু আলোচনা করিয়াছিলাম এবং তাহাতে কি অনিষ্টকারিতা আছে কিয়দংশে তাহাও দেখাইয়া ছিলাম।

সম্প্রতি ঢাকা সমাজের বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় গোস্বামীর অবলম্বিত মতগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মসঙ্গত কি না ইহা জানিবার জন্য শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট কএকটী প্রশ্ন করিয়া পাঠান। ঐ সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় এইমাত্র

---

* ৫৮ ব্রাহ্ম সম্বতের আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনীতে আধ্যাত্মিক রূপক নামক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

বলেন যে এখন তাঁহার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কোন প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে এবং তাহা লইয়া বাদানুবাদ করিতে আর তাঁহার শক্তি নাই। তবে তিনি জিজ্ঞাসুকে সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াছেন যে যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ ব্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি তাহা সুব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকলের বিপরীত কথা যিনি যাহাই বলুন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের এই সংক্ষেপ প্রত্যুত্তর তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ হইবার পর বাবু সীতানাথ নন্দী ঐ তত্ত্বকৌমুদীতে এক সুদীর্ঘ পত্রে বলিতেছেন যে প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ও ব্যাখ্যানাদিতে যাহা বলিয়াছেন তদ্বিপরীত যিনি যাহা বলুন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, এই কথা বলায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্পষ্টত গণ্ডীবদ্ধ করিতেছেন এবং ইহা দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের স্কন্ধে অভ্রান্ত শাস্ত্রের গুরুভার চাপাইয়া দিতেছেন। প্রত্যুত্তরে আমরা সংক্ষেপে নন্দী মহাশয়কে দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কথার নিস্কর্ষ অর্থ এই যে যাহা সত্যের বিপরীত তাহা কোন কালেই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পারে না। তিনি ব্যাখ্যানাদিতে যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহার কোন অংশই সাম্প্রদায়িক দোষে দূষিত নয়। তাহার সমস্তই জ্ঞানসঙ্গত সার্ব্বভৌমিক সত্য। আর আর ধর্ম্মশাস্ত্র নানারূপ কাল্পনিকতায় পূর্ণ কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ সতর্কতার সহিত সে দোষ পরিহার করিয়াছেন। বিপরীতে বরং আমরা এই বলিয়া শঙ্কিত হইতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক সত্যের পরিবর্ত্তে পাছে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়া তাহার উচ্চ আদর্শ মলিন করিয়া দেয়। যদিও সার্ব্বভৌমিক সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ও ব্যাখ্যানাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু যদি ব্যক্তি বিশেষ তাহার কোন অংশ অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেন তাহা হইলে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যখন তাহা হয় নাই এবং ব্রাহ্ম সাধারণে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য বলিয়াই শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছেন তখন নন্দী মহাশয় তন্মধ্যে এমন কি দেখিলেন যাহাকে তিনি সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হন? এক্ষণে কথা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি সত্য ধর্ম্ম হয় এবং সেই সত্যই যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ও ব্যাখ্যানাদিতে বিবৃত হইয়া থাকে তবে ইহা তো সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাহার বিপরীত কথা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন যে কোন ধর্ম্মের যে কোন সত্যই হউক না তাহা যদি প্রকৃত সত্য হয় তবে তাহার বিপরীত কথা অবশ্য অসত্য। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রকাশিত সত্যের বিপরীত কথা কি রূপে সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। ফলত সত্যের বিপরীত যাহা কিছু তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে এ কথাতে যে কি দোষ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। নন্দী মহাশয় কি বলিতে পারেন যে যাহা সত্যের বিপরীত অর্থাৎ অসত্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম? বোধ হয় তিনি ইহা কখনই বলিবেন না। তবে তিনি এমন আশঙ্কা করিতে পারেন যে ভবিষ্যতে যদি কোন সত্য আবিষ্কৃত হয় প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মতে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে না। তিনি এইরূপ বুঝিয়াই বোধ হয় বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে গণ্ডীবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখুন তাঁহার এইরূপ সংশয় করিবার কোনই মূল নাই। প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন ব্যাখ্যানাদিতে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা সত্য, ইহার বিপরীত অর্থাৎ অসত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে এ কথার ব্যাখ্যা এমন হইতে পারে না যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে যদি কোন সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহা

ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে। সকল সত্যই পরস্পর সৌহার্দ বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং ভবিষ্যতে এমন কোন সত্যই বাহির হইতে পারে না যাহা বর্ত্তমান সত্যের বিরোধী। বরং সেই ভবিষ্যৎ সত্যের এমন শক্তি থাকিতে পারে যে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান সত্য আরও উজ্জ্বল হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে যখন সত্যেরই আদর করা হইয়াছে তখন যে কোন সত্য যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য হইবে দেশ কাল যে তাহার প্রতিপন্থী হইতে পারে না ইহা স্থির। তবে ইহার মধ্যে একটু কথা আছে, সত্য অবশ্য দেশ কালে অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু তাহার বাহ্য পরিচ্ছদের উপর দেশকালের একটা অধিকার আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই বিষয়ে একটু সাবধান হইতে হইবে। মনে কর ব্রহ্ম সাধনের জন্য চিত্ত সমাধান আবশ্যক। এই চিত্ত সমাধান অবহমান কাল বিভিন্ন প্রণালীতে হইয়া আসিতেছে। কেহ মনে করেন ব্রহ্মের উপর অটল বিশ্বাস ও ভক্তি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্ন থাকিলে তাহা সহজেই ব্রহ্মে সমাহিত হয়। আর কেহ বা মনে করেন নিশ্বাস রোধ পূর্ব্বক নাসাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিলে চিত্তের স্থিরতা অভ্যাস হয়। সেই স্থির চিত্তে ব্রহ্মদর্শন সহজ হইয়া থাকে। এস্থলে ব্রহ্মদর্শনের জন্য চিত্তের স্থিরতা ইহাই লক্ষ্য বস্তু। ইহার দুই পথ। ফলত একই বস্তু বিভিন্ন পরিচ্ছদে দুই পথ দিয়া উপস্থিত হইতেছে। এখন দেখিতে হইবে ইহার মধ্যে কোনটি স্বাভাবিক এবং কোনটি কৃত্রিম, অর্থাৎ বল-পূর্ব্বক ঘটানো। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় ইহার মধ্যে প্রথমটি স্বাভাবিক। কেন না মানসিক সাধনার সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতির যেরূপ অব্যবহিত যোগ রহিয়াছে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত সেরূপ নহে। যোগ শাস্ত্রেও এমন কোন কথা নাই যে প্রাণায়াম না করিলে যোগ হয় না। প্রত্যুত তাহাতে আধ্যাত্মিক প্রযত্ন ও বৈরাগ্যই যোগের মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং শরীরের অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্যই প্রাণায়াম আদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামাদি যে উদ্দেশে উপযোগী এইটুকু লক্ষ্য করিয়া তেমন ইহাও বলা যাইতে পারে যে প্রতিদিন নিয়মিত ভ্রমণ এবং যুক্ত আহার বিহারও যোগ সাধনের উপযোগী। ফল কথা আধ্যাত্মিক প্রযত্ন ও বৈরাগ্য এই দুইটা প্রাণায়াম অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী যে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রাণায়ামই যেমন দৈহিক পীড়ার কারণ হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই এবং ইহার উপকারিতা সর্ব্ববাদিসম্মত।

কালের সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে। জনসমাজের যখন যেরূপ শিক্ষা ও অবস্থা, তদনুসারে সৎধর্ম্মের সৎপথ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। উপরে যেমন সাধন প্রণালীর বিষয় একটীকে স্বাভাবিক ও অপরটীকে কৃত্রিম বলিলাম তেমনি আরও এমন কতকগুলি আছে যাহাতে কোনরূপ সত্য নাই, কিন্তু বর্ত্তমান কালের অনেকটা পশ্চাৎবর্ত্তী। সেই জন্য ব্রহ্মসাধনে কষ্টস্বীকার একান্ত আবশ্যক। নচেৎ সাধন হইতে পারে না। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন পথও আছে। বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ একপ্রকার কষ্ট সাধন। অন্য পক্ষে শীত বাতাতপ দ্বারা কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া অনশনাদি দ্বারা প্রাণকে নিস্তেজ করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা অপর প্রকার কষ্ট সাধন। এই দুইটীই শাস্ত্রানুমোদিত প্রণালী। কিন্তু প্রথমটি সকল কাল ও সকল অবস্থায় উপ-

যোগী আর দ্বিতীয়টিতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলেও উহা বর্ত্তমান জনসমাজের অনুপযোগী। এখনকার এই উন্নত শতাব্দীর ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথনই স্থান পাইতে পারে না। ফলতঃ যাহা দেশোপযোগী ও কালোপযোগী এইরূপ শোভন পরিচ্ছদই ব্রাহ্মধর্ম্মের গাত্রে শোভা পায়, নচেৎ একটা কিম্ভূত কিমাকার কৃত্রিম সাজসজ্জা নিশ্চয়ই ইহাকে কদর্য্য করিয়া ফেলিবে।

বাহ্য পরিচ্ছদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাদি গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের সত্য গৃহীত হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের আর একটী বিশেষ উপকার হইয়াছে। সে উপকারটি পৌত্তলিকতা হইতে ইহাকে রক্ষা। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক রূপক নামক প্রস্তাবে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি যে কি অর্থে শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছি। তখন বলিয়াছিলাম রূপকের মূলে অবশ্য গূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহা দ্বারা রূপকের স্রষ্টা মহাজ্ঞানী কবির কোন অনিষ্ট হইবে না, কারণ প্রকৃত সত্যটী তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক। তিনি বাহ্যে তাহার একটা পরিচ্ছদ দিয়াছেন মাত্র। ইহা দ্বারা অনিষ্ট তাঁহার না হৌক কিন্তু যাহারা জ্ঞানালোকে ইহার অভ্যন্তর না দেখিবে তাহারা বাহ্য পরিচ্ছদেই বদ্ধ হইয়া থাকিবে। বাস্তব ঘটনাও তাহাই। জনসমাজ সত্যটি না পাইয়া তাহার বাহ্য পরিচ্ছদ কৃষ্ণ মূর্ত্তিটিকে পূজা করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ও ব্যাখ্যানাদি এরূপ প্রচ্ছন্ন সত্যে বিশেষ সাবধান। কিন্তু এখন যাঁহারা এই বাহ্য পরিচ্ছদের উপকারিতায় তুচ্ছ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজে মূর্ত্তিপূজার বীজরোপণ করিয়া যাইতেছেন। বর্ত্তমানেই দেখ না মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ইহারই মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত। প্রাণায়াম লইয়া এই দ্বৈধীভাব। কেহ কহিতেছেন প্রাণায়াম যোগের একটা অঙ্গ মাত্র, কেহবা কহিতেছেন ইহাই যোগ। বস্তুত প্রাণায়াম চিত্তস্থৈর্য্যের খানিকটা সাহায্য করিলেও ইহা কদাচ সাক্ষাৎ যোগ নহে। সেই জন্য কহিতেছি এই জ্ঞানোজ্জ্বল কালেই যখন সত্যের বাহ্য পরিচ্ছদ লোকের এইরূপ চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া দেয়, তখন ইহা ব্যক্তিবিশেষের উপযোগী হইলেও সাধারণ প্রণালী বলিয়া প্রচার করা সত্যধর্ম্ম প্রচারক বিচক্ষণ লোকের কর্ত্তব্য নহে।

নন্দী মহাশয় এক স্থলে শাস্ত্র কথাটী লইয়া বড় হুলস্থুল বাঁধাইয়াছেন। আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম তন্মধ্যেই এই আপত্তির খণ্ডন রহিয়াছে তথাচ একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র! ইহা কি নূতন কথা। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মীমাংসা করা ব্রাহ্মোচিত নহে। অবশ্য নন্দী মহাশয় শাস্ত্রের নাম শুনিলে অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে পারেন কিন্তু সকলে তাহা করেন না। যাহা সত্যের শাসন তাহাই শাস্ত্র। কিন্তু আমরা একটী কথা নন্দী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি সত্যের শাসন শিরোধার্য্য করেন কি না? যদি তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকে তবে যাহাতে সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন সত্য সংগ্রহীত হইয়াছে সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের শাসনে তিনি কি জন্য ভীত হইয়াছেন। তিনি কি সত্যের শাসন ছাড়িয়া অসত্যের শাসন মান্য করিতে চান? ফলত শাস্ত্র নামেই ভীত হওয়া সত্যানুরাগী ব্রাহ্মের উচিত নয়। ইহাতে সত্যেরই এক প্রকার অবমাননা করা হয়।

পত্র।

প্রশংসিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত কএক পংক্তি সাধারণের গোচর জন্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে সুখী হইব।

পরম পূজনীয় শ্রীমন্ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীযুক্ত দীননাথ অধ্যেতা নামধেয় একজন প্রিয় শিষ্য কলিকাতা হইতে রংপুর গমন কালীন কএক দিবস আমার বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি বুদ্ধিমান আশৈশব অন্ধ, চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অন্ধ হয়েন; কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রে ইঁহার অভিজ্ঞতা, সঙ্গীত শাস্ত্রে ইঁহার দক্ষতা, তেজোময় বাগ্মিতা এবং ইঁহার কার্য্য-কুশল ক্ষমতা সুক্ষরূপ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে ইঁহাকে মাদৃশীয় একটী খনিগুহানিহিত অতীব উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইনি একজন হরিভক্তি-পরায়ণ উদাসীন, কাহারও নিকট অর্থোপার্জ্জন লালসার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থের প্রার্থনা বা গ্রহণ করেন না। হরিগুণানুকীর্ত্তন সাধারণকে শ্রবণ করানই ইঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিগত ১০ই পৌষ শনিবার আমার বাটীতে ইনি দয়া করিয়া তাঁহার স্বরচিত ও অশ্রুতপূর্ব্ব প্রহ্লাদচরিত্র গীতাভিনয় অভিনয় করিয়াছিলেন। নিরূপিত সময়ের পূর্ব্ব হইতে কুমারখালি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বহুতর ভদ্রলোক সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া ঔৎসুক্য পরিপূর্ণচিত্তে অধ্যেতা মহাশয়ের সভামণ্ডপে আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এমন সময় যখন তাঁহাকে সভামধ্যে আসীন করিয়া দেওয়া হইল তখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে কএকটি সুললিত ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সেই সুমধুর হরিগুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। পল্লীতে সেই অপরূপ দৃশ্য অভুতপূর্ব্ব বলিয়া অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তৎপরে গীতাভিনয় আরম্ভ হইল। প্রহ্লাদ নাম শুনিবামাত্রই প্রত্যেক সভ্যের হিন্দুর মনে ভক্তিতরঙ্গমালা উদ্বেলিত হইতে থাকে; প্রকৃত ভক্তের মুখে সেই প্রহ্লাদের আশৈশব হরিভক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া সভার কোন ব্যক্তিই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রাত্রি অধিক হওয়াতে গীতাভিনয় ঐ দিন সম্পূর্ণ শেষ হইতে পারে নাই। সকলের দ্বারা সবিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি পরদিন অবশিষ্টাংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ দিনের কার্য্য অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্র ইঁহার স্বরচিত। ইঁহার রচনা কৌশল ও কবিত্ব যেরূপ ভাবোদ্দীপক ইঁহার সততা নম্রতা ও সাধুতা ততোধিক মনোমুগ্ধকারী। জগদীশ ইঁহাকে দীর্ঘজীবি ও ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করুন ইহাই প্রার্থনা।

কলিকাতা
২৫শে পৌষ,
১২৯৪।

বশম্বদ
শ্রীঅম্বিকাচরণ মৈত্র
যদুবয়রা।

নূতন গ্রন্থ।

LECTURE ON RELIGIOUS SUBJECTS.

হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন, হরিশ্চন্দ্রের নাম ভুবন বিদিত তাঁহার লেখনী অমৃত প্রসবিনী, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ অভিপ্রায় ইহা জানা শিক্ষিত লোকমাত্রেরই আবশ্যক। ব্রজলাল বাবু এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়া জনসমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা এপর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় দেয় মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। আশা করি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত ও আমাদিগের অনর্থক ডাকমাশুল ব্যয় করিতে হইবে না।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল বালী গ্রামে একটি "ধর্ম্ম-সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত প্রতিপাদিত বিশ্বজনীন সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক মতালোচনা এবং ধর্ম্মাবহ পূর্ণ পরাৎপর পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করাই এই সমাজ সংস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদিন জনৈক ভদ্রলোকের নিকেতন মধ্যে উক্ত সমাজের কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে তথায় উপাসনা কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নানাবিধ দুর্নিবার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে একটি স্বতন্ত্র স্থানের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানের পর সমাজের উপযোগী একটি স্থান ১০০০৲ টাকায় পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেবল ২১০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হওয়াতে আমরা উহা ক্রয় করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে ধর্ম্মোৎসাহী দেশহিতৈষী সদাশয় জনগণের নিকট সকাতরে আমাদের এই নিবেদন যে যদি তাঁহারা স্ব স্ব বদান্যতা-গুণে আমাদিগকে কিছু অর্থ সাহায্য বিধান করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইব। শ্রদ্ধার সহিত যিনি যাহা দান করিবেন তাহা উক্ত সমাজের সম্পাদক অথবা আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। অলমতিবিস্তরেণেতি।

তাং ১৭ কার্ত্তিক ১৮০৯ শক।

বালী গাঙ্গুলী পাড়া }
উত্তরপাড়া ডাকঘর }
শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক "বালী ধর্ম্মসমাজ"।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে সুলভ মূল্যে পুস্তক বিক্রয় হইবে।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১লা হইতে ১২ই মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ৮ই মাঘের পূর্ব্বে মনিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের" নিকট "যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ৮ই মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠান হইবে না।

১৭৬৯ শক অবধি, ১৮০৮ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অষ্ট পঞ্চাশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ মঙ্গলবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

প্রাতঃকাল।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

ভৈরোঁ—কাওয়ালি।

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা পরশে,
হৃদয়নাথ,
তিমির রজনী অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয় গগনে
বিমল তব মুখভাতি।

—

উদ্বোধন।

পূর্ব্ব সমুদ্রে অবগাহন করিয়া ১১ই মাঘের পবিত্র প্রাতঃকাল আকাশে উদিত হইয়াছে। বেদবিদ্যা সমাপন করিয়া, উপনয়ন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, স্নাতক ব্রহ্মচারী যেমন গুরুর আশ্রম হইতে গৃহাশ্রমে প্রবেশ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম পরিশুদ্ধ অনুষ্ঠান সেইরূপ অরণ্যবাসী সন্যাসীর আশ্রম হইতে গৃহীর পুত্র-কলত্র-পরিবেষ্টিত গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই শুভ দিনের, এই শুভ ঘটনার পবিত্র স্মৃতি উদ্বোধিত করাই ১১ই মাঘের উৎসব। যে ধর্ম্ম অরণ্যবাসী ঋষির হৃদয় হইতে উপনিসদের পৃষ্ঠাতে সমাবৃত ছিল, তাহাই ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্মে এবং ব্রাহ্মের হৃদয়ে সমাগত হইয়াছে। পুণ্যবান তিনি, সৌভাগ্যশালী তিনি, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনাদি অনন্ত সত্য, তাহার ধ্রুব বিশ্বাস আপনার আত্মাতে প্রকৃষ্ট রূপে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আপনার প্রেমের আবির্ভাব যে দিন পরাৎপর ব্রহ্ম তাহাতে প্রথম বিকাশ করিলেন, তাহাতে যে সৌন্দর্য্য আকাশে উদ্ভাসিত হইল, যে সৌন্দর্য্য মনুষ্যের মুখশ্রীতে উদ্ভাসিত হইল, যে সৌন্দর্য্য মানবাত্মার প্রাণে সঞ্চারিত হইল, তাহা হইতেই মানবাত্মায় ধর্ম্মের পিপাসা। এই পিপাসার শান্তিসমুদ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম। জড়বাদ অতিক্রম করিয়া, মূর্ত্তিবাদ অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতের গুহা কন্দর এবং অরণ্যের অন্ধকার অতিক্রম করিয়া, মানব মাত্রের প্রাপ্য বস্তু, আত্মার চিরবাঞ্ছিত মহামূল্য রত্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর গৃহাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাঘের

একাদশ দিবস ব্রাহ্মধর্ম্মের গৃহপ্রতিষ্ঠার দিন। এই জনাই মাঘের একাদশ দিবস আমাদের স্মরণীয়, অতি আদরণীয়। আজ ১১ মাঘের উৎসব। অদ্যকার দিনে সমাগত সকলে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা উপলব্ধি কর। অদ্যকার সূর্য্যের পুণ্য কিরণ, আকাশের নির্ম্মল আনন্দময় ভাব, ব্রাহ্ম হৃদয়ের নির্ম্মল প্রফুল্লতার উৎসাহ, এ সকলের মধ্যে ঈশ্বরের পুণ্য জ্যোতি অবলোকন কর। আইস আজি ভ্রাতা ভগিনী, জনক জননী; আইস আজি বন্ধু বান্ধব, আবাল বৃদ্ধ নর নারী, দীন দুঃখী, পাপী তাপী, সাধু অসাধু, সকলে একহৃদয়ে ব্রহ্মোৎসবে আগমন কর। সমাগত সকলে সেই পরম কৃপাময় পরমেশ্বরের অপার প্রীতি অনুভব কর। আইস, "যুজে বাম্ ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ" নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদের ও আমাদের সেই চিরন্তন ব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। "অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে।" হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্ তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। তুমি আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর।

উপদেশ।

আজ আমরা যাঁর উপাসনার জন্য মিলিত হইয়াছি তিনি জীবন্ত দেবতা। এই মাত্র আমরা বেদবাক্যে তাঁহার যে স্তব করিলাম তাহা তাঁহার রাজসিংহাসনের সন্নিহিত হইয়াছে, মুক্ত হৃদয়ে যে প্রার্থনা করিলাম তিনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি সহস্র জ্যোতিতে আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান। এই পবিত্র মুহূর্ত্তে একবার জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে দেখিয়া লও। এমন ভুবনমোহন রূপ আর কখন দেখ নাই। এই যে উষার স্নিগ্ধ প্রকাশ, ঐ যে রক্তচ্ছবি সূর্য্য, এই যে সম্মুখের শোভন উদ্যানে বিচিত্র বর্ণের পুষ্প, এই সমস্ত তাঁহারই রূপের ছায়া। যিনি হৃদয়-মন্দিরে একবার এই অলৌকিক রূপ দেখিতে পান তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। তাঁহার হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ ও সমস্ত সংশয়চ্ছেদ হয়। কিন্তু এই অরূপীর রূপ আত্মায় প্রত্যক্ষ করা বড় সহজ কথা নয়। ইহার জন্য বিশেষ সাধন আবশ্যক। সকল প্রকার বিষয় বাসনা সংযত করিয়া বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে হৃদয়ে অনুরাগ-বহ্নি সন্ধুক্ষিত করা আবশ্যক, তবে এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাইবে। কিন্তু বড় ক্ষোভের কথা অনেকে এই ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না। অল্প দিনে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে সাধনে বীতরাগ হন। হয় তো অনেকেই এককালে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে বিচরণ করেন। কিন্তু একবার স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ এই পৃথিবীতেই যখন সামান্য লোকের পক্ষে এক জন উচ্চপদস্থ অনায়াসলভ্য নন তখন যাঁর এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে তুমি অল্পায়াসে তাঁর দর্শন প্রত্যাশা কর। একি দুরাশা।

ব্রহ্ম আমাদের দূরে নন। তিনি অন্তরে। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে চিত্তের স্থৈর্য্য চাই। যোগশাস্ত্রে ইহাই বৃত্তিনিরোধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। নানা উপায়ে এই বৃত্তিনিরোধ হইতে পারে। কিন্তু যাহা স্বাভাবিক তাহা আশ্রয় করা আবশ্যক। জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস ইন্দ্রিয় দমন বিষয়ে অনাসক্তি এইগুলি থাকিলে মন অল্পে অল্পে সহজেই স্থির হয়। কিন্তু অনেকে এই সহজ পথে যাইতে চান না। তাঁহারা পূরক রেচক প্রভৃতি প্রাণব্যাপার লইয়া ব্যস্ত। অবশ্য এই প্রণালী যে সিদ্ধিলাভের প্রতিপন্থী তাহা নহে। কিন্তু পক্ষপাতশূন্য হইয়া বুঝিয়া দেখ জ্ঞান ভক্তি

প্রভৃতির সহিত মনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগ। আর প্রাণব্যাপারের সহিত উহার ব্যবহিত সম্বন্ধে যোগ। সুতরাং যাহার সহিত সাক্ষাৎ যোগ সেই পথই জনের পক্ষে স্বাভাবিক। আর যাহার সহিত ব্যবহিত যোগ তাহা বলকৃত। অতএব যে পথ স্বাভাবিক তদ্দ্বারা ঈশ্বর্য্য অভ্যাস কর অবশ্যই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার পাইবে। আরও, প্রাণব্যাপার তো এই জড়পিণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আছে, আধ্যাত্মিক সাধনে তাহার বিশেষ উপযোগিতা কি। যদিও কিছু থাকে যুক্ত আহার বিহার দ্বারা তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। ফলত যোগাচার্য্যদিগের মতে ইহা একটী গৌণ অঙ্গমাত্র। তাহাও আবার সকল অবস্থায় প্রয়োজ্য হইতে পারে না। অতএব যে পথ সর্ব্বাবস্থায় অনুকূল কঠোর ব্রহ্মসাধনে তাহা উপেক্ষা করিও না। এই চিত্তস্থৈর্য্য লাভের জন্য বিশেষ ধৈর্য্য চাই। প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় কোন ঋষি তপঃসাধনের জন্য যুগযুগান্তকাল এক আসনে উপবিষ্ট। বল্মীক মৃত্তিকায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রোথিত, জটাজালে পক্ষিরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই ব্যাপক কালেও তাঁহার ব্রহ্মদর্শন ঘটিতেছে না। এই কথার ভিতর কোন রূপ কবিকল্পনা থাকিলেও ইহা নিশ্চয় সত্য যে যোগ্যতাসিদ্ধি অগ্রে চাই। ইহার জন্য সময়ের কোন রূপ সীমা হইতে পারে না। যিনি যে পরিমাণে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবেন তাঁহার সিদ্ধি ততই সুলভ হইবে। তবে এত অধৈর্য্য কেন? ঋষিসেবিত স্বাভাবিক পথ আশ্রয় করিয়া অল্পে অল্পে আপনাকে উপযুক্ত কর কালে অবশ্যই ব্রহ্মদর্শন হইবে। এই স্বাভাবিক পথকে দেশকাল কখন সঙ্কুচিত করিতে পারে না। প্রত্যুত সকল দেশ ও সকল কালেরই ইহা উপযোগী। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যসাধারণ ধর্ম্ম। ইহা কেবল তোমার কি কেবল আমার নয়। অতএব এই ধর্ম্মসাধনের জন্য যে প্রণালী মনুষ্যসাধারণের পক্ষে সঙ্গত প্রাণপণে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিও। ব্রহ্মকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হও কিন্তু চঞ্চল হইও না। এই পথ নিতান্ত দুর্গম। চাপল্যে পদস্খলনের খুব সম্ভাবনা। জ্ঞানে অটল হও, ভক্তিকে দৃঢ় কর নিশ্চয়ই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ব্রহ্মন্, যে দিন সকলে রোগশয্যার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া শোকাশ্রুর সহিত আমাদিগকে বিদায় দিবে সেই দিন স্মরণ করিলে বড় ভীত হই। চক্ষের এই দুই খানি কবাট একবার পড়িয়া গেলে পরে যে কি দেখিব কিছুই জানি না। এই জন্য প্রাণের পিপাসা যে ইহ জীবনেই একবার তোমাকে দেখি। যদি ইহ জীবনে তোমায় দেখিতে পাই তবে ভবিষ্যতের ঘোর অন্ধকার আর আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না। কারণ তুমিই সেই অন্ধকারের একমাত্র আলোক।

নাচারী তোড়ি। ধামার।

নূতন প্রাণ দাও-প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে।

বিভাস চৌতাল।

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
তোমাপানে ধায় প্রাণ
সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে।

ভৈরবী—চৌতাল।

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে।

মহান্ জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে।
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্য-
লোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক।
তাঁহার আহ্বান রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে।

দেওগিরি বেলাবলী। আড়া চৌতাল।

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তমনাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে।
সঙ্গীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে
স্তব্ধ গগন পূর্ণ কর ব্রহ্ম নামে।

বেলাবলী। রূপক।

হে মন তাঁরে দেখ আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে।
সবারে ছাড়ি প্রভু কর তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখ তাঁর অধীনে।

বেলাবলী। চৌতাল।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়,
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্লবন,
মধুর বিহগকলধ্বনি।
কোথা হতে বহিল সহসা
প্রাণভরা প্রেম হিল্লোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে।
অতি আশ্চর্য্য দেখ সবে
দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে
অসীম জগতস্বামী বিরাজে
সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব জীবন,
ধন্য বিশ্ব জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম
তিনি ধন্য ধন্য।

ভৈরবী একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ
করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি
চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ,
সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে
জেনেও জানিনা,
ঐ, মঙ্গল রূপ ভুলি তাই
শোক সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব
শোভাসুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই
বাসনা অনুগামী।
মোহ বন্ধ ছিন্ন কর
কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে
থাক দিবস-যামী।

সাংবৎসরিক।

উপদেশ।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলেন,

"ধর্ম্মংচর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

ধর্ম্ম আচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধুস্বরূপ।

যে দেশে, যে কালে, যে অবস্থাতে যে কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে সেই কর্ম্ম করিবার আদেশ আমাদের প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিতে ঈশ্বর অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার সেই সকল আদেশের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া কল্যাণ পথে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিলে ছিন্নশিরা হইলেও তাঁহার অমৃত নিকেতনে জীবন লইয়া উপনীত হইতে পারি। ঈশ্বরাদিষ্ট এইরূপ কর্ত্তব্য সাধনের নামই ধর্ম্ম। মনুষ্যের যখন জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার বুদ্ধি

উজ্জ্বল হয় এবং তখন সে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ভূমি, সকল বিশ্বের এক মাত্র আশ্রয় স্বরূপ সত্যের শাশ্বত পরম পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া অমৃতের প্রতি স্থিরনিশ্চয় হয়। এই সত্য হইতেই ধর্ম্ম রসাকর্ষণ করিয়া জীবিত রহে ও বর্দ্ধিত হয়। সত্যই ধর্ম্মের প্রাণ ও সত্যই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। যিনি জ্ঞান-প্রসাদে সত্য এবং ধর্ম্মের এইরূপ অব্যবচ্ছেদ্য যোগ ও প্রসূতি-পুত্র সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারই ধর্ম্ম সত্যেতে অমৃতেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহার ধর্ম্ম সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সত্যের মাতৃস্তন হইতে যাহার ধর্ম্ম দুগ্ধ পান করিয়া পরিপুষ্ট হয় না, তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকলের ঝটিকা প্রবাহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শূন্যে উড়িয়া যায়। তিনি সংসারে যতই জয়লাভ করুন, আপাততঃ তাঁহার যতই শ্রীবৃদ্ধি হউক, চরমে তাঁহার দুঃখ ক্লেশ অনিবার্য্য, তাঁহার মুক্তির দ্বার যে নিবারিত তাহা একেবারে নিশ্চয়। ধনের জন্য যশের জন্য, খ্যাতি প্রতিপত্তি বা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ সাধনের জন্য তিনি ধর্ম্মাচরণে আরত থাকুন তাঁহার ধার্ম্মিক নাম দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হউক কিন্তু তাহা শূন্যগর্ভ ছায়াবৎ মৃত ধর্ম্ম! তাহাতে মোক্ষ সাধন হয় না, তাহাতে মনুষ্যের অনন্ত জীবন, অনন্ত উন্নতি উপার্জ্জিত হয় না। ধর্ম্মেতে সত্যের দ্বারা প্রাণ সঞ্চার না করিলে তাহাকে হনন করা হয়। যিনি এইরূপে ধর্ম্মকে হনন করেন ধর্ম্ম স্বয়ং হত হইয়া তাঁহার হন্তারকের প্রাণ বিনাশ করেন। অতএব ধর্ম্ম যেমন মানবাত্মার পরম সুহৃৎ, তাহার মুক্তি মঙ্গলের একমাত্র কারণ, তেমনি অসত্য-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম, অবমানিত ধর্ম্ম মানবাত্মার বিনাশের হেতু। যাহারা কেবল বিষয় সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মকে গ্রহণ করে, তাহাদের লক্ষ্য অতি নীচ।

অনন্ত শাশ্বত আনন্দপ্রদ ধর্ম্মের বিনিময়ে ক্ষুদ্র বিষয়-সুখ কদাপি প্রার্থনীয় হইতে পারে না। ধর্ম্মের উপযুক্ত লক্ষ্য ধর্ম্মের যোগ্য পুরস্কার কেবল সেই ধর্ম্মাবহ পবিত্র পরমেশ্বর। ধর্ম্ম যেমন সংসারে পবিত্রতা রক্ষা করেন, সেইরূপ ধর্ম্ম মোক্ষের সেতু হইয়া ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যান। বিষয়-সুখ ভোগের জন্য যে ধর্ম্ম তাহা অতি নিকৃষ্ট—ঈশ্বরের জন্য যে ধর্ম্ম তাহাই উৎকৃষ্ট। আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যে ধর্ম্মকে উপার্জ্জন ও রক্ষা করি, পার্থিব কোন বস্তুই তাহার পুরস্কার হইতে পারে না। বিষয়-সুখের জন্য কে প্রাণ দিতে পারে? কিন্তু ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়। বিষয়-সুখকে যদি ধর্ম্মের পুরস্কার মনে করা যায়, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করাই যদি ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম নামের উপযুক্ত নহে। যাহারা ধর্ম্মকে বিষয় ভোগের উপায় করে, তাহারাই ধর্ম্মকে হনন করে। আমরা এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এখানে আমাদের এক দিকে শ্রেয় আর এক দিকে প্রেয়; এক দিকে সংসার আর এক দিকে সত্যস্বরূপ পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর। এই দুয়েতে মনুষ্যের সমান অনুরাগ হয় না। সংসারে যাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি, ঈশ্বরে তাহাদের বিরাগ হয়, এবং ঈশ্বরে যাহাদের অনুরাগ সংসারে তাহাদের বিরাগ। বিষয়াসক্তি ও আত্মাভিমান প্রভৃতি ধর্ম্মপথের শত শত শত্রু মানবাত্মাকে সংসারের অন্ধকার গহ্বরে—বিষয় ব্যাপারের বিষময় মোহকবলে নিমজ্জিত করিবার জন্য সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছে। শরীরস্থ দুর্জ্জয় রিপু সকল প্রতি নিশ্বাসে ছিদ্রান্বেষণ করিতেছে—কখন তাহারা মনুষ্যকে অনৃতসঙ্গ দেখিতে পাইবে এবং সেই অবসরে আপনাদিগের অধীনে আনিয়া

মানবাত্মার দুর্গতি সাধন করিবে। এই সকল দুর্জ্জয় রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সত্যের আশ্রয় নিতান্তই আবশ্যক।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ সত্যেন লভ্যস্তপসা হোষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্তি ঋষয়োহ্যাপ্ত কামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।"

শান্ত-চিত্ত হইয়া সত্যকে জান, এবং সত্যকে জানিয়া সত্যের পথে চল; তবে সত্যের জয়ে তুমি জয়-যুক্ত হইবে। যদি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে, তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর, মিথ্যা ও কপটতা পরিহার কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, সেই সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আপ্তকাম নির্দ্দোষ ঋষিরা কেবল এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সত্য ধর্ম্মের প্রাণ, সত্য মানব আত্মার প্রাণ, সত্য সমস্ত জগতের প্রাণ। এই সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি বর্ত্তমান ছিলেন, এখন যিনি বর্ত্তমান থাকিয়া এই সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং এই সমুদায় বিশ্ব সংসার ধ্বংশ হইয়া গেলেও যিনি বর্ত্তমান থাকিবেন তিনিই সত্য। এই যে অসীম বিশ্ব যাহা আমাদের সম্মুখে অহরহ প্রতিভাত রহিয়াছে, এ সকল সেই ধ্রুব সত্যেরই বহির্বিকাশ। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান সত্যের প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। সেই সত্য হইতে বিযুক্ত হইলে ইহার আর কিছুই থাকে না। রজনীর অন্ধকার উপস্থিত হইলে আকাশস্থ এই বিচিত্র বর্ণ-সকল যেমন বিলুপ্ত হয় এবং প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে আবার সকলি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, সেইরূপ সেই সত্য স্বরূপের প্রেম যখন উদ্ভাসিত হয় তখন এই সকলি প্রকাশিত হয়। তিনিই পূর্ণ সত্য আর তাঁহা হইতে এ সকলি নিঃসৃত হইয়াছে। সেই সত্য হইতে এই সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী; সেই সত্য হইতে এই গিরি নদী বন; সেই সত্য হইতে এই পশু, পক্ষী, মনুষ্য; সেই সত্য হইতে এই শরীর ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা; সেই সত্য হইতে বাক্য; সেই সত্য হইতে এই প্রাণ, মন ও আত্মা। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" সেই দীপ্যমান সত্যের প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া এ সকলি প্রকাশ পাইতেছে। সেই সত্য হইতে বিযুক্ত হইলে আমাদের আর কি থাকে? আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। সত্যকে পরিত্যাগ করিলে কর্ণ বধির হয়; চক্ষু অন্ধ হয়; বাক্য স্তব্ধ হয়, প্রাণ অসাড় হয়; শরীর ভস্ম হয়; আত্মা শূন্য হয়; এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। অতএব

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং"

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, জীবনের কল্যাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না। এক সত্যকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যের সকলি চলিয়া গেল, এক সত্যকে রক্ষা করিলে মনুষ্যের সকলি রক্ষিত হইল। যিনি এই মূল সত্যকে জানিতে পারেন, তিনি আর সকল সত্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। সেই অপ্রতিম শাশ্বত সত্যের ভাব যাঁহার জ্ঞান-নেত্রে পরিস্ফুরিত হয় নাই, তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে সঞ্চরণ করে। লোকে এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য বা একটু ছিন্ন বস্ত্রের জন্য বা একটু প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনায়াসে ভূরি ভূরি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া ফেলে, ভূরি ভূরি অসৎ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া ফেলে; আপনার জীবনের সহিত পরকালের মঙ্গলের যে যোগ-সূত্র রহিয়াছে তাহা

ছিন্ন করিয়া আপনারই অধঃপাতের কারণ হয়।

উপনিষৎ পাঠে জানিতে পারি যে, অতি প্রাচীন কালে বাজশ্রবস নামে একজন পরম ত্যাগশীল দাতা বাস করিতেন। তিনি যজ্ঞ করিয়া আপনার সকল বিষয় বিভব বিতরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দানাবশিষ্ট যে কয়েকটি গাভী ছিল তাহা তিনি পুরোহিতদিগের দক্ষিণার্থ বাহির করেন। নচিকেতা নামে তাঁহার ক্ষুদ্র বালক তদ্দৃষ্টে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন যে, এই সকল গরু তাহাদের জীবনের শেষ জল পান করিয়া, শেষ তৃণ ভক্ষণ করিয়া এবং শেষ দুগ্ধ প্রদান করিয়া এখন কেবল মরণেরই অপেক্ষা করিতেছে। অতএব এই সকল গরু দান করিয়া পিতার সুখ শান্তিবিহীন অনন্দা নামক লোকই প্রাপ্তি হইবে। পিতার লাভের এইরূপ শোচনীয় ফল নিরীক্ষণ করিয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কাহাকে দান করিবেন? পিতা কোন উত্তর করিলেন না। বালক [illegible] ও পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করিয়া পিতাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া কহিলেন মৃত্যুকে তোমাকে প্রদান করিলাম। পিতার এই অস্বাভাবিক বাক্য শ্রবণে নচিকেতা স্বীয় জীবনের জন্য কিছুমাত্র ভাবনা করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে যে এক অনন্তের ভাবনার উদয় হইল তাহা নিতান্তই অলৌকিক ও অমর্ত্য দেব ভাবনা। তিনি ভাবিলেন, এই মায়াময় সংসারে পিতা কখন পুত্রকে যমভবনে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবেন না। তাঁহার ক্রোধ শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমার যমালয়ে যাত্রা রহিত করিবেন এবং সত্য ভঙ্গ হেতু মহা পাপে নিপতিত হইয়া আপনার অমঙ্গলের কারণ হইবেন। অতএব তিনি পিতাকে বুঝাইলেন—পিতঃ! অতীত কালে পিতা পিতামহাদি পুরুষদিগের এবং বর্ত্তমান কালের সাধু মনুষ্যদিগের প্রবৃত্তি সকল অনুধাবন করুন। কখন তাঁহারা অসত্য কথন দ্বারা আপনাকে পাপময় করেন নাই। আর মিথ্যা কথন দ্বারা কেহ কখন অমরত্ব লাভ করিতে পারেন না। ইহ লোকে মনুষ্যের এই শরীর শস্যের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করে ও শস্যের ন্যায় বিনষ্ট হয়। এই অনিত্য সংসারে অসত্য কথন দ্বারা কি লাভ? অতএব আমাকে যমভবনে প্রেরণ করিয়া সত্য রক্ষা করুন। অতঃপর সত্য রক্ষার্থ পিতার আদেশে নচিকেতা যমভবনে প্রেরিত হইলেন। সত্যের জন্য রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির মহারাজ [illegible] হইয়াও সপরিবারে বনবাসে গমন করেন। সত্যকে রক্ষা করিয়া অবশেষে তাঁহাদের সকলি রক্ষা হইয়াছিল। মনুষ্য জীবনে সত্যের এইরূপ মহান্ আদর্শ অতি বিরল। তখনকার [illegible] পিতা পুত্রকে যমভবনে এবং যমালয়সদৃশ হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রেরণ করিয়া সত্য রক্ষা করিতেন। এখনো কোন কোন এমন সাধু মহাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যই যাঁহার ব্রত। তিনি সত্যকে বিশিষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই সংসারের নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাহাকে অকাতরে রক্ষা করেন। সমুদায় পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও তিনি সত্যকে পরিত্যাগ করেন না। সত্য পালনে সত্য কথনে ও সত্যাচরণে তিনি যেমন আনন্দ প্রাপ্ত হন, এমন আনন্দ আর কিছুতে প্রাপ্ত হন না। তিনি সেই সত্য দেবতার প্রিয় উপাসক হইয়া বাহিরের সকল কঠোরতা ও সকল বিপদকে তুচ্ছ করেন। সত্য অগ্নিস্বরূপ। যিনি সত্যাচরণ করেন, তাঁহার

সমস্ত পাপ, সকল তাপ, সকল শোক, সকল দুঃখ সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায় ও তাঁহার আত্মা সত্যাগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইয়া বিমল জ্যোতি ধারণ করে। আত্মা সত্যো-জ্জ্বল হইলে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে করিতে অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়া যায়।

সত্য আদিতে, সত্য মধ্যে, সত্য অন্তে। "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ" সত্যের দ্বারা এই পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছে, সূর্য্যের দ্বারা আকাশে দ্যুলোক অবস্থিতি করিতেছে। সত্যেতে সকলি পূর্ণ। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। সত্যই বল। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি সত্যরত হইয়া সত্য কথা কহিবেন, সত্য ব্যবহার করিবেন এবং সত্যেতে আপনার ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের পরম মঙ্গল সাধন করিবেন। নতুবা সম্মুখে ভী-ষণ মৃত্যু।

হে পরমাত্মন্, বিষয়াশক্তির প্রবল আ-কর্ষণে মোহাক্রান্ত হইয়া আমরা সত্যের পথ নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগের আত্মাতে এমন বল দেও, যা-হাতে আমরা সকল প্রকার মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্যের আদেশ পালন করিতে পারি এবং জীবনকে সত্যে অলঙ্কৃত করিয়া তোমার পবিত্র চরণতলে উপনীত হইবার যোগ্য হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পূরবী—কাওয়ালি।

শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে এ কি খেলা!
আজি বহে অমৃত সমীরণ চল চল এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হের ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা।

কল্যাণ—চৌতাল।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস, এস মনোরঞ্জন।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ, কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি;
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে, শশি তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্বগঞ্জন।

মাঝ কেদারা—চৌতাল।

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,
তুমি কোথায় তুমি কোথায়!
হায় সকলি অন্ধকার চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্ব জগত,
তোমার প্রকাশে হৃদয় মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে।

কাফি—চৌতাল।

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি!
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে।
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে।
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে!

কাফি—কাওয়ালি।

জানি তুমি মঙ্গলময়
প্রতি পলকে পাই পরিচয়
সুখে রাখো, দুখে রাখো, যে বিধান হয়
কিছুতেই নাই ভয়।

আর যাই কর প্রভু
মোরে ত্যজিবে না কভু
এই মোর ভরসা—
এস প্রভু, এস প্রভু, হৃদয় মাঝে,
হবে শুভ নিশ্চয়।

কানাড়া—চৌতাল।

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক।
নিভৃত হৃদয় মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয় দান।

সিন্ধুড়া কাওয়ালী।

জরজর প্রাণে নাথ বরিষণ কর তব প্রেমসুধা,
নিবার এ হৃদয় দহন।
করহে মোচন কর সব পাপ মোহ
দূর কর বিষয় বাসনা।

শঙ্করা—চৌতাল।

জাগিতে হবে রে; মোহ নিদ্রা কভু না
রবে চিরদিন, ত্যজিতে হইবে সুখ শয়ন
অশনি ঘোষণে।
জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্ব্বভুবনে।
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্রনেত্র পাপ তিমিরে।

হুসেনীকানাড়া—কাওয়ালি।

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখোনা রেখোনা,
থেকোনা থেকোনা দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে হেরিব।

মেঘ—ধামার।

নিশীথ নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখিতারা।
সুপ্ত লোকলোকান্তরে সে আঁখি নিমেষহারা।
শ্বাসহীন মহাপ্রাণ মহাকাশে স্তম্ভমান,
অচেতন বিশ্বে বহে অনন্ত চেতনাধারা।
ছাড় যোগী নিদ্রাবেশ, হের আঁখি অনিমেষ,
মিল সে জাগ্রত প্রাণে, ভাঙ্গ এ কুহক-কারা।

সিন্ধু-ভৈরবি।

হৃদয় বেদনা বহিয়া
প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্য্যামী হৃদয়স্বামী
সকলি জানিছ হে,
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট
আর জানাইব কারে।
অপরাধ কত করেছি নাথ,
মোহ পাশে পড়ে,
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জ্জনা, কেহ
করিবে না সংসারে।
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন,
তোমার প্রেম পাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব,
তব মিলন অমৃত ধারে।
আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে
তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু লয়ে যাও
সংসার সাগর পারে।

দর্শন—সংহিতা।

সিদ্ধান্ত ॥৬॥

জ্ঞানের বীজ মাত্রা।

জ্ঞানের পরাক্ অংশ তাহার প্রত্যক্ অংশ হইতে বিবিক্ত হইতে পারে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। জ্ঞানের প্রত্যক্ এবং পরাক্ এই দুই অংশের সঙ্ঘাতই জ্ঞানের বীজ মাত্রা।

প্রমাণ।

যদি জ্ঞান-সন্নিধানে জ্ঞানের পরাক্

অংশ (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয়) তাহার প্রত্যক্ অংশ হইতে (অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে) বিচ্ছিন্ন হইতে পারিত, তাহা হইলে প্রত্যক্ অংশের উপলব্ধি ব্যতিরেকেও পরাক্ অংশ উপলব্ধি-সাধ্য হইত। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, তাহা হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান সন্নিধানে জ্ঞানের প্রত্যক্ অংশ তাহার পরাক্ অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

অপিচ; তাহাকেই বলে জ্ঞানের বীজ মাত্রা (অর্থাৎ ন্যূনতম মাত্রা) যাহার একটি কোন অংশ অপহৃত হইলে তাহার সমস্তটাই তিরোহিত হইয়া যায়। জ্ঞানের প্রত্যক্ এবং পরাক্ এই দুই অংশের সঙ্ঘাতই সেই বীজ মাত্রা; কারণ পরাক্ বর্জ্জিত প্রত্যক্—বিশেষ বর্জ্জিত সার্ব্বভৌমিক—যখন কোন জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে (তৃতীয় সিদ্ধান্ত দেখ) তখন কাজেই—জ্ঞানের মধ্য হইতে তাহার পরাক্ অংশটি অপসারিত হইলে তাহার প্রত্যেক্ অংশটিও জ্ঞান হইতে সরিয়া পড়ে সুতরাং জ্ঞান সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তেমনি আবার জ্ঞানের প্রত্যক্ অংশটি যদি জ্ঞান হইতে অপসারিত হয়, তবে যতই আমরা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিই না কেন যে, পরাক অংশটি এখনো জ্ঞানাভ্যন্তরে অবশিষ্ট আছে—কিছুতেই জ্ঞান টেঁকিতে পারে না। অতএব জ্ঞানের প্রত্যক্ এবং পরাক্ এই দুই অংশের সঙ্ঘাতেই জ্ঞানের বীজ-মাত্রা সংসিদ্ধ হয়।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের অবতারণার প্রয়োজনীয়তা ॥১॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত গুলির অনুবৃত্তি ভিন্ন স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত নহে—ইহা সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাকে স্বতন্ত্ররূপে প্রদর্শন করিবার বিশেষ কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ জ্ঞান-গত অবিচ্ছেদ্যতা কাহাকে বলে, আর, জ্ঞানের বীজ-মাত্রাই বা কাহাকে বলে, এই দুইটি বিষয় আজ পর্য্যন্ত কেহ ভালরূপ বুঝেন নাই; বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গাধীনে তাহা বুঝাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও জ্ঞানের প্রত্যক্ অংশ এবং পরাক্ অংশের পরস্পর অবিচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সাধারণ লোকের এবং মনোবিজ্ঞানের এই যে, একটি ভ্রম যে, আশয় (অর্থাৎ জ্ঞাতা) এবং বিষয় জ্ঞানের দুইটি স্বতন্ত্র বীজ-মাত্রা অর্থাৎ এ নহে যে, উভয়ে মিলিয়া জ্ঞানের একটি মাত্র বীজ-মাত্রা, এ ভ্রমটি দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে তেমন স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শিত এবং সংশোধিত হয় নাই। এই সকল কারণে জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটিকে একটি সুব্যক্ত স্থান অধিকার করিতে দেওয়া পরামর্শ-সিদ্ধ।

জ্ঞানগত অচ্ছেদ্যতা কাহাকে বলে ॥২॥

জ্ঞানাভ্যন্তরে দুই বস্তু তখনই পরস্পর হইতে বিচ্ছেদ্য বলিয়া অবধারিতব্য, যখন উভয়ের একটি ব্যতিরেকেও অন্যটি জ্ঞানে উপলব্ধি হইতে পারে। যথা;—জ্ঞানাভ্যন্তরে একটি বৃক্ষ এবং একটি প্রস্তর-খণ্ড উভয়ে পরস্পর হইতে বিচ্ছেদ্য; কেন? না যেহেতু প্রস্তর-খণ্ড ব্যতিরেকেও বৃক্ষ জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য; বৃক্ষ-ব্যতিরেকেও প্রস্তর-খণ্ড জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য। কিন্তু দুই বস্তু যদি এরূপ হয় যে, উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সত্ত্বেও—উভয়ের একটির সহিত আর-একটি মিশিয়া একীভূত হইতে না পারা সত্ত্বেও—উভয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর একটি জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে, তবে তখন-আর এরূপ বলা শোভা

পায় না যে, উভয়ে পরস্পর হইতে বিচ্ছেদ্য —তখন শুদ্ধ কেবল এইমাত্র বলাই সঙ্গত যে, উভয়ে পরস্পর হইতে বিবেক-সাধ্য। আশ্রয় এবং বিষয় এইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। উভয়ে সকল-সময়েই পরস্পর হইতে বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবিক্ত হইতে পারে, কিন্তু কোন কালেই পরস্পর হইতে বুদ্ধি-পূর্ব্বক বিয়োজিত হইতে পারে না। উভয়ে পরস্পর-হইতে—সুস্পষ্টরূপে বিবেক-সাধ্য—কিন্তু একান্তই অবিচ্ছেদ্য।

ভ্রমের সম্ভাবনা ॥ ৩ ॥

বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত উভয়েই একবাক্যে বলিতেছে যে, আত্মা তাহার জ্ঞাত বিষয় মাত্রেরই একটি অপরিহার্য্য অংশ। কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মা তাহার এরূপ বিষয় সকলের অংশ নহে যাহা দিগকে পুস্তক লেখনী আসন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ঠিক্ তাহার বিপরীত। পুস্তক প্রভৃতি ঐ যে-সকল বিষয়, উহাদের কেহই আত্মার সমগ্র জ্ঞাত বিষয় নহে, উহাদের প্রত্যেকেই জ্ঞাত বিষয়ের একাংশমাত্র—পরাক্ অংশ মাত্র। অতএব এই যে একটি কথা যে, আত্মা তাহার জ্ঞাত বিষয় মাত্রেরই অপরিহার্য্য অংশ, ইহার অর্থ এ নহে যে, আত্মা তাহার জ্ঞাত বিষয়ের ঐসকল পরাক্ অংশেরও অংশ। সজ্জন পাঠক! তোমার সম্মুখস্থিত পুস্তকটি তোমার জ্ঞাত বিষয়ের একাংশ মাত্র (পরাক্ অংশ); তাহার অবশিষ্ট অংশ (প্রত্যক্ অংশ) তুমি নিজেই। তোমার জ্ঞানের যথার্থ এবং সমগ্র বিষয়—পুস্তক বা লেখনী বা আর যাহা কিছু হউক তাহা এবং তাহার সঙ্গে তুমি আপনি। শেষোক্ত প্রত্যক্ অংশ (আত্মা) কিছু আর পূর্ব্বোক্ত পরাক্ অংশের (পুস্তকাদির) অংশ নহে;—তাহা হইতেই পারে না। কেননা একাংশকে অপরাংশ বলা, অথবা যাহা আরো অসঙ্গত একাংশকে অপরাংশের অংশ বলা, নিতান্তই স্ববিরোধী। জ্ঞানের এই যে দুইটি বিভিন্ন অংশ—জ্ঞানের এই যে দুইটি মৌলিক উপাদান—কিনা প্রত্যক্ এবং পরাক্, উভয়ে চিরকালের মত পরস্পর হইতে পৃথক্‌রূপে বিবেচ্য—বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়ম চিরকালের মত দুয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে—উভয়ের একটি আর একটির স্থান অধিকার করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ নহে। কিন্তু এই অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানই আবার উভয়কে জ্ঞানাভ্যন্তরে অকাট্য বন্ধন-সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

জ্ঞানে অবিচ্ছেদ্য স্বতন্ত্র এবং আকাশে অবিচ্ছেদ্য স্বতন্ত্র ॥ ৪ ॥

জ্ঞানে অবিচ্ছেদ্য বলিতে আকাশে অবিচ্ছেদ্য বুঝায় না। বস্তু-সকল আমাদের সন্নিকর্ষ হইতে আকাশে যতদূর ইচ্ছা ততদূর বিচ্ছিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হউক না কেন—জ্ঞানের অখণ্ডনীয় নিয়ম তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না। আকাশাভ্যন্তরে যাহাই হউক না কেন—এটা স্থির যে, আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে বস্তু-সকল আমাদের আপনাদের সন্নিকর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হইতে পারে না—জ্ঞানের অখণ্ডনীয় নিয়ম কোন ক্রমেই তাহা হইতে দেয় না। আশ্রয় এবং বিষয়, এইরূপ, আকাশাভ্যন্তরে পরস্পর হইতে বিচ্ছেদ্য বলিয়া অনেকে হয় তো মনে করেন যে, উভয়ে জ্ঞানাভ্যন্তরেও পরস্পর হইতে বিচ্ছেদ্য। কিন্তু আকাশে অবিচ্ছেদ্য স্বতন্ত্র এবং জ্ঞানে অবিচ্ছেদ্য স্বতন্ত্র। আকাশাভ্যন্তরে আশ্রয় এবং বিষয়ের মধ্যে প্রভূত বিচ্ছেদ বর্ত্তমান থাকিবার কোন বাধা নাই—শুদ্ধ কেবল জ্ঞানাভ্যন্তরে উভয়ে পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। আকাশ নিজেই আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে আমা

দের আপনাদের সন্নিকর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না,—অন্যে পরে কা কথা! আমি যাহাকে আকাশ বলি তাহা আমারই জ্ঞানাভ্যন্তরস্থিত আকাশ সুতরাং তাহা আমা হইতে বিচ্ছেদ্য নহে। অতএব আকাশস্থিত বস্তু সকলের মধ্যে সহস্র বিচ্ছেদ সত্ত্বেও সমস্ত আকাশ—এবং যখন যে কোন বস্তু আকাশে প্রতিভাত হয় সমস্তই —আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে আমাদের আপনাদের নিকট হইতে অবিচ্ছেদ্য। পাছে মায়াবাদে লিপ্ত হইতে হয় এই ভয়ে হয় তো তত্ত্বানুশীলকেরা বিষয় এবং আশয়ের জ্ঞানগত অবিচ্ছেদ্যতা স্বীকার করিতে এত কুণ্ঠিত; যেন প্রকৃত মায়াবাদ সত্যসত্যই বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব কোন কালে অস্বীকার করিয়াছে—এমন কথা বলিয়াছে যে, বাহ্য বস্তু সকল আমাদের বহিঃস্থিত নহে। মায়াবাদ কেবল এই কথাটি জিজ্ঞাসা করে যে, কাহাকে তুমি বাহ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ? তাহা কি অন্তরের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ-রহিত? তাহা যদি বল তবে ও তোমার কথা নিতান্তই অর্থ-শূন্য।

জ্ঞানের বীজ মাত্র। ৫॥

ন্যূনতম জ্ঞেয় যাহা জ্ঞানে উপলব্ধিযোগ্য তাহাই জ্ঞানের বীজ মাত্র বলিয়া উক্ত হয়। ন্যূনতম জ্ঞেয় বিষয় কি? না শুদ্ধ কেবল জ্ঞেয়ত্বের জন্য যতটুকু বিষয়ের প্রয়োজন ততটুকু মাত্র বিষয়—তাহার অধিক নহে। এ সম্বন্ধে দৃশ্য বিষয়ের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের বিশেষ একটু প্রভেদ আছে। ন্যূনতম দৃশ্য বিষয় যে কতটুকু তাহা স্থির করা অসাধ্য—কেননা তাহার কোন স্থিরতা নাই; এক ব্যক্তির চক্ষে যাহা ন্যূনতম দৃশ্য আর এক ব্যক্তির চক্ষে হয় তো তাহা অপেক্ষা আরো ক্ষুদ্র বস্তু ন্যূনতম দৃশ্য। দর্শকের দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে ন্যূনতম দৃশ্যের নড় চড় হয়। কিন্তু ন্যূনতম জ্ঞেয় যে কতটুকু, তাহা জ্ঞানের অখণ্ডনীয় নিয়ম প্রসাদাৎ একেবারেই স্থির-নির্দ্দিষ্ট। জ্ঞানের বীজ-মাত্রা—ন্যূনতম জ্ঞেয় বিষয়—কি? না আশয়-সমন্বিত কোন না কোন বিষয়; ইহা অপেক্ষা তাহা এক বিন্দুও ন্যূন হইতে পারে না, কেননা ইহার কমে কোন বিষয়ই জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। আশয় এবং বিষয় এ দুয়ের একটি জ্ঞান-বহির্ভূত হইলে দুইটিই জ্ঞান-বহির্ভূত হয়—তাহা হইলে জ্ঞানের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। দৃশ্য বিষয়ের ন্যূনতার সীমা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না; তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন—তাহা অপেক্ষা আরো ক্ষুদ্রতর বস্তু যন্ত্রাদির সাহায্যে দৃষ্টি-গোচর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের এই যে একটি অখণ্ডনীয় নিয়ম, কিনা আশয় + বিষয় ইহার কমে কোন কিছুই জ্ঞান-গম্য হইতে পারে না—এই নিয়মটি জ্ঞেয় বিষয়ের ন্যূনতার সীমা চিরকালের মত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে—কদাপি তাহার তিল মাত্রও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। জ্ঞানের ন্যূনতম মাত্র—বীজমাত্র—যাহা স্বতঃ উপলব্ধি যোগ্য, তাহা ঐ। বিষয় (তা সে—যে বিষয়ই হউক না কেন—মানসিকই হউক আর ভৌতিকই হউক—হাতিই হউক আর ঘোড়াই হউক—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না;—বিষয়) + আশয়, ইহাই ন্যূনতম স্বতো-জ্ঞেয়।

"স্বতোজ্ঞেয়" ইহার অর্থ কি। ৬॥

"স্বতোজ্ঞেয়" এই কথাটির তাৎপর্য্যের প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য! জ্ঞানের প্রত্যক্ অংশও জ্ঞানে উপলব্ধ হইতে পারে—জ্ঞানের পরাক্ অংশও জ্ঞানে উপলব্ধ হইতে পারে, কিন্তু উভয়ের কোনটিই স্বতঃ (অর্থাৎ অন্যটিকে ছাড়িয়া একাকী) জ্ঞানে উপলব্ধ হইতে পারে না; পরাক্

অংশ জ্ঞেয় বটে কিন্তু স্বতোজ্ঞেয় নহে—কেননা জ্ঞানে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য তাহা প্রত্যক্ অংশকে অপেক্ষা করে; প্রত্যক্ অংশও জ্ঞেয় বটে কিন্তু স্বতোজ্ঞেয় নহে—কেননা জ্ঞানে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য তাহা পরাক্ অংশকে অপেক্ষা করে; স্বতোজ্ঞেয় তবে কি? না প্রত্যক্ এবং পরাক্ এই দুই অংশের সমষ্টি—আশয় এবং কোন-না-কোন বিষয় এই দুয়ের সমষ্টি, ইহাই স্বতোজ্ঞেয়; কেননা ইহা জ্ঞানে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য দ্বিতীয় কোন কিছুকে অপেক্ষা করে না। অতএব ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয়ই জ্ঞানের বীজ মাত্রা, এবং তাহা আর কিছু নয়—আশয় × কোন-না-কোন বিষয়। মনে কর তিল-পরিমাণ ক্ষুদ্র বস্তু পর্য্যন্তই আমাদের দৃষ্টি চলে—তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্তু আমার দৃষ্টির অতীত; তাহা হইলে আমি মোটা-মুটি বলিতে পারি যে, তিল আমার নিকট ক্ষুদ্রতম দৃশ্য অথবা দৃশ্যের বীজ-মাত্রা; কিন্তু সব দিক্ বাঁচাইয়া বলিতে হইলে ঐ কথা-টির সঙ্গে "স্বতঃ" এই আর একটি কথা জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। কেননা, "তিল আমার নিকট ক্ষুদ্রতম দৃশ্য" ইহার অর্থ এই যে, তিল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্তু আমার দৃষ্টিগম্য নহে—তিলের অর্দ্ধাংশ আমার দৃষ্টিগম্য নহে; কিন্তু যখন আমি তিল দেখিতেছি তখন আমি সেই সঙ্গে তাহার অর্দ্ধাংশও দেখিতেছি—তবে আর কেমন করিয়া বলি যে, তিল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্তু আমার দৃষ্টি-গম্য নহে অথবা যাহা একই কথা—তিল আমার নিকট ক্ষুদ্রতম দৃশ্য বস্তু? তিলের অর্দ্ধাংশ কি তিল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নহে? অতএব এ কথা সর্ব্বাংশে ঠিক্ নহে যে, তিল আমার নিকট ক্ষুদ্রতম দৃশ্য; এই কথাই ঠিক্ যে, তিল আমার নিকট ক্ষুদ্রতম স্বতো-দৃশ্য; কেননা, তিলের একাংশ যদিচ তাহার অপর অংশের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আ-মার দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত হইতে পারে, কিন্তু তাহার কোন অংশই স্বতঃ (অর্থাৎ অপর অংশকে ছাড়িয়া একাকী) তাহা পারে না; সুতরাং তিলের কোন অংশই আমার নিকট স্বতোদৃশ্য নহে,—অতএব তিল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্তু আমার নিকট স্বতোদৃশ্য নহে; তবেই হইতেছে—যে, তিল আমার নিকট ক্ষুদ্রতম স্বতোদৃশ্য। এই কারণে আশয় এবং কোন-না-কোন বিষয় এ দুয়ের সঙ্ঘাতকে ন্যূনতম জ্ঞেয় না বলিয়া ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয় বলিলে তাহার উপর আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না। আশয় যখনই জ্ঞান-পথে আবির্ভূত হয়, তখনই তাহা কোন-না-কোন বিষয়ের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আবির্ভূত হয়—বিষয় যখনই জ্ঞান-পথে আবির্ভূত হয় তখনই তাহা আশয়ের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আবির্ভূত হয়, উভ-য়ের কোনটিই স্বতঃ জ্ঞানে আবির্ভূত হইতে পারে না। আশয় এবং কোন-না-কোন বিষয় দুয়ের সমষ্টিই স্বতঃ উপলব্ধি-গম্য—ইহাই ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয়।

জ্ঞানের বীজ মাত্রার অর্থ আরো বিবরীকৃত হইতেছে। ৷

জ্ঞানের বীজমাত্রার অভ্যন্তরে যতই কেন বিভিন্ন অবয়ব অন্তর্ভূত থাকুক্ না—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; তাহাতে বীজ-মাত্রার বীজত্বের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। জ্ঞানের বীজ-মাত্রার অবয়ব-সংখ্যা যতই অধিক হউক্ না কেন—সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া তাহা একটি-মাত্র জ্ঞান, তাহার অধিক নহে। আশয়-সমন্বিত যে কোন বিষয়ই হউক, আর, যতগুলি বিষয়ই হউক্, তদীয় জ্ঞান একের অধিক নহে। যদি আশয়-ব্যতিরিক্ত বিষয়ের অথবা বিষয়-ব্যতিরিক্ত আশয়ের জ্ঞান সম্ভব হইত, তাহা হইলেই বলা যা-

হইতে পারিত যে, আমরা যাহাকে জ্ঞানের বীজ-মাত্রা বলিতেছি তাহা একাধিক জ্ঞান। অতএব আশয় এবং বিষয় যদিও জ্ঞানের দুইটি বিভিন্ন অবয়ব বলিয়া পরস্পর-হইতে বিবিক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ অবয়ব-দ্বয়ের দ্বৈত জ্ঞানের একত্বেরই প্রতিপাদক; কেননা, ঐ দুই অবয়বের সংযোগেই সমগ্র একটি জ্ঞান দাঁড়ায়, আর, উভয়ের একটির বিয়োগেই সেই সমগ্র জ্ঞান-টি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

জ্ঞানের বীজ-মাত্রা এবং মহামাত্রা দুয়ের প্রভেদ ॥ ৮ ॥

পরাক্ অংশের বৃদ্ধিতে জ্ঞানের ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয়ের মূলের কিছুই বৃদ্ধি হয় না—কেবল অন্যাংশের ডালপালারই যাহা কিছু বৃদ্ধি হয়। লৌকিক বিচারে, বালুকণা + আমি ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ড + আমি প্রলয় বৃহৎ। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের বিচারে, দুয়ের প্রভেদ অতীব অকিঞ্চিৎকর। আশয় সংক্ষেপে আ বলিয়া এবং বিষয় বি বলিয়া নির্দিষ্ট হউক; আ কর্তৃক আ + বি উপলব্ধ হইলেই জ্ঞান-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়—জ্ঞান সিদ্ধির জন্য আর কিছুই আবশ্যক হয় না; তাহা হইলেই সমগ্র একটি জ্ঞান—ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয়—জ্ঞাতার হস্তগত হয়। বি'র সঙ্গে আর-যত জনা ইচ্ছা ততগুলা বি জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু একটা বি'ও বি—সহস্রেও বি—জ্ঞানের চক্ষে দুয়ের প্রভেদ কোন কার্য্যেরই নহে। আ + সহস্র বি—ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয় অপেক্ষা ব্যবহারতঃ যতই অধিক হউক্ না কেন—তত্ত্বতঃ তাহা-অপেক্ষা উহা একটুও অধিক নহে। জ্ঞানের বীজ-মাত্রা (অর্থাৎ ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয়), এবং মহামাত্রা (অর্থাৎ বৃহত্তম স্বতোজ্ঞেয়), দুয়ের ভেদ-দৃষ্টি লৌকিক ব্যবহারের পক্ষে সুবিধা-জনক হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের চক্ষে দুইই সমান।

ষষ্ঠ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ৯ ॥

জ্ঞানাভ্যন্তরে জ্ঞানের পরাক্ অংশ এবং প্রত্যক্ অংশ উভয়ে পরস্পর হইতে বিচ্ছেদ্য। আশয় জ্ঞান এবং বিষয়-জ্ঞান উভয়ের প্রত্যেকেই সমগ্র একটি জ্ঞান। আশয় + বিষয় জ্ঞানের একটি-মাত্র বীজ-মাত্রা নহে—কিন্তু দুইটি বীজ-মাত্রা; অথবা যাহা একই কথা—দুয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর-একটি জ্ঞানে স্বতঃ উপলব্ধ হইতে পারে।

ইহা লৌকিক চিন্তার অনবধানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥

এই প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে লৌকিক চিন্তার অনবধানতা মূর্ত্তিমান্ দেখা দিতেছে। লৌকিক ব্যবহার কালে, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জ্ঞেয় বিষয়-সকলকে আমাদের আপনাদের হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন বলিয়া অবধারণ করি। আমরা মনে করি যে, আমরা আপনাকে না জানিয়াও বহির্বিষয় জানিতে পারি এবং জানিয়া থাকি। আমরা বহির্বিষয়-সকলকে আমাদের আপনাদের সম্বন্ধ-হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিতে একটুও ভার বোধ করি না। আমরা সচ্ছন্দে মনে মনে সিদ্ধান্ত করি যে, জ্ঞানের একটি বীজমাত্রা—বহির্বিষয়, আর-একটি বীজমাত্রা—আমরা আপনারা। এরূপ সিদ্ধান্ত জ্ঞানের অখণ্ডনীয় নিয়মের বিরোধী—সুতরাং লৌকিক অনবধানতা ভিন্ন উহা আর কিছুই হইতে পারে না। এই সকল দুরপণেয় অনবধানতার প্রতিবিধানের জন্যই তত্ত্বজ্ঞান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মনোবিজ্ঞান আরো ভ্রান্ত ॥ ১১ ॥

যেমন ক্রমাগত দেখিয়া আসা যাইতেছে—মনোবিজ্ঞান লৌকিক চিন্তা অপেক্ষাও ভ্রমাত্মক। মনোবিজ্ঞান একেতো

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করেন, তাহাতে আবার প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আরো গভীর-তর ভ্রমকূপে নিমগ্ন হ'ন। মনোবিজ্ঞান মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করেন; তাহাতে লাভের মধ্যে হয় এই যে, প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের ভিতর যে একটি স্ববিরোধ প্রচ্ছন্ন আছে—তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া মনোবিজ্ঞান অতিরিক্ত আর-একটি স্ববিরোধে জড়াইয়া পড়েন। সেটি এই;—আশয় এবং বিষয় যদিও জ্ঞানাভ্যন্তরে অবিচ্ছেদ্য, তথাপি তাহা জ্ঞানের একটি-মাত্র বীজ-মাত্রা নহে কিন্তু তাহা দুইটি স্বতন্ত্র বীজ-মাত্রা। এ কথাটির স্ববিরোধিতা এরূপ সুস্পষ্ট যে, তাহার বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। তথাপি, কি সূত্র হইতে এই মহৎ ভ্রমটির উৎপত্তি হইয়াছে—তাহা প্রদর্শন করা নিতান্ত নিষ্ফল নহে।

মনোবিজ্ঞানের ভ্রমের মূল ॥ ১২ ॥

মনোবিজ্ঞানীর উভয়-সঙ্কট। তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, জ্ঞানাভ্যন্তর-স্থিত আশয় এবং বিষয়ের পরস্পর অবিচ্ছেদ্যতা স্পষ্টরূপে অস্বীকার করিলে জ্ঞানের অখণ্ডনীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়; অথচ, যদি তিনি তাহা স্বীকার করেন, তবে আশয় এবং বিষয় উভয়ের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সত্তার গুরুতর একটি প্রমাণ (গুরুতর কেবল নয়—অদ্বিতীয় একটি প্রমাণ) একেবারেই তাঁহার হাত-ছাড়া হয়। এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দুই দিক্ বাঁচাইবার চেষ্টা করেন; এক দিকে তিনি বলেন যে, বিষয় এবং আশয় জ্ঞানাভ্যন্তরে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য (ইহাতে জ্ঞানের অখণ্ডনীয় নিয়মের মান রক্ষা করা হয়); আর-এক দিকে তিনি বলেন যে, বিষয়-জ্ঞান এবং আশয়-জ্ঞান জ্ঞানের দুইটি স্বতন্ত্র বীজ-মাত্রা (ইহাতে বিষয় এবং আশয়ের পৃথক্ সত্তার বলবৎ একটি প্রমাণ হস্তে রাখা হয়)। তাঁহার এই দুইটি কথা পরস্পর বিরোধী—কেননা জ্ঞানাভ্যন্তরে যদি বিষয় এবং আশয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্যই হয়, তবে কেমন করিয়া একটিকে ছাড়িয়া আর-একটি স্বতন্ত্র-রূপে জ্ঞানে উপলব্ধ হইবে? মনোবিজ্ঞানী, এইরূপে, দুই কূল বাঁচাইতে গিয়া দুই কূল হারাইয়া বসিয়া থাকেন; তাঁহার এতটা মনের দৃঢ়তা নাই যে, তিনি ফলাফল-নিরপেক্ষ হইয়া একান্তঃকরণে সত্যের পক্ষ আশ্রয় করেন।

জড়-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের প্রভেদ ॥ ১৩ ॥

বিজ্ঞান সচরাচর এই যে দুইটি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে—কিনা মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান—উভয়ের প্রভেদকে যদি শব্দ-ঘটিত ও কতক পরিমাণে কার্য্যের সুবিধা-জনক এ ভিন্ন বেশী আর কিছু মনে করা যায়, তবে সে প্রভেদ মনোবিজ্ঞানের ঐ ভ্রমটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বিষয় এবং আশয়ের দ্বৈতভাবকে সম্যক্ দ্বৈতভাব মনে করা—ঐকান্তিক দ্বৈতভাব মনে করা (মনোবিজ্ঞান যেমন অনেক সময় করিয়া থাকেন) অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা দ্বৈতভাব যাহা একত্ব হইতে একেবারেই বিচ্যুত—এইরূপ মনে করা, আর, জ্ঞানালোক একেবারেই নির্ব্বাণ করিয়া ফেলা—একই কথা। কেননা, জ্ঞানকে তাহার অখণ্ডনীয় নিয়মের প্রতিকূলে চালাইলে—প্রদীপকে প্রবাতের প্রতিকূলে লইয়া যাইলে—তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে না তো আর কি? কেহ যদি মনে করেন যে, মনোবিজ্ঞানের উপর আমরা নিতান্তই নির্দ্দয়রূপে খড়্গহস্ত, তবে তাঁহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, মনোবিজ্ঞান যখন আপনার অধিকার উল্লঙ্ঘন করিয়া জ্ঞানের মৌলিক ব্যাপার সকলেতে হস্তার্পণ করিতে

যা'ন্—তত্ত্বজ্ঞান প্রদেশে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে যা'ন্—তখন তাঁহার সেই অনধিকার চর্চা কাজেই আমাদের তিরস্কার ভাজন, এবং তাহার অকিঞ্চিৎকরতা প্রকাশ করিয়া দেখানো কাজেই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু মনোবিজ্ঞান যখন আপনার অধিকারাভ্যন্তরে লাগিয়া থাকেন—অর্থাৎ যখন ভাবানুবন্ধিতা (Association of Ideas) প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকলের পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, তখন তাঁহার সেরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে কেহ যে কোন কথা বলিবেন তাহার জো নাই।

ষষ্ঠ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের দুর্ব্বলতা ॥ ১৪ ॥

মনোবিজ্ঞান ১১ পরিচ্ছেদোক্ত নিতান্ত অযৌক্তিক মাধ্যমিক পথই অবলম্বন করুন আর তাহা অপেক্ষা অল্প অযৌক্তিক ষষ্ঠ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তই অবলম্বন করুন—ফলে দুইই সমান। ষষ্ঠ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের অকিঞ্চিৎকরতা যথেষ্ট প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথম সিদ্ধান্তকে ধরাশায়ী করিতে না পারিলে উক্ত প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের কোথাও আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, আমাদের আর কোন কথা বলিবার নাই, কেবল তাহার গোড়ার যুক্তির সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখনো বলিবার আছে।

জ্ঞানাভ্যন্তরে এমন অনেক বিষয়-যুগল আছে যাহা অবিচ্ছেদ্য অথচ বিবেকসাধ্য ॥ ১৫ ॥

আশয় এবং বিষয় জ্ঞানাভ্যন্তরে পরস্পর হইতে বিবিক্ত হইতে পারে, এই সত্যটিই ষষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভ্রমের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে সহসা এইরূপ ভ্রমে পতিত হয় যে, উভয়ে যখন পরস্পর হইতে বিবিক্ত হইতে পারে, তখন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নও হইতে পারে। আবার, "উভয়ে জ্ঞানাভ্যন্তরে পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য" এ কথার অর্থ অনেকে হয় তো এইরূপ মনে করেন যে, জ্ঞানাভ্যন্তরে বিষয় এবং আশয়ের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়া উভয়েই একাকারে পরিণত। এরূপ যদি কেহ মনে করেন তবে তাহাতে তাঁহার অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। এমন অনেক বিষয়-যুগল আছে, যাহা পরস্পর হইতে বিলক্ষণই বিবিক্ত হইতে পারে, অথচ উভয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে। আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে একটি যষ্টির কোন একটি প্রান্ত তাহার দ্বিতীয় প্রান্ত হইতে অনায়াসে বিবিক্ত হইতে পারে কিন্তু তাহার কোন প্রান্তই দ্বিতীয় প্রান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া—দ্বিতীয়-বিহীন হইয়া—জ্ঞানাভ্যন্তরে একাকী থাকিতে পারে না। যষ্টি অথচ তাহার একটি মাত্র প্রান্ত ভিন্ন দ্বিতীয় প্রান্ত নাই—ইহা কোন জ্ঞানেরই উপলব্ধি-গম্য নহে। অবশ্য, যষ্টির বিশেষ কোন একটি প্রান্তকে কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নূতন একটি প্রান্ত সেই কর্ত্তিত প্রান্তের স্থলাভিষিক্ত হইবে; এ ভিন্ন, কোন কালেই এরূপ হইতে পারে না যে, যষ্টির শুদ্ধ কেবল একটি-মাত্র প্রান্তই অবশিষ্ট আছে—তাহার দ্বিতীয় প্রান্ত আদবেই নাই। তেমনি জ্ঞান হইতে জ্ঞানের কোন-একটি বিষয় অপসারিত হইবা মাত্র আর কোন-না কোন বিষয় আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে; এ ভিন্ন কোন কালেই এরূপ হইতে পারে না যে, জ্ঞানাভ্যন্তরে শুদ্ধ কেবল আশয় মাত্রই অবশিষ্ট আছে—বিষয় আদবেই নাই। পুনশ্চ যষ্টির প্রান্ত মাত্রই দ্বিতীয়-সাপেক্ষ—সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া উহার একপ্রান্ত উহার অপর প্রান্ত নহে; এক দিকে যেমন—যষ্টির এক প্রান্ত বিদ্যমান সত্ত্বে দ্বিতীয় প্রান্ত কিছুতেই ঘুচিবার নহে, আর-এক দিকে তেমনি দুই প্রান্তের মধ্যস্থিত ব্যবধান কিছুতেই বিলুপ্ত

হইবার নহে। তেমনি, জ্ঞানাভ্যন্তরে বিষয় এবং আশয় যদিচ পরস্পর সাপেক্ষ তথাপি উভয়ের মধ্যগত প্রভেদ কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে।

দ্বিতীয় উদাহরণ॥ ১৭॥

চক্রের পরিধি এবং কেন্দ্র পরস্পর হইতে বিলক্ষণই-বিবিক্ত হইতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। জ্যামিতিক চক্র—অথচ তাহার পরিধি আছে কেন্দ্র নাই, অথবা কেন্দ্র আছে পরিধি নাই, ইহা কোন ক্রমেই জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া কে এরূপ মনে করে যে কেন্দ্রই পরিধি অথবা পরিধিই কেন্দ্র? তবে কেন লোকে শুধু শুধু এরূপ মনে করিতে যাইবে যে, জ্ঞানের সমগ্র একটি ক্রিয়া—যাহার পরাক্ এবং প্রত্যক্ অংশ পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য—তাহার প্রত্যক অংশই তাহার পরাক্ অংশ অথবা তাহার পরাক্ অংশই তাহার প্রত্যক অংশ? উভয়ে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বলিয়া যে, উভয়ের প্রভেদও অস্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কিরূপ ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া লোকে আমাদের এই ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে এবং ষষ্ঠ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তে ঘাড় পাতিয়া দেয়, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে; তাহা আর কিছু নয়—বিচ্ছিন্ন এবং বিবিক্ত এ দুয়ের প্রভেদের প্রতি অনবধানতা।

ফল কথা॥ ১৮॥

ফল কথা এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার কোন জ্ঞানের বিষয়কে কোন কালেই অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারে না। যে-কোন জ্ঞানে যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, তাহা গোড়া হইতেই অহংরসে নিষিক্ত, এবং সেই আদিম নিষেকের সৌরভ চিরকালই তাহাতে লাগিয়া থাকে—তাহা এক তিলও তাহার সঙ্গ ছাড়ে না। জ্ঞানের বিষয় যাহাই হউক্ না কেন—ভৌতিকই হউক্ আর মানসিকই হউক্—সহস্র চেষ্টা করিলেও আমরা তাহাকে অহংপদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহা আমাদের একটা ঘর-গড়া সামগ্রী নহে যে, চাই ইহাকে আমরা গ্রহণ করি—চাই ফেলিয়া দিই,—ইহা জ্ঞানের একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য—অনতিক্রমনীয় নিয়ম; ইহাতে মস্তক অবনত না করিয়া আমরা কিছুতেই পার পাইতে পারি না।

সত্তা-সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হইতেছে না॥ ১৯॥

এটি যেন মনে থাকে যে, জ্ঞানের আশয় এবং বিষয় বাস্তবিক দুইটি বিভিন্ন বীজ-মাত্র কি না—সে বিষয়ে আমরা একেবারেই নীরব। আমরা কেবল এই মাত্র বলিয়াছি এবং বলিতেছি যে, উভয়ে মিলিয়া—জ্ঞানের—একটি মাত্র বীজমাত্রা। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কালে বৈদ্য-শাস্ত্রের আলোচনা যেমন অপ্রাসঙ্গিক—জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যা কালে অস্তি-নাস্তি বিষয়ক আলোচনাও সেইরূপ। আগে তো "জ্ঞানে কি আমরা জানি—কি আমরা জানি না" তাহা খুঁজিয়া বাহির করা হউক্—তাহার পরে তখন "কি আছে—কি নাই" তাহার অন্বেষণের একটা ব্যবস্থা করা যাইবে। একান্ত পক্ষেই জ্ঞানের অগম্য কি—তাহা পরবর্তী তিন-টি সিদ্ধান্তে বিবৃত করিয়া দেখানো হইতেছে।

মহদ্বাক্য।

ভাল কাজ করিবার জন্য যদি তোমাকে কুবাক্য শুনিতে হয় ও অপমানিত হইতে হয় তাহা হইলে ক্ষেদ করিও না, কেন না

সৎকার্য্য জন্য কষ্ট সহ্য করিতে দেবতারাও অসম্মত হয়েন না।

যিনি জানিয়াছেন যে আত্মা আছে, ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে, তিনি কখন ধর্ম্ম সাধন জন্য প্রাণ দিতে সঙ্কুচিত হয়েন না।

আমাদিগের যে কষ্ট বাস্তবিকই অসহ্য তাহা আমাদিগকে কখন সহ্য করিতে হয় না—কেন না অসহ্য কষ্ট পাইবার পূর্ব্বেই আমাদিগের আত্মা দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে।

যশ বা অযশের কোন মূল্য নাই। কোন মানুষ কখন অপর কোন মানুষের যথার্থ গুণ বা দোষ জানিতে পারে না—তাহা কেবল অন্তর্যামী অদ্বিতীয় পুরুষই জানেন। অতএব আমাদের যশ বা অযশ কখন আমাদিগের প্রকৃত দোষ বা গুণের পরিমাণ নহে।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যশের জন্য লালায়িত বা অযশের জন্য দুঃখিত না হইয়া উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন।

জীবন অভিনয় নহে, সংগ্রাম। যে নাটকের যে অংশ অভিনয় করে সে পূর্ব্ব হইতেই জানে পরে কি করিতে হইবে, কিন্তু সংগ্রামে ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে কিছুরই স্থিরতা থাকে না। অতএব জীবন সংগ্রাম, অভিনয় নহে।

শারীরিক কষ্টের জন্য যখন মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা হয়, তখন স্মরণ করিও যে কষ্টে কেবল শরীর মাত্র দুঃখ পায়, কিন্তু মিথ্যা বলাতে অমর আত্মা মলিন ও অপবিত্র হয়।

দুঃখের সময় আপনার মধ্যে প্রবেশ করিও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে তথায় একটী অনন্ত সুখের প্রস্রবণ বিরাজ করিতেছে।

সকল বস্তুই একটী না একটা উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। চন্দ্র সূর্য্যের উদ্দেশ্য আছে, আবার কীট পতঙ্গেরও উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার কি উদ্দেশ্য? সুখ ভোগই কি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য? যদি তোমার সহজ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে তদপেক্ষা তোমার উদ্দেশ্য মহত্তর।

যাহা কিছু আমার ভাগ্যে ঘটে, আমি ঈশ্বরকে ডাকিয়া তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করি। তাহা কি তুমি পারিবে না?

যাহার জন্য আমরা সৃষ্ট হইয়াছি তাহা সাধন করিলেই সুখ, সন্তোষ ও আনন্দ পাই, অন্য পথে সুখ সন্তোষ ও আনন্দ কোথায়?

কর্ত্তব্য সাধন কর, আর কিছু চিন্তা করিও না।

প্রত্যেক ঘটনার প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কর, এবং বুঝিয়া জ্ঞানী হও।

যিনি এই বিশ্ব সংসারের স্রষ্টা তিনি জ্ঞানময় ও করুণাময়—এই পরম সত্য যদি সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে পার, তাহা হইলে তোমার আর ভয় থাকিবে না, দুঃখ থাকিবে না, দুশ্চিন্তা থাকিবে না।

প্রত্যেক দিন আমাদের আয়ু হ্রাস হইতেছে ইহা জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই তাহারা সংসার ও শরীর লইয়া এত ব্যস্ত—তাই তাহারা আত্মা ও আধ্যাত্মিক জগৎ ভুলিয়া থাকে।

আমরা এরূপ আলস্যের সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি, সময়ের এরূপ অপব্যবহার করি যেন আমরা এ পৃথিবীতে দশ হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিব। এ ভ্রম দূর করিয়া উপলব্ধি কর যে মৃত্যু তোমার পার্শ্বেই দণ্ডায়মান।

কোন ভবিষ্যৎজ্ঞ দেবতা যদি তোমাকে আসিয়া বলেন যে কল্যই তোমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে তোমার কি দশা হয়? ইহা ভাবিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিবে।

যদি বিশেষ করিয়া জান যে জীবন অনন্ত, যে আত্মা [illegible] তাহা হইলে কোন বিষয়েই তোমার নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই—কেননা কোন মানবাত্মা এরূপ ক্ষীণ নহে যে অনন্তকালের মধ্যে বল না পাইবে, এরূপ অপবিত্র নহে যে অনন্তকাল মধ্যে পবিত্র না হইতে পারিবে; এরূপ অজ্ঞান নহে যে অনন্তকাল মধ্যে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিবে।

তোমার কার্য্য, তোমার আচার ব্যবহার, তোমার হাব ভাব তোমার চিন্তার বাহ্য চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিন্তাকে নিয়মিত কর, পবিত্র বিশুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার কার্য্য, আচার ব্যবহার ও হাব ভাব নিয়মিত হইবে এবং পবিত্র ও বিশুদ্ধ হইবে।

যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সে দেশ মন্দ হইলেও তাহাকে ভালবাস, যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছ তাহা তোমার মনোমত না হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে চেষ্টা কর, যে সকল লোকের মধ্যে তোমাকে বাস করিতে হয় তাহারা অযোগ্য হইলেও তাহাদিগকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি কর।

প্রত্যহ যেন আমরা আমাদিগের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে চেষ্টা করি, তাহা না হইলে তাহা ক্ষীণ হইয়া যাইবে।

মানুষের চোখে ধাঁধা দিয়া যেন আমরা উল্লসিত না হই, কেননা, মানুষ আমাদিগের বিচারক নহে। যিনি আমাদিগের বিচারক তিনি সর্ব্বান্তর্যামী তাঁহার নিকট কিছুই অজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের আত্মার যে আলোক আছে তাহা ক্রমে নিষ্প্রভ হইতেছে—তাহাকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রসাদ ভিক্ষা কর।

আমরা অনেক সময় রিপু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মনে করি যে উৎসাহ আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছে।

যদি তোমার হৃদয় পবিত্র হয় তাহা হইলে প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু তোমার নিকট সত্যের দর্পণ ও পবিত্রতার শিক্ষাদাতারূপে আবির্ভূত হইবে।

এ জগতে এমন কোন সৃষ্ট বস্তু নাই যাহা ঈশ্বরের দয়া ও মঙ্গলময় ভাব প্রকাশ না করে।

পবিত্র হৃদয় যাঁহার, তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা সর্ব্বদা উন্মুক্ত ও দৃশ্যমান।

যদি অন্তর বিশুদ্ধ ও পবিত্র থাকে তাহা হইলে অন্তর্জ্জগতের সত্য উপলব্ধি করা অতি সহজসাধ্য হইবে।

যদি জগতে আনন্দ থাকে তাহা হইলে যাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ তিনিই তাহা উপভোগ করিতে পারেন।

আমরা অনেক সময়ে অপকার্য্য করি, কিন্তু সরল ভাবে তাহা স্বীকার না করিয়া তাহা লুকাইতে গিয়া আমাদের পাপ ভার আরও বৃদ্ধি করি।

আমরা অন্যের সামান্য দোষ দেখিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করি, কিন্তু আমাদিগের নিজের বড় বড় দোষ অগ্রাহ্য করিয়া থাকি।

অন্যে আমাদিগকে তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে যে কষ্ট দেয় তাহার জন্য আমরা সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করি, কিন্তু আমরা অন্যকে জানিয়া যে কষ্ট দিই তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না।

যে ব্যক্তি আত্ম পরীক্ষা করে, সে আপ-

ন্যার দোষ দেখিতে পায়, সে অন্যের দোষ গুণ বিচারে পক্ষপাতী হয় না।

যাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ নাই এরূপ বস্তু তোমার নিকট মহৎ, বা উচ্চ বা সুখকর বলিয়া যেন প্রতীয়মান না হয়।

নূতন পুস্তক।

বৈশেষিক দর্শন। কণাদ মহর্ষি প্রণীত।

পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার স্বরচিত ভাষ্যের সহিত ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষে যে এক সময় বিজ্ঞান চর্চ্চার সূত্রপাত হইয়াছিল এই দর্শনে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তর্কালঙ্কার মহাশয় এ দেশের সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীন ভাষ্য থাকিলেও তাঁহার কৃত ভাষ্য যে অনেক উপকারে আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এ সময় এইরূপ একখানি কঠিন গ্রন্থের ভাষ্য করা বড় সহজ কথা নয়। ফলত আমরা এই ভাষ্য পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। বর্ত্তমানে যে এমন দক্ষতার সহিত প্রাচীন রীতিতে সংস্কৃত রচনা হইতে পারে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লেখনীই তাহা প্রদর্শন করিয়াছে।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। সন ১২৯৫।

এরূপ অল্প মূল্যে এমন উৎকৃষ্ট পঞ্জিকা আর পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৩শে ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২০৯১৸০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩১৯৭৸৶৫
সমষ্টি	৫২৮৯॥৶৫
ব্যয় ...	২৩৩২। ১৫
স্থিত	২৯৫৭।৶১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৮৩ ⁄ ১০
মাসিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	১৲
" " শ্রীনাথ মিত্র	১৷০
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
" " শ্রীনাথ মিত্র	২৲
" " ভুমেশচন্দ্র বসু	২৲
" " কানাইলাল পাইন	১৲
" " হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১৷৶০
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল মল্লিকের মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু কালীন দান	১০৲
" " ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস (উনাও)	১৲
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহের দান	৩০৲
দানাধারে প্রাপ্ত ইত্যাদি বিবিধ আয়	১০৸৶১৫
	৮৩ ⁄ ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮২৸৶০
পুস্তকালয় ...	৩৩॥৶০
যন্ত্রালয় ...	১৫৮৯ ৶৫
গচ্ছিত ...	৫৯।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৩॥৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	২০৲
সমষ্টি	২০৯১৸০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪১৫৸ ⁄ ১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২২৬। ⁄ ১০
পুস্তকালয়	১০৮॥৶০
যন্ত্রালয়	১০১৫॥৶৫
গচ্ছিত	৪৫৮॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৫৶১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	২০৲
দাতব্য	৪২৲
সমষ্টি	২৩৩২।১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

দ্বাদশ কল্প।

প্রথম ভাগ।

১৮১৯ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৪। কলিগতাব্দ ৪৯৯৮। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪ চারি টাকা মাত্র।

অকারাদি বর্ণক্রমে দ্বাদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সাক্ষাৎ কারণ এবং মূল কারণ।

প্রথমে সাক্ষাৎ কারণের বিষয় আলোচনা করা যাউক, তাহার পরে মূল কারণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। সাক্ষাৎ কারণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) পরাধীন কারণ. (২) স্বাধীন কারণ। কাহাকে আমরা সাক্ষাৎ কারণ বলিতেছি, তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলি;—একটি বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাখা হইতে পত্র বাহির হয়, স্কন্ধ হইতে শাখা বাহির হয় এবং মূল হইতে স্কন্ধ বাহির হয়; এখানে শাখাও পত্রের কারণ, মূলও পত্রের কারণ; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাখাই পত্রের কারণ, পরম্পরা-সম্বন্ধে মূল—পত্রের কারণ; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, শাখা পত্রের সাক্ষাৎ কারণ—মূল উহার গৌণ কারণ। পুনশ্চ মনে কর তুমি আমাকে বলিলে যে, জন্তু-শালায় এক প্রকার অদ্ভুত বন-মানুষ আসিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমি পরদিনই তাহা দেখিতে চলিলাম; এখানে আমার চলন-কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ আমি নিজে—গৌণ কারণ তোমার উত্তেজনা বাক্য। এখন পূর্ব্বোক্ত সাক্ষাৎ কারণ—কিনা পত্রের সাক্ষাৎ কারণ শাখা, এবং শেষোক্ত সাক্ষাৎ কারণ—কিনা আমার চলন-কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ আমি আপনি—এ দুয়ের প্রভেদের প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। পূর্ব্বে আমি নিয়ম স্থির করিয়াছি যে, আমি বন-মানুষ দেখিতে যাইব, পরে আমি আপনার সেই নিয়মে আপনাকে নিয়মিত করিয়া বন-মানুষ দেখিতে চলিলাম; এস্থলে আমি আপনিই নিয়ন্তা এবং আপনিই নিয়মিত, অথবা যাহা একই কথা—আমি আপনার নিয়মের আপনি অধীন;—ইহাকেই বলে স্বাধীনতা। স্বাধীন—কি না আপনি আপনার অধীন। কিন্তু শাখা যখন পত্র উৎপাদন করে, তখন তাহা আপনি আপনাকে নিয়মিত করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কোন ভৌতিক বস্তুই আপনার নিয়মে আপনি চলিতে পারে না—প্রত্যেক পরমাণুই অন্যান্য পরমাণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বারা চালিত হয়। আমি যখন বন-মানুষ দে-দেখিতে চলিতেছি তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি আপনার নিয়মে আপনি নিয়মিত হইতেছি—আপনার উদ্যমে আপনি চালিত

হইতেছি—সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি স্বাধীন কারণ; কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে তোমার উত্তেজনা-বাক্য দ্বারা চালিত হই-তেছি; পরম্পরা-সম্বন্ধে আমি পরাধীন কারণ,—সুতরাং আমি সর্ব্বতোভাবে স্বা-ধীন কারণ নহি; এক ভাবে আমি যেমন স্বাধীন কারণ—আর এক ভাবে তেমনি আমি পরাধীন কারণ; কিন্তু ভৌতিক বস্তু কোন-ভাবেই স্বাধীন কারণ নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানবান্ জীব অপূর্ণ স্বাধীন কারণ—ভৌতিক বস্তু পরাধীন কারণ। এই গেল সাক্ষাৎ কারণ—এখন মূল কারণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

পৃথিবীর একটি রেণু-কণার প্রতি দৃষ্টি কর; তাহা পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়াই চলা ফেরা করিতেছে—পৃথিবীকে ছাড়িয়া অন্য কুত্রাপি যাইতে পারে না; সুতরাং তাহা পরাধীন এবং পৃথিবীই তাহার নির্ভর-স্থল; কিন্তু পৃথিবী নিজে কি? পৃথিবী সৌর জগৎকে আশ্রয় করিয়া চলা ফেরা করিতেছে; সুতরাং পার্থিব রেণু এবং পৃথিবী উভয়ে মিলিয়া একটি পরাধীন বস্তু, আর তাহার নির্ভর-স্থল তৃতীয় একটি বস্তু—কি? না সৌর জগৎ। কিন্তু সৌর জগৎও নাক্ষত্রিক জগৎকে আশ্রয় করিয়া চলা ফেরা করিতেছে, সুতরাং পার্থিব রেণু পৃথিবী সৌর জগৎ তিনে মিলিয়া একটি পরাধীন বস্তু, আর, তাহার নির্ভর স্থল চতুর্থ আর একটি বস্তু—কি? না নাক্ষত্রিক জগৎ। পৌরাণিক ভাষায় সৌর জগৎ বাসুকী ও নাক্ষত্রিক জগৎ ইন্দ্রের ঐরাবত। কিন্তু বাসুকী পৃথিবীর নির্ভর-স্থল—ইহা বলাও যা, আর, এক অন্ধ আর এক অন্ধের পথ-প্রদর্শক ইহা বলাও তা, দুইই সমান; কেননা পৃথিবীও যেমন অন্যের আশ্রয় সাপেক্ষ, বাসুকীও তেমনি অন্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ; সুতরাং পৃথিবী+বাসুকী অন্যের আশ্রয় সাপেক্ষ। যদি বল যে, ঐরাবত হস্তী—বাসুকীর নির্ভর-স্থল, তবে জিজ্ঞাসা করি হস্তীর নির্ভর-স্থল কে? পৃথিবীও যেমন পরাধীন, পৃথিবী+বাসুকীও তেমনি পরাধীন, পৃথিবী+বাসুকী+হস্তীও তেমনি পরাধীন; এরূপ করিয়া চলিলে পরাধীন বস্তুর শুদ্ধ কেবল কলেবর-বৃদ্ধিই সার হয়—তাহার নির্ভর-স্থলের ঠিকানা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে নয় ক্ষুদ্র একটি পার্থিব রেণু পৃথিবীর কোথায় কোন্ এক টেরে পড়িয়া টিম্‌টিম্ করিতেছিল—এখন নয় বৃহৎ একটা ব্রহ্মাণ্ড অসীম আকাশ জুড়িয়া বসিল; কিন্তু উহাও যেমন পরাধীন—ইহাও তেমনি পরাধীন; সুতরাং উভয়েরই নির্ভর-স্থল অন্যত্র অন্বেষ্টব্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পরাধীন বস্তুর কলেবর কোটি গুণ বর্দ্ধিত হইলেও তাহা আপনি আপনার নির্ভর-স্থল হইতে পারে না—তাহার অন্য একটা নির্ভর-স্থল আবশ্যক হয়। পরাধীন পরমাণু আর পরাধীন ব্রহ্মাণ্ড, দুইই অন্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ; পরাধীন বস্তু-মাত্রই অ-ন্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ। অতএব যেখানে যত পরাধীন বস্তু আছে সমস্তকেই আপাদ মস্তক সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া যদি চিন্তাক্ষেত্রে মহা-প্রকাণ্ড একটা পরাধীন বস্তু খাড়া করানো যায়—অর্থাৎ যদি এরূপ হয় যে, সকল পরা-ধীন বস্তুকেই তাহার মধ্যে ধরা হইয়াছে—কোন পরাধীন বস্তুই বাহিরে অবশিষ্ট নাই, তবে দাঁড়ায় এই যে, সেই বৃহৎ পরাধীন বস্তুটাই একমাত্র পরাধীন বস্তু, তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পরাধীন বস্তু নাই। তাহা যখন পরাধীন বস্তু, তখন অবশ্যই তাহা অন্যের আশ্রিত, কিন্তু তাহা ছাড়া যখন দ্বিতীয় প-রাধীন বস্তু নাই, তখন তাহা কাজে-কাজেই স্বাধীন বস্তুর আশ্রিত। ইহার ভিতরকার নিগূঢ় কথা এই যে, পরাধীন পরমাণুই হউক,

আর, পরাধীন ব্রহ্মাণ্ডই হউক—তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, পরমাণু এবং ব্রহ্মাণ্ড উভয়কেই ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ যদি কেবল তাহাদের পরাধীন ভাবটির প্রতি লক্ষ নি-বিষ্ট করা যায়, তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, স্বাধীনতার আশ্রয় ব্যতি-রেকে পরাধীনতা এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। অতএব কি ক্ষুদ্র পর-মাণু কি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড—স্বাধীন বস্তু সমস্তেরই মূলাধার।

"স্বাধীন বস্তু" না বলিয়া "স্বাধীন পুরুষ" বলাই শ্রেয়। কেননা;—আপনার নিয়মে আপনি চলাই স্বাধীনতার লক্ষণ, কার্য্য কর্ত্তা সজ্ঞান ভাবে যে নিয়ম স্থির করেন, তাহাই তাঁহার আপনার নিয়ম এবং তদ-নুসারে চলিলেই কার্য্য-কর্ত্তার আপনার নিয়মে আপনি চলা হয়; কার্য্য-কর্ত্তার অ-জ্ঞাত-সারে যদি কোন নিয়মানুসারে কোন কার্য্য হয়, তবে সে নিয়ম কার্য্য-কর্ত্তার আ-পনার নিয়ম নহে—সুতরাং কার্য্যকর্ত্তা সে কার্য্যের স্বাধীন কারণ নহেন—ইহা বলা বাহুল্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, স্বা-ধীন কারণ মাত্রই জ্ঞানবান পুরুষ। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, জ্ঞানবান্ জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার সজ্ঞান কার্য্যের স্বাধীন কারণ বটে, কিন্তু পরম্পরা-সম্বন্ধে পরাধীন কারণ (যে-মন পূর্ব্বোল্লিখিত বন-মানুষ দেখিতে যাওয়া-কালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি আপনার নিয়মে আপনি চলিতেছি কিন্তু পরম্পরা-সম্বন্ধে তোমার উত্তেজনা বাক্যে চালিত হইতেছি); কোনও জ্ঞানবান্ জীবই সর্ব্ব-তোভাবে স্বাধীন কারণ নহে। কিন্তু সমস্ত জগৎই মূল-কারণের অধীন—সুতরাং তিনি কোন অংশেই পরাধীন নহেন—তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন।

যে কোন ঘটনার সাক্ষাৎ কারণ যাহাই হউক্ না কেন—তাহার মূল কারণ পরমেশ্বর ইহাতে আর সংশয়-মাত্র নাই। যদি এক ব্যক্তি বলে যে, কলের জল চোঙ্গা হইতে আসিতেছে ও আর-এক ব্যক্তি বলে যে, কলের জল গঙ্গা হইতে আসিতেছে, তবে দুই ব্যক্তির কথাই সত্য; প্রভেদ কেবল এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কলের জলের সা-ক্ষাৎ আকরের কথা বলিতেছে ও শেষোক্ত ব্যক্তি মূল আকরের কথা বলিতেছে। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত অতীব স্থূল দৃষ্টান্ত। গঙ্গা কলের জল হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করে কিন্তু মূল কারণ কোন কার্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করেন না। মূল কারণ ভৌতিক কারণ নহেন কিন্তু আধ্যাত্মিক কারণ, সুতরাং আকা-শের ব্যবধান তাঁহার সহিত সংলগ্ন হয় না; তিনি যেমন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বর্ত্তমান তেমনি তিনি প্রত্যেক পরমাণুর মূলে বর্ত্ত-মান। গণিতের গুণক যেমন গণিতব্যের সমষ্টিতেই প্রয়োগ করুক আর, ব্যষ্টিতেই প্রয়োগ করুক—ফলে দুইই সমান (যথা২ ২×(১+২+৩)=২×১+২×২+২×৩). তেমনি পরমাত্মা সমস্ত [illegible] নিয়মিত করিতেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুকে নিয়মিত করিতেছেন, এ দুই কথার মধ্যে কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই।

অতঃপর মূল [illegible] সাক্ষাৎ কারণের সম্বন্ধ কিরূপ [illegible] প্রতি প্রণি-ধান করা যাউক। যদি শুদ্ধ কেবল জড় জগৎই সৃষ্ট হইত—তাহা হইলে সৃষ্টির আদবেই কোন অর্থ থাকিত না; জড়-জগৎ আপনাকে আপনি জানে না—এবং যে তাহাকে জানিবে ও ভোগ করিবে এমন কেহই জগতের কুত্রাপি নাই—তবে আর হইল কি? সুতরাং জীবসৃষ্টিই প্রকৃত সৃষ্টি। তেমনি আবার জীবের মধ্যে শুদ্ধ যদি কেবল নিকৃষ্ট জীবই সৃষ্ট হইত—মনুষ্যের

ন্যায় জ্ঞানবান্ জীব সৃষ্ট না হইত—তাহা হইলে অবশ্য এ কথা বলা যাইতে পারিত যে, সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু এরূপ কথা বলা যাইতে পারিত না যে সৃষ্টির কোন চরম উদ্দেশ্য আছে। নিকৃষ্ট জীবদিগের চেতন বহির্মুখী চেতন; তাহাদের চেতন থাকা সত্ত্বেও চেতন যে, কি, তাহা তাহারা জানে না; এজন্য তাহারা চেতনের অনুশীলন করিয়া উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হইতে পারে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা যে, কি, তাহা তাহারা জানে বলিয়া অন্ন পানের চেষ্টায় ফিরে, কিন্তু তাহারা চেতনের মূল্য আদবেই জানে না—এ জন্য তাহারা জ্ঞানচর্চ্চায় একেবারেই পরাঙ্মুখ। পশুদিগের চেতন আপনার প্রতি আপনি ফিরিয়া দেখে না—তাহা শুদ্ধ কেবল সম্মুখের বিষয় সমূহেই ব্যাপৃত; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের চেতন এক-মুখা চেতন। এরূপ চেতনের চরম উদ্দেশ্য কিছুই থাকিতে পারে না; কেননা জগতের মূল প্রদেশেই জগতের চরম উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে,—কিন্তু মূল-প্রদেশে নিকৃষ্ট জীবদিগের দৃষ্টি চলে না। মূল প্রদেশে মনুষ্যেরই কেবল দৃষ্টি চলে—মনুষ্যের চেতন আপনার প্রতি আপনি ফিরিয়া দেখে; মনুষ্যই আপনার চেতনের মূল্য আপনি জানে—তাই বিদ্যা বুদ্ধির অনুশীলন করে। মনুষ্যের বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি দুইই আছে এ জন্য বলা যাইতে পারে যে মনুষ্যের চেতন দুইমুখা চেতন। বিদ্যা আর কিছু নয়—মূলের প্রতি দৃষ্টি। জ্যোতিষের দৃষ্টি পৃথিবী হইতে উঠিয়া সূর্য্যে সমাহিত হয়, রসায়নের দৃষ্টি স্থূল পিণ্ড হইতে উঠিয়া পরমাণুতে সমাহিত হয়; ভৌতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি দৃশ্যমান জগৎ হইতে উঠিয়া শক্তি-জগতে সমাহিত হয়;—মনুষ্যের জ্ঞান মূলের প্রতি এত আগ্রহান্বিত কেন? টানা জালে সমস্ত আয়ত্ত করিবার জন্য। কিন্তু প্রকৃত মূল আর কেহই নহে—স্বয়ং ঈশ্বর। যে জগৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জগৎ মনুষ্য পুনঃসৃষ্টি করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। গুরু মহাশয় তাল পত্রে ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত লিখিয়া দেন—ছাত্রও ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত দাগা বুলায়; মনুষ্যের আত্মা তেমনি জগতের মূল হইতে চরম পর্য্যন্ত—স্বাধীনতা হইতে প্রেমানন্দ পর্য্যন্ত জগদ্গুরু ঈশ্বরের নিকট হইতে অল্পে অল্পে আত্মসাৎ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। জড় জগতের সহিত ঈশ্বরের আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ, নিকৃষ্ট জীবের সহিত পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ, কিন্তু মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ—পিতাপুত্রের সম্বন্ধ; এবং তাহা হইতেও অধিক—হৃদয়-বিনিময়ের সম্বন্ধ। মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ অধিকার এই যে, মনুষ্য ঈশ্বরেতে হৃদয় সমর্পণ করিতে পারে;—ইহাই জগতের চরম উদ্দেশ্য।

দর্শন-সংহিতা।

সিদ্ধান্ত ॥৭॥

জড়বস্তু স্বতঃ কিরূপ।

জড়বস্তু স্বতঃ, সমস্ত জড় জগৎ স্বতঃ, একান্তপক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

প্রমাণ।

সমস্ত জড়জগৎ, স্বতঃ, আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়-রাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে প্রমাণ করা হইয়াছে যে আশয়+বিষয় ভিন্ন কেবল-মাত্র বিষয় জ্ঞানের অগম্য। অতএব জড়জগৎ স্বতঃ একান্ত-পক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

পুনশ্চ; আশয়+বিষয় ন্যূনতম স্বতো-

জ্ঞেয় (ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত দেখ,) সুতরাং আশয়-ভ্রষ্ট জড়জগৎ ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয় অপেক্ষা ন্যূনতর। অতএব এরূপ জড়জগৎ যদি স্বতোজ্ঞেয় হয়, তবে তাহা ন্যূনতম স্বতোজ্ঞেয় অপেক্ষাও ন্যূনতর স্বতোজ্ঞেয়; কিন্তু তাহা হইতে পারে না—যেহেতু তাহা স্ববিরোধী; কেননা ন্যূনতম শব্দের অর্থই এই যে, তাহা অপেক্ষা ন্যূনতর সম্ভবে না। অতএব আশয়-ভ্রষ্ট সমস্ত জড়জগৎ একান্ত-পক্ষেই জ্ঞানের অগম্য।

মন্তব্য এবং ব্যাখ্যান।

জড়বাদ এবং মায়াবাদের মূল এইস্থানটিতে ॥ ১ ॥

এইস্থানটিতেই জড়বাদ এবং মায়াবাদের তর্কবিতর্কের উপর আলোক উদ্ভাসিত হইতেছে। এই স্থানটিতেই তত্ত্বালোচনা-বৃক্ষের স্কন্ধ-প্রদেশ হইতে ঐ তর্কবিতর্কের শাখা প্রশাখা বিনির্গত হইয়াছে। মায়াবাদের মধ্যে যাহা কিছু যুক্তি-সঙ্গত, সমস্তই এই সপ্তম সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত।* জড়-বাদ—যাহা জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে তাহা নিম্ন-লিখিত প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

সপ্তম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

জড়বস্তু স্বতঃ একান্ত-পক্ষে জ্ঞানের অগম্য নহে। উহা আমাদের জ্ঞান-গোচর হইতে পারে এবং হয়ও।

লৌকিক সিদ্ধান্ত এইরূপই বটে ॥ ৩ ॥

জড়বস্তুর উপলব্ধি সম্বন্ধে লৌকিক সিদ্ধান্ত এইরূপই বটে। লৌকিক ব্যবহার কালে আমরা মনে করি যে, জড়বস্তু-সকলকে আমরা স্বতন্ত্র রূপে উপলব্ধি করিতেছি। আমরা যখন নদী বন পর্ব্বত অবলোকন করি, অথবা কাষ্ঠ লোষ্ট্র লইয়া নাড়া চাড়া করি, তখন আমরা মনে করি যে, কেবল মাত্র ঐ সকল বস্তুই আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছি, তাহা ছাড়া—যাহা চক্ষে দেখিতেছি না—কর্ণে শুনিতেছি না—এমন কোন কিছুই তাহার সঙ্গে উপলব্ধি করিতেছি না, এক কথায়—আমরা আপনাদিগকে তাহার সঙ্গে উপলব্ধি করিতেছি না।

আত্মবিস্মৃতি কেবল একটা ভান-মাত্র তাহা বাস্তবিক নহে—ঐকান্তিক নহে ॥ ৪ ॥

কিন্তু আমাদের ঐ যে আত্মবিস্মৃতি উহা বাস্তবিক নহে—ঐকান্তিক নহে। উহা কৃত্রিম এবং আংশিক। উহা কেন যে হয় তাহা প্রথম সিদ্ধান্তে দেখানো হইয়াছে; আমাদের সহিত আপনার অতিমাত্র ঘনিষ্ঠতা এবং আত্মার অতীন্দ্রিয়তা এই দুই কারণেই উহা ঘটিয়া থাকে। মনুষ্যের লৌকিক বুদ্ধি সপ্তম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তকে যতই কেন প্রশ্রয় দান করুক না—জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম তাহার নিতান্তই বিরোধী। "আমি উপলব্ধি করিতেছি" এইটি উপলব্ধি না করিয়া কাহারো সাধ্য নাই যে, অন্য কোন কিছু উপলব্ধি করে।

মনোবিজ্ঞানের মত ॥ ৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলেও যেমন—এখানেও তেমনি—মনোবিজ্ঞান আপনার মত স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন না। কিন্তু এটা স্থির যে, মনোবিজ্ঞানের জড়বাদের মধ্যে যৌক্তিক যাহা কিছু, তাহা বর্ত্তমান প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তেরই সামিল। প্রচলিত মনোবিজ্ঞান যখন জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন, তখন অবশ্য তিনি সেই স্বতন্ত্র সত্তার জ্ঞান-

* জ্ঞান-বহির্ভূত জড়বস্তুর অস্তিত্ব কোন ক্রমেই জ্ঞানে প্রকাশ পাইবার নহে, অথচ আমরা মনে করি যে তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে—ইহাই অবিদ্যা। একবার যাহাকে জানিলাম—জ্ঞান-বহির্ভূত, আবার তাহাকে বলিতেছি যে, তাহা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে,—জ্ঞান-বহির্ভূত সত্তা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে; এই অসম্ভব কথাটি ভ্রম নহে তো আর কি? এইরূপ স্ববিরোধী কথা অবিদ্যা-শব্দের বাচ্য। সং

গম্যতাও স্বীকার করেন ; তাহা যদি না করেন—তিনি যদি বলেন যে, জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞান-গম্য নহে কিন্তু তাহা আছে তাহাতে আর ভুল নাই, তবে তাঁহার সে কথার প্রমাণ কি? জ্ঞানের অগোচর-তাই কি জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার প্রমাণ? মনোবিজ্ঞানের যুক্তি তবে কি এই যে, জড়বস্তু কোন ক্রমেই স্বতন্ত্র-রূপে জ্ঞাত হইতে পারে না—যখনই উহা জ্ঞাত হয় তখনই উহা জ্ঞাতার সঙ্গাশ্রিত রূপে জ্ঞাত হয়—অতএব প্রমাণ হইল যে, জড়বস্তু স্বতন্ত্র-রূপে বর্ত্তমান? এ বলাও যা, আর এ বলাও তা যে, দেবদত্তের শরীর দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ—অতএব প্রমাণ হইল যে, তিনি প্রত্যহ উপবাস করেন। এতবড় একটা অযৌক্তিক কথা কখনই মনোবিজ্ঞানের অভিপ্রেত হইতে পারে না ; তবেই হই-তেছে যে, মনোবিজ্ঞান যখন জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন, তখন তিনি প্রকারান্তরে সপ্তম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত শিরো-ধার্য্য করেন ; সে সিদ্ধান্ত এই যে, জড়-বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য। পদ্ম পুষ্প আমি দেখিয়াছি বা আর কেহ দেখিয়াছে বলিয়াই আমরা বলি যে, পদ্ম পুষ্প আছে ; সুতরাং "পদ্ম পুষ্প আছে" বলিলেই বুঝায়—যে, তাহা কাহারো না কাহারো জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য ; কিন্তু যাহা কেহ কখনও জানে নাই—জানে না—জানিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে "আছে" বলাও যা, আর, "নাই" বলাও তা, দুইই সমান। আকাশ-কুসুম কেহ কখন দেখে নাই দেখিবে না—অতএব তাহা আছে, এরূপ যুক্তি অতীব অদ্ভুত যুক্তি। অতএব মনোবিজ্ঞান যখন জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন, তখন তাহার অর্থই এই যে, জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য।

মনোবিজ্ঞানের জড়বাদ চারিটি প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬ ॥

আমাদের চারিটি প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের উপর ভর করিয়া জড়বাদ দিব্য অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। প্রথম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ; অন্যান্য বস্তু জানিবার জন্য আপনাকে জানিবার আবশ্যকতা নাই। দ্বিতীয় প্রতি-পক্ষ সিদ্ধান্ত ; অতএব, আমরা আপনাকে না জানিয়াও অন্যান্য বিষয় জানিতে পারি। ষষ্ঠ প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ; অতএব, জ্ঞানের পরাক্ অংশ স্বতোজ্ঞেয়। সপ্তম প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ; অতএব, জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা যাহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের পরাক্ অংশ মাত্র, তাহা আমাদের জ্ঞানগম্য। অতএব প্রমাণ হইল যে, জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই যে একটি ধারাবাহিক যুক্তি পরম্পরা—ইহার খুবই শৃঙ্খলা-পারিপাট্য, কিন্তু হইলে হইবে কি—উহার গোড়া আলগা,—বজ্রের বাঁধুনি ফস্কা গিরা! প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তগুলি জ্ঞা-নের অখণ্ডনীয় নিয়মের বিরোধী সুতরাং নিতান্তই বালির বাঁধ।

জড়বাদের যুক্তি দোষ ॥ ৭ ॥

ঐ চারিটি প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্তের সম্মুখে আমাদের স্বপক্ষের চারিটি সিদ্ধান্ত আনিয়া দাঁড় করাইলেই জড়বাদের যুক্তি-দোষ স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। প্রথম সিদ্ধান্ত ; কোন কিছু জানিতে হইলেই আপনাকে জানা আবশ্যক। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ; অতএব আপনাকে না জানিয়া কোন কিছুই জানা যাইতে পারে না। ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত ; অতএব জ্ঞানের পরাক্ অংশ স্বতোজ্ঞেয় নহে। সপ্তম সিদ্ধান্ত ; অতএব আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু, যাহা জ্ঞানের পরাক্ অংশ মাত্র ও জ্ঞানের বীজমাত্রা অপেক্ষা ন্যূনতর, তাহা কাহারো কর্ত্তৃক জ্ঞাত হইতে পারে না। অতএব, আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুর সত্তার প্রমাণার্থে আ-

যরা ঐরূপ জড়বস্তুর জ্ঞানকে সাক্ষী মান্য করিতে পারি না—যেহেতু ওরূপ জ্ঞান এ-কান্ত-পক্ষেই অসম্ভব। আশয়-ভ্রষ্ট জড়-বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে থাকুক্—না থাকে না থাকুক্—এখানে আমরা তাহার স্বপক্ষেও কোন কথা বলিতেছি না—তাহার বিপক্ষেও কোন কথা বলিতেছি না, এখানে আমরা কেবল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত যে, ওরূপ সত্তার যখন জ্ঞান সম্ভবে না, তখন তাহার জ্ঞান-মূলক কোন প্রমাণও সম্ভবে না।

বিনা প্রমাণে বিচার-নিষ্পত্তি ॥ ৮ ॥

জড়বাদী এবং মায়াবাদী উভয়েই আগে ভাগে—বিনা প্রমাণে—একটি গুরুতর প্রশ্নের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া বসিয়া আছেন; প্রশ্ন-টি এই যে, জ্ঞানের এরূপ একটি অনিবার্য্য এবং অনতিক্রমণীয় নিয়ম আছে কি না যাহা আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুকে জ্ঞাত হইতে দেয় না। জড়বাদী আগেভাগেই বলিয়া বসেন "না—সেরূপ কোন নিয়ম নাই।" তাঁহার মতে আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু জ্ঞান-গোচর হ-ইলেও হইতে পারে,—হইতে যখন পারে—তখন হয়ও। তিনি বলেন—"এই যে আ-মাদের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড জগৎ দেদীপ্যমান, সকলই তো বিষয়-মাত্র—আশয় ইহার কোন্ খানে? অথচ তাহা আমাদের জ্ঞানে প্র-কাশ পাইতেছে; জ্ঞানে যখন তাহা প্রকাশ পাইতেছে তখন তাহা আছে তা-হাতে আর ভুল কি? আশয়-ভ্রষ্ট জড়-বস্তুর জ্ঞানই তাহার সত্তার যথেষ্ট প্রমাণ।" জড়বাদী যেমন আগেভাগেই বলেন "না—জ্ঞানের এমন কোন অতিক্রমণীয় নিয়ম নাই যাহা আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুকে জ্ঞাত হইতে দেয় না," মায়াবাদী তেমনি আগে ভাগেই বলেন "হাঁ, জ্ঞানের ঐরূপ একটি অনতিক্রমণীয় নিয়ম আছে।" ইনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন যে, ঐ নিয়মটি জ্ঞানের প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত রহিয়াছে।

অকস্মাৎ বিচার-নিষ্পত্তির কারণ নির্দ্দেশ ॥ ৯ ॥

বিনা প্রমাণে জড়বাদী এবং মায়াবাদী দুই বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এরূপ যে ঘটিয়াছে তাহার কারণ শুদ্ধ কেবল এই যে, উভয়েই জ্ঞানতত্ত্বের বিচার নিঃশে-ষিত না করিয়া আগে-ভাগেই অস্তিতত্ত্বের বিচারে হস্তার্পণ করিয়াছেন। এইরূপ বিপথে পদার্পণ করাতেই জড়বাদী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ও মায়াবাদী সত্যের ঈষৎ আভাস মাত্র পাইয়াই সন্তুষ্ট আছেন। জ্ঞানের ঐরূপ কোন অখণ্ডনীয় নিয়ম আছে কি না—এপ্রকার প্রশ্নই জড়বাদীর মনে ইতিপূর্ব্বে কখন উদিত হয় নাই, কাজেই উহার ভিতরে যে কি সার প্যাঁচ লুক্কা-য়িত আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন; তাই তিনি জ্ঞানের ঐ অখণ্ডনীয় নিয়মটি অস্বীকার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন না। জ্ঞানের ঐরূপ যে একটি নিয়ম আছে—ইহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর। তিনি মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসিয়া আছেন যে, জ্ঞানের ওরূপ কোন নিয়ম নাই। তাই তিনি অকুতোভয়ে জড়-বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার পক্ষ সমর্থন করেন। মায়াবাদী জ্ঞানের ঐ নিয়মটি দেখিতে পাইয়াছেন—সত্য, কিন্তু তিনি জ্ঞানের নিয়ম-সকল রীতিমত করায়ত্ত না করিয়াই আগে ভাগে অস্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছেন—আগেভাগেই এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসিয়া আছেন যে, জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অগ্রে তাঁহার উচিত ছিল এইটি সংস্থাপন করা যে, জড়-বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে,—তাহা তিনি করেন নাই। তাঁহার

কথা যতই সত্য হউক্ না কেন তিনি যখন তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই তখন তাহা কাহারো বোধগম্য হইতে পারে না; নানা লোকে তাহার নানারূপ অর্থ করিতে পারে—তাহা নিতান্তই বলহীন এবং অব্যবস্থিত।

প্রথম সিদ্ধান্তের বিচার-নিষ্পত্তি কিরূপ ॥ ১০ ॥

বর্ত্তমান তন্ত্র ঐ গোড়া'র প্রশ্নটির হাঁ'য়ের দিক্ শিরোধার্য্য করিয়া মুক্ত-কণ্ঠে বলিতেছে যে, জ্ঞানের এইরূপ একটি অনতিক্রমণীয় নিয়ম আছে যাহা আশ্রয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুকে জ্ঞানাভ্যন্তরে কোন-ক্রমেই স্থান পাইতে দেয় না। ইহার বিপরীতে প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত বলিতেছে যে, জ্ঞানের সেরূপ কোন নিয়ম নাই। আমাদের কথার যত কিছু বল সমস্তই প্রথম সিদ্ধান্তের—জ্ঞানের অটল ভিত্তিমূলের—প্রসাদাৎ। প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত ঐ ভিত্তিমূলের উচ্ছেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

সংকেত ॥১১॥

লৌকিক বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান-সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানই বা কোন্ স্থানটিতে দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহার বিরুদ্ধে আমরাই বা কোন্ স্থানটিতে দাঁড়াইয়া আছি, তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিম্নলিখিত সংকেতের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা বোধসুলভ হইতে পারে। বহির্বিষয় বি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক, এবং আশয় (কি না জ্ঞাতা) আ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্। আ-কর্ত্তৃক আ'র জ্ঞান আআ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্ এবং আ-কর্ত্তৃক বি'র জ্ঞান আবি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক। জ্ঞানের নিয়ম এই যে, আআ ব্যতিরেকে আবি কোনক্রমেই সিদ্ধ হইতে পারে না। আ কোন-কালেই বি'কে স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিতে পারে না,—স্বতন্ত্ররূপে যাহা সে উপলব্ধি করে তাহা বি নহে কিন্তু আ+বি। আবি আআ'কে অপেক্ষা করে, সুতরাং উভয়ের কোনটিই অনন্য-সাপেক্ষ স্বতন্ত্র একটি জ্ঞান নহে। আ আ+আবি অথবা যাহা একই কথা আ (আ+বি), ইহাই অনন্য-সাপেক্ষ স্বতন্ত্র একটি জ্ঞান। জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক নিয়মই এই যে, আশয় এবং বিষয়ের সঙ্ঘাত ভিন্ন—আ+বি ভিন্ন—আর কিছুই স্বতন্ত্ররূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে।

সংকেত ॥১২॥

এখন মনোবিজ্ঞান এবং লৌকিক চিন্তা কোন্ স্থানটিতে দাঁড়াইয়া আছে দেখা যাউক। ইঁহাদের মত এই যে, আ তখনই বি'কে উপলব্ধি করে যখন বি আ'র সন্নিধানে উপস্থিত হয়। ইঁহাদের মতে বি'কে জানিতে হইলে যাহা নিতান্ত নহিলে নয় তাহা শুদ্ধ কেবল—বি'র সন্নিধানে আ'র উপস্থিতি-মাত্র; অর্থাৎ আ বি'র সন্নিধানে উপস্থিত থাকিলেই হইল—আ আপনাকে জানুক্ বা না জানুক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। পূর্ব্বের ন্যায় আ-কর্ত্তৃক আ'র জ্ঞান আআ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্; আ-কর্ত্তৃক বি'র জ্ঞান আবি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্, এবং অধিকন্তু আ'র সন্নিধান-বর্ত্তী বি আ-বি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক্। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, আবি শুদ্ধ কেবল আ-বি সাপেক্ষ—তা ভিন্ন তাহা আআ সাপেক্ষ নহে। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র প্রকার—তাহা এই যে, আবি-সিদ্ধির পক্ষে যাহা নিতান্ত নহিলে নয় তাহা শুদ্ধ কেবল আ-বি মাত্র নহে—তদ্ব্যতীত তাহা আআ। আ—বি'র সহস্র সন্নিধান-বর্ত্তী হইলেও আ'কে না জানিয়া বি'কে জানা যাইতে পারে না—আআ ব্যতিরেকে আবি সিদ্ধ হইতে পারে না। শুদ্ধ যদি কেবল আ'র সন্নিধান-বর্ত্তিতা-গুণেই বি'কে জানা যাইতে পারিত—তবে

আত্মা ব্যতিরেকেও আবি সিদ্ধ হইতে পা-রিত, এক কথায়—আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় জ্ঞান-গম্য হইত। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট প্রমাণ করিয়াছি যে, আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় কোন জ্ঞানেরই উপলব্ধি গম্য নহে। *

আমাদের সিদ্ধান্ত ॥১৩॥

বি'কে জানিতে হইলে আ'কে বি'র সন্নিধানে উপস্থিত থাকা চাই—এতো সোজা কথা পড়িয়া আছে, ইহা লইয়া কোমর বাঁধিয়া সংগ্রাম করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বেশীর ভাগ আমাদের বক্তব্য এই যে, আ শুধু কেবল বি'র সন্নিধানে উপস্থিত থাকিলেই চলিবে না—আ'র আপনাকে আপনি জানা চাই। আবি সিদ্ধির জন্য আ-বি আবশ্যক ইহা সকলেই জানে—কিন্তু আবি সিদ্ধির জন্য আআ আবশ্যক ইহা অনেকের নিকটেই নূতন। তাহাতে কিছুই আইসে যায় না—বিজ্ঞান-রাজ্যে অনেক এমন নূতন কথা সময়ে সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে যাহা ভাবিয়া দেখিলে—তাহাই পুরাতন সত্য—চিরন্তন সত্য; আমাদের এখানকার সিদ্ধান্ত সেইরূপ একটি কথা—তাহা এই যে, আ তখনই বি'কে জানিতে

---

* মূল গ্রন্থের সংকেত অপেক্ষা আরো সূক্ষ্মতর সংকেত এই;—বহির্বিষয় বি বলিয়া ধার্য্য হউক; আশয় "১" বলিয়া ধার্য্য হউক; জ্ঞান-ক্রিয়া "×" এইরূপ গুণন ক্রিয়া বলিয়া ধার্য্য হউক। ইহাতে এইরূপ পাওয়া যায়;—বি = ১×বি; ইহার অর্থ, বি-মাত্রেই এক দ্বারা গুণিত কিনা আশয় দ্বারা জ্ঞাত;—কোন বিষয়ই এমন হইতে পারে না যাহা ১×বি নহে অর্থাৎ আশয়-দ্বারা জ্ঞাত নহে। ১×বি—সংক্ষেপে—১ বি বলিয়া ধার্য্য হউক। তাহা হইলে বি = ১ বি। পুনশ্চ; ১(বি + বি + বি) = ১ বি + ১ বি + ১বি; ইহার অর্থ এই যে, নানা বিষয়ের সমষ্টি যেমন আশয় দ্বারা জ্ঞাত, তেমনি তাহাদের প্রত্যেকেই আশয়-দ্বারা জ্ঞাত। এখন, আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে; যাহা বি অথচ ১ বি নহে, তাহাই আ-শয়-ভ্রষ্ট বিষয়; অর্থাৎ যাহা বিষয় অথচ কোন জ্ঞানেরই বিষয় নহে, তাহাই আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়;—এরূপ বিষয় নিতান্তই স্ববিরোধী সুতরাং একেবারেই অসম্ভব। পুনশ্চ; ১ = ১×১; ইহার অর্থ এই যে, ১ আপনা কর্তৃক আপনি গুণিত অর্থাৎ আশয় আপনা কর্তৃক আপনি জ্ঞাত। ১ বি = ১×১ বি, ইহার অর্থ এই যে, বিষয় জ্ঞানের সহিত আশয়-জ্ঞান (আপনাকে আপনি জানা) অবিচ্ছেদ্য। ১ বি, অথচ তাহা ১×১বি নহে, ইহা স্ববিরোধী।

এখানে এইটির প্রতি সবিশেষ লক্ষ করা উচিত যে, আশয় হইতে ব্যবচ্ছিন্ন বি—বি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না; কেননা, বি বলিবামাত্রই বুঝায় যে তাহা ১×বি; তেমনি আবার বিষয় হইতে ব্যবচ্ছিন্ন আশয় ১ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, কেননা ১ বলিবামাত্রই বুঝায় যে, তাহা ১টাকা বা ১ পয়সা বা ১ হাত বা ১ গজ—১ কোন-না-কোন কিছু; আশয় বলিবামাত্রই বুঝায় যে, তাহা কোন-না-কোন ভৌতিক বস্তু বা মানসিক ভাব বা শারীরিক অথবা মানসিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। অতএব আশয়-ভ্রষ্ট বি এবং বিষয়-ভ্রষ্ট আ—এ দুয়ের দুইটি নূতন সংকেত আবশ্যক। দুইই স্ববিরোধী। বীজ-গণিতের সিদ্ধান্ত অনুসারে $\sqrt{-১}$ এবং $-\sqrt{-১}$ এই দুইটি অঙ্কের কোন অর্থই কাহারো বোধ-গম্য হইতে পারে না, অথচ $(\sqrt{-১}) \times (-\sqrt{-১}) = ১$। যাহা স্ববিরোধী অসঙ্গত এবং অচিন্তনীয় তাহা $\sqrt{-১}$ এবং $-\sqrt{-১}$ এই দুইটি সংকেত দ্বারা দিব্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আশয়-ভ্রষ্ট এবং বিষয়-ভ্রষ্ট উভয়ে পরস্পরের বিপরীত পৃষ্ঠ; কেননা আশয়কে ছাঁটিয়া ফেলিলে ভিতর হইতে বাহিরে—সামান্য হইতে বিশেষে—প্রত্যক্ হইতে পরাকে—বিনির্গত হইতে হয়, বিষয়কে ছাঁটিয়া ফেলিলে ঠিক তাহার উল্টা দিকে অর্থাৎ বাহির হইতে ভিতরে—বিশেষ হইতে সামান্যে—পরাক্ হইতে প্রত্যকে প্রবিষ্ট হইতে হয়। বীজগণিতের নিয়মানুসারে এইরূপ বিপরীত পৃষ্ঠ দ্বয় (+) এবং (—) এই দুই বিপরীত চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিতব্য। মনে কর, $+\sqrt{-১}$ এই চিহ্নটি বিষয়-ভ্রষ্টের চিহ্ন, তাহা হইলে উপরি-উক্ত নিয়মানুসারে অগত্যা দাঁড়ায় যে, $-\sqrt{-১}$ এই চিহ্নটি আশয়-ভ্রষ্টের চিহ্ন। অতএব বিষয়-ভ্রষ্ট আশয় এবং আশয়-ভ্রষ্ট বিষয়, উভয়ে $+\sqrt{-১}$ (সংক্ষেপে $\sqrt{-১}$) এবং $-\sqrt{-১}$ এই দুই বিপরীত চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিতব্য। ইত্যানুসারে পাওয়া যায় যে, বিষয়-ভ্রষ্ট আ-শয় = $\sqrt{-১}$ আ = $(\sqrt{-১})$ ১ সংক্ষেপে $\sqrt{-১}$, আশয় ভ্রষ্ট বিষয় = $-\sqrt{-১}$ বি; এখন, উভয়ের মধ্যে (×) এই গুণন-চিহ্ন অর্থাৎ জ্ঞান-যোগ নিবদ্ধ হউক, তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে, $(\sqrt{-১}) \times (-\sqrt{-১}$ বি$)$ = বি; ইহার অর্থ এই যে, ব্যবচ্ছিন্ন বিষয় ($-\sqrt{-১}$বি) ব্যবচ্ছিন্ন আশ-য়ের সহিত ($\sqrt{-১}$ ইহার সহিত) জ্ঞান-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আশয়াক্রান্ত সংহত বিষয়ে (১×১×বি, এইরূপ বি'তে) পরিণত হইল। এইরূপে আশয়ের বিষয়-ভ্রষ্টতা ($\sqrt{-১}$ এইটি) ঘুচিয়া গিয়া আশয় ($\sqrt{-১}$ ইহার পরিবর্ত্তে ১ হইল; ও বিষয়ের আশয়-ভ্রষ্টতা ($-\sqrt{-১}$) ঘুচিয়া গিয়া বিষয় ($-\sqrt{-১}$ বি ইহার পরিবর্ত্তে) বি হইল। বি কিনা ১×১×বি, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞাতার জ্ঞানগোচর বিষয়। জ্ঞান বহিষ্কৃত বিষয় তবে কি? না—$-\sqrt{-১}$ বি। সং।

পারে, যখন সেই সঙ্গে সে আ'কেও জানে। ইহা হইতেই পাওয়া যাইতেছে যে, বি'র স্বতন্ত্র সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি গম্য নহে।

সপক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মত-ভেদ ॥১৪॥

পাছে কেহ মনে করেন যে,প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারেও এইরূপ দাঁড়ায় যে, আশ্রয়-ভ্রষ্ট বিষয় অর্থাৎ জড়বস্তুর স্বতন্ত্র-সত্তা জ্ঞানে উপলব্ধি গম্য নহে, এ জন্য তাঁহার ভ্রম নিবারণার্থে গুটি দুই কথা বলা আবশ্যক। মনে কর যেন আমরা মনোবিজ্ঞানের মতেই মত দিলাম—এই বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলাম যে, বি'কে জানিতে হইলে আ'কে বি'র সঙ্গে লাগিয়া থাকা চাই; তাহা হইলেও এরূপ হইতে পারে যে, বি'র সঙ্গে আ লাগিয়া আছে বটে কিন্তু বি'র সঙ্গে আ জ্ঞাত হইতেছে না; জ্ঞাত হইবার বেলায় বি একাকী জ্ঞাত হইতেছে—স্বতন্ত্র-রূপে জ্ঞাত হইতেছে; তবেই হইল যে, আ'র ব্যতিরেকেও আবি সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে বি'কে জানিতে হইলে বি'র সঙ্গে আ শুধু কেবল লাগিয়া থাকিলেই চলিবে না—তাহা ছাড়া আ আপনার নিকট আপনি জ্ঞাত হওয়া চাই; ইহা হইতেই পাওয়া যাইতেছে যে, আ'কে না জানিয়া বি'কে জানা যাইতে পারে না, সুতরাং বি স্বতন্ত্র-রূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য নহে।

আর একরূপ মতভেদ ॥ ১৫ ॥

প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের সহিত আমাদের আর একরূপ মতভেদ আছে, তাহা এই;—মনোবিজ্ঞান এরূপ বলিলেও বলিতে পারেন, এবং অনেক সময়ে বলেনও যে, আমাদের জ্ঞানের যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে আমরা আ'কে না জানিয়া বি'কে জানিতে পারি না—বি'কে স্বতন্ত্র রূপে জানিতে পারি না—এ কথা সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া বি যে, কাহারো জ্ঞানেই উপলব্ধি-গম্য নহে—এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। আমার জ্ঞানের প্রকৃতি একরূপ, আর-এক ব্যক্তির জ্ঞানের প্রকৃতি হয় তো আর একরূপ; আমি আ'কে না জানিয়া বি'কে জানিতে পারি না, আর এক ব্যক্তি হয় তো তাহা পারে। মনোবিজ্ঞানীর মতে বি'কে স্বতন্ত্র রূপে জানিতে না পারা আমাদের জ্ঞানের একপ্রকার অক্ষমতা, আর, এইরূপ অক্ষমতা মানব-জ্ঞানের একটি বিশেষ ধর্ম্ম—সকল জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম্ম নহে। মনুষ্য-বুদ্ধির অশেষ প্রকার দৌর্বল্য আছে—উহা তাহাদেরই মধ্যে একটি। অন্যের কথা দূরে থাকুক্—কাণ্ট্ যিনি বর্ত্তমান অব্দের তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের গুরু তিনি পর্য্যন্ত এইরূপ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। দেবতারা জড়বস্তুকে কি ভাবে উপলব্ধি করেন—আমাদের বুদ্ধি সেখানে নাগাল পায় না,—এটা অবশ্য আমাদের বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্য; কিন্তু জড়বস্তুকে আমরা যে স্বতন্ত্র-রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না—তাহার কারণ স্বতন্ত্র। তাহার কারণ আমাদের নিজের কোন অক্ষমতা নহে,—আমাদের অক্ষমতা এত আছে যে,যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট, যাহা নাই তাহা বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া তাহার দল পুষ্টি করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না; তবে কি? না একটি অনতিক্রমণীয় নিয়ম যাহা শুদ্ধ কেবল আমাদের আপনাদের জ্ঞানের পক্ষে নহে কিন্তু সকল জ্ঞানের পক্ষেই বলবৎ তাহাই উহার কারণ; তাহাই জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তাকে নিখিল জ্ঞান-রাজ্য হইতে চিরকালের মত বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। সে নিয়ম এই যে, যে-কোন জ্ঞানে যাহা কিছু জ্ঞাত হউক্ না কেন, তাহারই সঙ্গে জ্ঞাতাকে আপনার নিকট আপনি জ্ঞাত হওয়া চাই। অতএব যতই কেন বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট

বিভিন্ন জ্ঞান হউক্ না—কোন জ্ঞানেই জড়-বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি-গম্য নহে। আ-শয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু একান্ত পক্ষেই অবিজ্ঞেয়, সকলের নিকটেই অবিজ্ঞেয়—একা কেবল আমাদের নিকটে নহে। জগতের মধ্যে যত জ্ঞান আছে সমস্ত জ্ঞান ঘুরিয়া আইস—দেখিবে যে, কোন জ্ঞানেই আশয় ভ্রষ্ট জড়বস্তু উপলব্ধি-গম্য নহে; তবে আর, কেমন করিয়া বলিব যে, মনুষ্যই কেবল তাহার জ্ঞানের দুর্ব্বলতা বশতঃ জড়বস্তুকে স্বতন্ত্র-রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। আশয়-ভ্রষ্ট বি আ-একটিকে বলিল "আমাকে তুমি স্বতন্ত্র-রূপে জানো;" আ বলিল "তাহা আমি পারি না—কেননা তাহা হইলে সেই সঙ্গে আমাকে আপনাকেও আপনার নিকট জ্ঞাত হইতে হইবে; আশয়-ভ্রষ্ট বি দ্বিতীয় আ'র নিকটে গেল—সেখানেও ঐরূপ প্রত্যুত্তর শুনিল; আশয়-ভ্রষ্ট বি, এইরূপ, তৃতীয় চতুর্থ প্রভৃতি যে আ'য়ের নিকটে যায়, তাহারই নিকট হইতে তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসে—কেহই তাহাকে স্বীয় জ্ঞানা-ভ্যন্তরে অধিকার দেয় না। তবে আর মনোবিজ্ঞানের এ কথা কোথায় রহিল যে, আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু মানব জ্ঞানে না হউক্—ভিন্ন জাতীয় কোন জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য হইলেও হইতে পারে। মনোবিজ্ঞান অব-শ্যম্ভাবী সত্যের নিকটেও যা'ন না—তিনি কেবল আগন্তুক সত্যের ব্যবসায়ী বলিয়া আপনার পরিচয় দে'ন; মনোবিজ্ঞানের এইরূপ অনর্থক ভীরুতা হইতেই উপরি উক্ত ভ্রমটি প্রসূত হইয়াছে;—আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুর অবিজ্ঞেয়তার কারণ নির্দ্দেশ ক-রিতে গিয়া বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অযথা কারণ নির্দ্দেশ করা ভ্রম নহে তো আর কি? আর, সে ভ্রম যে কত দোষাবহ, তাহা অ-জ্ঞান-তত্ত্বে প্রকাশ পাইবে। বর্ত্তমান সং-হিতা শুদ্ধ কেবল অবশ্যম্ভাবী সত্যেরই ব্যবসায়ী; অবশ্যম্ভাবী সত্যের প্রসাদেই আমরা ঐ ভ্রমটির হস্ত হইতে রক্ষা পাই-য়াছি—তাই আমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে বলিতে পারিতেছি যে, শুদ্ধ কেবল মানব-জ্ঞানে নহে কিন্তু যেখানে যত জ্ঞান আছে কোন জ্ঞানেই আশয়-ভ্রষ্ট জড় জগৎ উপলব্ধি-গম্য নহে। আমাদের এ সিদ্ধান্তটি এখানে (অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বে) মুকুলিত হইল মাত্র—অজ্ঞানতত্ত্বে ইহা বিকসিত হইবে—এবং অস্তিত্বতত্ত্বে ইহার ফলোদ্গম হইবে।

আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় স্ববিরোধী। ১৬।

এইরূপ-যুক্তি অনুসারে প্রতিপন্ন হই-তেছে যে, আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় নিতান্তই একটা স্ববিরোধী ব্যাপার; তাহা যে কেবল আমাদে-রই নিকট অবিজ্ঞেয় তাহা নহে, তাহা এ-কান্ত পক্ষেই অবিজ্ঞেয়—স্বরূপত অবিজ্ঞেয়। আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু এই যে এক বিষম সং-কটে নিক্ষিপ্ত হইল—মনোবিজ্ঞানের ইহাতে কোন হস্ত নাই, ইহা শুদ্ধ কেবল অবশ্যম্ভাবী সত্যের প্রসাদেই হইতে পারিয়াছে। মনো-বিজ্ঞান বলেন—"মানিলাম আশয়-ভ্রষ্ট বিষয় আমাদের নিকট অবিজ্ঞেয়, কিন্তু তাহাতে কি? যদি তাহা আর কাহারো জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য হয়, তাহা হইলে তো আর তাহা স্ববিরোধী নহে।" "যদি তাহা আর কাহারো জ্ঞানে উপলব্ধি-গম্য হয়"—কিন্তু যদি কোন জ্ঞানেই তাহা উপলব্ধি-গম্য না হয়,—তাহা হইলে তো তাহা স্ববিরোধী? যাহা কোন জ্ঞানেই কোন প্রকারেই উপ-লব্ধি-গম্য নহে—তাহা স্ববিরোধী নহে ত কি? বক্র ঋজুরেখা স্ববিরোধী কেন? না যেহেতু জ্ঞানের নিয়ম তাহাকে কোন জ্ঞা-নেই জ্ঞাত হইতে দেয় না। আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু স্ববিরোধী কেন? ঐ একই কারণে। তাহা জ্ঞান পথে উপনীত হইতে না হই-

তেই জ্ঞানের অনতিক্রমনীয় নিয়ম তাহাকে পথি মধ্যে আটক করে, ও তাহার পরিবর্ত্তে জ্ঞানে আর এক বস্তু আনিয়া দাঁড় করায়—কি? না আশয়-সমন্বিত জড়বস্তু। স্ববিরোধিতার অন্ধকূপ হইতে আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুর এক যা পলাইবার পথ (কি না একজাতীয় জ্ঞানে তাহা উপলব্ধি-গম্য না হউক্ আর এক জাতীয় জ্ঞানে তাহা উপলব্ধি-গম্য)—এইবারে তাহা জন্মের মত অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

স্ববিরোধিতা জ্ঞান ছাড়াইয়া জ্ঞানের বিষয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করে॥ ১৭॥

কেহ মনে করিতে পারেন যে, আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুর জ্ঞানই স্ববিরোধী—আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু নিজে তাহা নহে। এ ভ্রমটি স্বাভাবিক কিন্তু গুরুতর; ইহার অপনয়নার্থে আমরা এইটি দেখাইতে চাই যে, ঐ যে স্ববিরোধ, উহা শুদ্ধ কেবল জ্ঞানেতেই আবদ্ধ নহে—জ্ঞানের বিষয় পর্য্যন্ত উহা দ্বারা কলুষিত হয়। এমন হইতে পারে যে, শুদ্ধ কেবল জ্ঞান-মাত্রই স্ববিরুদ্ধ—জ্ঞানের বিষয় অবিরুদ্ধ। মনে কর জ্ঞানের এই একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম স্বীকৃত হইল যে, বস্তু সকল তখনই কেবল জ্ঞাত হইতে পারে, যখন তাহারা জ্ঞান-সন্নিধানে উপস্থিত হয়। ইহাতে দাঁড়ায় শুধু এই যে, অনুপস্থিত বস্তু-সকলের—জ্ঞানই—কেবল স্ববিরোধী, তদ্ভিন্ন এরূপ দাঁড়ায় না যে, অনুপস্থিত বস্তু-সকলও স্ববিরোধী। তাহারা আপাততঃ জ্ঞানে উপস্থিত নাই—এই পর্য্যন্ত, এ নহে যে, তাহারা মূলেই জ্ঞানে উপস্থিত হইতে পারে না। আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুর জ্ঞান যদি শুদ্ধ কেবল অবস্থা-বিশেষে স্ববিরোধী হইত, তাহা হইলে এরূপ বলা যুক্তি সিদ্ধ হইত না যে, আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু নিজে স্ববিরোধী; কেননা যাহার জ্ঞান এক অবস্থায় স্ববিরুদ্ধ, আর এক অবস্থায় অবিরুদ্ধ, তাহার জ্ঞান একান্ত অসম্ভব নহে ও যাহার জ্ঞান একান্ত অসম্ভব নহে তাহা স্ববিরোধী নহে। জ্ঞান-সিদ্ধি অবশ্য সাধন-বিশেষকে অপেক্ষা করে; সেই সাধনের ত্রুটিবশতঃ আমরা যদি জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হই—তবে আমরা আমাদের নিজের দোষেই অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হই। আমাদের নিজের এই প্রকার দোষ আমরা যদি আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুর স্কন্ধে চাপাই—আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুর উপস্থিতিকালে আমরা ঘুমাইয়াছিলাম অথবা আর কোন বিষয়ে ব্যাপৃত ছিলাম বলিয়া যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত করি যে, উক্ত জড়বস্তু নিজে স্ববিরোধী, তবে ঐ নিরীহ জড়বস্তুটির উপর নিতান্তই অন্যায় শক্ত বিচার প্রয়োগ করা হয়। এরূপ স্থলে আমাদের—জ্ঞানই—কেবল স্ববিরোধী, তদ্ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় স্ববিরোধী নহে। এরূপ স্থলে জ্ঞানের বিষয় আপাততঃ (অর্থাৎ যতক্ষণ না জ্ঞান-সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছে ততক্ষণ) জ্ঞানের অগম্য—এই পর্য্যন্ত, এমন নহে যে, তাহা একেবারেই জ্ঞানের অগম্য।

আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু নিজে স্ববিরুদ্ধ॥ ১৮॥

কিন্তু এখানে আমরা যে স্ববিরোধিতার কথা উল্লেখ করিতেছি তাহা স্বতন্ত্র প্রকার। জ্ঞানের ভিত্তি মূল সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের সহিত আমাদের আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমরা বলি যে, কোন বস্তু জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে হইলে, জ্ঞান-সমক্ষে একা-কেবল সেই বস্তুটি উপস্থিত থাকিলে চলিবে না—তাহার সঙ্গে জ্ঞাতাকেও জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত থাকা চাই। ইহা হইতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, অহংপদার্থ জ্ঞেয় বিষয় মাত্রেরই একটি সার ভূত অংশ (৬ সিদ্ধান্ত, ৩ পরিচ্ছেদ দেখ)। সেই সারাংশটি বাদে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু;

কাজেই তাহা স্ববিরোধী। তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। তাহা যে কেবল আপাততঃ অবিজ্ঞাত তাহা নহে—তাহা একান্তই অবিজ্ঞেয়। এখানে স্ববিরোধিতা শুধু কেবল জ্ঞানকে নয়—জ্ঞানের বিষয় পর্য্যন্তকে আক্রমণ করিতেছে। কেননা, জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেই আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, যে-কোন বিষয় যে-কোন জ্ঞানে যখনই উপস্থিত হউক্ না কেন—তাহাই প্রত্যক এবং পরাক্ এই দুই অংশের সঙ্ঘাত। জ্ঞানগত এবং বিষয়-গত স্ববিরোধিতার মধ্যে প্রভেদ যে কিরূপ তাহা নিম্নের উদাহরণ দৃষ্টে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। চক্র অথচ তাহা প্রত্যক্ষেও উপস্থিত নাই; ভাবনাতেও উপস্থিত নাই এরূপ চক্রের "জ্ঞান" স্ববিরোধী। এ স্ববিরোধিতা আমাদের জ্ঞানেতেই আবদ্ধ—চক্রকে উহা স্পর্শ করে না। আর একদিকে দেখা যায় যে, কেন্দ্রহীন চক্রের জ্ঞান শুধু নহে—কিন্তু কেন্দ্রহীন চক্র নিজে—স্ববিরোধী। কেন্দ্রহীন চক্র একান্তই স্ববিরোধী। আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তুর স্ববিরোধিতা অবিকল এইরূপ। কেন্দ্র (যাবতীয় জ্ঞাত চক্রের কেবল নয় কিন্তু) যাবতীয় জ্ঞেয় চক্রের সারভূত অংশ এই জন্যই কেন্দ্রহীন চক্র স্ববিরোধী. আশয়ও তেমনি (যাবতীয় জ্ঞাত বিষয়ের কেবল নয় কিন্তু) যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের সারভূত অংশ এই জন্যই আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু স্ববিরোধী। অতএব ইহা সুনিশ্চিত যে, আশয়-ভ্রষ্ট জড়বস্তু নিজে স্ববিরোধী। এখানে জ্ঞানও যেমন—জ্ঞানের বিষয়ও তেমনি—উভয়েই স্ববিরোধিতা দোষে দূষিত। এমন একটি বস্তু যাহা আর একটি বস্তুকে ছাড়িয়া একাকী জ্ঞানে উপলব্ধিগম্য নহে, তাহাকে স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিতে গেলে কাজেই তাহা স্ববিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

ব্রহ্ম-দর্শন।

ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি বহির্জগতের সঙ্গে মনুষ্যের যোগ। মনুষ্য নয়ন মেলিয়াই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আপনার সম্মুখে দেখে; তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলই তাহার জ্ঞানের বিষয়। মনুষ্য যে কয়েকটি মানসিক বৃত্তি লইয়া এখানে আইসে তাহার মধ্যে বস্তুজ্ঞান লইয়া মনের কার্য্যের সূচনা হয়। মনুষ্য এক দেখে আবার দেখিতে চায়, এক শুনে আবার বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়, এইরূপ বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্যের অবধি নাই। নানা ভাবের নানা পদার্থ ইন্দ্রিয়-যোগে অনুভব করিতে করিতে সে চিন্তা করিতে থাকে, দেখে স্পষ্ট বুঝিতে থাকে এই এই জ্ঞানে সাদৃশ্য বা প্রভেদ আছে, কখন বা পূর্ব্বলব্ধ কোন সুখকর জ্ঞানের অংশ স্মরণ করিয়া সেই জ্ঞানের বিষয়কে প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত হয়। এইরূপে বাহ্য বিষয়ের সহিত বহিরিন্দ্রিয় যোগে যতই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, ততই চিন্তা সহজ ও সামান্য হইতে ক্রমে জটিল ভাব ধারণ করিতে থাকে। যে সকল বস্তুতে আমরা অধিক প্রীতি পাই, যাহার আলোচনায় মনে অদ্ভুতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, কেবল তাহা লইয়া সম্ভোগ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ হয়। এ অবস্থায় পৃথিবীই আমাদের জ্ঞানের বিষয়, এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই আমাদের তাবৎ, সুতরাং চিন্তা একণ ভাবাপন্ন ও জড়জগৎ লইয়া উন্মত্ত। এ অবস্থায় মনুষ্য পৃথিবীর কীট, রূপজ মোহ আসিয়া সহজে তাহাকে মোহিত করিয়া ফেলে, গীতবাদ্যের আকর্ষণ, সুগন্ধি কুসুমের আঘ্রাণ, সুকোমল বস্তুর স্পর্শ, সুমধুর বস্তুর রসগ্রহণ তাহার সর্ব্বস্ব বোধ হয়। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুখ, বিমল আন-

ন্দের আদর্শ কোন মতেই মনে মনে গঠন করিতে পারে না। বাহ্য জগতই তাহার সর্ব্বস্ব, সে পৃথিবীর অতীত কোন বিষয় মনে স্থান দিতে চাহে না। সে পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধিকে করায়ত্ত করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয় সমূহে পরিবৃত থাকিবার জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে থাকে। "নাল্পে সুখমস্তি" এই মহাবাক্যের ক্ষীণ ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না।

যখন কামনার বিষয় সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে সুখী মনে করিতে যায়, শুষ্ক হৃদয় হইতে কোন উত্তরই প্রাপ্ত হয় না। তথাপি কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এমন সময়ে নশ্বর জগতে নশ্বর সুখের উপাদানের স্খলন হইল, বিষয়ী সচকিত হইয়া ইতস্তত লক্ষ্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তথাপি আপনার ভ্রান্তি বুঝিল না। আবার প্রিয়বস্তুর বিনাশ তাহার মর্ম্মস্থান প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। এবার ভ্রান্তির মূলে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। পৃথিবীর সুখের অসারত্ব তাহার অন্তরে জাগিল। এবার অসার সংসারের সেবা তাহাকে আর আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তখন সে শোকে তাপে নিরাশায় জর্জ্জরিত হইয়া উপায়ান্তর দর্শনে কৃতসংকল্প হইল। এ অবস্থা তাহার কি অশান্তির অবস্থা। যে কল্পনাকে এতদিন হৃদয়ের কোমল প্রদেশে যত্নের সহিত পোষণ করিতে হইয়াছিল; পরীক্ষায় তাহার অসারত্ব অনুভব করিয়া তাহাকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে। কি ঘোর পরিতাপের বিষয়! এক দিক হইতে প্রবঞ্চিত ও বিতাড়িত হইয়া সহজেই তাহার নয়ন মন ভিন্ন দিকে প্রধাবিত হইল। সাংসারিক সুখের ভিত্তিমূল যে বিলক্ষণ অসার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। কোথায় সুখ কোথায় আনন্দ ইহা লইয়া অন্তর প্রদেশে এক মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয় সকলকে ক্ষণকালের জন্য নিরস্ত করিয়া স্থিরভাবে চিন্তা করা সহজ ব্যাপার নহে। তখন সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ইহাই কি আমার তাবৎ। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি কোথায় যাইব, "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতং বাচমিমাং বদন্তি. চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবোযুনক্তি" কাহা দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মন স্ববিষয়ে গমন করে? কাহা দ্বারা নিযুক্ত হইয়া প্রাণ স্বীয় কার্য্য নিষ্পন্ন করে? কাহা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বাক্য নিঃসরণ হয় আর কোন্ দীপ্তিমান কর্তা চক্ষু শ্রোত্রকে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে নিযুক্ত করেন? এইরূপ আত্মজিজ্ঞাসা মনোমধ্যে উদিত হইয়া অল্পে অল্পে হৃদয়াকাশ হইতে মোহমেঘ অপসারিত করিয়া দিয়া কার্য্যের পশ্চাতে কারণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে থাকে? তখন আর এক জগতের ছায়া চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন সৃষ্টির অন্তরালে স্রষ্টাকে সসীমের ভিতরে অসীমের আভাস প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত সৃষ্টি কৌশলে তাঁহার অনুপম জ্ঞান, তাঁহার অতুলন পালনী শক্তি, মনুষ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া সেই পাষাণসমান সংসারীর অন্তরে প্রেমের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে, কৃতজ্ঞতা ভরে চক্ষু জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে।

তখন সেই কৃতপুণ্য সংসারী তাঁহারই প্রসাদে তাঁহার পথের পথিক হইয়া আপনার গন্তব্য পথকে পরিচ্ছন্ন দেখে, জগতের আপাত প্রতীয়মান সামঞ্জস্যশূন্য ঘটনার রহস্য বুঝিতে পারে। ধর্ম্মের বীজ অন্তরে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আত্মার

অনবরত, নিজ নিজ দায়ীত্ব মনে প্রতিভাত হয়। আনন্দপ্রদ ব্রহ্মের পবিত্র উপাসনায় উন্মত্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যশ্রেণী হইতে স্খলিতপদ হন না। তাঁহার ধ্যান ধারণা সেই সাধকের এমনই সুমিষ্ট বোধ হয়, যে ক্ষণস্থায়ী বিষয়-সুখ আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইতে থাকে, ততই বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগের খর্ব্বতা হইতে থাকে। যতই বহিরিন্দ্রিয়গণের কার্য্যের প্রসর অল্প হইতে থাকে ততই ধ্যান ধারণা সুদৃঢ় ও প্রেম ভাব ধারণ করিতে থাকে। একদিকে হৃদয় হইতে বিষয়সুখলিপ্সার অন্ত আর এক দিকে সত্য কিরণে অন্তরাকাশে প্রেম-সূর্য্যের উদয় প্রকাশমান হইয়া উঠে। যে হৃদয় এতদিন বাহ্য বিষয় হইয়া বিভোর ছিল, যেখানে অমানিশার ঘোর অন্ধকার রাজত্ব পাতিয়াছিল, সেই খানে ক্রমে ক্রমে অন্ধকার তিরোহিত করিয়া দিয়া প্রেম-চন্দ্রের উদয় হইল।

চক্ষুতে বালুকাকণা পতিত হইলে যেমন ধরাপৃষ্ঠ দর্শন করিবার ক্ষমতা চক্ষু হারাইয়া ফেলে তেমনি আমারদের আত্মারূপ ক্ষুদ্র দর্পণে সেইরূপ অবিদ্যা আসিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিলে অনন্ত ঈশ্বরকে ধারণ করিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া যায়। অকম্পিত সাগরবক্ষে যেমন চন্দ্রের কিরণ সহজেই প্রতিফলিত হয়, বিষয়রাগাদি পরিশূন্য মানবাত্মায় অশরীরী পরমেশ্বর সেইরূপ প্রকাশিত হয়েন। বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করিতে পারিলে মন শান্তভাব ধারণ করে। তখন বোধ হয় যেন জগতে আর কিছু নাই, সৃষ্টের মধ্যে আমি, আমি ভিন্ন যেন আর সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যেন লয়ের সাক্ষী স্বরূপ একাকী আছি। মনকে এইরূপ অবস্থায় আনয়ন করিতে পারিলে তবে গঙ্গা ও সরযূ সঙ্গমের ন্যায় মন ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। আপনার সত্ত্বা ও জগতের সত্ত্বা বা দেশ কাল সকলই ভুলিয়া যাই। দুই মিশিয়া যেন এক হইয়া যায়। আপনার অস্তিত্বকে আর খুঁজিয়া পাই না। যেন পরমাত্মাই সব আমি যেন তাঁহার অস্তিত্বের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি।

এ অবস্থা মনুষ্যের বাঞ্ছিত অবস্থা। এ অবস্থা স্থায়ী করিতে পারিলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। আমরা বিষয়াকৃষ্ট জীব। এরূপ পবিত্র সঙ্গম আমারদের জীবনে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ক্ষণিক হইলেও অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া নিরাশার সাগরে মগ্ন হইয়া প্রতারিত হওত তাঁহার অনন্ত পথের যাত্রী হইয়া আপনাকে সাধন তপস্যার গুণে পবিত্র পরিশুদ্ধ করিতে না পারিলে আর এমন দেবদুর্লভ ব্রহ্মদর্শন জীবনে পাই না। কোথায় আমরা মর্ত্ত্যের জীব, স্ত্রী পুত্র পরিবার আহার বিহার [illegible] লইয়া ব্যতিব্যস্ত, আমারদের চেষ্টা কোথায়, সাধন কোথায় যে তাহার গুণে দেবপদবীতে আরোহণ করিতে পারিব। আমারদের পাথেয় কোথায় যে ব্রহ্মদর্শনে গমন করিয়া আপ্তকাম হইয়া আসিব। যাইতে যাইতে আমারদের সম্বল ফুরাইয়া যায়; তাই আমরা তাঁহার উপাসক হইয়াও হৃদয়ের অশান্তির পরিহার করিতে পারি না। ব্রহ্মদর্শন এরূপ সাধনের পুরস্কার নহে। আপনাকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের যোগ্য করিলে তবে তিনি কৃপা করিয়া আমারদের মনকে দর্শন দিবেন। তিনি ত হৃদয়াসন অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আমরা যে লৌহ কবাটে উঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।

ব্রহ্মকে দর্শন করিবার একমাত্র উপায় আছে। চরিত্রকে পরিশুদ্ধ কর, ইন্দ্রিয়-গণকে সুশাসিত কর, ব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা কর, তাঁহার নাম লইয়া ওঁ বলিয়া বা গায়ত্রী যোগে বা অপর কোন অভিমত নাম লইয়া পুনঃপুন তাঁহার বিষয় চিন্তা কর, শরীর মন বাক্য এই কার্য্যে নি-য়োগ কর, দেখিবে এইরূপ কায়মনোবাক্যে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মন স্থির হ্রদের ন্যায় নিশ্চল হইয়া আসিবে। এইরূপ নির্জ্জন যোগে মন শান্তভাব ধারণ করিলে তবে ব্রহ্মদর্শন হয়।

তর্ক বিচার ও যুক্তিবলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে পৌঁছান, ইহাই আমাদের যথেষ্ট নহে। তিনি আমাদের লাভ করিবার বস্তু। তাঁ-হাকে হৃদয়াকাশে সকল সময়ে অনুভব করিতে হইবে। তাঁহাকেই গতিমুক্তির এক-মাত্র নিদান জানিয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে যে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সংযমের আবশ্যকতা এত বিশেষরূপে কথিত আছে তাহা কেবল তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য। কেহ কেহ মনে করেন যে তাঁহাকে কারণের কারণ ও সকলের মূলাধার জানিলেই যথেষ্ট হইল। তাঁহাকে আবার লাভকরা কি? ইহার উত্তরে তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে সাংসারিক সুখ উপভোগ হইতে যেমন তাঁহাকে জানিতে পারিবার অবস্থা উচ্চ, তেমনি তাঁহাকে লাভ করিবার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহাকে বিশেষ রূপে অনুধাবন করিলে মনুষ্য তাঁহাকে লাভ না করিয়া কোন মতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না। আমরা যাহাকে বলি এ অবস্থা তাঁহাকে জানিবার অবস্থা সে অবস্থা বাস্তবিক তাঁ-হাকে জানিবার অবস্থা হইলে আর মনুষ্য নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিত না। তাঁহার জ্ঞানে এতই মাধুরী যে সে অমৃতের আস্বাদ পাইলে কাহার সাধ্য তাহাকে তাঁহার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয়। ইন্দ্রিয়-লোল্য জন্য চিত্ত বিক্ষেপ দূর করিয়া জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম-স্বরূপ দর্শন কর। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়-মানঃ।

নিশীথ কাল।

(সহসা সুপ্তোত্থিত জন)

ঘুমাইয়া অনন্ত আকাশ
চারিধারে শান্তির আভাস
তারকারা শুধু জেগে একা
আর কারো—কারো নাই দেখা!
জলদের খণ্ড ভেসে যায়
নীরবে বিশ্বের গান গায়
জুড়াইয়া তাপিত হৃদয়
ব'হে যায় মৃদুল মলয়
ঝুরু ঝুরু ঝুরু তরুগুলি
ছাড়ে তান সুখে ভালাভুলি
বিহরিছে ফুলে ফুলবনে
ঝোঁপ ঝাঁপ আকাশের তলে
বাদুড় পেচক পাখাদল
অন্বেষয়ে আহার সম্বল।
ওঠে ডেকে কাঁপায়ে প্রহরে
থেকে থেকে কর্কশ স্বরে।
স্তবধ আকাশ ভেদি ঝরে
সুধাপাণী ধরণীর পরে
যেথায় তৃষিত মর্ম্ম যত
করে পান নিজ সাধমত।
সুদূরে পথিক যায় চ'লে
আঁধারে একা কি যায় ব'লে!

অসীমের প্রতিধ্বনি তায়
ওঁং, ফুটে ওঠে ছুটে যায়।
প্রতিপ্রাণে বিদ্যুতের প্রায়
চকিতে চমক দিয়ে যায়।
জেগে ওঠে অস্ফুট পিরীত
টুটে যায় বিষাদ অহিত
সুললিত সকলি মধুর।
নেচে ওঠে পরাণ বিধুর
হেরে, স্নিগ্ধ প্রেমের শয়নে
বিভোররে প্রেমের স্বপনে
ঘুমাইছে জগত নীরব।
নিনাদিত অনন্তের রব।

উপাসনা।

আইস অনন্তদেব
আইস আমার চিতে
হৃদয় আকুল হয়ে
এসেছে তোমায় নিতে।
মিশাও তোমার সাথে
তুমি আমি এক হই
চাহি না দেখিতে কিছু
তোমাতেই ডুবে রই।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক
মহাশয়েষু।

আজ কাল একটী কথা উঠিয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজে শান্তি নাই। ব্রাহ্মগণ যেরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানে রত, তাহার উপযোগী আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে তাহাদিগের নিষ্ঠা নাই। লব্ধ জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য তাহাদিগের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা নাই। তাহাদিগের সাহায্যে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে যোগ সাধন হয় না। ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ দোষারোপ করিয়া কেহ কেহ ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিতেছেন। একি অসহনীয় কলঙ্ক!! এ কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্ত যদি আমরা বদ্ধপরিকর না হই তবে কিসের জন্য জীবন ধারণ। আমরা কি বিস্মৃত হইয়াছি যে ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা উপনিষদ কালাবধি যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, তাহা জাতি, ধর্ম্ম গ্রন্থ বিশেষে বদ্ধ ও ব্যক্তিগত। যাহাতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ মিলিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ও মুক্ত ভাবে অর্থাৎ জাতি, বর্ণ নির্ব্বিশেষে সত্য শাস্ত্র মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আপনাদিগের উন্নতিশীল নিত্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন তাহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা কি জানিনা যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার সংগ্রহ।" ও "ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান, গ্রন্থ, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। যাহা যখন যেখানে সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।" আমরা কি বিদিত নহি যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম মার্জ্জিতবুদ্ধি উন্নতমনা লৌকিক শ্রদ্ধাবান্ ঋষিদিগেরই গ্রহণোপযোগী ধর্ম্ম।" আর "ঋষিজীবন স্থান, কাল ও সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে।" সকল দেশে ও জাতিতে উহা দৃষ্ট হয়। যিনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মঙ্গলময়ের সত্য, নিত্য, মঙ্গলপূর্ণ অভয় চরণে বাস করিয়া আপনার শরীর মনের সুস্থতা ও নির্ম্মলতা ও তাঁহাতে জ্ঞান জ্যোতি আনন্দ, অমৃত, শান্তি, মঙ্গল পবিত্রতা ও শোভা ভোগ করেন, আর পরের নিত্যোন্নতি ও মঙ্গল সাধনে যত্নশীল থাকেন তিনিই ঋষি।" ঈদৃশ মহৎ, উদার ব্যাপক উন্নতিশীল ও নিত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুগত জীবনে কি শান্তি নাই? সে জীবন লব্ধ সত্যে সত্যময় হয় না? তাহাতে ব্রহ্মযোগ সাধন হয় না? একি ভয়ানক কথা! এ দুর্ব্বিষহ শোচনীয় কলঙ্ক কেন উঠিল। ইহারই জন্য যে দেখিতেছি আমাদিগের কতিপয় ভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বীতরাগ হইয়া নিজ নিজ নিত্য মঙ্গলোন্নতি সাধন নিমিত্ত উপায়ান্তর গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। আর কত ভ্রাতৃগণ যে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন কে জানে। ব্রাহ্মগণ! এই বিষম নিন্দাবাদের কারণ একবার অনুসন্ধান করুন দেখি, আমার যেন মনে হইতেছে যে আমরাই ইহার কারণ। আমরা কি পবিত্র ও উন্নত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি? আমাদিগের কি মান ও অপমান সমজ্ঞান হইয়াছে? আমরা কি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু তৃণের ন্যায় বিনীত হইয়াছি? আমরা কি আমাদিগের পাশব জীবনকে দেব জীবনে পরিণত করিতে পারিয়াছি? আমরা কি প্রাণেশ্বরের বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম সদা জপ করিয়া থাকি? কি গৃহে, কি বাহিরে, কি সজনে, কি নির্জ্জনে, কি কার্য্যালয়ে কি উপাসনালয়ে কি শয়নে কি স্বপ্নে, কি ইচ্ছাপ্রকাশে, কি আত্মালাপে কি আহার বিহারে, আমরা কি তাঁহার শত শত নামের মধ্যে কোন না কোন প্রাণের প্রিয় নাম স্মরণ বা মনন করিয়া থাকি? প্রাণেশ্বরের প্রাণের প্রিয় নামসুধা কি আমরা আমাদিগের প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে পান ভোগ করিয়া থাকি? তাঁহার সঙ্গ

কালীন নিত্যানন্দ ভোগ জন্য কি আমরা লালায়িত হইয়া থাকি? অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় আমরা কি আমাদিগের মন, মন প্রাণ তাঁহার পবিত্র ও মঙ্গলপূর্ণ চরণে স্থির রাখিবার অভ্যাস করিতেছি? আমাদিগের অশন, বসন কি আমাদিগের শরীর মনের সুস্থতা ও পবিত্রতা সম্পাদনের উপযোগী? আমাদিগের দৈনিক জীবন কি সুনিয়মিত ও সুশাসিত? আমরা কি আমাদিগের অহং জ্ঞান দূর করিবার জন্য প্রাণেশ্বরের নিকট দিবা নিশি এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকি যে আমাদিগের ইচ্ছা জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা ও চিন্তা, বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহার সকলই সম্পূর্ণরূপে ও নির্বিশেষে তব পবিত্রতম চরণাধীন কর? আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর আমাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই দিতে সাহসী হইবেন না। এক দিনের পর অদ্য এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় দণ্ডায়মান হইলাম। এত ব্রহ্মোপাসনা এত ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিবার পরও আমাদিগের এই দুর্বিসহ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল!! হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়, প্রাণ যে ফাটিয়া যায়!!

ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়! যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য আপনি চল্লিশ বৎসরাধিক প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, প্রচুর অর্থব্যয়, নানা ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা, ঘোরতর তর্কবিতর্ক, নানা সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন, নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ, বহুবিধ লোকনিন্দা ও আত্মত্যাগজনিত দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিলেন ও প্রাণপণে হৃদয় ও মস্তিষ্ক চালনা করিলেন, এত দিনের পর সেই আপনার ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বোক্ত দুর্বিসহ কলঙ্ক উঠিল! আপনি কি এই নিদারুণ কথা শুনিবার নিমিত্ত জীবিত আছেন? কোথায় আপনি আপনার জীবনের শেষদশায় আপনার বহুদিনের পরিশ্রম, কষ্ট ও আন্তরিক যত্নের মধুময় ফল ব্রাহ্মদিগের জীবনে ভোগ হইতেছে ইহাই শুনিবেন; কোথায় আপনি দেখিবেন যে বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মযোগ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন ও তজ্জনিত তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর দেশে তাঁহারা নিত্যশান্তি, আনন্দ ও পবিত্রতা ভোগ করিতেছেন; কোথায় ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মপ্রীতি সুধাতে দিন দিন অধিকতর মত্ত হইতেছেন; কোথায় তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস পান করিয়া ব্রহ্মসত্তাসাগরে আপনাদিগের মন প্রাণ সদা নিমগ্ন রাখিতে সমর্থ হইবেন; কোথায় তাঁহারা প্রতিদিনের অবলম্বিত ব্রহ্মভক্তির আশ্রয় গ্রহণে আত্মসমাধান তাঁহাদিগের দেহ, মন, প্রাণ পবিত্র করিয়া নিত্য শান্তি, আনন্দ ও মঙ্গল ভোগ করিতে দুর্ব্বলমনা ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে প্রেমভরে শান্তিময় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবেন, না ব্রাহ্মদিগের [illegible] বিচ্ছিন্নতা, [illegible]দর্শিতা, সাধারণমঙ্গলজনক বিবিধ কার্য্যে যত্নশিথিলতা, অপ্রসারিত প্রেম ও [illegible] দারিদ্র্য!! হায়! হায়! এ দুর্দ্দশা কেন [illegible] অহো! এই অনিত্য অমঙ্গলের মূলে দেখিতেছি নিত্য মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ হস্ত। তিনি এই অনিত্য অমঙ্গল নিত্য মঙ্গলে পরিণত করিবেন বলিয়াই [illegible] বিয়োগ এত শোক বিলাপ! আর্য্য! আপনি অধিকতর জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা বিতরণ করিবার জন্য আর কিছু দিন আমাদিগের নিকট এই মর্ত্তালোকে অবস্থান করুন। আপনার সেই সঞ্চিত জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতা আপনি একা কখনই ভোগ করিতে পারিবেন না। আপনার উদার ও প্রসারিত প্রেম ও প[illegible] কনিষ্ঠ ও দুঃখী ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের জীবনের বিধানে আপনাকে বাধ্য করিবে। ইহা ধ্রুব ও সত্য। ইহার অন্যথা কখনই হইবে না। আপনার এক একটী কথা অমূল্য ও এক একটী উপদেশ অমূল্য এবং আপনার জীবনও অমূল্য। আর্য্য! আপনি এক্ষণে ঈশ্বর প্রসাদে আর কিছু দিন পৃথিবীতে থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। দেখিবেন [illegible] যে সকল সত্যমূলক জ্ঞান ব্রাহ্মসমাজে লাভ [illegible] পাইছি ও করিব তাহা যেন আমাদিগের জীবনে পরিণত হয়, তাহা যেন জীবন্ত ভাবে আমাদিগকে ধর্ম্মের [illegible] হইতে উচ্চতর সোপানে উত্থিত করিতে পারে। এই অতি প্রার্থনীয় ফললাভ হয় না বলিয়াই [illegible] নিন্দাবাদের অশ্রাব্য রব আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। আবার যাহাতে আমাদিগের লব্ধ জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার স্থায়ীভাব আমরা আমাদিগের জীবনে ধারণ করিতে সমর্থ হই, তদ্বিষয়ে আপনি আমাদিগকে আপনার শ্রেয়স্কর সহায়তা প্রদানে যত্নশীল হউন।

কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান মাস হইতে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, আদি ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক [illegible]।